দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত

অনুবাদক
শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মূল্য—এক টাকা

অনুবাদকের নিবেদন

আমরা বাঙ্গালীরা বাংলার বাহিরের কথায় বড় সহজে কান দিতে চাই না। আজকালই কম কান দিতে চাই—তখন, ১৯০৬ সালে ত আরো কম পরের কথা শুনিতে চাহিতাম; তাহার প্রমাণ গান্ধীজী নিজে। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় মজুরদের দুর্দ্দশার কথা দেশকে শুনাইতে চাহেন। তাঁহার কথা পুনা ও বোম্বাইয়ের লোকেরা মন দিয়া শুনে। তাঁহাকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে ও যে সহানুভূতি এই দূরদেশের ছেলেদের জন্য ভারত-মায়ের কাছে গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন তাহা তিনি পুরাপুরি পান। কিন্তু যখন বাংলায় আসেন তখন দেখেন শক্ত ব্যাপার; বাংলার দেশী সংবাদপত্রওয়ালারা ত তাঁহাকে আমলই দেন না। সভা করিবেন, কিন্তু তাহাই কি করা যায়! নানাস্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়া তিনি হয়রাণ হন। কলিকাতার লোকেরা দক্ষিণ আফ্রিকা বুঝে না, তাঁহাদের কথা শুনিতে চাহিবে না—এই প্রকার তখনকার নেতারা মনে করিতেন। আজও যে এই অবস্থার খুব পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা মনে হয় না।

জেলের ভিতর 'ইয়ং-ইণ্ডিয়া' আনিতে চাহিলে দেওয়া হয় না; গ্রেগ সাহেবের লেখা "খদ্দরের অর্থশাস্ত্রে" বহিখানা পর্য্যন্ত বারণ। কি জানি খদ্দরের ভিতর আবার কি গোলমালের কথা থাকিবে—এই ত জেল-কর্ম্মচারীদের বিশ্বাস। তাঁহারা কিন্তু 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ' বহিখানা জেলের ভিতর প্রবেশ করিতে দেন। আমার মনে হয়, ইহার কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস—দক্ষিণ আফ্রিকাতেই হোক্ বা হনলুলুতেই হোক্, সেখানে সত্যাগ্রহ হয় না, কি হইয়াছে, উহাতে এ দেশের কিছুই

আসে যায় না। মোদ্দাকথা বইখানা জেলে প্রবেশের জন্য পাশ পায়। সেইখানেই আমি উহার তরজমা করিয়াছিলাম।

এক্ষণে ছাপাখানার বাড়ীতে অনেক দিন থাকিয়া 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ' পাঠকদের নিকট উপস্থিত হইল। আশা করি, পাঠকগণ দক্ষিণ আফ্রিকার দূরত্ব ও উহা যে বিদেশ—একথা ভুলিয়া গিয়া, উহা যে আমাদের দেশের ভাইদেরই দেশ, ওখানে যে সত্যাগ্রহ হয় তাহার সহিত ভারতবর্ষেরই নাড়ীর যোগ ছিল ও বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ আন্দোলন যে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহেরই সন্তান—এইকথা ভাবিয়া ইহা পড়িতে প্রস্তুত হইবেন। একবার রস বোধ করিলে, আখ্যানভাগ নিজ আকর্ষণেই পাঠককে মুগ্ধ করিবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

বহিখানা গান্ধীজী জেলে বসিয়া লিখিয়াছিলেন। কোনও কাগজ পত্র হইতে দিন তারিখ, লোকের নাম ইত্যাদি দেখিয়া লওয়ার সুযোগ তিনি পান নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাঁহার মূল গুজরাটী লেখায় ও ভালজী দেশাইর অনুবাদে আমি তফাৎ দেখিতে পাইলাম না। কেবল দুইটি স্থানে নামে মাত্র তুচ্ছ তফাৎ আছে। অথচ ভালজ দেশাই তৎকালীন কাগজ পত্র দেখিয়া সংশোধিত করিয়া গান্ধীজীর গুজরাটী হইতে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। ধন্য স্মৃতিশক্তি গান্ধীজীর।

পাঠকগণকে এক্ষণে গান্ধীজীর ভাষায় তাঁহার যুগান্তকারী সত্যাগ্রহ-তথ্য আবিষ্কারের ও তাহার প্রয়োগের কাহিনী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল
জানুয়ারী, ১৯৩১।

বিনীত—
শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

প্রকাশকের নিবেদন

গান্ধীজীর প্রশংসমান দৃষ্টি বাংলার উপর বরাবর রহিয়াছে। বাংলার সহিত প্রেমের সম্পর্ক বর্দ্ধিত হোক, এই ইচ্ছা তাঁহার তীব্র রহিয়াছে। বাঙ্গালীর বাংলা সম্বন্ধে যে প্রকার অভিমান আছে, বাঙ্গালীর সম্বন্ধে অভিমান গান্ধীজীর তদপেক্ষা কম নয়। বাংলার কৃতী-পুরুষেরা তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্তলে স্থান অধিকার করিয়া আছেন। আজ বাংলার অনেক নর-নারীর সহিত তিনি আত্মীয়তার সম্পর্কেই বদ্ধ।

তাহা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে তাঁহার মত, তাঁহার ভাব-ধারা এখনো তেমন করিয়া অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধীজীকে ভালবাসিলেও বাংলার সমাজের উপর তাঁহার প্রভাব আরও অধিকতর হওয়ার অবকাশ রহিয়াছে। বাংলাদেশের শিক্ষিতদের ভিতরেও অনেক লোক গান্ধীজীকে ভাল করিয়া জানেন না। তাঁহার প্রতি একটা বিরাট শ্রদ্ধা আছে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাঁহার মতবাদের সহিত, তাঁহার জীবন-ধারার সহিত অনেকেই ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত নহেন। গান্ধীজীর জীবনী, গান্ধীজীর সৃষ্ট সাহিত্য, গান্ধীজীর ভাব-ধারার ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারাই এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে পারে। সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইলে বাংলার শুভ, ভারতবর্ষের শুভ।

এই ইচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া গান্ধীজীর লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি বাংলার পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যাহাতে গান্ধীজীর লেখা সকলেই পড়িতে পারেন, সকলেই গান্ধীজীকে জানিতে

পারেন, সে জন্য খুব অল্প মূল্যে তাঁহার লেখার অনুবাদগুলি বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—গান্ধীভাষ্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গান্ধীজীর নিকট অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থ। তিনি জীবনের ও ধর্ম্মের মূল সূত্র ইহাতেই পাইয়াছেন এবং গীতার উপদেশ অনুযায়ী আচরণ করার জন্য তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা গত ৩৮ বৎসর চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। গীতার যে অর্থ তিনি জীবনে ও আচরণে সত্য করিয়া তুলিয়াছেন, সেই অর্থ এই ভাষ্যে ও অনুবাদে তিনি দিয়াছেন। "গীতা প্রবেশিকা" নাম দিয়া এই গ্রন্থখানার প্রথম ভাগে সতীশবাবু গীতার ধর্ম্মের দার্শনিক অংশ আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের ভাবার্থ থাকায় সমস্ত বিষয়টা চিত্রবৎ পরিস্ফুট হওয়ার সুবিধা হইয়াছে। গীতার অপরে যে স্থলে যুদ্ধের প্ররোচনা দেখিয়াছেন, গান্ধীজী সেখানে অহিংসার প্রতিষ্ঠা দেখিয়াছেন। ইহাতে গান্ধীজী তর্ক করেন নাই, কাহারও মত খণ্ডন করেন নাই, গীতাকেই গীতার টীকা জ্ঞান করিয়া যে অর্থ পাইয়াছেন ও যে অর্থ অনুযায়ী আচরণের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জগতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার আত্মকথা পাঠ করা যথেষ্ট নহে, তাঁহার গীতাই প্রথমে পাঠ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

তাঁহার গীতা-ভাষ্য তাঁহার জীবনের সাধনার প্রেরক, তাঁহার আত্মকথাদি গ্রন্থের ভিতর দিয়া সেই জীবনের ও সেই সাধনার পরিচয় তিনি দিয়াছেন এবং তাঁহার লিখিত 'জীবন ব্রতের' ভিতর দিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সেই মূল তত্ত্বগুলি যে ভাবে প্রয়োগ করিতে প্রয়াসী তাহা পরিষ্কার করিয়াছেন।

গান্ধীজীর লেখা এই গীতা 'অনাসক্তি যোগ' নাম দিয়া প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা অল্প দিনের ভিতরেই নিঃশেষ হওয়ায়, তাহার সহিত আরও কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সংযুক্ত করিয়া "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—গান্ধীভাষ্য" নাম দিয়া সতীশ বাবু এই গ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছেন। এই বহিখানা ৫৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আত্মকথা

তাহার পরই গান্ধীজীর 'আত্মকথা'র অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহা বাস্তবিক জীবন-কাহিনী নহে। এই গ্রন্থে গান্ধীজী নিজের জীবনটাকেই সত্যের পরীক্ষার কষ্টিপাথরে ফেলিয়া, কোথায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কোথায় হন নাই তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষার এই বিবরণ পাওয়ায়, নৈতিক জীবন উন্নত করিতে প্রয়াসী লোক মাত্রেরই লাভ হইবে। গান্ধীজীর আত্মকথা এতই চিত্তাকর্ষক ও পবিত্র জিনিষ যে, উহাতে রস পাইবে না, এমন লোক নাই। আজ যেমন লোকের গান্ধীজীর প্রতি একটা অন্ধ শ্রদ্ধা আছে, এই আত্মকথা পাঠ করিলে তাহা দৃঢ় হইয়া জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইবে এবং প্রত্যেক শ্রদ্ধালুকেই উহা নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে সাধু ও সৎজীবন যাপনে প্রণোদিত করিবে। গান্ধীজী নিজের দুর্ব্বলতার কথা এতই সাফ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহা পাঠ করিয়া দীনতম পাপীর মনেও আশ্বাস আসিবে—সে ফিরিবার পথ পাইবে।

গান্ধীজীর নানা শক্তির মধ্যে অল্প কথায় অনেক ভাব ব্যক্ত করার, সহজ ভাষায় গভীর ভাব ব্যক্ত করার একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। তিনি এই শক্তির ব্যবহার দ্বারা গুজরাটী সাহিত্যকে নবরূপ দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা গুজরাটকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গৌরব-মণ্ডিত

করিয়াছে। রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক প্রভাব ছাড়া, সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাহার প্রভাব অসাধারণ। বাংলা ভাষার সহিত গুজরাটী ভাষার খুব সৌসাদৃশ্য আছে। সেইজন্য গুজরাটী হইতে বাংলা অনুবাদে গুজরাটীতে ব্যবহৃত বারো আনা শব্দই রহিয়া গিয়াছে। ফলে গান্ধীজীর লেখার বাংলা অনুবাদেও অনেকটা গান্ধীজীর নিজের লেখার ধাঁচই রহিয়া গিয়াছে। অনুবাদ প্রায় শব্দশঃ করিতে পারা গিয়াছে, অথচ তাহাতে অর্থ প্রকাশের কোনও বাধা হয় নাই। ইহার ফলে গান্ধীজীর লেখার যে বিশেষত্ব, অর্থাৎ সহজ ভাষা ও সংক্ষেপে গভীর তত্ত্ব বুঝান, তাহা বাংলা অনুবাদে পুরাপুরি রহিয়া গিয়াছে। অনুবাদকালে কোথাও ইচ্ছা করিয়া ভাষাকে অলঙ্কৃত করা হয় নাই। সোজা লোক সোজা-ভাষায় যে সোজা কথা গুজরাটীতে বলিয়া গিয়াছেন বাংলায় তাহাই ভাষান্তরিত মাত্র করা হইয়াছে। ইহাতে গান্ধীজীর লেখার আস্বাদ, তরজমার ভিতর দিয়া যতটা পাওয়া যাইতে পারে তাহা পুরাপুরি পাইবেন। মনে হয় ইহাতে বাংলা-সাহিত্যেরও লাভ হইবে।

আত্মকথা গুজরাটীতেই গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন। উহার ইংরাজী তরজমা মহাদেব দেশাই ও প্যারীলাল করেন। ইংরাজী বই দুই খণ্ডের মূল্য সাড়ে দশ টাকা। উহা মূল্যাধিক্য হেতু ইংরাজী-অভিজ্ঞ অনেক বাঙ্গালী পাঠকেরও দুষ্প্রাপ্য ছিল। বাংলা অনুবাদের দুইখণ্ড দেড়টাকায় বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইল। এই পুস্তকগুলি যতটা সম্ভব কম দামে দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। বহিগুলির ভাষার সরলতা রক্ষা করার চেষ্টাও বরাবরই করা হইবে। ইহাতে অল্পশিক্ষিত বাংলার ভগ্নীরা, পাঠশালার গুরুমহাশয় ও পাঠশালার ছাত্রেরা সকলেই উহা পড়িতে পারিবেন—পড়া দরকার। কেবল আত্মকথা নহে গান্ধীজীর সমস্তগুলি লেখা সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

(গান্ধীর লেখার অনুবাদ)

আত্মকথার পর গান্ধীজীর গুজরাতী ভাষায় লেখা "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের" অনুবাদ প্রকাশিত করা হইতেছে। উহাও প্রায় চারিশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

গান্ধীজীকে জানিতে হইলে তাঁহার আত্মকথা পড়া চাই। কিন্তু তাঁহার আত্মকথার ভিতর অনেক ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। তিনি নিজেই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা অন্য গ্রন্থে ও লেখায় যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, আত্মকথায় তাহা লিখিতে গেলে দ্বিরুক্তি হইত।

গান্ধীজীকে জানিতে হইলে সেইজন্য তাঁহার "আত্মকথা" পড়া চাই এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যগ্রহ" ও "য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা" ইত্যাদিও পড়া দরকার। "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ" একটা সত্যগ্রহের গল্পমাত্র নহে। গান্ধীজীকে কেন্দ্র করিয়া সত্যাগ্রহ কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল, গান্ধীজীর অধ্যাত্ম জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া সত্যাগ্রহ নব নব রূপ লইতেছিল, উহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গান্ধীজী যে কালটায়, জীবনে সর্ব্বপেক্ষা অধিক ব্যাপক ও মহত্ত্বপূর্ণ পরিণাম লাভ করেন, সেই সময়টার কথা—১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৪ সালের কথা তাঁহার আত্মজীবনীতে কিছু নাই বলা যায়। তাহা এই দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে রহিয়াছে। আবার সত্যাগ্রহের দিক দিয়া এই "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ" গ্রন্থখানা আদি-গ্রন্থ। তিনি উহাতে যে সত্য অধিকার করিয়াছেন, যে ভাব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছেন। সত্য শাশ্বত। সেইজন্য তিনি যে সত্য দক্ষিণ আফ্রিকায় লাভ করিয়াছেন তাহা আজ ভারতে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন। দেশের লোককে সত্যাগ্রহী হইতে হইবে। কিন্তু সত্যাগ্রহ মূলে পদার্থটা কি, উহা যে দুই দিনের জিনিষ নয়, উহা যে আভরণের ন্যায় গায় দেওয়া ও তুলিয়া রাখার বস্তু নহে, উহা যে সত্যাগ্রহীর রক্তমাংসের সহিত জড়িত হওয়া চাই, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে পরিষ্কার করিয়াছেন।

"হিন্দ্ স্বরাজ্য"

(গান্ধীজীর লেখার বাংলা অনুবাদ)

সত্যাগ্রহ কি তাহা বুঝিতে হইলে গান্ধীজীর "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ" অবশ্যই পাঠ করা দরকার। গান্ধীজীর জীবনের বিকাশ দেখিতে হইলেও উহা পড়া আবশ্যক। কিন্তু সত্যাগ্রহ-অস্ত্র যখন গান্ধীজীর হাতে ধরা দেয়, তখন হইতেই তিনি ভারতবর্ষের দাসত্ব দূর করার জন্য উহার প্রয়োগের আয়োজন করিতেছিলেন।

ভারতবর্ষের জন্য স্বরাজ্য কি রূপ হইবে এবং কি ভাবে সত্যাগ্রহ দ্বারা উহা পাওয়া যাইবে, তাহা তিনি ১৯০৮ সালে "হিন্দ্ স্বরাজ্য" অর্থাৎ "ভারতবর্ষের জন্য স্বরাজ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। বহিখানা আজ হইতে তেইশ বৎসর পূর্ব্বে লেখা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তিনি আজ যে ভাবে ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ চালাইতেছেন তাহা এবং অসহযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার গত দশবৎসরের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা—সমস্তই "হিন্দ্-স্বরাজ্য" গ্রন্থে দেওয়া রহিয়াছে। কাজেই আজকার ভারতবর্ষের আইন-অমান্য আন্দোলন বুঝিতে হইলে উহার আদি পরিকল্পনা কি তাহা জানা দরকার। উহার ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে এ কথা বলিতেছি না। আজকার আন্দোলনের প্রতি অঙ্গের বিষয়, প্রতি ব্যবহারের বিষয় এই গ্রন্থে এমন ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িয়া মনে হয়, যেন গত ১৯৩০ সালের মার্চ্চ

মাসে আইনঅমান্য করিতে যাত্রা করিবার পথেই ঐ বহিখানা লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ বইখানার কথা গত বৎসর কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিলে তিনি বলেন যে, বইখানাতে তখনও তাঁহার একটা কথাও বদলাইবার নাই। এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থ পড়িলে, ভারতের আন্দোলনের প্রাণ যে শাশ্বত সত্য ও অহিংসার উপরেই যে তাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝা যায়। গত ২৩ বৎসরে পৃথিবীর রাজনীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ওলট পালট হইয়াছে, কত নূতন মত গৃহীত এবং পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজীর মত ও পথ অটল রহিয়াছে।

"হিন্দ্ স্বরাজ্যখানা" এই আন্দোলন বুঝার জন্য নিতান্ত আবশ্যক। উহার অনুবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে প্রথমবারকার ছাপা ২৫০০ খানা বহি নিঃশেষিত হওয়ায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

"য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা"

(গান্ধীজীর লেখার অনুবাদ)

গান্ধীজী গতবার যখন জেল হইতে বাহির হইয়া আসেন তখন "য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা" বলিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। উহাতে সত্যগ্রহীর কর্ত্তব্য কি, কোথায় অনশনব্রত লওয়া যাইতে পারে ও পারে না, গান্ধীজীর ধর্ম্মমতের বিচার, মহাভারতের সহিত গিবনের রোমের তুলনা ইত্যাদি দ্বারা নিজের জীবন ও চিন্তার ধারার সহিত পাঠকের পরিচয় করাইয়াছেন। তাঁহার আত্মকথা ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত লেখা। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের—১৯২১-২৩ এই দুই বৎসরের অমূল্য ইতিহাস এই পুস্তকে আছে। কাজেই তাঁহার আত্মকথা পাঠ সম্পূর্ণ করিতে গেলে "য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা" পড়া দরকার। যখন গান্ধীজী য়েরোড়াতে ছিলেন তখন সেইস্থানে মুলশীপেটা

সত্যাগ্রহীরাও বন্দী হইয়াছিল। এই সত্যাগ্রহীদের উপর জেল কতৃপক্ষের বিষম নির্য্যাতন চলিতেছিল। সত্যাগ্রহীরাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি সব সময় ঠিক মত ধরিতে না পারায় সংঘর্ষ চলিতেই থাকে। এই অবস্থায় গান্ধীজী সত্যাগ্রহের মূলনীতির আলোচনা দ্বারা ভবিষ্যৎ সংঘর্ষ যেমন করিয়া বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহারই অপূর্ব্ব বর্ণনা রহিয়াছে। জেলে গিয়াও সত্যগ্রহী কয়েদীরা, জেলের আদেশ অমান্য করিতে চাহেন; জেল কর্ত্তৃপক্ষকে বাধা দিতে চাহেন। কেনই বা তাহা করেন তাহার হেতু এবং কেন সত্যাগ্রহীর তাহা করণীয় নহে তাহা এই "যেরোড়া জেলের অভিজ্ঞতার" ভিতর স্পষ্ট করিয়াছেন। বস্তুতঃ সত্যাগ্রহীর পক্ষে জেলের ভিতর কি ভাবে থাকা উচিত তাহার আলোচনা এখানে যে প্রকার আছে অন্যত্র তত সুন্দর ও বিশদ ভাবে নাই।

কারাগারটা গভর্ণমেণ্টের একটা গুপ্ত বিভাগের মত, উহাতে একবার কাহাকেও ফেলিলে সে বাহ্য জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সরকারও সেখানে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন—করিয়া থাকেন। গান্ধীজী এই গুপ্ত বিভাগটির আঁধার কুঠুরীর ভিতর সূর্য্যের আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আজ কয়েক বৎসর জেলের যে সংস্কার হইয়া আসিতেছে, তাহার হেতু গান্ধীজীর এই অভিজ্ঞতাগুলি প্রকাশ করিয়া দেওয়ার ভিতর অনেক পরিমাণ রহিয়া গিয়াছে। গান্ধীজীর নিকট, হাসপাতাল যেমন শারীরিক রোগীর চিকিৎসার স্থান, কারাগারও তেমনি মানসিক রোগ চিকিৎসার স্থান হওয়া উচিত। আজ যে দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েদীকে কারাগারে পাঠানো হয়, তাহা না করিয়া, হাসপাতালের ন্যায় সেবা ভাবেই কারাগার পরিচালিত হওয়া উচিত, এই সত্য এই অভিজ্ঞতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গান্ধীজীর চম্পারণ সত্যাগ্রহ

(সতীশ বাবুর লেখা)

গান্ধীজী ভারতবর্ষে এই সত্যাগ্রহেই প্রথমে প্রজাদের সহিত একাত্ম হইয়া যান। চম্পারণ সত্যাগ্রহে যাহা ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাহাই ব্যাপক ভাবে ঘটিয়াছে। চম্পারণ সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে অনেক কথাই গান্ধীজী তাঁহার আত্মকথায় বলিয়া গিয়াছেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ "চম্পারণে মহাত্মা গান্ধী" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উহাই অবলম্বন করিয়া সতীশবাবুর "চম্পারণ সত্যাগ্রহ" লিখিত।

আত্মকথায় গান্ধীজী লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দিন কতক বোলপুরে শান্তি-নিকেতনে ছিলেন। সেখান হইতে যখন গোখলের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি পুনায় রওনা হইয়াছেন তখনই, সেই ১৯১৪-১৫ সালে এণ্ড্রুজ গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি ভারতবর্ষে কবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন। তিনি বলেন— অহিংসার ও সত্যাগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের তৈরী হইতে এখনো বৎসর পাঁচেক লাগিবে। বস্তুতঃ বৎসর পাঁচেক পরই ভারতব্যাপী অসহযোগ আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে সত্যাগ্রহের সহিত ভারতবাসীকে পরিচয় করাইবার জন্য ঈশ্বর গান্ধীজীর হাতে কতকগুলি খণ্ড সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার দেন। ইহা দ্বারা সত্যাগ্রহ কি তাহার সম্বন্ধে দেশবাসীর ধারণা হয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রগতি গান্ধীজীর স্পর্শে বদলাইয়া যায়, আবেদন-নিবেদনের পালা পরিত্যক্ত হইয়া আত্মনির্ভরতা দেখা দেয়। উহার সহিত চম্পারণ ক্ষেত্রেই দেশবাসীর প্রথম পরিচয় ঘটে। চম্পারণে কয়েক সপ্তাহ মাত্র কার্য্য করিয়া

শত বৎসরের প্রাচীন অন্যায়ের প্রতিকার-কার্য্য তিনি কেমন করিয়া নীলকরের বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও চালান ও তাহাতে কৃতকার্য্য হন, তাহাই চম্পারণ সত্যাগ্রহ হইতে শিক্ষণীয়।

স্বাস্থ্য রক্ষা

(গান্ধীজীর লেখা আরোগ্য সাধনের বাংলা অনুবাদ)

গান্ধীজী বলেন যে, তিনি যত বই লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে এই ছোট বইখানা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদৃত হইয়াছে ও নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইতেছে। ইহাতে গান্ধীজী আশ্চর্য্য হইয়াছেন। বস্তুতঃ আশ্চর্য্য হওয়ার কথা নাই। জীবনের রীতিতে গতানুগত্যের ভিতরে তিনি একটা বিরোধের বীজ বপন করিয়াছেন, যেখানে আরামে খাওয়া-শোওয়াকেই সামাজিক আদর্শ বলিয়া মানা হইয়া থাকে, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রবল নূতনত্ব আনিয়া ফেলিয়াছেন—তাহাতেই এই বই-খানা বলপূর্ব্বক সকলের মনোহরণ করিয়াছে। আবশ্যকতার মাপ-কাঠিতে দেখিলে কি পোষাক পরিতে হয়, রত্নাভরণ ব্যবহারের স্থান কোথায় থাকে, অশন বসন কি প্রকার হইয়া পড়ে—এ সমস্তরই মৌলিক আলোচনা দ্বারা সমাজকে একটা বিষম আঘাত করিয়া, জীবন যে কর্ত্তব্যের সমষ্টি মাত্র—ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। কেহ আসিলেই তাহাকে খাইতে দিয়া ভদ্রতা করিতে, কিছু না হউক একটু চা বা মিষ্টি খাওয়াইতে আগ্রহ করিয়া থাকি। কিন্তু অন্য শারীরিক প্রয়োজন সম্বন্ধেই বা তাহা করি না কেন, কেন বলি না, মহাশয় দাঁতন দিব কি? এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া গান্ধীজী ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনের সম্পর্কে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গান্ধীজীর অনেক অদ্ভুত খেয়াল আছে বলিয়া লোকে

মনে করিয়া থাকে। যাঁহার খেয়াল, তাহা তিনি কি দৃষ্টিতে দেখেন তাহা এই পুস্তকে তিনি জানাইয়াছেন। জানিলে আর উহা খেয়াল বলা চলে না। সত্য দৃষ্টিতে দেখিলে আমাদের সাজ-গোজ, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসা, কি প্রকারের হওয়া ভাল তাহাই তিনি চিত্তাকর্ষক ভাবে দেখাইযাছেন।

জীবনব্রত

(গান্ধীজীর লেখা ব্রতবিচারের বাংলা অনুবাদ)

গান্ধীজী ১৯৩০ সালে যেরোড়া জেল হইতে সবরমতী আশ্রম-বাসীদের প্রার্থনায় পাঠের জন্য যে সমস্ত ব্রতের বিষয় লিখিয়া পাঠাইতেন ইহা তাহারই সমষ্টি।

গান্ধীবাদ বা 'গান্ধীইজম' কি ইহা লইয়া অনেকের মতান্তর আছে। কিন্তু এই বইখানাকে জীবনব্রত নাম না দিয়া গান্ধীবাদ বা 'গান্ধীইজম' নাম দেওয়া যাইতে পারিত। জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত, তিনি সমাজকে কোন আদর্শের অভিমুখী করিতে চাহেন, তাঁহার লক্ষ্যই বা কি; আর তাহার পথই বা কি—একথা তিনি এই কয়টি প্রবন্ধে যেমন স্পষ্ট করিয়াছেন এমন আর কোথাও করেন নাই।

গান্ধীজীর ভাষা এই বাইখানাতে যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি সরল ও তেমনি বেগবান হইয়াছে। সত্যদৃষ্টি লাভ করায়, তিনি যে কি চাহেন তাহা তিনি নিতান্তই সহজ কথায় বুঝাইতে পারিয়াছেন। এই ছোট বহিখানি পাঠ করিয়া হৃদ্গত করিলে, আচরণে সত্য করিয়া তোলার চেষ্টা করিলে, মানুষ ব্যক্তিগত হিসাবে ও সামাজিক হিসাবে সমস্ত দ্বন্দ্ব-মুক্ত হইবে।

গান্ধীজী সামাজিক সাম্য বলিতে কি বুঝেন ও কি প্রকার সমাজ

চাহেন, ধনী নির্ধনে, ও স্বামীস্ত্রীতে কি সত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা তিনি করিতে চাহেন তাহাই ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে; সত্যই যে পরমেশ্বর এবং সেই সত্যে পহুঁছিবার পথ যে অহিংসা, ইহারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গান্ধীজী বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমের সফলতা দ্বারাই মাপ করা হইবে। এই জীবনব্রত বহিতে যে মতবাদ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেবল বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা বুঝার ও সন্তোষ লাভ করার জন্য নয়। সবরমতীতে যে জীবন-প্রবাহ চলিতেছে তাহারই সাহায্যকল্পে, সেখানকার বালক-বালিকার ও নর-নারীর দৈনন্দিন জীবনে সাহায্য করিবার জন্য, প্রার্থনায় পাঠের জন্য ও দিনের কর্ম্মে তাহা সার্থক করার পবিত্র উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত। তিনি ভারতবর্ষকে যাহা করিতে চাহেন তাহাই তিনি তাঁহার হাতের গড়া আশ্রমের মধ্য দিয়া সত্য করিয়া তুলিতে প্রয়াস করেন। সেই প্রয়াসে যাহা লিখিয়াছেন সেই পবিত্র লেখা ভারতবাসীর অতিশয় আদরের বস্তু হইয়াছে।

সূচীপত্র

বিষয়

প্রস্তাবনা	১
ভূবৃত্তান্ত	১১
ইতিহাস	১৮
দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রবেশ	৩৬
অভাব অভিযোগের আলোচনা—নাতাল ...	৪৩
অভাব অভিযোগের আলোচনা—ট্রান্সভাল ও অন্যান্য উপনিবেশ	৫১
প্রাথমিক দ্বন্দ্বের আলোচনা	৬০
প্রাথমিক দ্বন্দ্বের আলোচনা—পূর্ব্বানুবৃত্তি ...	৭৪
প্রাথমিক দ্বন্দ্বের আলোচনা—পূর্ব্বানুবৃত্তি ...	৯৬
বুয়ার যুদ্ধ	৯৯
যুদ্ধের পরে	১১৫
উদারতার পুরস্কার—ঘাতকী আইন	১৩৭
সত্যাগ্রহের জন্ম	১৪৬
সত্যাগ্রহ ও প্যাসিভ রেজিষ্টান্স	১৫৮
বিলাতে ডেপুটেশন	১৬৫
বক্রনীতি	১৭৬
আমদ মহম্মদ কাছলীয়া	১৮০
প্রথম ভাঙ্গন	১৯০
প্রথম সত্যাগ্রহী কয়েদী	১৯৪
ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন	১৯৯

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধর পাকড়	২০৪
প্রথম মিটমাট	২১৬
মিটমাটে বিরোধ ও আক্রমণ	২২১
গোরা সহায়কবর্গ	২৪২
বিশেষ আভ্যন্তরীণ অসুবিধা	২৫৬

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা	২৬৫
জেনারেল স্মাট্‌সের বিশ্বাসঘাতকতা (?)	২৬৯
লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি	২৮১
গৃহীত সার্টিফিকেটের বহ্যুৎসব	২৮৬
নূতন বিষয় আনার অভিযোগ	২৯১
সোরাবজী শাপুরজী আড়াজনীয়া	২৯৮
শেঠ দাউদ মহম্মদ প্রভৃতির যোগদান	৩০৫
নির্ব্বাসন	৩১১
পুনরায় ডেপুটেশন	৩১৯
টলষ্টয় ফার্ম্ম—১	৩২৬
টলষ্টয় ফার্ম্ম—২	৩৩০
টলষ্টয় ফার্ম্ম—৩	৩৪০
গোখলের প্রবাস	৩৬১
গোখলের প্রবাস (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	৩৭২
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ	৩৭৮
যে বিবাহ বিবাহই নয়	৩৮৪
স্ত্রীলোকেরা জেলে	৩৯১

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
মজুরের স্রোত	...	...	৩৯৬
খনির মালিকগণ	...	...	৪০২
ট্রান্সভালে প্রবেশ	...	..	৪০৯
মহা অভিযান	...	...	৪১৫
সকলেই জেলে	..	..	৪২১
পরীক্ষা	...	..	৪৩০
যুদ্ধ সমাপ্তির আরম্ভ	...	...	৪৩৭
প্রাথমিক মিটমাট	...	...	৪৪৬
পত্র আদান-প্রদান	...	...	৪৫০
যুদ্ধান্তে	...	...	৪৫৬
উপসংহার	...	...	৪৫৯

প্রস্তাবনা

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের সত্যাগ্রহ যুদ্ধ আটবৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। এই যুদ্ধকালেই সত্যাগ্রহ শব্দটা সৃষ্ট হয় এবং ব্যবহৃত হয়। এই যুদ্ধের একটা ইতিহাস নিজেই লিখিব বলিয়া অনেক দিন হইতে ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম। এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা কেবল আমিই লিখিতে পারি। যে সেনাপতি যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে, সেই জানে যে কোন সৈন্য কেন চালনা করা হইতেছে। সত্যাগ্রহের নীতি রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হওয়ার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত বলিয়া, জন-সাধারণের ইহার পরিণতির কথা জানা আবশ্যক।

আজিকার দিনে ভারতবর্ষই অবশ্য সত্যাগ্রহের বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্র। বিরামগামের একটা স্থানীয় অসুবিধার প্রতিকার হইতে আরম্ভ করিয়া, এদেশে একটির পর একটি করিয়া কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী সত্যাগ্রহ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইতেছে।

ওয়াঢ়াওয়ানের জনসেবক সুচরিত্র দর্জি ভাই মতিলালের জন্যই, আমি বিরামগ্রামের কাষ্টম বা শুল্কের প্রশ্নে মনোনিবেশ করি। আমি তখন সবে মাত্র ১৯১৫ সালে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছি এবং কাথিয়াওয়াড়ে যাইতেছি। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতেছিলাম। ওয়াঢ়াওয়ান ষ্টেশনে মতিলাল ছোট একদল লোক সহ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বিরামগামে লোকের যে দুর্গতি হয়, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া সে বলিল—"এই কষ্ট দূর করার জন্য আপনি কিছু করুন। আপনার

জন্মভূমি কাথিয়াওয়াড়ের ইহাতে অশেষ উপকার করা হইবে।” তাহার চোখে-মুখে একটা সমবেদনা ও দৃঢ়তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“তুমি কি জেলে যাইতে প্রস্তুত আছ?”

সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—“জেল কেন, ফাঁসিতে ঝুলিতেও প্রস্তুত আছি।”

আমি বলিলাম—“আমার কাজ জেলে গেলেই হইবে, কিন্তু দেখিও যেন শেষকালে না পলাও।”

মতিলাল বলিল—“তাহা কাজের বেলাতেই দেখিতে পাইবেন।” আমি রাজকোটে গিয়া এ বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্র-ব্যবহার আরম্ভ করিলাম। বাগসারা এবং অন্যান্য স্থানে আমার বক্তৃতায় আমি এই ইঙ্গিত করিলাম যে, যদি আবশ্যক হয়, তবে বিরামগ্রামের লোকের সত্যাগ্রহ করিতে প্রস্তুত হওয়া চাই। কর্ত্তব্য-পরায়ণ সি-আই-ডি পুলিশ এ সংবাদ গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিল। এই কার্য্যদ্বারা তাহারা যেমন গবর্ণমেণ্টের সেবা করিয়াছিল, তেমনি জন-সাধারণেরও উপকার করিল। অবশেষে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহিত আমার এ বিষয়ে কথা হয়। তিনি বিরামগামের কাষ্টমস্ বা শুল্ক আফিস উঠাইয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করেন এবং কথানুযায়ী কাজও করেন। আমি জানি, অপরেও এই জন্যই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অনতিবিলম্বে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই, আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাহা দিয়াছিলেন; অন্ততঃ উহাই তাহা দেওয়ার প্রধান কারণ।

তারপর আসিল ভারতীয়দের ইমিগ্রেসন বা বিদেশ-বসতির আইন। চুক্তি করিয়া এদেশ হইতে বিদেশে যে কুলি লইয়া যাওয়া হয়, তাহাকে

'ইন্‌ডেন্‌চার' বলে। উহা বন্ধ করার জন্য খুব প্রচেষ্টা হইয়াছিল, এবং বেশ আন্দোলন চলিতেছিল। বোম্বাইয়ের জন-সভা স্থির করে যে, ১৯১৭ সালের ৩১শে মে তারিখের পর ঐভাবে চুক্তি-বদ্ধ মজুর-প্রেরণ-প্রথা বন্ধ করা হইবে। ঐ বিশেষ তারিখটা কেন স্থির করা হইয়াছিল, সে কথা এস্থানে বলার আবশ্যক নাই। এই সম্পর্কে বড়লাটের নিকট মহিলাদের এক ডেপুটেশন যায়। শ্রীমতী জাইজী পেটিট-ই এই ডেপুটেশন লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। এবারও সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সঙ্কল্পের দ্বারাই কাজ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে এই পার্থক্যটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এবারে জন-সাধারণ কর্ত্তৃক আন্দোলন করা আবশ্যক হইয়াছিল। বিরামগামের কাষ্টম তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এ ব্যাপারটা গুরুতর ছিল। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড, রাউলাট আইন ইত্যাদি করিয়া অনেকগুলি ভুল করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলেও তিনি বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু সিভিল সার্ভিসের স্থায়ী আমলাদের দুষ্ট প্রভাব হইতে, কোন্‌ বড়লাটই বা মুক্ত থাকিতে পারেন?

তারপর সত্যাগ্রহের তৃতীয় দফায় আসিল চম্পারণের যুদ্ধ। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ উহার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন। এখানকার ব্যাপারের সহিত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের অনেক দিনের স্বার্থ জড়িত ছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধতার জন্য, কেবলমাত্র সত্যাগ্রহের উদ্যোগ দ্বারা কাজ হয় নাই, যুদ্ধই করিতে হইয়াছিল। চম্পারণের লোকেরা যে ভাবে শান্ত ছিল তাহা উল্লেখ যোগ্য। সেখানকার নেতারা যে, মনে বাক্যে ও কর্ম্মে অহিংস ছিলেন, সে কথার সাক্ষ্য ত আমি নিজেই। আর এই জন্য ছয়মাসের মধ্যেই এই বহু-পুরাতন অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

চতুর্থ যুদ্ধ হয় আহ্‌মদাবাদের কলের মজুরদের লইয়া . গুজরাটে এ ইতিহাস কাহারও অবিদিত নাই। এখানে মজুরেরা চমৎকার শান্ত ছিল। আর নেতাদের সম্বন্ধে ত কিছুই বলার নাই। তবুও আমি একথা বলিব যে, এখানে যে জয়লাভ হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ছিল না, কেননা মজুরদিগকে সঙ্কল্পে স্থির রাখার জন্য আমি যে উপবাস গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার প্রভাব পরোক্ষভাবে মিল-মালিকদের উপরও হইয়াছিল। আমার উপবাসে তাঁহারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারেন না, কেননা তাঁহাদের সহিত আমার মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল। তথাপি ঐ যুদ্ধের যে নৈতিক ফল, তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। যদি মজুরেরা শান্ত থাকিয়া তাহাদের যুদ্ধ চালায়, তবে তাহারা অবশেষে জয়লাভ ত করিবেই, তাহাদের মালিকদের হৃদয়ও জয় করিয়া লইবে। এ ক্ষেত্রে তাহারা মালিকদের হৃদয় জয় করিতে পারে নাই, কেননা তাহারা কায়মনোবাক্যে দোষ-স্পর্শশূন্য ছিল না। তাহারা কার্য্যতঃ নিরুপদ্রব ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই গুণের কথাটাই বলা যায়।

পঞ্চম যুদ্ধ হয় খেড়ায়। আমি একথা বলিতে পারি না যে, সত্যাগ্রহ-পরিচালক স্থানীয় নেতাগণের সকলেই সর্ব্বাংশে সত্যের পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। শান্তি রক্ষিত অবশ্যই হইয়াছিল, কিন্তু কৃষক-সাধারণের অহিংস ভাবটা, আহ্‌মদাবাদে কলের মজুরদের ন্যায়ই ভাসা ভাসা ছিল। আর সেই জন্য এই যুদ্ধে আমরা কোনও রকমে মান বাঁচাইয়া বাহির হইতে পারি। তবে এ কথা ঠিক যে, লোকের ভিতর সেখানে বিপুল জাগৃতি দেখা দেয়। কিন্তু খেড়ার লোকেরাও অহিংসার মর্ম্ম তখন ঠিক বুঝিতে পারে নাই এবং আহ্‌মদাবাদের মজুরেরাও শান্তি রক্ষার সত্যকার অর্থ বুঝিতে পারে নাই, এই জন্য লোকদের দুঃখও পাইতে হইয়াছে। রাউলাট সত্যাগ্রহের সময় এই জন্যই

আমাকে 'পর্ব্বতপ্রমাণ ভুল' স্বীকার করিতে হয়, আমাকে উপবাস করিতে হয় এবং অপরকেও উপবাস করিতে বলিতে হয়।

ষষ্ঠ যুদ্ধ হয় রাউলাট আইন লইয়া। এইবারেই আমাদের অভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে। কিন্তু সত্যাগ্রহের বনিয়াদ বেশ ভাল ও পাকা করিয়াই পত্তন করা হইয়াছিল। আমরা আমাদের যাহা কিছু দোষ ত্রুটি তাহা স্বীকার করি এবং প্রায়শ্চিত্ত করি। যখন আইন প্রবর্ত্তন করা হয়, তখনই রাউলাট আইনটা অকার্য্যকরী ছিল এবং পরে এই বহু নিন্দিত আইন প্রত্যাহৃতও হইয়াছিল। এই যুদ্ধে আমাদের খুব শিক্ষা হয়।

সপ্তম যুদ্ধ হয় পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার ও স্বরাজ লাভের জন্য। এই যুদ্ধ আজও চলিতেছে। আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় রহিয়াছে যে, যদি একজনও খাঁটি সত্যাগ্রহী শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে, তবে জয় একেবারে সুনিশ্চিত।

কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ মহাসমরের পর্য্যায়ভুক্ত। আমরা অজ্ঞাতসারে এই মহাসমরের জন্য যে ভাবে প্রস্তুত হইতেছিলাম, তাহা বর্ণনা করিয়াছি। আমি যখন বিরামগামের ব্যাপার হাতে লই, তখন আমার কোনই ধারণা ছিল না যে, আরো যুদ্ধ করিতে হইবে। আর যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলাম তখন আমি বিরামগাম সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। সত্যাগ্রহের মাধুর্য্যই এইখানে। সত্যাগ্রহ স্বচ্ছন্দ-লব্ধ, উহা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। সত্যাগ্রহ-নীতির ভিতরেই এই গুণটি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। যে ধর্ম্মযুদ্ধের মধ্যে গুপ্ত কিছুই নাই, যেখানে চালাকী খাটাইবার কোনও অবকাশ নাই, অসত্যের স্থান নাই, এমন যুদ্ধ অযাচিত ভাবেই আসিয়া পড়ে এবং ধর্ম্মাচরণকারী সর্ব্বদাই এমন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন। যে যুদ্ধের জন্য পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়, তাহা

ন্যায়ানুমোদিত যুদ্ধ নহে। ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধের পরিকল্পনা ভগবান স্বয়ং করেন এবং তিনিই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ঈশ্বরের নাম লইয়া কেবল ধর্ম্মযুদ্ধই করা যাইতে পারে এবং যখন দেখা যায় যে, সত্যাগ্রহীর শেষ অবলম্বনও শেষ হইয়াছে, সে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল নিরুপায় হইয়াছে, যখন সে চারিদিক অন্ধকার দেখে, তখনই ঈশ্বরের কৃপা উদ্ধারার্থে অবতীর্ণ হয়। যখন কেহ নিজেকে পথের ধূলির অপেক্ষাও অসহায় ও ক্ষুদ্র মনে করে, তখনই ঈশ্বর সাহায্য করেন। কেবল দুর্ব্বল ও অসহায়ের নিকটেই ঈশ্বরের কৃপা প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই সত্যটা আমাদের এখনো শিক্ষা করিতে হইবে. সেজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস আমাদের সহায়ক হইবে বলিয়াই মনে করি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যাহা যাহা হইয়া গিয়াছে, আমাদের বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহার ঠিক অনুরূপ ঘটনা পাঠক খুঁজিয়া পাইবেন। আর এই ইতিহাস হইতে পাঠক ইহাও দেখিবেন যে, বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে নিরাশ হওয়ার কোনই কারণ নাই। কৃতকার্য্যতার জন্য একমাত্র এই লক্ষ্যই রাখা দরকার যে, আমরা যেন আমাদের কর্ম্ম-পদ্ধতি দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়া থাকি।

আমি জুহুতে বসিয়া এই প্রস্তাবনা লিখিতেছি। আমি এই ইতিহাসের প্রথম ত্রিশ অধ্যায় য়েরোড়া জেলে লিখি। শ্রীযুক্ত ইন্দুলাল যাজ্ঞিক লিখিয়া যাইতেন, আর আমি বলিয়া যাইতাম। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলি আমি অতঃপর লিখিতে ইচ্ছা রাখি। জেলে আমার কাছে দেখিয়া-সাহায্য-লওয়ার-মত কোনও বহি ছিল না। আর এখানেও আমি কাগজপত্রের সাহায্য লইতেছি না। একটা নিয়মিত ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার আমার সময় নাই, আমার ইচ্ছাও নাই। এই বই

লেখার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহা সহায়ক হইতে পারে এবং ভবিষ্যতের কোনও ঐতিহাসিকের সাহায্যে আসিতে পারে। যদিও আমি কোনও কাগজপত্র না দেখিয়াই লিখিতেছি, তথাপি পাঠক মনে করিবেন না যে, ইহাতে একটা বিষয়েও এতটুকু ভুল আছে, অথবা কোথাও অতিশয়োক্তি আছে।

জুহু
২রা এপ্রিল, ১৯২৪। } মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

প্রথম অধ্যায়

ভূবৃত্তান্ত

আফ্রিকা পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশগুলির মধ্যে একটি। ভারতবর্ষকে একটা দেশ না বলিয়া একটা মহাদেশ বলা হয়। কিন্তু আফ্রিকার ভিতর এমন চার পাঁচটা ভারতবর্ষ বসানো যায়। ভারত-বর্ষের মতই আফ্রিকা একটা উপদ্বীপ। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকাংশই সমুদ্র-বেষ্টিত। সাধারণতঃ একটা ধারণা আছে যে, আফ্রিকা পৃথিবীর মধ্যে উষ্ণতম দেশ। এক দিক দিয়া দেখিলে কথাটা ঠিক। আফ্রিকার মধ্য দিয়া বিষুবরেখা চলিয়া গিয়াছে। আর বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের স্থান যে কি প্রকার উষ্ণ, তাহা ভারতবাসীরা ধারণা করিতে পারিবে না। আমরা দাক্ষিণাত্যে যে গরম সহ্য করি, তাহা হইতে বিষুবরেখার নিকটের স্থানের গরম কতকটা অনুমান করিতে পারা যায় মাত্র। কিন্তু বিষুবরেখা হইতে অনেক দূরে বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা মোটেই এরকম নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক স্থানে জলবায়ু এত স্বাস্থ্যপ্রদ ও নাতিশীতোষ্ণ যে, সেখানে ইউরোপীয়েরা—যাহারা ভারতবর্ষের জলবায়ুতে বাস করিতে পারে না তাহারা—স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের কাশ্মীর অথবা তিব্বতের মত খুব উচ্চ ভূখণ্ডসমূহ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া তিব্বতের কোন কোনও স্থান যেমন ১০ হাজার বা ১৪ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত, সেগুলি তত উচ্চে নয়। সেই জন্য সে স্থানের জলবায়ু শুষ্ক ও এরূপ ঠাণ্ডা, যে সহ্য করা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় কতকগুলি স্থান আছে যাহা যক্ষ্মা রোগীদের পক্ষে

খুবই উপকারী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। জোহানেস্‌বর্গ এমনি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান, ইহাকে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণপুরী বলা হয়। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, এক্ষণে যে স্থানে জোহানেস্‌বর্গ সহর গড়িয়া উঠিয়াছে সে স্থান সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য, শুষ্ক ঘাসে-পূর্ণ জমি ছিল। কিন্তু যখন সোণার খনি আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, তখন যেন মন্ত্রবলে বাড়ীর পর বাড়ী নির্ম্মিত হইতে লাগিল। আজ সেস্থান সুন্দর ও পাকাপোক্ত রকমের অনেক ইমারতে পূর্ণ হইয়াছে। এখানকার ধনী বাসিন্দারা দক্ষিণ আফ্রিকার অধিকতর উর্ব্বর স্থান হইতে, অথবা ইউরোপ হইতে অনেক মূল্য দিয়া গাছ আনিয়া সেখানে বসাইয়াছেন। এক একটা গাছের জন্য তাঁহাদিগকে এক গিনি পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে হইয়াছে। যে পথিক পূর্ব্বের খবর রাখে না, সে আজ সেখানে গেলে মনে করিবে যে, ঐ সকল গাছ বরাবরই ঐ স্থানে ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত অংশের বর্ণনা আমি করিতে চাই না, কেবল যে সকল স্থান আমাদের আখ্যানভাগের সহিত সম্পর্কিত, সেই সকল স্থানেরই বিবরণ দিব। দক্ষিণ আফ্রিকার এক অংশ পর্ত্তুগীজ-দিগের অধিকারে আছে, বাকিটা ইংরাজদিগের। পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারস্থ অংশের নাম 'ডেলা গোয়া বে'। ভারত হইতে আফ্রিকাগামী জাহাজ প্রথমেই আফ্রিকার উপকূলে এই বন্দরে লাগে। আর খানিকটা দক্ষিণে গেলেই নাতালে পৌঁছানো যায়। উহাই ইংরাজদিগের সর্ব্ব-প্রথম-স্থাপিত উপনিবেশ। ইহার প্রধান বন্দরের নাম পোর্ট-নাতাল, কিন্তু আমরা ইহাকে ডারবানই বলিয়া থাকি। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই বন্দরটি সাধারণতঃ এই ডারবান নামেই পরিচিত। নাতালের রাজধানী পিটর-মরিৎসবর্গ। এই স্থান ডারবান হইতে প্রায় ষাট মাইল দূরে ভিতরের দিকে এবং উহা উচ্চে প্রায় দুই হাজার ফিট। ডারবানের আবহাওয়া

বোম্বাই হইতে অধিকতর ঠাণ্ডা হইলেও প্রায় বোম্বাইয়েরই মত। আমরা যদি নাতাল ছাড়িয়া আরও অধিক দূরে দেশের ভিতর দিকে যাইতে থাকি, তাহা হইলে ট্রান্সভালে পঁহুছিব।

পৃথিবীতে যত সোণা ব্যবহৃত হয়, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশীর ভাগই আসে ট্রান্সভাল হইতে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হীরকের খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই স্থান হইতেই পৃথিবীব বৃহত্তম হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। এই হীরকের নাম "কুলিনান"। হীরকের খনির মালিকের নাম হইতেই উহার ঐ নাম হইয়াছে। উহার ওজন তিন হাজার ক্যারাট, অথবা প্রায় তিপ্পান্ন ভরি। "কোহিনুরের" এখনকার ওজন ১০০ ক্যারাট এবং 'অরলফ' নামক রাশিয়ার রাজকীয় হীরকের ওজন ২০০ ক্যারাট।

জোহানেসবর্গ, স্বর্ণ-খনির কাজের কেন্দ্র হইলেও এবং উহার নিকটে হীরার খনি থাকিলেও, উহা ট্রান্সভালের সরকারী রাজধানী নহে। এখান হইতে ৩৬ মাইল দূরস্থিত প্রিটোরিয়াই রাজধানী। প্রিটোরিয়াতে কেবল রাজকর্ম্মচারী ও রাজনৈতিকগণ এবং যাঁহারা তাঁহাদের সহিত কার্য্যের যোগে যুক্ত তাঁহারাই থাকেন, সেইজন্য এই স্থানটা অনেকটা নিরিবিলি, আর জোহানেসবর্গ হট্টগোলে পূর্ণ। গ্রামের কোনও লোক যদি বোম্বাই আসে, তবে সহরের গোলমাল ও তাড়াহুড়াতে যেমন হতভম্ব হইয়া যাইবে, প্রিটোরিয়া হইতে কেহ জোহানেসবর্গে আসিলে তাহারও সেই দশা হইবে। জোহানেসবর্গের লোকেরা হাঁটিয়া চলে না, দৌড়ায়—একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কাহারও এমন সময় নাই যে, ডাহিনে বামে ফিরিয়া অন্য কাহারও দিকে তাকাইয়া দেখে; প্রত্যেকেই, কত অল্প সময়ের মধ্যে কত অধিক ধন সঞ্চয় করিতে পারা যায়, তাহার জন্যই ব্যস্ত! যদি ট্রান্সভাল পার হইয়া আমরা আরো অভ্যন্তরে

পশ্চিম মুখে যাইতে থাকি, তাহা হইলে আমরা 'অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেট' বা অরেঞ্জীয়াতে পঁহুছিব। এখানকার রাজধানী হইতেছে ব্লুম-ফণ্টেন। এটাও একটা খুব ছোট, নিরিবিলি সহর। ট্রান্সভালের মত অরেঞ্জিয়াতে কোনও খনি নাই। এই স্থান হইতে আর কয়েকঘণ্টা রেলে চলিলেই আমরা কেপ্-কলোনির সীমার মধ্যে গিয়া পড়ি। কেপ্-কলোনি, দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কেপ্-কলোনির রাজধানী কেপ্-টাউন। কেপ্-টাউন এই কলোনির সর্ব্বাপেক্ষা বড় বন্দর। এই বন্দর উত্তমাশা অন্তরীপের উপর অবস্থিত। 'উত্তমাশা' অন্তরীপ নাম হওয়ার কারণ এই যে, পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক উহা আবিষ্কৃত হওয়ার পর পর্ত্তুগালের রাজা 'জন' মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ পথে ভারতবর্ষে যাওয়ার একটা নূতন ও সহজ রাস্তা পাওয়া গেল। তখনকার দিনে ভারতবর্ষ খুঁজিয়া বাহির করা অনেক সমুদ্র-যাত্রারই কামনার বিষয় ছিল।

এই চারিটি বড় বৃটিশ উপনিবেশ ব্যতীত আরও কতকগুলি রাজ্য আছে। সেগুলিও বৃটীশ রক্ষণাবেক্ষণের অধীন। ইংরাজেরা যাওয়ার পূর্ব্বে, অপরাপর জাতি দেশান্তর হইতে আসিয়া সেগুলি অধিকার পূর্ব্বক বসবাস করিতেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান শিল্পই হইতেছে কৃষি-শিল্প। এই ভূভাগ কৃষির জন্য অতিশয় উপযোগী। ইহার কোনও কোনও অংশ প্রীতিপ্রদ ও উর্ব্বর। এখানকার প্রধান শস্য হইতেছে মকাই। মকাই চাষ করিতে বিশেষ পরিশ্রম আবশ্যক হয় না এবং ইহাই দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোদের প্রধান খাদ্য। কোনও কোনও অঞ্চলে গমের চাষও হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ফলের জন্য বিখ্যাত। নাতালে নানা প্রকারের অত্যুৎকৃষ্ট কলা পেঁপে ও আনারস হয়। উহা এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় যে,

দরিদ্রতম লোকেরাও খাইতে পারে। নাতালে এবং অন্যান্য উপনিবেশে কমলালেবু পীচ এবং আপ্রিকট এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে, এই দেশের সহস্র সহস্র লোককে উহা সংগ্রহ করিবার জন্য কেবল কুড়াইয়া লওয়ার পরিশ্রমটুকুই করিতে হয়। এত সুন্দর আঙ্গুর আর কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। আর মরসুমের সময় উহা এতই সস্তায় পাওয়া যায় যে, খুব গরীবও পেট ভরিয়া আঙ্গুর খাইতে পারে। ভারতবাসীরা যেখানে গিয়া বাস করিতেছে, সেখানে আম পাওয়া যাইবে না ইহা হইতেই পারে না। ভারতবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় আমের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ফলে, এখন প্রচুর আম পাওয়া যায়। ওখানকার, আমের কতকগুলি জাত বোম্বাইয়ের অত্যুৎকৃষ্ট আমের সমকক্ষ। এই উর্ব্বর দেশে শাক-সব্জীও খুব উৎপন্ন হয়। ভারতবাসীরা ওখানে গিয়া, ভারতে যত রকমের ভাল শাক-সব্জী আছে, তাহার প্রায় সবগুলিরই চাষ করিয়াছে।

পশুপালনের কার্য্যদ্বারা পশুর সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি করা হইতেছে। সেখানকার গাভী ও ষাঁড়, ভারতবর্ষের জাতের অপেক্ষা সুগঠিত ও বলশালী। ভারতবর্ষ জগতের নিকট গো-রক্ষার দাবী করে, কিন্তু যখন ভারতবর্ষের মানুষের মতই ভারতবর্ষের কঙ্কালসার গো-জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমার লজ্জা হয়, অনেক স্থলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যদিও আমি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বত্রই চক্ষু খুলিয়াই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তথাপি আমি একটাও কঙ্কালসার গাভী অথবা ষাঁড় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতিদেবী যে ঐ দেশকে কেবল অকুণ্ঠিত সম্পদ দিয়াছেন তাহাই নহে, দৃশ্য ও শোভাতেও উহাকে রমণীয় করিয়াছেন।

ডারবানের প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর বলা হয়। কিন্তু কেপ্-টাউনের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও শোভা ইহা অপেক্ষাও রম্য। কেপ্-টাউন টেবল-পর্ব্বতের

পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত এবং স্থানটা অত্যন্ত অধিক উচ্চও নয়, নীচুও নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধা একজন প্রতিভা-সম্পন্না মহিলা-কবি, তাঁহার কবিতায় লিখিয়াছেন যে, টেবল-মাউনটেন দেখিয়া তাঁহার মনে অসীমের যে ধারণা উপস্থিত হয়, অন্য কোনও পর্ব্বত দেখিয়াই সে প্রকার হয় না। কথাটার ভিতর অত্যুক্তি থাকিতে পারে, আমার মনে হয় আছেও; কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যে একটা কথা আমার কাছে সত্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, টেবল মাউনটেন যেন কেপ্-টাউন শহরবাসীর বান্ধবের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উহা অতিশয় উচ্চ নয় বলিয়া ভীতির উদ্রেক করে না, লোকে দূর হইতে উহার পূজা করিতে বাধ্য হয় না। উহার গাত্রে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়া থাকে। আর উহা একেবারে সমুদ্র-সংলগ্ন বলিয়া, স্বচ্ছ জল-রাশিদ্বারা সমুদ্র ইহার পাদদেশ নিরন্তর ধুইয়া দিতেছে। ছেলে-বুড়া, স্ত্রী-পুরুষ, সকলেই নির্ভয়ে এই পর্ব্বতে বিচরণ করে, হাজার হাজার কণ্ঠধ্বনিতে এই পর্ব্বত দিনমানে ধ্বনিত হয়। সু-উচ্চ বৃক্ষ সমূহে, নানা বর্ণের সুগন্ধী পুষ্পসম্ভারে এইস্থান এতই রমণীয় যে, এখানে যতই দেখা যাক্ না কেন, চোখের আকাঙ্ক্ষা মিটে না, আর ঘুরিয়া ঘুরিয়াও বেড়াইবার সাধ মিটে না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গঙ্গা অথবা সিন্ধুর ন্যায় এমন বিশাল নদী নাই। অল্প যে কয়েকটা নদী আছে, তাহারা ছোট ছোট। নদীর জল সে দেশে অনেক স্থানেই পাওয়া যায় না। মালভূমিতে খাল কাটিয়াও লইয়া যাওয়া যায় না। তা-ছাড়া বড় বড় নদী না থাকিলে খালই বা কি করিয়া থাকিবে? যেখানেই ভূমির উপরিভাগে জল অপ্রচুর, সেখানেই নলকূপ বসাইয়া হাওয়া চালিত পাম্প বা ষ্টীম এঞ্জিন চালিত পাম্পদ্বারা জল তুলিয়া সেচের কার্য্য চালানো হয়। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যের

খুব সাহায্য করিয়া থাকেন। সরকার, কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়ার জন্য কৃষি-বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগকে পাঠাইয়া থাকেন, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র রচনা করিয়া কৃষকদিগের উপকারার্থে পরীক্ষাদি করিয়া থাকেন, কৃষক-দিগকে ভাল পশু ও ভাল বীজ যোগাইয়া থাকেন, খুব কম খরচাতে কৃষকদিগের জন্য নলকূপ খনন করিয়া থাকেন, এবং উহার ব্যয় ধীরে ধীরে আদায় করিয়া থাকেন। আবার এমনি ভাবেই, সরকার কৃষকদের জমি কাঁটাতারের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিয়া থাকেন।

বিষুবরেখার দক্ষিণদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর দিকে ভারতবর্ষ অবস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার জল হাওয়ার ঠিক পাণ্টা সম্পর্ক রহিয়াছে। সেখানকার ঋতুসমূহ এদেশের বিপরীত ক্রমে আসে। উদাহরণ স্বরূপ, যখন ভারতবর্ষে শীতকাল, দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন গ্রীষ্মকাল। সে দেশে বর্ষার কিছু নিশ্চয়তা নাই, যখন তখন বৃষ্টি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গড়ে বার্ষিক ২০ ইঞ্চির বেশী বৃষ্টিপাত হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ভৌগলিক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মোটেই প্রাচীন নহে। পূর্ব্বকালে দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা কাহারা ছিল, তাহা জানা যায় নাই। ইউরোপীয়েরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে, তখন তাহারা নিগ্রোদিগকে দেখিতে পায়। আমেরিকায় নিগ্রোদের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হইত, তাহা হইতে অব্যাহিত পাওয়ার জন্য যাহারা পলাইয়া দেশত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছিল, এখনকার নিগ্রোরা তাহাদেরই সন্তান একথা বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি দল আছে, যেমন জুলু, স্বাজী, বাসুতো, বেচুয়ানা ইত্যাদি। তাহাদের মধ্যে কয়েকটা বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। এই নিগ্রোদিগকেই আফ্রিকার আদিম অধিবাসী ধরিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকা এত বড় দেশ যে, এখন যত নিগ্রো আছে, তাহার বিশ বা ত্রিশ গুণ লোকও বাস করিতে পারে। কেপটাউন ও ডারবানের মধ্যে রেলপথে প্রায় ১৮০০ মাইল ব্যবধান। সমুদ্র পথেও হাজার মাইলের কম হইবে না। চারিটি উপনিবেশের সমষ্টিতে ৪,৭৩,০০০ বর্গমাইল স্থান আছে। ১৯১৪ সালে এই মহাভূভাগে মাত্র ৫ লক্ষ নিগ্রো ছিল, আর ইউরোপীয় ছিল সওয়া লক্ষ। নিগ্রোদের মধ্যে জুলুরাই সব চাইতে লম্বা ও দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। নিগ্রোদের বেলায় সুন্দর শব্দটা আমি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি। আমাদের সৌন্দর্য্যের আদর্শ হইতেছে ফর্সা রং ও সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা। যদি এই কুসংস্কার আমরা ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করি,

তাহা হইলে দেখিব যে, স্রষ্টা এই জুলুদিগকে নিখুঁত করিয়া গঠন করিতে ত্রুটি করেন নাই। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা যেমন লম্বা তেমনি প্রশস্ত-বক্ষ। তাহাদের মাংসপেশী সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত। পায়ের ও হাতের মাংসপেশী-সমূহ বেশ পেশল ও গোলাকার। উপর-হইয়া-চলা বা কুঁজো নিগ্রো প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না। তাহাদের ওষ্ঠ বড় ও মোটা হইলেও, সারা শরীরের গঠনের সহিত উহার সামঞ্জস্য আছে বলিয়া উহা কদাকার বলা যায় না। চোখগুলি গোল ও উজ্জ্বল। নাক চেপ্টা ও বৃহদাকার; তাহাদের মুখমণ্ডল যেমন বড় তাহাতে ইহাই শোভা পায়। তাহাদের মাথার কোঁকড়ানো চুল তাহাদের গায়ের আবলুশের মত উজ্জ্বল কালো রংয়ের সহিত বেশ মানায়। যদি কোনও জুলুকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন নিগ্রোদের মধ্যে কাহারা দেখিতে সুন্দর, তবে তাহারা নিজেদিগকেই সেই সম্মানের স্থান দিবে এবং আমার মনে হয় যে, উহাতে তাহাদের বিচারের দোষ দেওয়া যাইবে না। জুলুদের শরীর-গঠন প্রকৃতি দেবীই সুঠাম ও পেশল করিয়া দিয়াছেন বলিয়া, তাহাদের জন্য স্যাণ্ডো ইত্যাদির মত মাংসপেশী সংগঠন বিষয়ে ওস্তাদের আবশ্যক হয় না। প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃই বিষুবরেখার নিকটস্থ স্থানের লোকের গায়ের রং কালো হয়। যদি আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, প্রকৃতি-গঠিত সমস্ত দ্রব্যের মধ্যেই শ্রী আছে, তাহা হইলে আমরা ভারতবাসীরা গায়ের রং ফর্শা না হইলে যে খুঁত খুঁত করি ও মিথ্যা লজ্জা বোধ করি, তাহা অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারি।

নিগ্রোরা গোলাকার ঘরে বাস করে, উহা শরের তৈরী এবং মাটি দিয়া লেপা। কুটিরগুলির একটামাত্র গোলাকার দেওয়াল থাকে এবং একটামাত্র মধ্যস্থ খুঁটি থাকে, তাহার উপরে পাতার ছাউনী

থাকে। হাওয়া যাতায়াতের আর মানুষের প্রবেশের জন্য একটিমাত্র নীচু দ্বার থাকে। দরজায় কবাট বড় থাকে না। আমাদের মতই নিগ্রোরা দেওয়াল ও মেঝে গোবর ও মাটি দ্বারা নিকায়। নিগ্রোরা গোলাকার ছাড়া নাকি কিছুই চতুষ্কোণ করিয়া গড়িতে পারে না। তাহাদের চক্ষু কেবলই গোল জিনিষ খুঁজিতে ও গড়িতে অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কখনো প্রকৃতিকে সরল রেখা টানিতে বা সরল-রেখ-ক্ষেত্র গঠন করিতে দেখি না। আর প্রকৃতির এই সরল সন্তানেরা প্রকৃতির সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইতেই তাহাদের সমুদায় জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে। উহাদের কুটিরও যেমন সাদাসিধা, তাহার আসবাবও তদনুরূপ। কুটিরের ভিতর চেয়ার টেবিল বাক্স ইত্যাদির স্থান নাই, আজও এসকল দ্রব্য তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই বলিয়া, কদাচিৎ এগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় সভ্যতার আমদানীর পূর্ব্বে নিগ্রোরা জন্তুর চামড়া পরিধেয় বলিয়া ব্যবহার করিত। চামড়াই তাহাদের আস্তরণ, বিছানার চাদর ও লেপের কাজ করিত। আজকাল উহারা কম্বল ব্যবহার করে। ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থাতেই ঘুরিয়া বেড়াইত। গ্রামের ভিতর এখনো অনেকেই সেই অবস্থাতেই থাকে। তাহাদের গুপ্ত অঙ্গ এক টুকরা চামড়া দ্বারা আবৃত রাখে, কেহ আবার তাহাও করে না। কিন্তু ইহা হইতে একথা কেহ মনে করিবেন না যে, ইহারা ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে না। যখন একটা বৃহৎ সম্প্রদায় একটা রীতি অবলম্বন করে, তখন ইহা খুবই সম্ভব যে, সে রীতি দোষশূন্য, যদিও অপর সমাজে উহা নিতান্তই দূষণীয় মনে হইতে পারে। নিগ্রোদের কিছু হাঁ করিয়া একে অন্যের দিকে তাকাইয়া থাকার অবকাশ নাই। ভাগবতে আমরা পড়িয়াছি যে, শুকদেব যখন নগ্ন অবস্থায় স্নান-নিরতা

স্ত্রীলোকদিগের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার মনে একটি চঞ্চলতার রেখাও পড়ে নাই, স্ত্রীলোকেরাও বিচলিত হয় নাই অথবা লজ্জাবোধ করে নাই। এ বিবরণের ভিতর যে অমানুষিক কিছু আছে, একথা আমার মনে হয় না। আজ যদি ভারতে শুকদেবের মত এমন একজনও কেহ বর্ত্তমান না থাকে, যে ঐরূপ অবস্থায় অমনি পবিত্র থাকিবে, তবে তাহাতে লোকের পবিত্র হওয়ার চেষ্টার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় না, কেবল আমাদের অধঃপতনের কথাই সূচিত করে। আমরা কেবল অভিমান বশতঃই নিগ্রোদিগকে বুনো মনে করি। আমরা তাহাদিগকে যে প্রকার বর্ব্বর মনে করি, তাহারা তাহা নহে।

আইন হইয়াছে যে, নিগ্রো স্ত্রীলোকদের শহরে আসিতে তাহাদের বুক হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকিয়া আসিতে হইবে। সেই জন্য এখন এক-টুকরা কাপড় তাহাদের দেহে জড়াইতে তাহারা বাধ্য হয়। সেই জন্য এ ধরণের টুকরার আজকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় খুব বিক্রয় আছে। ঐ প্রকার সহস্র সহস্র কম্বল বা কাপড় প্রতিবৎসর ইউরোপের আমদানি হইয়া থাকে। পুরুষদিগকেও আইন অনুসারে কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকিতে হয়। সেই জন্য অনেকেই, ইউরোপের আমদানী পুরাতন বস্ত্র পরার প্রথা আরম্ভ করিয়াছে। আবার কেহ কেহ এক রকমের পাজামা, ফিতা দ্বারা কোমরে বাঁধিয়া পরিধান করে। এ সমস্ত বস্ত্রই ইউরোপ হইতে আমদানী করা হয়।

নিগ্রোদের প্রধান খাদ্য হইতেছে মকাই, আর যদি জোটে তবে মাংস। সুখের বিষয় ইহারা মসলা, চাট্‌নি কি জিনিষ তাহা জানে না। যদি তাহাদের খাদ্যে মসলা থাকে, অথবা তাহা হলুদ দিয়াও রং করা হয়, তবে তাহারা নাক সিট্‌কাইবে, আর তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে বেশী অসভ্য

বলা হয়, তাহারা ত সে খাদ্য স্পর্শই করিবে না। জুলুদের পক্ষে একবারে আধসের মকাই, একটু লবন দিয়া খাওয়া একটা অসাধারণ কিছু নহে। মকাইয়ের জাউ একটু লবণ দিয়া খাইয়াই তাহারা বেশ সন্তুষ্ট থাকে। যখন মাংস পাওয়া যায়, তখন তাহা কাঁচাই হোক্ অথবা সিদ্ধকরা বা ঝলসানোই হোক্, একটু লবনের সহযোগে তাহারা খাইয়া ফেলে।

নিগ্রোদের দলের নামেই তাহাদের ভাষার নাম দেওয়া হইয়া থাকে। লিখিবার কলা ইউরোপীয়েরা তাহাদের মধ্যে সম্প্রতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। নিগ্রোদের ভাষায় বর্ণমালা বলিয়া কিছু নাই। বাইবেল ও অন্যান্য পুস্তক রোমান অক্ষরে নিগ্রোভাষায় এক্ষণে ছাপানো হইয়াছে। জুলুদের ভাষা বড় মধুর। অনেক শব্দই 'আ' এই প্রকার উচ্চারণে অন্ত হয়, সেই জন্য শুনিতে মৃদু ও মধুর লাগে। আমি শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি যে, উহাদের শব্দগুলি যেমন অর্থযুক্ত তেমনি কবিত্বপূর্ণ। আমি যে দুইচারিটা কথা শিখিতে পারিয়াছিলাম, তাহা হইতেও সে কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়। আমি যে উহাদের বাসস্থানের নামগুলি উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি নিগ্রো নাম। উহাদের মানেও কবিত্বপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর। আমার স্মরণ নাই বলিয়া সে গুলি এখানে দিতে পারিলাম না।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মতে নিগ্রোদের কোনও ধর্ম্ম ছিল না, এখনো নাই। কিন্তু ধর্ম্মের ব্যাপক অর্থ ধরিলে, নিগ্রোরা নিশ্চয়ই মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য এক পরম সত্বায় বিশ্বাস করে ও তাঁহার পূজা করে। তাহারা এই শক্তিকে ভয়ও করে। তাহারা অস্পষ্ট ভাবে ইহাই অনুভব করে যে, এই দেহের অবসানের সহিতই সত্তার সম্পূর্ণ শেষ হয় না। যদি আমরা সুনীতিকে ধর্ম্মের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করি, তাহা হইলে নিগ্রোরা নীতিপরায়ণ বলিয়া উহাদিগকে ধার্ম্মিকও বলা যায়। সত্য ও মিথ্যার ভেদ তাহারা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে। নিগ্রোরা তাহাদের

আদিম অবস্থায় সত্যের যেমন সেবা করে, আমরা অথবা ইউরোপীয়েরা ততটা করি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তাহাদের কোনও মন্দির, অথবা ঐ ধরণের কিছু নাই। তাহাদের মধ্যে অন্যান্য জাতির ন্যায় অনেক কুসংস্কার আছে। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই জাতি—শারীরিক বলে জগতে যাহাদের সমকক্ষ কেহ নাই—এত ভীতু যে, একজন নিগ্রো একজন ইউরোপীয় বালককে দেখিলেও ভয় পায়। যদি তাহার দিকে একটা পিস্তল বাগাইয়া ধরা যায়, তবে সে হয় পলাইবে, আর নয়ত এত অভিভূত হইবে যে, পলাইতেও পারিবে না। ইহার অবশ্যই হেতু আছে। 'নিগ্রোদের মনের মধ্যে একথাটা মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় যে তাহাদিগের স্বত সংখ্যায় অধিক বন্য জাতিকে দাবাইতে পারিয়াছে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ইন্দ্রজাল আছে। নিগ্রোরা বর্ষা, ধনুক ও বাণের ব্যবহার ভাল রকমই জানিত। তাহাদিগকে ইহার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাহারা কখনও একটা বন্দুক দেখে নাই অথবা ব্যবহার করে নাই। একটা দেশলাই পর্য্যন্ত আবশ্যক হয় না, একটা আঙ্গুল টিপিলেই নলের মুখ হইতে একসঙ্গে শব্দ হয়, আগুনের ঝলক দেখা দেয় এবং গুলি গিয়া মানুষের দেহ বিদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলে, এই জিনিষটা নিগ্রোরা বুঝিতে পারে না। সে নিজে এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা দেখিয়াছে যে, অনেক নিরপরাধ, উপায়হীন নিগ্রোর প্রাণ গুলি খাইয়াই গিয়াছে। অনেকে আজও জানেনা যে, কেমন করিয়া এই ব্যাপারটা হয়। সেই জন্যই যাহারা এইপ্রকার অস্ত্র ধারণ করে তাহাদিগকে যমের মত ভয় করে।

'সভ্যতা' নিগ্রোদের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। ধর্ম্ম-নিরত মিশনারীরা, খৃষ্টের বাণী তাঁহারা যেমন বুঝিয়াছেন সেই মত

প্রচার করেন, নিগ্রোদের জন্য স্কুল বসান এবং তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখান। তাহাদের মধ্যে অনেকে লেখাপড়া না জানায় এই 'সভ্যতার' মর্ম্ম বুঝিত না এবং সে জন্য অনেক পাপ হইতে মুক্ত ছিল; আজ তাহারা পাপে পতিত হইয়াছে। যাহারা এই সভ্যতার সম্পর্কে আসিয়াছে, এমন কোনও নিগ্রোই আর মদ খায় না, এরূপ বড় দেখা যায় না। আর যখন তাহার ঐ বিশাল শক্তিমান দেহ মদের নেশার ঘোরে পড়ে, তখন সে উন্মত্ত হয় এবং নানাপ্রকার দুষ্কার্য্য করে। দুইয়ে দুইয়ে চার হওয়া যেমন নিশ্চিত তেমনি, যেখানে 'সভ্যতা' সেইখানেই অভাব বাড়িবে ইহাও নিশ্চয়। নিগ্রোদিগের অভাব বাড়াইবার জন্য অথবা তাহাদিগকে শ্রমের মর্য্যাদা শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাহাদের উপর একটা মাথা পিছু অথবা ঘর পিছু টেক্স বসানো হইয়াছে। যদি এই রকম টেক্স ইত্যাদি না বসানো হইত, তবে নিগ্রোরা শতশত ফিট নিম্নস্থ ভূগর্ভে গিয়া পরিশ্রম করিয়া সেখান হইতে সোনা ও হীরা তুলিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদের চাষবাস ছাড়িয়া খনির কাজে ঢুকিত না। আর যদি খনিতে খাটাইবার জন্য তাহাদিগকে না পাওয়া যাইত, তবে ঐ সকল সোনা ও হীরক ভূগর্ভেই থাকিয়া যাইত। আবার ঐ প্রকার টেক্স না বসাইলে ইউরোপীয়দের চাকর পাওয়াও দুর্ঘট হইত। ফলে এই হইয়াছে যে, হাজার হাজার নিগ্রো অন্যান্য ব্যাধিতে ত ভোগেই, তা'ছাড়া একরকম যক্ষ্মা—যাহাকে 'খনির যক্ষ্মা' বলে, তাহাতেও ভুগিতেছে। এই ব্যাধি সাংঘাতিক। যাহারা এই ব্যাধির কবলে পড়ে তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ ভাল হইতে পারে। পাঠক ইহাও বিবেচনা করিবেন যে, খনির মজুরেরা নিজেদের ঘরবাড়ী হইতে হাজার মাইল দূরে থাকিয়া কতটা সংযম পালন করিতে পারে। এই হেতু তাহারা সহজেই উপদংশাদি রোগে আক্রান্ত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ভাবুক ইউরোপীয়েরা যে এই ব্যাপারের

গুরুত্ব না বুঝেন তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ একথা নিশ্চয়তার সহিত মানেন যে, সকল দিক দেখিলে 'সভ্যতা' দ্বারা এই জাতির মঙ্গল হয় নাই। আর অমঙ্গল যে কি হইয়াছে তাহা ত এত স্পষ্ট যে, তাহা আপনা-আপনিই চোখে পড়ে।

নিগ্রোদের মত সরল এবং স্বাভাবিক অবস্থার লোকের দ্বারা অধ্যুষিত এই মহান দেশে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ডচেরা আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা ক্রীতদাস রাখিত। জাভা দেশ হইতে কতকগুলি ডচ্ তাহাদের মালয় ক্রীতদাস সহ আসিয়া যেখানে উঠিয়াছিল উহাকে এক্ষণে 'কেপ্-কলোনি' বলা হয়। এই মালয়েরা মুসলমান। তাহাদের রক্তে ডচ্ রক্তের মিশ্রণ ছিল এবং ডচ্‌দের কতকগুলি গুণ তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া আছে, তবে কেপ্-টাউনই তাহাদের প্রধান আড্ডা। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপীয়দিগের ভৃত্যের কাজ করে, কেহ কেহ স্বাধীন ব্যবসা করে। মালয় স্ত্রীলোকেরা বড়ই পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমতী। তাহাদের জীবন-যাত্রার ব্যাপারে তাহারা অতিশয় পরিচ্ছন্ন। ধোবার কাজ বা শেলাইয়ের কাজে তাহারা নিপুণ। পুরুষেরা ছোটখাট ব্যবসা করে, অনেকে ভাড়া-গাড়ী হাঁকায়। কেহ কেহ উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছেন। কেপ্-টাউনের ডাক্তার আব্দুল রহমান তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি কেপ্-টাউনের পুরাতন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা পরিষদের একজন সভ্য ছিলেন। নূতন আইন অনুসারে তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ-অধিকার প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

ডচ্‌দিগের কথা বলিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে আমি মালয়দিগের কথা কিছু বলিয়া লইলাম। এক্ষণে ডচেরা কি করিয়াছিলেন দেখা যাক্। ডচেরা যেমন কুশলী যোদ্ধা ছিল, কৃষিকার্য্যেও তাহারা তেমনি

পারদর্শী। তাহারা দেখিল যে, তাহাদের চতুঃপার্শ্বস্থ দেশ কৃষির অত্যন্ত উপযোগী, এবং স্থানীয় অধিবাসীরা বৎসরে অল্পকালমাত্র কৃষিকার্য্যে খাটিয়াই জীবনাতিপাত করিয়া থাকে। তাহা হইলে এই লোকগুলিকে জোর করিয়া খাটাইয়া লওয়া হইবে না কেন? ডচেদের বন্দুক ছিল, তাহারা ফন্দীবাজও ছিল। তাহারা অন্যান্য জন্তুর মত মানুষকেও পোষ মানাইতে জানিত এবং তাহাদের ধর্ম্মে ইহা বাধে না বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা তখন স্থানীয় আদিম নিবাসী "নেটিভ"দের সাহায্যে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল—ঐভাবে নেটিভদিগকে খাটানো ন্যায়ানুমোদিত কিনা, সে বিষয়ে তাহাদের সন্দেহেরও অবকাশ হয় নাই। ডচেরা কৃষিকার্য্যের জন্য ভাল জমি যখন খুঁজিতেছিল, ইংরাজেরাও সেই সময় ক্রমে ক্রমে এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংরাজে ডচে জ্ঞাতিভাই সম্পর্ক। তাহাদের চরিত্র, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা একই অভিমুখী ছিল। একই পাঁজার হাঁড়ি কলসীতে মাঝে মাঝে ঠোকাঠুকি লাগে, তেমনি এই দুই জাতি, উভয়েই নিগ্রোদিগকে দমন করিয়া নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ বাধাইয়া ফেলিত। তাহাদের মধ্যে কলহ হয়, পরে যুদ্ধও হয়, ইংরাজেরা "মাজুবা-হিল" নামক স্থানে পরাজিত হয়। মাজুবার পরাজয় একটা ক্ষত রাখিয়া দেয়, যাহা পরবর্ত্তী বুয়র-যুদ্ধে বিষম আকার ধারণ করিয়াছিল। ঐ যুদ্ধ ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত চালিয়াছিল। যখন জেনারেল ক্রঞ্জি আত্মসমর্পণ করেন, তখন লর্ড রবার্টস রাণী ভিক্টোরিয়াকে তারযোগে জানান যে, মাজুবার প্রতিহিংসা লওয়া হইয়াছে। যখন এই দুই জাতের মধ্যে, বুয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বেকার ঐ প্রথম সংঘর্ষ হইয়াছিল, তখন অনেক ডচ, বৃটিশের নাম-মাত্র অধীনত্বেও থাকিতে রাজি না হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অজানা অন্তরতর প্রদেশে চলিয়া

যায়। ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটের উৎপত্তি এমনি করিয়া হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ডচেরা বুয়ার বলিয়া পরিচিত হয়। সন্তান যেমন মাকে আঁকড়াইয়া থাকে, এই বুয়ারেরা তেমনি তাহাদের মাতৃভাষাকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া, ঐ ভাষাকে জীবন্ত রাখিয়াছে। তাহাদের ভাষার সহিত তাহাদের স্বাধীনতার যে অতি নিকট সম্বন্ধ, ইহা তাহারা অতি তীব্রভাবে অনুভূতির ভিতর গ্রহণ করিয়াছে। অনেক আক্রমণ সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের মাতৃভাষা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহাদের ভাষা বুয়রদের উপযোগী এক নূতন আকার ধারণ করে। তাহারা তাহাদের মাতৃভূমি হলাণ্ডের সহিত যোগ রাখিতে না পারায়, ডচ হইতে উৎপন্ন একটা রূপান্তরিত ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল। যেমন প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, এ ভাষাও কতকটা সেই রকমের। নিজেদের সন্তানদের উপর ভাষার কাঠিন্যের চাপ দিতে অনিচ্ছাবশতঃ তাহারা এই প্রাকৃত ডচ্‌কে স্থায়ী রূপ দিয়াছে। এই ভাষা 'টাল' নামে অভিহিত। তাহাদের ছেলেদিগকে 'টালে'র সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, বইগুলি 'টাল' ভাষাতেই লেখা, এবং ইউনিয়ন পার্লামেন্টের বুয়ার সভ্যগণ 'টাল' ভাষাতেই বক্তৃতা দেওয়ার বিশেষত্ব জেদ করিয়াই রক্ষা করেন। ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট হওয়ার পরে 'টাল' বা ডচ্‌ভাষাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বত্র ইংরাজীর সমস্থান দেওয়া হয়; এমন কি গবর্ণমেন্ট-গেজেট বা পার্লামেন্টের রেকর্ড দুই ভাষাতেই রাখা হয়।

বুয়ারেরা সরল, অকপট এবং ধর্ম্মভীরু। তাহারা বিস্তীর্ণ কৃষি-ক্ষেত্রের মধ্যে খামার করিয়া বাস করে। এই সকল খামারের ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। আমরা খামার বলিতে এক বা দুই একর

(৩ বা ৬ বিঘা) জমি বুঝিয়া থাকি, কখনও বা ইহা অপেক্ষাও কম জমি খামারে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে একজন কৃষকের হাতেই শত শত অথবা হাজার হাজার একর জমি আছে। এই সমস্ত জমিই তাহার চাষে আনার কোনও গরজ নাই। যদি এবিষয়ে কেহ তাহার সহিত তর্ক করে, তবে বলিবে—"পতিত থাকুক না, এখন যে জমি পতিত থাকিবে আমাদের ছেলেরা তাহা চাষ করিবে।"

প্রত্যেক বুয়ারই ভাল যোদ্ধা। বুয়ারেরা নিজেদের মধ্যে যতই ঝগড়া করুক না কেন, যখন তাহাদের স্বাধীনতা বিপদাপন্ন হয়, তখন সকলেই সজ্জিত হইয়া যেন একাত্ম হইয়া যুদ্ধ করে। তাহাদের বিশদ-ভাবে ড্রিল শিক্ষার আবশ্যক করে না, কেননা সমস্ত জাতিটার ভিতরেই যুদ্ধ করা মজ্জাগত। জেনারেল স্মাটস্, জেনারেল ডিওয়েট, জেনারেল হার্টজগ, ইঁহারা সকলেই বড় উকীল, বড় খামারের মালিক এবং তেমনি বড় যোদ্ধা। জেনারেল বোথার একটা খামারে নয় হাজার একর জমি ছিল। তিনি কৃষিকার্য্যের জটিল সমস্যাগুলির সহিত সুপরিচিত ছিলেন। যখন তিনি শান্তির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চালাইতে বিলাতে যান, তখন তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রকার একটা কথা রটিয়াছিল যে, সারা ইউরোপে তাঁহার মত ভেড়ার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আর কেহ ছিল না। জেনারেল বোথা প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের স্থান লইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী খুব ভালই জানিতেন। তবুও তিনি যখন রাজা ও মন্ত্রীদিগের সহিত বিলাতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন নিজের মাতৃভাষাতেই কথা-বার্ত্তা বলিয়া ছিলেন। এই প্রকার করাই যে ঠিক হয় নাই, সে কথা কে বলিতে পারে? তিনি ইংরাজী বলিতে গিয়া যদি কোনও একটা ভুল করিয়া বসেন, সে দায়িত্ব তিনি কেন লইতে যাইবেন? তাঁহার চিন্তাস্রোত ঠিক একটা উপযুক্ত শব্দ খোঁজার জন্য কেনই বা

ব্যাহত করিবেন? ইংরাজ মন্ত্রীরা কিছু মনে না করিয়াই এমন একটা অপরিচিত ইংরাজী বাক্য সমাবেশ করিতে পারেন যে, তিনি তাঁহাদের কথা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভুল জবাব দিতে পারেন ও গোলে পড়িয়া যাইতে পারেন, তাহাতে তাঁহার অভীষ্টের হানি হইতে পারে। তাঁহার এমন বিষম ভুল করার দরকার কি?

বুয়ার স্ত্রীলোকেরা বুয়ার পুরুষদের মতই সাহসী ও সরল। বুয়ার স্ত্রীলোকগণের সাহসে ও তাহাদের অনুপ্রেরণাতেই বুয়ারেরা যুদ্ধে তেমন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে, তেমন করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা বৈধব্যের ভয় করিত না, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিত না।

আমি বলিয়াছি যে, বুয়ারেরা ধর্ম্ম-প্রবণ খৃষ্টান। কিন্তু তাহারা যে নিউটেষ্টামেণ্টে (নব বিধানে যাহা যিশু প্রবর্ত্তন করেন) বিশ্বাস করিত একথা বলা যায় না। বস্তুতঃ বলিতে গেলে, যদিও ইউরোপ যিশুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, তবুও কিন্তু সে দাবি করে যে সে উহাতে শ্রদ্ধা রাখে। অল্প সংখ্যক লোকই সেখানে যিশুর শান্তির ধর্ম্ম জানে ও পালন করে। তবে বুয়ারদের সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে, তাহারা নববিধানের কেবল নামটাই জানে। তাহারা পুরাতন বিধান ভক্তির সহিত পড়ে ও উহাতে বর্ণিত যুদ্ধের কাহিনী কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। মোজেজ যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—"একটা চক্ষুর বদলে পাণ্টা আর একটা চক্ষু লইবে, একটা দাঁতের বদলে আর একটা দাঁত লইবে" এই নিয়ম, তাহারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সেই মতই আচরণ করে।

বুয়ার স্ত্রীলোকেরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহাদিগকে দুঃখ পাইতে হইবে; আর সেই জন্যই ধৈর্য্যের সহিত এবং

সন্তোষের সহিত সমস্ত ক্লেশই সহ্য করিয়াছিল। তাহাদের তেজস্বিতা নষ্ট করার জন্য লর্ড কিচেনার কোন চেষ্টারই ক্রটি করেন নাই। তাহাদিগকে পুরুষদিগের নিকট হইতে ভিন্ন করিয়া 'জোটবন্দী ক্যাম্পে' (Concentration Camp) রাখিয়াছিলেন। সেখানে তাহাদিগকে অবর্ণনীয় যাতনা সহ্য করিতে হইত। তাহারা অনাহারে থাকিয়াছে, তীব্র শীতে দুঃখ পাইয়াছে, আগুনের মত রৌদ্রের তাপ সহ্য করিয়াছে। কখনো কখনো সুরাপানে অজ্ঞান অথবা কামোন্মত্ত সৈন্য এই অরক্ষিত স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণও করিয়াছে। তবুও এই বীর রমণীরা দমে নাই। অবশেষে রাজা এডোয়ার্ড, লর্ড কিচেনারকে লেখেন যে, তিনি আর এসকল সহ্য করিতে পারিতেছেন না। আর যদি বুয়ারদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার উহাই একমাত্র উপায় হয়, তবে তিনি ঐ ভাবে যুদ্ধ চালানো অপেক্ষা, যে কোনও সর্ত্তে সন্ধি করা পছন্দ করিবেন। তিনি লর্ড কিচেনারকে শীঘ্র যুদ্ধ সমাপ্ত করিতে বলেন।

যখন স্ত্রীলোকদিগের মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন ইংলণ্ডে পঁহুছিল, তখন ইংরাজেরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। বুয়ারদের বীরত্বের জন্য তাহাদের মন প্রশংসায় পূর্ণ ছিল। এমন ছোট একটা জাতি ইংরাজের জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে, ইহাতেই তাহাদের হৃদয়ে দাহ হইত। ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত এই সকল অত্যাচারের জন্য স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়-ভেদী চিৎকার ইংলণ্ডে পঁহুছিল। বুয়ার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যস্থতায় নয়, বুয়ার পুরুষদিগের দ্বারা নয়—কারণ পুরুষেরা ত যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিল—পরন্তু কয়েকজন দক্ষিণ আফ্রিকায় আগত উচ্চান্তঃকরণ ইংরাজ পুরুষ ও রমণীর সহযোগে যখন এই সংবাদ বিলাতে পঁহুছিল, তখন ইংরাজদিগের মন নরম হইয়া আসিল। স্বর্গগত সার হেনরী ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান ইংরাজের হৃদয়-বৃত্তি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি

এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গগত মিঃ ষ্টেড প্রকাশ্য ভাবে ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনায় জানাইলেন যে, তিনি এই যুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় কামনা করেন। তিনি অপর সকলকে সেই প্রার্থনায় যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। সে এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য হইয়াছিল। সত্যকার দুঃখ যদি বীরত্বের সহিত সহ্য করা যায়, তবে পাষাণ হৃদয়ও গলে। তপস্যা বা দুঃখ সহনের এমনি শক্তি। আর সত্যাগ্রহের মূলমন্ত্রও ইহারই মধ্যে রহিয়াছে।

এই সকলের ফলে ভেরিনিগিং-এর সন্ধি হয়। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকার চারিটা উপনিবেশই সংযুক্ত হইয়া একটা ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট সৃষ্ট হয়। যদিও যে সকল ভারতবাসী সংবাদপত্র পড়েন তাহারা এই সন্ধির কথা জানেন, তথাপি এই সম্পর্কে কয়েকটা কথা আছে যাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। সন্ধি হওয়া মাত্রই ইউনিয়ন গঠিত হয় নাই, প্রত্যেক উপনিবেশেরই নিজ নিজ ব্যবস্থা পরিষৎ ছিল। মন্ত্রীগণ সম্পূর্ণ-ভাবে পরিষদের নিকট দায়ী ছিলেন না। ট্রান্সভাল ও ফ্রী ষ্টেট, 'ক্রাউন-ঔপনিবেশ' যে ধরণে শাসিত হয় সেই শাসন প্রথায় শাসিত হইতেছিল। জেনারেল স্মাটস্ ও বোথা এই প্রকার সঙ্কুচিত ভাবে স্বাধীনতার প্রয়োগে সন্তুষ্ট হওয়ার লোক নহেন। তাঁহারা ব্যবস্থা পরিষৎ বর্জ্জন করিলেন, অসহযোগ করিলেন, সরকারের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতে তাঁহারা অস্বীকার করিলেন। লর্ড মিলনার একটা ঝাঁঝাল বক্তৃতা করিয়া বলিলেন যে, জেনারেল বোথা নিজের সম্বন্ধে এতটা অভিমান না দেখাইলেও পারিতেন। তাঁহাকে বাদ দিয়াও দেশ-শাসন-কার্য্য ভাল রূপেই চালানো যাইতে পারে। লর্ড মিলনার, এই ভাবে বরকে বাদ দিয়াই বিবাহের আয়োজন করিলেন।

আমি বুয়ারদিগের সাহস, স্বাধীনতা-স্পৃহা এবং আত্মোৎসর্গের অকুণ্ঠিত

প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া আমি একথা বুঝাইতে চাই না যে, তাহাদের দুর্দ্দিনে তাহাদের মধ্যে মতভেদ ছিল না, অথবা তাহাদের মধ্যে দুর্ব্বল চিত্তের লোক কেহ ছিল না। লর্ড মিলনার, যাহারা অল্পেতেই সন্তুষ্ট এমন কতকগুলি লোক লইয়া একটা দল খাড়া করিলেন, এবং মনে করিলেন ইহাদের সহায়তাতেই পরিষৎকে কার্য্যকরী করিতে পারিবেন। একটা নাটকও তাহার নায়ক ব্যতীত খাড়া করা যায় না। যে রাজনীতিবিদ্ প্রধান ব্যক্তিকেই বাদ দিয়া একটা শাসন-তন্ত্র খাড়া করিতে চাহেন, তাঁহাকে বাতুল ছাড়া আর কি বলা যায়? লর্ড মিলনারের ব্যাপার এই রকমই হয়। তিনি ধাপ্পা দিয়া কাজ চালাইতে থাকিলেও, জেনারেল বোথাকে বাদ দিয়া ট্রান্সভাল ও ফ্রী ষ্টেট শাসন করা এত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে অনেক সময়ই তাঁহার উদ্যানে উন্মনা ও উদ্বিগ্ন মনে থাকিতে দেখা যাইত। জেনারেল বোথা সাফ্ করিয়া বলেন যে, ভেরিনিগিং-এর সন্ধি দ্বারা বুয়ারেরা তখন হইতে রাজ্য ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, তাহা না হইলে তিনি ঐ সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতেন না। লর্ড কিচেনার উত্তরে বলেন যে, তিনি জেনারেল বোথাকে এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বুয়ারেরা যদি তাহাদের রাজভক্তি প্রমাণ করে, তবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন পাইবে। এখন এই দুই ব্যক্তির কথার মাঝখানে কে বিচারক হইয়া বসিবে? যদি একটা সালিশীর কথাই হয়, তাহা হইলেই বা জেনারেল তাহাতে বসিতে চাহিবেন কেন? এ বিষয়ে সাম্রাজ্য-পরিষৎ যে সিদ্ধান্ত করেন, তজ্জন্য তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহারা একথা বলেন যে, সন্ধির যে অর্থ দুর্ব্বল প্রতিপক্ষ করেন, সবল পক্ষ তাহাই গ্রহণ করিবেন। ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা অনুসারে,

ইহাই হইতেছে ঠিক ব্যবস্থা। আমি হয়ত কোনও কিছু বলিতে চাহিয়া থাকিব, কিন্তু আমাকে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার লেখার বা বক্তৃতার যে মানে পাঠক বা শ্রোতা করেন, তাহাই উহার ঠিক অর্থ। আমাদের জীবনে আমরা এই সুবর্ণ নিয়ম প্রায়ই ভঙ্গ করিয়া থাকি। এই জন্য অনেক বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ হয় এবং অর্দ্ধ সত্য, যাহা অসত্য অপেক্ষাও দোষাবহ, তাহাই সত্যের পরিবর্ত্তে কাজে লাগানো হয়।

এই ক্ষেত্রে সত্যের পক্ষ, অর্থাৎ জেনারেল বোথা যখন সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন, তখন তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সমস্ত উপনিবেশগুলি একত্র যুক্ত করা হইল ও দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত হইল। দক্ষিণ আফ্রিকার পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক, ম্যাপে উহার রং লাল দেখানো হয় (ইহাতে ইংরাজাধিকার সূচিত হয়)। তবুও একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পূর্ণ স্বাধীন। বৃটিশ সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের অনুমতি ব্যতীত একটা পয়সাও সেখান হইতে পাইতে পারেন না। কেবলমাত্র ইহাই নহে, উপরন্তু বৃটিশ মন্ত্রীরা একথাও মানিয়া লইয়াছেন যে, যদি দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটিশ পতাকা—ইউনিয়ন জ্যাক পরিত্যাগ করে এবং নামেও স্বাধীন হয়, তাহা হইলেও কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারে না। বুয়ারেরা আজ পর্য্যন্ত নামেও যে এই স্বাধীনতা গ্রহণ করে নাই, তাহার বিশেষ হেতু আছে। একটা হেতু হইতেছে, বুয়ার-নেতারা চতুর ও বিচক্ষণ লোক। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত একটা অংশীদারী ভাব বজায় রাখায় তাহাদের কোনও ক্ষতিই নাই, ইহা তাঁহারা দেখিতেছেন। কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও ব্যাবহারিক হেতুও আছে। নাতালে ইংরাজের সংখ্যা বেশী, কেপ্-কলোনিতে যদিও ইংরাজেরা সংখ্যায় বুয়ারদিগের অপেক্ষা বেশী নয়, তথাপি সংখ্যায় অনেক; জোহানেসবর্গে

ইংরাজের সংখ্যাই অধিক। এই প্রকার অবস্থায় তাহারা যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহা হইলে নিজেদের ভিতরেই বিরোধ এবং একটা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ঘটার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা উপনিবেশ বলিয়াই রহিয়া গিয়াছে।

যে ভাবে এই ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের শাসন-পদ্ধতি স্থির হয়, তাহাতে বিশেষত্ব আছে। বিভিন্ন ব্যবস্থা পরিষদের সমস্ত পক্ষের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত একটা "জাতীয় কনভেনসন" বা সভা, একটা সর্ব্ব-সম্মত শাসন-পদ্ধতির খসড়া প্রস্তুত করেন এবং ইংরাজ সরকারের পার্লামেণ্টকে উহা সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতে হয়। পার্লামেণ্টের হাউজ অফ কমন্সের একজন সভ্য ঐ খসড়ার একটা ব্যাকরণ ভুল দর্শাইয়া ভুলটা সংশোধন করিতে বলেন। স্বর্গগত সার হেনরী ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া বলেন যে, রাজনীতি চালাইতে ব্যাকরণ শুদ্ধির অত্যাবশ্যকতা নাই। তিনি বলেন যে, ঐ খসড়া বৃটিশ মন্ত্রী সভার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রীদের খুব ঘনিষ্ঠ যোগের ফল স্বরূপ খাড়া করা হইয়াছে, এবং তাঁহারা বৃটিশ পার্লামেণ্টের হাতে একটা ব্যাকরণ অশুদ্ধিও সংশোধন করার ক্ষমতা দেন নাই। ঐ খসড়া সেইজন্য বৃটিশ সরকারী বিলের আকারে উভয় হাউজ দ্বারা ঠিক যেমন অবস্থায় উপস্থিত করা হইয়াছিল, তেমনি বিনা পরিবর্ত্তনে পাস হইয়া যায়।

এই সম্পর্কে আর একটা বিষয় উল্লেখ করার আছে। এই সংগঠিত ও যুক্ত সরকারের শাসন-পদ্ধতির মধ্যে এমন কতকগুলি সর্ত্ত আছে, যাহা সাধারণ পাঠকের নিকট অর্থহীন বলিয়া বোধ হইবে। উহাতে ব্যয়ভার খুব বাড়িয়াছে। ইহা রাজনৈতিকদিগের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

কিন্তু রাজনৈতিকদের শুধু একটা আদর্শ পদ্ধতি খাড়া করাই উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল মিটমাট দ্বারা একটা কার্য্যকরী পদ্ধতি গ্রহণ করা। এই জন্যই এই ইউনিয়ন সরকারের চারিটা রাজধানী আছে। কোনও উপনিবেশই নিজ নিজ রাজধানী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল না। তেমনি আবার যদিও পুরাতন ব্যবস্থা-পরিষদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তবুও উহার অধীনস্থ করিয়া এবং কতকগুলি ক্ষমতা ব্যবহারের আজ্ঞা প্রদান করিয়া, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষৎ রাখা হইয়াছে। যদিও গভর্ণরের পদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হয়, তথাপি রাজধানীতে গভর্ণরের অনুরূপ ক্ষমতা-সম্পন্ন কর্ম্মচারী, প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা নাম দিয়া রাখা হয়। সকলেই একথা জানে যে, চারি চারিটা পরিষৎ, গভর্ণর ও রাজধানী অনাবশ্যক, কেবল দৃষ্টিশোভা মাত্র। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর রাজনীতি-বিশারদগণ উহা গ্রাহ্য করেন নাই। ঐ ব্যবস্থার মধ্যে একটা বাহ্য আড়ম্বর রহিয়া গিয়াছে এবং উহা ব্যয়-বহুলও হইয়াছে, তথাপি রাজনৈতিকেরা এ বিষয়ে লোকে কি বলিবে তাহা না দেখিয়া, যাহা নিজেরা ভাল বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাই করিয়া, বৃটিশ পার্লামেণ্ট-দ্বারা তাহা স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন।

সত্যাগ্রহের মহাযুদ্ধের মর্ম্মকথা দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস না জানিলে বুঝা যাইবে না বলিয়া, আমি সংক্ষেপে এই ইতিহাস দিলাম। এক্ষণে আমরা দেখিব যে, ভারতীয়েরা কেমন করিয়া এ দেশে আসেন এবং সত্যাগ্রহের সূচনার পূর্ব্বে প্রতিপক্ষদের সহিত কিভাবে তাঁহাদিগকে যুঝিতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রবেশ

ইংরাজেরা কেমন করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমি লিখিয়াছি। তাহারা নাতালে বসবাস করিতে আরম্ভ করে এবং জুলুদের নিকট হইতে কিছু সুবিধা লওয়ার ব্যবস্থা করে। তাহারা দেখিতে পাইল যে, নাতালে খুব ভাল আখ, চা ও কফি জন্মিতে পারে। ব্যাপকভাবে চাষ করাইতে হাজার হাজার মজুর লাগিবে। তাহার যে কয়েকটি সেখানে বাস করিতে গিয়াছে তাহা ত মুষ্টিমেয়।

ঐ সময় দাস-প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় যদিও তাহারা নিগ্রোদিগকে কৃষিকার্য্যে মজুরী করার জন্য অনুরোধ করে এবং অবশেষে ধমক দেখায়, তবুও তাহাতে কাজ হয় না। নিগ্রোরা কঠিন পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত নহে। বৎসরে ছয়মাস কাজ করিলেই তাহাদের সহজেই দিন-পাত হয়, তবে তাহারা কেন বিদেশীদের নিকট গিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকিবে? একটা স্থায়ী মজুরের দল না পাওয়ায় এই ইংরাজদের চাষের কাজে মোটেই সুবিধা হইতেছিল না। এই অবস্থায় তাহারা ভারত-গবর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালায় এবং মজুর জোগার করিয়া দেওয়ার জন্য ভারত-সরকারের সাহায্য চাহে। ভারত-সরকার ইহাতে সম্মত হয় এবং প্রথম আমদানি-করা 'গিরমিটিয়া' মজুরের দল ১৮৬০ সালের ১৬ই নভেম্বর নাতালে পঁহুছে। এই ইতিহাসের পক্ষে উহা এক বিশেষ দিন। যদি ইহা না হইত তবে ভারতীয়েরাও সেখানে

থাকিত না, দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ করারও আবশ্যক হইত না, আর এই বই লেথারও প্রয়োজন থাকিত না।

আমার বিবেচনায় ভারত-সরকার মজুর যোগাইতে স্বীকার করিয়া ভাল করেন নাই। ভারতস্থ ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের নাতালবাসী ভাইদের দিকে পক্ষপাত করিয়াছিলেন। আমদানি-করা মজুরদের স্বার্থরক্ষার্থ যতগুলি সর্ত্ত করা দরকার মনে হইয়াছিল সে সকলই করা হইয়াছিল, একথা সত্য। তাহাদের খাওয়ার এক রকম ভাল ব্যবস্থাই হইয়াছিল। কিন্তু এতগুলি অশিক্ষিত লোকের যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তবে তাহার প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। তাহাদের ধর্ম্ম-আচরণের সাহায্যার্থে ও তাহাদের নৈতিক ব্যবস্থা ভাল রাখার দিকে কোনই দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। ভারতস্থ বৃটিশ-কর্ম্মচারীরা ইহা বিবেচনা করেন নাই যে, যদিও দাস-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি মালিক তাহার মজুরদিগের সহিত দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতেই ইচ্ছা করিবে। তাঁহাদের একথা বুঝা উচিত হইলেও তাঁহারা বুঝেন নাই যে, এই মজুরেরা কিছুদিনের জন্য বাস্তবিক পক্ষে ক্রীতদাসই হইয়া গেল। সার ডবলিউ ডবলিউ হাণ্টার এই মজুরদের সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, নাতালের ভারতীয় মজুরেরা অর্দ্ধ ক্রীতদাসের অবস্থায় থাকে। আর একবার একখানা পত্রে তিনি উহাদের অবস্থা 'প্রায় ক্রীতদাসের' মত বলিয়া বর্ণনা করেন। তারপর নাতালের একজন প্রধানতম ব্যক্তি মিঃ হ্যারি এসকম্ব কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে উঠিয়া ঐ কথাই স্বীকার করেন। ভারত-সরকারের নিকট যে সকল আবেদন-পত্র পাঠানো হয়, সেগুলি খুঁজিলেও দেখা যাইবে যে, তাহাতে যে সকল শীর্ষস্থানীয় নাতালবাসী ইউরোপীয়দের বিবৃতি পত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেও

ভারতীয় মজুরদের দাসত্বের অবস্থাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু অদৃষ্ট নিজ কার্য্য করিয়া যাইবেই। যে ষ্টীমার নাতাল অভিমুখে ঐ ভারতীয় মজুরদিগকে লইয়া গিয়াছিল, সেই ষ্টীমারই সত্যাগ্রহের বীজও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

আমি এই বহিতে ভারতীয় মজুরদের দুঃখের সকল কথা লিখিবার স্থান দিতে পারিব না। কেমন করিয়া যে তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে, নাতালের সহিত সম্পর্কিত ভারতীয় আড়কাঠিরা ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়া ভুলের মোহে পড়িয়া তাহারা মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিল, কেমন করিয়া নাতালে পঁহুছিয়াই তাহাদের চোখ খুলিয়া যায়, তবুও কেমন করিয়া তাহারা সেখানে টিকিয়া থাকে, কেমন করিয়া তাহাদের পর আরও মজুরেরা যাইতে থাকে, কেমন করিয়া তাহারা সমাজ ও ধর্ম্মের সমস্ত সংযম ত্যাগ করে, অথবা তাহাদের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, কেমন করিয়া এই হতভাগ্যদের ভিতর হইতে বিবাহিত স্ত্রী ও রক্ষিতা স্ত্রীলোকের ব্যবধান পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হয়, সে সকল কথা আমার এখানে বলার স্থান নাই।

যখন মরিসস্ দ্বীপে সংবাদ গেল যে, ভারতবাসী মজুরেরা নাতালে আসিয়াছে, তখন মরিসসের ভারতীয় বেপারী যাহাদের সহিত এই ধরণের মজুরদের সম্পর্ক ছিল, তাহারাও নাতালে যাইতে প্রলুব্ধ হয়। ভারতবর্ষ হইতে নাতালে যাইতে মাঝখানে মরিসস্ দ্বীপ পড়ে। সেখানে হাজার হাজার ভারতীয় মজুর ও বেপারী বাস করে। মরিসসের একজন ভারতীয় বেপারী শেঠ আবুবকর আমদ নাতালে দোকান খোলার ইচ্ছা করেন। তখনকার দিনে নাতালের ইংরাজেরা জানিত না যে, ভারতীয়েরা ব্যবসাক্ষেত্রে কি করিতে পারে, জানিবার আগ্রহও তাহাদের ছিল না। তাহারা ভারতীয় মজুরের সাহায্যে খুব লাভজনক কৃষিকার্য্য করিতেছিল, ইক্ষু, চা,

কফি ইত্যাদির চাষ সুরু করিয়াছিল। তাহারা চিনি তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করে এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় একরূপ ভাল পরিমাণেই স্থানীয় চিনি, চা ও কফি যোগাইতে আরম্ভ করে। তাহারা এত টাকা রোজগার করিতে লাগিল যে, তাহারা প্রাসাদতুল্য বাড়ী তৈয়ারী করিয়া ফেলিল ও একটা বনভূমিকে উদ্যানে পরিণত করিল। এই অবস্থায় শেঠ আমদের মত একজন সৎ ও কুশল ব্যবসায়ী যদি তাহাদের মধ্যে গিয়া বসেন, তবে তাহা তাহাদের গ্রাহের মধ্যে না আনারই কথা। আবার ইহার উপরে একজন ইংরাজই অংশীদার হিসাবে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। আবুবকর শেঠ ব্যবসা করিতে লাগিলেন, জমি ক্রয় করিলেন এবং তাঁহার সমৃদ্ধির কথা তাঁহার দেশ পোরবন্দর ও চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানে পঁহুছিল। তারপর অন্য মেমানেরা নাতালে আসিলেন। সুরাটের বোরারা মেমানদের পশ্চাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সমস্ত বেপারীদের কারবারের হিসাব রাখার দরকার হইত। সেই জন্য গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড় হইতে হিন্দু হিসাব-নবিসেরা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

নাতালে এইভাবে দুই শ্রেণীর লোক বাস করিতে লাগিল। এক স্বাধীন বেপারী ও তাহাদের কর্ম্মচারীগণ, আর আমদানি-করা মজুর। সময়ক্রমে আমদানি-করা মজুরদের সন্তান হইতে লাগিল। যদিও তাহারা কাজ করিতে বাধ্য ছিল না, তথাপি এই সকল সন্তানদের উপরেও কতকগুলি কঠিন আইনের সর্ত্ত প্রযুক্ত হয়। দাসের সন্তানেরা দাসত্বের দাগ এড়াইবে কি করিয়া? মজুরেরা নাতালে পাঁচ বৎসর কাজ করিবার সর্ত্ত করিয়া যাইত। এই কাল অতিবাহিত হইলে তাহাদের আর কাজ করার বাধ্যতা ছিল না। ইচ্ছা করিলে স্বাধীনভাবে নাতালে তাহাদের তখন মজুরী করিতে পারারই কথা

অথবা ব্যবসা করিতে বা বসবাস করিতে পারার কথা। কেহ কেহ ঐভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিল, কেহ কেহ বা দেশে ফিরিল। যাহারা নাতালে রহিল, তাহাদিগকে মুক্ত ভারতবাসী বলা হইত। এই শ্রেণীর লোকের অবস্থার বিশিষ্টতা বুঝা দরকার। যাহারা একেবারে স্বাধীনভাবেই ভারত হইতে গিয়াছে, তাহাদের সমান সুখ-সুবিধা এই মুক্ত ভারতীয়েরা ভোগ করিতে পারিত না। যেমন, একটা নিয়ম ছিল যে, তাহারা বিনা পাসে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারিবে না। যদি তাহারা বিবাহ করে, তবে সে বিবাহ এক জন রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট গিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে হইত। আরও কতগুলি কঠিন বিধি-নিষেধ তাহাদের পালন করিতে হইত।

ভারতীয় বেপারীরা দেখিল যে, তাহারা কেবল আমদানি-করা মজুর ও স্বাধীন ভারতীয়দের সহিত বেপার করা ছাড়াও নিগ্রোদের সহিতও বেপার করিতে পারে। নিগ্রোরা ইংরাজ বেপারীকে বড় ভয় করিত বলিয়া ভারতীয়দের সহিত বেপার করিতে তাহাদের খুব সুবিধা হইত। ইউরোপীয়েরা নিগ্রোদের সহিত বেপার করিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু তাই বলিয়া নিগ্রোর সহিত ভদ্রভাবে ব্যবহার করিবে—একথা নিগ্রোরা প্রত্যাশা করিতে পারে না। যদি টাকার মূল্যের উপযুক্ত জিনিষ পায় তাহা হইলেই তাহার অদৃষ্ট ভাল বলিতে হইবে। তাহাদের কাহারও কাহারও ভাগ্যে এমনও ঘটিত যে, হয়ত ৪ শিলিং মূল্যের কিছু কিনিয়াছে, আর একটা সভরেন ফির্‌তি দিবার জন্য দিয়া, এবং ১৬ শিলিং ফির্‌তি না পাইয়া মাত্র ৪শিলিং ফির্‌তি পাইয়াছে। আবার কখনো বা কিছুই পায় নাই। যদি বেচারী বাকিটা চায় ও বলে যে তাহার পাওনা আছে, তাহার উত্তরে তাহার উপর অকথ্য গালি বর্ষিত হয়। আর যদি ঐ পর্য্যন্তই থামে, তাহার উপর লাথি ও থাপ্পড় না পড়ে, তবেই তাহার সৌভাগ্য

বলিতে হইবে। সকল ইংরাজ ব্যবসাদারেরাই যে এইরূপ করে, একথা আমি বলি না। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, এই ধরণের ঘটনা অনেক ঘটে। অপর পক্ষে ভারতীয় বেপারীরা নিগ্রোর সহিত মিষ্ট কথা বলিত, কখন কখন হাসি-তামাসাও করিত। সরল নিগ্রোরা দোকানে ঢুকিয়া যাহা কিনিতে ইচ্ছা করে তাহা যদি হাতে লইয়া দেখিতে ইচ্ছা করিত, ভারতীয়েরা তাহাও দিত। অবশ্য কোন উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা এরূপ করিত না। তাহাদের ব্যবসায়ের স্বার্থই ভদ্রব্যবহারের হেতু ছিল। ভারতীয় বেপারীও সুবিধা পাইলে নিগ্রোকে ঠকাইত, তবুও ভদ্রব্যবহারের জন্য ভারতীয়েরা নিগ্রোদের প্রিয় হইয়া উঠে। অপরপক্ষে ইহাও দেখা গিয়াছে যে, হয়ত কোনও ভারতীয় নিগ্রোকে ঠকাইয়াছে এবং নিগ্রোরা ধরিতে পারিয়া বেপারীকে লাঞ্ছিতও করিয়াছে।

নিগ্রো ক্রেতারই ভারতীয় বেপারীদিগকে গালিগালাজ করার কথা বেশী শুনা যায়। নিগ্রো ও ভারতীয়দের কথা ধরিলে, ভারতীয়েরাই নিগ্রোদিগকে ভয় করিয়া চলিত। ফলে ভারতীয়দের নিগ্রোদের সহিত ব্যবসা খুব লাভজনকই হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় নিগ্রো ত সর্ব্বত্রই ছিল।

গত শতাব্দীর ১৮৮০ সালের কাছাকাছি ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটে বুয়ারদিগের প্রজা-তন্ত্র-শাসন ছিল। বলাই বাহুল্য যে, এই শাসনতন্ত্রে নিগ্রোর কোনও স্থান ছিল না। উহা সাদা লোকদিগেরই নিজস্ব ছিল। ভারতীয়েরা শুনিয়াছিল যে, তাহারা বুয়ারদিগের সহিতও বেপার করিতে পারে। বুয়ারেরা সরল, অকপট ও অনাড়ম্বর বলিয়া ভারতীয়দের সহিত তাহাদের ব্যবসা করা সম্ভব। সেইজন্য কয়েকজন ভারতীয় বেপারী ট্রান্সভাল ও ফ্রী ষ্টেটে গিয়া দোকান খোলে। তখন রেল ছিল না বলিয়া বেপারীরা খুব লাভ করিত। ভারতীয়দের অনুমান ঠিকই হইয়াছিল। তাহারা বুয়ার ও নিগ্রোদের সহিত বিস্তীর্ণভাবে বেপার করিতে আরম্ভ

করে। আবার কেপ্‌-কলোনিতেও জনকতক ভারতীয় বেপারী গিয়া ভালরূপ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করে। ভারতীয়েরা এইভাবে চারিটা উপনিবেশের মধ্যে অল্প অল্প ছড়াইয়া পড়ে।

এই সময় সম্পূর্ণ স্বাধীন ভারতবাসীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার, মুক্ত ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

অভাব অভিযোগের আলোচনা

নাতাল

নাতালের ইউরোপীয় কৃষিক্ষেত্রের স্বামীদের আবশ্যক ছিল কেবল ক্রীতদাসের। যাহারা নির্দ্দিষ্ট সময় তাহাদের চাকুরী করিয়া তাহার পর তাহাদেরই সহিত যত সামান্য ভাবেই হোক্, প্রতিযোগিতা করিতে বসিবে, এমন লোক তাহারা রাখিতে পারে না। যাহারা ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যে বা অন্য কার্য্যে বিশেষ সফলতা পায় নাই, তাহারাই যে আমদানি-ভুক্ত মজুর হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবুও একথা মনে করা চলে না যে, তাহারা কৃষিকার্য্য জানিত না, অথবা জমির সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল না। তাহারা দেখে যে, যদি তাহারা নাতালে কেবল সব্জীরই চাষ করে তাহা হইলে বেশ উপার্জ্জন করিতে পারে, আর যদি একটু জমি নিজস্ব পায় তবে আরও ভাল হয়। সেইজন্য অনেকেই নিজেদের চুক্তির সময় শেষ হইলে কোনও না কোনও একটা কাজ লইয়া বসিয়া যাইতে লাগিল। নাতালের ঔপনিবেশিকদিগের পক্ষে মোটের উপর ইহা ভাল ছিল। অনেক তরকারী ও সব্জী যাহা পূর্ব্বে উপযুক্ত কৃষক অভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মিত না, এক্ষণে তাহার চাষ হইতে আরম্ভ হইল। অন্যান্য তরকারি যাহা অল্পমাত্র উৎপন্ন হইত, তাহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। তরকারির দাম সস্তা হইয়া গেল। ইউরোপীয় ক্ষেত্রাধিকারীরা এই উন্নতিটা পছন্দ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদের

একচেটিয়া কারবারের মধ্যে প্রতিযোগী প্রবেশ করিতেছে। মুক্ত ভারতীয় মজুরদিগের বিরুদ্ধে সেই জন্য একটা আন্দোলন আরম্ভ হইল। পাঠক হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে, যে ইউরোপীয়েরা বেশী বেশী করিয়া আমদানি-করা মজুর চাহিতেছিল এবং যত পাইতেছিল সে সমস্তই কাজে লাগাইতেছিল, অন্যত্র আবার তাহারাই, এই আমদানির সর্ত্ত হইতে মুক্ত হওয়ার পর এই ভারতীয় মজুরদিগকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। ভারতীয়েরা তাহাদের পরিশ্রম ও কুশলতার জন্য এই পুরস্কারই পাইল।

এই আন্দোলন নানারূপ আকার ধারণ করে। একদল এই চেষ্টা করিতে লাগিল যে, আমদানির সর্ত্তকাল পূর্ণ হওয়ার পরেই মজুরদিগকে হয় পুনরায় চুক্তি করিতে হইবে, নয় ত ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা হইবে এবং যাহারা নূতন আমদানিতে আসিবে তাহাদিগকে এই সর্ত্তেই আনা হইবে। আর একদল আন্দোলন করিতে লাগিল যে, চুক্তি-মুক্ত হওয়ার পরই ভারতীয়েরা পুনরায় নূতন মজুরীর চুক্তি না করিলে তাহাদিগের উপর মাথা পিছু খুব একটা মোটা রকম টেক্স ধার্য্য করা হইবে। যেমন করিয়াই হোক্ ভারতীয় চুক্তি-মুক্ত মজুরের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বাধীনভাবে থাকা বন্ধ করাই উভয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। এই আন্দোলন এত জোরের হয় যে, নাতাল-গবর্ণমেণ্ট একটা কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন দ্বারা আন্দোলনকারীদের সে সময়ে বিশেষ কোন লাভ হইল না। কমিশন যে সকল সাক্ষ্য লইলেন তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উভয়দলের দাবিই অন্যায্য এবং মুক্ত-মজুরেরা থাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার জন-সাধারণের মোটের উপর লাভই হইতেছে। নিরপেক্ষ লোকদিগের সাক্ষ্য আন্দোলনকারী-দিগের বিপক্ষেই যায়। আগুন যেখান দিয়া যায় সেখানে তাহার দাগ

রাখিয়া যায়, এই আন্দোলনও নাতাল-গবর্ণমেণ্টকে তেমনি কতকটা প্রভাবিত করিল। নাতাল-গবর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রের মালিকদের সহিত বন্ধুতাসূত্রেই বদ্ধ ছিলেন। নাতাল সরকার সেই জন্য ভারত সরকারের সহিত এ বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং উভয়দলের প্রস্তাবই ভারত-সরকারের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। যে প্রস্তাবে চুক্তি-বদ্ধ মজুরেরা চিরদিনের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত হয়, এমন প্রস্তাব ভারত-সরকার তখনই একেবারে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষ হইতে এত দূরে এই মজুরদিগকে যাইতে দেওয়ার একটা হেতু বা সাফাই এই ছিল যে, তাহারা সেখানে গিয়া, চুক্তিকাল শেষ করার পর নিজ নিজ পরিশ্রম দ্বারা অবস্থা ভাল করিয়া লইতে পারিবে। তখন নাতাল বৃটিশ রাজ-সরকারের উপনিবেশ ছিল, কাজেই ইংলণ্ডের উপনিবেশ আফিস হইতেও এই অন্যায্য বিষয়ে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল ও অন্যান্য হেতু বশতঃ নাতালে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন পাওয়ার আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং অবশেষে ১৮৯৩ সালে তাহা প্রাপ্ত হয়। এখন নাতাল নিজের সামর্থ্য অনুভব করিতে লাগিল। উপনিবেশের বিলাতস্থ বিভাগও যে কোন দাবি গ্রহণ করিতে আর এখন অসুবিধা বোধ করিবে না। নাতালের নব গঠিত সরকারের প্রতিনিধিরা ভারত-সরকারের সহিত পরামর্শ করিতে ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, চুক্তি-মুক্ত ভারতীয়দিগকে নাতালে থাকিতে বাৎসরিক ২৫ পাউণ্ড বা ৩৭৫ টাকা মাথা পিছু টেক্স দিতে হইবে। একথা বোঝা সহজ যে, দরিদ্র মজুরের সাধ্য নাই যে এই প্রকার একটা টেক্স দিয়া বাস করে। লর্ড এলগিন ছিলেন তখন ভারতবর্ষের বড়লাট। তিনি ঐ টাকাটা অতিরিক্ত মনে করেন এবং বাৎসরিক তিন পাউণ্ড টেক্স বসাইতে সম্মতি দেন। আমদানির সময়কার

বেতনের হারের তুলনায় ইহা প্রায় ছয় মাসের রোজগারের সমান। এই টেক্স কেবল মজুরের উপর ধার্য্য হইল না। তাহার স্ত্রীর উপর, কন্যার বয়স তের বৎসর হইলে তাহার উপর এবং পুত্রের বয়স ষোল বৎসর হইলে তাহার উপর এই টেক্স ধরা হইল। সাধারণতঃ ইহাতে প্রত্যেক মজুরকেই বার্ষিক ৩২ পাউণ্ড টেক্স দিতে হয়। এই টেক্সের জন্য যে কষ্ট হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাহাদের এই টেক্স দিতে হইত তাহারই ইহার দুঃখ যে কত তাহা অনুভব করিত, আর যাহারা তাহাদিগের দুঃখ চক্ষে দেখিত, তাহারাই উহার কতকটা ধারণা করিতে পারিত। নাতাল গবর্ণমেণ্টের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চলে। বিলাতে ও ভারত-সরকারের নিকট আবেদন করিয়া দুঃখ জানানো হয় কিন্তু টেক্সর পরিমাণ কিছু কমানো ছাড়া আর কোনও ফল হয় না। গরীব মজুরেরা ইহার বুঝেই বা কি, আর প্রতিকারের উপায়ই বা কি জানে? তাহাদের পক্ষ হইতে ভারতীয় বেপারীরাই দেশ-প্রেম অথবা জন-সেবার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন চালায়।

স্বাধীন ভারতীয়দের অবস্থাও বড় ভাল ছিল না। নাতালের ইউরোপীয় বেপারীরা, তাহাদের বিরুদ্ধেও একই অভিপ্রায়ে আন্দোলন চালাইতে থাকে। ভারতীয় বেপারীরা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা ভাল যায়গার জমি লইয়াছিল। যেমন মুক্ত মজুরদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, তেমনি তাহাদের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষ হইতে হাজার হাজার বস্তা চাউল আনাইয়া ভাল লাভ রাখিয়া বিক্রীত হইতে লাগিল। স্বভাবতঃই এই ব্যবসা ভারতীয়দের হাতেই ছিল। ভারতীয় বেপারীরা জুলুদের সহিতও ব্যবসা করিত। ইহারা এই জন্য ইউরোপীয় বেপারীদের চক্ষুশূল হয়।

এদিকে আবার কয়েকজন ইউরোপীয়, ভারতীয় বেপারীদিগকে দেখাইয়া দেন যে, তাঁহারা ব্যবস্থা পরিষদের মনোনয়ন ব্যাপারে ভোট দিতে পারেন এবং মনোনয়ন প্রার্থীও হইতে পারেন। কয়েকজন বেপারী নিজেদের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করিয়া দেন। ইহার ফলে ইউরোপীয় রাজনৈতিকেরাও ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সহিত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যোগ দেন। যদি নাতালে ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বাড়ে, তাহাদের যদি অবস্থা সুরক্ষিত হয় তবে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয়েরা টিকিতে পারিবেন কিনা—এই সন্দেহ তাঁহাদের হয়। সেই জন্য স্বায়ত্তাধিকার প্রাপ্ত নাতাল সরকারের প্রথম কাজই হয়—একটা আইন পাস করিয়া লওয়া, যাহাতে ভারতীয়দের যে কয়জন ভোটার-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাহা বাদে আর কেহ ভোটের অধিকার না পান। নাতালের ব্যবস্থা পরিষদে ১৮৯৪ সালে ঐ মর্ম্মে এক বিল উপস্থিত করা হয়। এই বিলের মধ্যে ভারতীয়দিগকে ভারতীয় বলিয়াই বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আইনের সম্পর্কে জাতিগত ভেদ স্বীকার করিয়া নাতালের এই প্রথম আইন। ইহার প্রতিবাদ ভারতীয়েরা করেন। একা রাত্রে চারিশত স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া এক আবেদন প্রেরিত হয়। এই আবেদন নাতালের পরিষদে উপস্থিত করিলে পরিষৎ চমকিত হইয়া পড়েন। তবে বিল যেমন পাস হওয়ার, পাস হইয়া যায়। বিলাতে তখন উপনিবেশের মন্ত্রী ছিলেন লর্ড রিপন। তাঁহার নিকট দশহাজার লোকের স্বাক্ষর সমেত এক আবেদন পাঠানো হয়। দশহাজার স্বাক্ষর মানে নাতালে তখন যত স্বাধীন ভারতবাসী ছিল তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই স্বাক্ষর। লর্ড রিপণ এই বিল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই প্রকার বর্ণভেদ সূচক আইন করায় সম্মতি দিতে পারে না। পাঠকেরা পরে বুঝিবেন যে, এই ঘটনা ভারতীয়দের

পক্ষে একটা কত বড় জিৎ হইয়াছিল। নাতাল সরকার তখন আর একটা আইনের বিল উপস্থিত করিলেন। তাহাতে জাতিভেদ ছিল না, কিন্তু অন্য উপায়ে ভারতীয়দিগকে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। ভারতীয়েরা ইহার বিরুদ্ধেও ব্যর্থ প্রতিবাদ করে। এই বিলের মানে দ্ব্যর্থযুক্ত ছিল। ভারতীয়েরা প্রিভি-কাউন্সিলে এই আইনের ব্যাখ্যার জন্য আবেদন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করা যুক্তি-যুক্ত মনে করেন নাই। আমি এখনও মনে করি যে, ভারতীয়েরা এই অফুরন্ত মামলার ফেসাদে না গিয়া ভালই করিয়াছিলেন। বর্ণভেদটা যে বিধিবদ্ধ হইতে দেওয়া হয় নাই উহাই কম কথা নয়।

নাতালের ক্ষেত্র-স্বামীরা ও নাতাল-সরকার ইহাই যথেষ্ট মনে করিলেন না। ভারতীয়দের রাজনৈতিক ক্ষমতা-প্রাপ্তি সমূলে নাশ করা কেবল প্রাথমিক অত্যাবশ্যকীয় করণীয় ছিল, কিন্তু তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয়দের ব্যবসা ও ভারতীয়দের অবাধে প্রবেশ অধিকার বন্ধ করা। কোটি কোটি লোকের সম্পদে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ পাছে লোক পাঠাইয়া নাতাল ভরিয়া ফেলে এই ভয়ই নাতালের ইউরোপীয়দের হইয়াছিল। নাতালের এই সময়কার মোট লোক সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ জুলু, ৪০ হাজার ইউরোপীয়, ৬০ হাজার চুক্তি-বদ্ধ ভারতীয়, ১০ হাজার চুক্তি-মুক্ত ও ১০ হাজার স্বাধীনভাবে আগত ভারতীয়। বস্তুতঃ ইংরাজদের সত্যকার কোনও ভয় ছিল না, কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট ভয় যাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, যুক্তি দিয়া তাহাদিগকে বুঝানো যায় না। তাহারা ভারতবাসীদের অসহায় অবস্থা ও তাহাদের আচার ব্যবহারের কথা জানিত না, সেই জন্য মনে করিত যে ভারতীয়েরা তাহাদেরই মত অদৃষ্ট লইয়া পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত, তাহাদের মতই উপায় উদ্ভাবনে তৎপর। তাহাদের নিজেদের সংখ্যার তুলনায় ভারতবর্ষের বিপুল

লোক-সংখ্যার কথা ভাবিয়া তাহারা যদি মিথ্যা ভয়ে ভীত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সে যাহাই হোক্, জাতি-বৈষম্যের আইন এইভাবে বাধা দেওয়ার ফলে, পরে আরো যে দুইটা আইন হয় তাহাতে পরোক্ষভাবে ঐ কার্য্য নাতাল-সরকার সারিয়া লন। সেই জন্য অবস্থাটা যত খারাপ হইতে পারিত তাহার তুলনায় কিছু কম হইয়াছিল। এই শেষোক্ত আইনের সময় ভারতীয়েরা খুবই বাধা দেন, কিন্তু উহাও আইন বলিয়া পাস হইয়া যায়। ইহার মধ্যে একটা আইন দ্বারা ভারতবাসীদের নাতালের ব্যবসার পথে যথেষ্ট বিঘ্নের সৃষ্টি করা হইয়াছিল, অপর আইন দ্বারা ভারতীয়দের নাতালে প্রবেশ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথম আইনটার মর্ম্ম ছিল যে, নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া নাতালে কেহ ব্যবসা করিতে পারিবে না। কার্য্যতঃ যে কোনও ইউরোপীয় লাইসেন্স পাইত, কিন্তু ভারতীয়দের অসুবিধার অন্ত ছিল না। ভারতীয়দিগকে এই জন্য উকীল লাগাইতে হইত এবং অন্য প্রকারে ব্যয় করিতে হইত। যাহারা ইহা করিতে পারিত না, তাহাদের লাইসেন্স পাওয়া ঘটিত না। আর দ্বিতীয় আইনটা ছিল যে, যাহারা কোনও ইউরোপীয় ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষায় পাশ হইবে, কেবল তাহাদিগকেই নাতালে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। ভারতের কোটি কোটি লোকের নিকট এইভাবে নাতাল প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হয়। নাতাল-সরকারের সম্বন্ধে আমি কোনও ভ্রান্ত ধারণা পাঠকদিগকে না দিয়া ফেলি, সেইজন্য আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। নাতাল সরকার ঐ আইনের মধ্যে এই সর্ত্তও রাখিয়াছিলেন যে, আইন পাস হওয়ার তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতে যাহারা নাতালে আছে, তাহারা নাতালবাসী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহারা স্ত্রী ও নাবালক সন্তান সহ ভারতে

যাইতে ও সেখান হইতে ফিরিয়া পুনরায় নাতালে প্রবেশ করিতে পারিবে।

উপরে যে সকল বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা ছাড়াও নাতালে চুক্তি-বদ্ধ অথবা মুক্ত ভারতীয়দের আইনী ও বেআইনী অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, আজও হইতেছে। সেগুলি বর্ণনা করা অনাবশ্যক মনে করি। বিষয়টা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে যতটা বিবরণ দেওয়া দরকার ততটুকুই আমি দিতে ইচ্ছা করি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয়দের স্থিতির অবস্থা বর্ণন করিতে অনেক লেখা আবশ্যক, কিন্তু উহা বর্ত্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত।

পঞ্চম অধ্যায়

অভাব-অভিযোগের আলোচনা

ট্রান্সভাল ও অন্য উপনিবেশে

১৮৮০ সালের পূর্ব্ব হইতেই নাতালের ন্যায় অন্যান্য উপনিবেশেও ভারতীয় বিরোধী সংস্কার গঠিত হইতে থাকে। এক কেপ্-কলোনি ছাড়া অন্য সর্ব্বত্রই এই ভাবটা দেখা দিয়াছিল যে, মজুরী খাটিতে ভারতীয়েরা খুব ভাল, কিন্তু স্বাধীন ভারতীয়ের প্রবেশ দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার যে ক্ষতি হইতেছে উহা স্বতঃসিদ্ধ, উহার আর প্রমাণের আবশ্যক নাই। ট্রান্সভাল গণতন্ত্র ছিল। ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্টের নিকট গিয়া বৃটিশ প্রজা বলিয়া দাবি করা মানে উপহাসাস্পদ হওয়া। যদি কোনও অসুবিধা থাকে, তবে বৃটিশ প্রজা হিসাবে তাহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়—প্রিটোরিয়ার বৃটিশ এজেণ্টকে জানানো। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বাধীন ট্রান্সভালে এই বৃটিশ এজেণ্ট তবুও যা'হোক্ কিছু সহায়ক ছিলেন, কিন্তু যখন ট্রান্সভাল বৃটিশ-অধিকারভুক্ত হইল তখন সাহায্য করার এমন লোকও আর রহিল না। লর্ড মর্লি যখন ভারতবর্ষের সেক্রেটারী ছিলেন, তখন এখানকার একদল প্রতিনিধি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া অভিযোগ জানাইতে গেলে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, বৃটিশ সরকারের উপনিবেশের উপর কোনই অধিকার নাই। তাঁহাদিগকে হুকুম করা যায় না। তাঁহারা কেবলমাত্র অনুরোধ করিতে পারেন, যুক্তি দেখাইতে পারেন, যাহাতে নীতি-সমূহ প্রযুক্ত হয় তাহার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় জানাইতে পারেন। বস্তুতঃ অন্য

রাজশক্তির সহিত তাঁহারা অধিকতর সফলতার সহিত বিতর্ক করিতে পারেন, ট্রান্সভাল গণতন্ত্রের সহিত তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজেদের উপনিবেশের সহিত তাঁহারা ততটাও করিতে পারেন না। বৃটিশ সরকারের সহিত উপনিবেশের এমন সূক্ষ্ম সূত্রের বন্ধন যে, সামান্য টান পড়িলেই তাহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। জোর করার সেখানে কোনই সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে কথাবার্ত্তা চালাইয়া যতটা হয় তাহা করিবেন বলিয়া লর্ড মর্লি প্রতিশ্রুতি দেন। যখন ট্রান্সভালে বুয়ারদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল, তখন ভারতীয়দিগের প্রতি বুয়ারদের দুর্ব্ব্যবহার যুদ্ধের অন্যতম কারণ একথা লর্ড ল্যান্সডাউন, লর্ড সেলবোর্ণ এবং অন্য ইংরাজ রাজনৈতিকেরা বলেন।

এই দুর্ব্ব্যবহারটা কি প্রকারের তাহা এক্ষণে দেখা যাক্। ভারতীয়েরা ১৮৮১ সালে প্রথম ট্রান্সভালে প্রবেশ করে। শেঠ আবুবেকার প্রিটোরিয়াতে একটা দোকান খোলেন এবং একটা প্রধান রাস্তার উপর এক টুকরা জমি কিনেন। তাঁহার পথ ধরিয়া অন্য বেপারীরা যায়। তাহাদের অতিশয় কৃতকার্য্যতা দেখিয়া ইউরোপীয় বেপারীদের ঈর্ষা হয় এবং তাঁহারা সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন ও তাঁহাদের পার্লামেণ্টে দরখাস্ত দেন যে, ভারতীয়দিগকে যেন বহিষ্কার করা হয় এবং তাহাদের ব্যবসা যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই নূতন আবিষ্কৃত দেশে ইউরোপীয়দের অর্থ-ক্ষুধা বড় বিষম ছিল। তাহারা ন্যায় অন্যায় নীতির বন্ধন জানিত না। তাহারা যে দরখাস্ত দেয় তাহাতে জানায় ;—"এই ভারতীয়দের মানুষের মত সম্ভ্রমের জ্ঞান নাই, তাহারা জঘন্য ব্যাধিতে ভোগে, তাহারা প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই তাহাদের কামনার বস্তু মনে করে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, স্ত্রীলোকদিগের কোনও আত্মাই নাই।" এই চারিটি বাক্যে চারিটি মিথ্যা কথা রহিয়া গিয়াছে। এই ধরণের উদাহরণ বাড়াইয়া

যাইতে পারা যায়। ইউরোপীয়েরা এবং তাহাদের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে সমান ছিল। ভারতীয়েরা জানিতই না যে, তাহাদের বিরুদ্ধে কি ভীষণ ও অন্যায় প্রচার কার্য্য চলিতেছে। তাহারা সংবাদপত্র পড়িত না: সংবাদপত্রের আন্দোলন এবং দরখাস্ত ইত্যাদিতে কাজ হইল। বুয়ার পার্লামেণ্টে একটা আইনের খসড়া উত্থাপিত হইল। প্রধান প্রধান ভারতীয়েরা যখন শুনিল যে, তাহাদের বিরুদ্ধে কি প্রকার ঘটনা সৃষ্টি করা হইয়াছে, তখন তাহারা স্তম্ভিত হইল। তাহারা প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের সহিত দেখা করিতে গেলে তিনি তাহাদিগকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড় করাইয়া রাখেন। তিনি খানিকক্ষণ তাহাদের কথা শুনিয়া বলেন—"তোমরা হইতেছ ইসমেলের সন্তান, সেই জন্য জন্ম হইতেই তোমরা ইসাউ-এর সন্তানগণের দাসত্ব করিতে বাধ্য। আমরা ইসাউ-এর সন্তান, আমরা তোমাদিগকে আমাদের সমান অধিকার দিতে পারি না। আমরা যেটুকু দিই তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিও।" প্রেসিডেণ্টের এই জবাব যে ক্রোধ বা দ্বেষ প্রণোদিত—একথা বলা যায় না। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার বাল্যকাল হইতেই পুরাতন বিধানের (Old Testament) গল্প শুনিয়া আসিয়াছেন, এবং তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। যদি কেহ নিজে যে বিশ্বাস পোষণ করে তাহাই ব্যক্ত করে, তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় কেমন করিয়া ? কিন্তু অজ্ঞতা যদি সরলতার সহিত যুক্ত থাকে তাহা হইলেও ক্ষতি অনিবার্য্য। ফলে ১৮৮৫ সালে একটা বিষম আইন 'ভল্‌কস্রাড্' বা পালামেণ্টের ভিতর দিয়া তাড়াহুড়া করিয়া পাস করা হইল। ভাব এই প্রকার যে, ভারতীয়েরা আসিয়া যেন টান্সভাল এখনই ছাইয়া ফেলিতেছে। ভারতীয় নেতাগণের অনুরোধে বৃটিশ এজেণ্টকেও এ বিষয়ে কিছু করিতে হয়। অবশেষে এই প্রশ্ন উপনিবেশের বিলাতস্থ

সেক্রেটারীর হাতে যায়। ১৮৮৫ সালের এই তিন আইন অনুসারে প্রত্যেক ভারতীয়কেই ২৫ পাউণ্ড করিয়া ফি দিয়া ব্যবসা করার হুকুম লইতে হইবে, আর না করিলে অনেক গুরুতর সাজার ব্যবস্থা ছিল। তারপর কোনও ভারতীয়কেই এক ইঞ্চি জমিরও অধিকারী হইতে দেওয়া হইবে না। অথবা ভারতীয়েরা নাগরিকের অধিকার পাইতে পারিবে না। এই সমস্তই এত স্পষ্টতঃ অন্যায় ছিল যে, টান্সভাল গবর্ণমেণ্টও ইহা যুক্তি দিয়া সমর্থন করিতে পারেন নাই। বুয়ার ও ব্রিটিশদের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল, তাহাকে "লণ্ডন কনভেনসন" বলা হইত। ইহার চতুর্দ্দশ ধারার দ্বারা ব্রিটিশ প্রজার অধিকার রক্ষিত হইয়াছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, কনভেনসনের বিরোধী বলিয়া এই আইনের প্রতিবাদ করেন। বুয়ারেরা বলে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে এই আইনে সম্মতি দিয়াছেন।

এই ভাবে বৃটিশ ও ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্টের ভিতর একটা অবনিবনাও-এর সূত্রপাত হয় এবং ব্যাপারটা কোনও সালিশে দেওয়ার প্রস্তাব হয়। সালিশের বিচারের ফল সন্তোষজনক হয় নাই। সালিশ উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। ফলে ভারতীয়েরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেবল এইমাত্র ফল হয় যে, অন্যায় যতটা হইতে পারিত তাহা না হইয়া কিঞ্চিৎ কম হয়। রেজেষ্ট্রীর ফি ২৫ পাউণ্ড হইতে তিন পাউণ্ড নামে। ভারতীয়েরা জমি আদৌ কিনিতে পারিবেন না, এ সর্ত্ত উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সরকারের ইচ্ছানুরূপ কতকগুলি স্থান বা গলি বা পাড়ায় ভারতবাসীরা স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবেন—স্থির হয়।

গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিশ্রুতিও সততার সহিত পালন করেন নাই এবং 'লোকেশনে' বা ভারতীয়দের কিনিতে পারার নির্দ্দিষ্ট স্থানেও মৌরসী স্বত্বে জমি ভারতীয়দিগকে কিনিতে দেওয়া হয় না। ভারতীয়দের বাস আছে

এরূপ প্রত্যেক শহরেই, শহর হইতে অনেক দূরে নোংরা যায়গায় এই 'লোকেশন' নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত—এবং সেখানে না থাকিত জল বা আলো বা রাস্তা বা পায়খানার ব্যবস্থা। এমনি করিয়া ভারতীয়েরা ট্রান্সভালের অস্পৃশ্য হইল। একথা সত্য যে ট্রান্সভালের এই ভারতীয় পাড়া বা 'লোকেশনের' সহিত ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যদের পাড়ার কোনও তফাৎ নাই। ঠিক যেমন হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, অস্পৃশ্যদিগকে ছুঁইলেই অশুচি হইতে হয়, ট্রান্সভালের ইউরোপীয়েরাও তেমনি বিশ্বাস করে যে, ভারতীয়দের স্পর্শে আসিলে অথবা তাহাদের নিকটে থাকিলেও তাহারা অশুচি হইবে। তারপর ট্রান্সভাল সরকার ১৮৮৫ সালের ৩ আইনের এমন অর্থও করেন যে, ভারতীয়েরা কেবলমাত্র 'লোকেশনে'ই ব্যবসা করিতে পারিবে। সালিশ বলিয়া দেন যে, আইনের অর্থ করা সাধারণ আদালতের উপর নির্ভর করিবে। ভারতীয় বেপারীরা এজন্য বড়ই বিশ্রী অবস্থায় পড়েন। তবুও তাঁহারা কোনও মতে চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। কোথাও বা ইহা লইয়া সরকারের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া, কোথাও বা নালিশ করিয়া, আবার কোথাও বা যতটুকু পারা যায় খাতিরে কাজ চালাইয়া লইতে লাগিলেন। বুয়ার যুদ্ধের আরম্ভের সময় ভারতীয়দের এমনি অনিশ্চিত ও দীন অবস্থা চলিতেছিল।

আমরা এখন ফ্রী ষ্টেটের অবস্থা আলোচনা করিব। সেখানে দশ বার জন ভারতীয় দোকান খুলিতেই ইউরোপীয়েরা সোরগোল আরম্ভ করিল। সেখানকার পার্লামেণ্ট খুব কড়া আইন পাস করিয়া ভারতীয়দিগকে ষ্টেট হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন এবং তাহাদের দোকানের জন্য নামমাত্র খেসারত দিলেন। সেই আইনের মর্ম্ম এই ছিল যে, কোনও ভারতীয়ই কোন ক্রমেই সেখানে সম্পত্তি করিতে পারিবে না, ব্যবসা করিতে পারিবে

না, অথবা ভোটের অধিকার পাইবে না। বিশেষ অনুমতিক্রমে কোনও *ভারতীয় মজুরী খাটার অথবা হোটেলের 'ওয়েটারের' কাজে লাগিতে* পারে। কিন্তু আবেদন করিলেই যে কর্ত্তারা এই বিষম অনুগ্রহ করিতে বাধ্য, তাহাও নহে। ফলে কোনও আত্মসম্মান-সম্পন্ন ভারতীয়ের দুই দিনের জন্যও ফ্রী-ষ্টেটে যাপন করা অসম্ভব হইয়াছিল। বুয়ার যুদ্ধের সময় ফ্রী-ষ্টেটে দুই একজন 'ওয়েটা'র ব্যতীত আর কোনও ভারতীয়ই ছিল না। কেপ্-কলোনিতেও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন চলিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রতি যে ব্যবহার করা হইতেছিল তাহাও হীনতার ছাপ হইতে মুক্ত ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ভারতীয়দের ছেলেদিগকে সাধারণ স্কুলে ভর্ত্তি করা যাইত না, ভারতীয় ভ্রমণকারীরা হোটেলে থাকার স্থান পাইত না। কিন্তু ব্যবসা বা জমি কেনা সম্বন্ধে কোনও প্রকার বাধা অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল না।

এই অবস্থার পার্থক্যের হেতুও ছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কেপ্-কলোনিতে, বিশেষতঃ কেপ্-টাউনে অনেক মালয় ছিল। মালয়-বাসীরা মুসলমান বলিয়া ভারতীয় মুসলমানদের সংস্পর্শে তাহারা অচিরকালেই আসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহা হইতে অন্য ভারতীয়দের সহিতও যোগ হইয়াছিল। তারপর জনকতক ভারতীয় মুসলমান মালয় স্ত্রী বিবাহ করে। কেপ্-কলোনির সরকার মালয়দের বিরুদ্ধে কেমন করিয়া আইন খাড়া করেন? কেপই ছিল তাহাদের মাতৃভূমি, ডচ ছিল তাহাদের ভাষা, এবং তাহারা প্রথম হইতেই ডচদের সঙ্গে থাকিয়া ডচদের জীবনযাত্রার ধারা অনেকাংশে অনুকরণ করিয়াছিল। সেইজন্য কেপ্-কলোনি বর্ণবিদ্বেষ দ্বারা খুব অল্পই প্রভাবিত হইয়াছিল।

তারপর কেপ্-কলোনি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন উপনিবেশ ছিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল। কেপ্-কলোনিতে

অনেক স্থির বুদ্ধি উদার হৃদয় ইউরোপীয় জন্মিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, *পৃথিবীতে এমন কোনও স্থান নাই বা এমন কোনও জাতি নাই* যাহা হইতে, উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির উদ্ভব না হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বত্র এই প্রকারের লোকের পরিচয় পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তবে কেপ্-কলোনিতে এই প্রকারের লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত ছিলেন মিঃ মেরিম্যান। ইনি ১৮৭২ সালে কেপ্-কলোনি যখন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়, তখন প্রথম মন্ত্রীদিগের একজন ছিলেন এবং তারপর সকল মন্ত্রী-সভাতেই তিনি মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন। তারপর ১৯১০ সালে ইউনিয়ন সরকার স্থাপিত হইলে তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁহাকে লোকে দক্ষিণ আফ্রিকার গ্লাডষ্টোন বলিত। তারপর ছিল মোলটেনো পরিবার ও শ্রাইনার পরিবার। সার জন মোলটেনো ১৮৭২ সালের মন্ত্রী সভায় প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করেন। মিঃ ডবলিউ পি শ্রাইনার এডভোকেট ছিলেন। তারপর কিছুকাল এটর্ণি জেনারেল ছিলেন, পরে প্রধান মন্ত্রী হন। তাহার ভগ্নী অলিভার শ্রাইনার বিদুষী মহিলা ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি সুপরিচিতা ছিলেন এবং যেখানেই ইংরাজী ভাষার ব্যবহার হয় সেইখানেই লোকে তাঁহাকে জানিত। তিনি 'স্বপ্ন' বলিয়া বইখানা লেখার পর বিখ্যাত হন। সমস্ত মানবজাতির জন্য তাঁহার অসীম প্রেম ছিল। তাঁহার চক্ষু ভালবাসা মাখা ছিল। যদিও তিনি এত উচ্চ পরিবারের কন্যা ছিলেন এবং এত শিক্ষিতা ছিলেন, তথাপি তাঁহার চালচলন এত সাধাসিধা ছিল যে, তিনি বাড়ীতে নিজেই বাসনপত্র মাজিতেন। মিঃ মেরিম্যান, মোলটেনোরা ও শ্রাইনারেরা বরাবরই নিগ্রোদের হিত দেখিয়াছেন। যখনই নিগ্রোদের অধিকার বিপদাপন্ন হইত, তখনই তাঁহারা বীরত্বের সহিত তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য

দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের ভারতীয়দের প্রতিও সদয় ভাব ছিল। কিন্তু ভারতীয় ও নিগ্রোদের মধ্যে তাঁহারা পার্থক্য দেখিতেন। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ ছিল—"নিগ্রোরা ঐ স্থানের আদিম নিবাসী, সেই জন্য ইউরোপীয় বাসিন্দারা তাহাদের পরে আসিয়া তাহাদের কোনও অধিকার অপহরণ করিতে পারে না। আর ভারতীয়দের বেলায় তাহাদের অন্যায় প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য যদি আইন করা যায়, তবে তাহাতে অন্যায় হয় না।" তাহা হইলেও ভারতীয়দের জন্য তাঁহাদের দরদ ছিল। গোখলে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান, তখন মিঃ শ্রাইনার টাউনহলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভাই এদেশে তাঁহার প্রথম সম্বর্দ্ধনা সভা ছিল। মিঃ মেরিম্যানও গোখলের সহিত অতিশয় ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ভারতীয়দের প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার সহানুভূতি জানাইয়াছিলেন। মিঃ মেরিম্যানের ন্যায় অন্য আরো ইউরোপীয় ছিলেন। আমি মাত্র কয়েকজনার নাম সেই শ্রেণীর লোকদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিলাম।

কেপ্-কলোনির সংবাদপত্রগুলিও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য স্থানের সংবাদপত্র অপেক্ষা ভারতীয়দের কম বিরোধী ছিল।

এই সকল কারণে কেপ্-কলোনিতে ভারতীয়দের প্রতি বিরাগের ভাব দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যস্থান অপেক্ষা কম হইলেও, অন্যত্র যে ভারতীয় বিদ্বেষ ছিল তাহা কেপ্-কলোনিতেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। এই স্থানেও নাতালের অনুকরণে দুইটি ভারতীয়-বিরোধী আইন পাশ হইয়াছিল, এক ইমিগ্রেশন আইন, যাহাতে ভবিষ্যতে ভারতীয়েরা আর না প্রবেশ করিতে পারে, অপর লাইসেন্স আইন, যাহাতে কোনও ব্যবসা করিতে হইলেই লাইসেন্স চাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার বুয়োর যুদ্ধের পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত মুক্ত ছিল, বুয়ার যুদ্ধের সময় হইতেই ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ হয়, একথা বলা যাইতে পারে। ট্রান্সভালে তিন পাউণ্ড কর ছাড়া প্রবেশের আর কোনও বাধা ছিল না। নাতাল ও কেপ্-কলোনি ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করায় তাহাদের পক্ষে ট্রান্সভালে যাওয়া কঠিন ছিল, কেননা সেখানে যাইতে নাতাল বা কেপ্-কলোনি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ডেলাগোয়া-বে বলিয়া যে পর্ত্তুগীজ বন্দর আছে, সেখানে নামিয়া অবশ্য ট্রান্সভাল যাওয়া যাইত। কিন্তু পর্ত্তুগীজেরাও অনেকটা ইংরাজদের নকল করিয়াছিল। একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কদাচিৎ কোনও ভারতবাসী নাতাল অথবা ডেলাগোয়া-বের পথে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া অথবা ঘুষ দিয়া ট্রান্সভাল যাইত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাথমিক দ্বন্দ্বের আলোচনা

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহে ভারতীয়দের অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া, ভারতীয়েরা তাহাদের প্রতি আক্রমণের প্রতিরোধ কি ভাবে করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাইয়াছি। সত্যাগ্রহ সংগ্রামের উদ্ভব সম্বন্ধে ঠিক মত ধারণা করার জন্য, সত্যাগ্রহের পূর্ব্বে ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সকল চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক।

১৮৯৩ সালের পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় উচ্চশিক্ষিত স্বাধীন ভারতবাসী তেমন কেহ ছিল না, যে ভারতবাসীদের স্বার্থ দেখিবে। যে সকল ভারতীয় ইংরাজী জানিত, তাহারা প্রায় সকলেই কেরাণী ছিল। তাহাদের কাজ চালাইবার মত ইংরাজী ভাষা তাহারা জানিত। দরখাস্ত আদির মুসাবিদা করার মত জ্ঞান তাহাদের ছিল না, আর তাহাদের সমস্ত সময়ই তাহাদের মনিকদের কার্য্যেই দিতে হইত। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই জন্মিয়াছিল, এমন আর একদল ইংরাজী জানা লোক ছিল। তাহারা প্রায় সকলেই চুক্তিবদ্ধ মজুরদের সন্তান সন্ততি। তাহাদের মধ্যে যাহারা পারিত, তাহারা আদালতে দোভাষীর কার্য্য করিত। ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য, তাহারা সহানুভূতি প্রকাশ করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিত না।

চুক্তিবদ্ধ অথবা মুক্ত মজুরেরা ভারতবর্ষের যুক্ত প্রদেশ অথবা মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, স্বাধীন ভারতীয়দের মধ্যে মুসলমানেরা ছিল বেপারী, আর হিন্দুরা ছিল তাহাদের মুহুরী।

ইহারা সকলেই গুজরাটী। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন পার্শী বেপারী ও তাহাদের কেরাণী ছিল, কিন্তু সারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩০।৪০ জনের বেশী পার্শী ছিল না। ভারতীয়দের মধ্যে একটা চতুর্থ দল ছিল সিন্ধী বেপারীদের। তাহারাও সংখ্যায় দুই শত অথবা কিছু বেশী হইবে। সিন্ধীরা ভারতের বাহিরে যেখানেই গিয়া বসে সেখানেই মনোহারী দ্রব্যের ব্যবসা করে, যথা রেশম, কিংখাব, কারুকার্য্য খচিত বাক্স, আবলুশ কাঠের গৃহ সজ্জা, চন্দন কাষ্ঠের ও হাতীর দাঁতের দ্রব্যাদি। তাহাদের ক্রেতারা সাধারণতঃ ইউরোপীয়।

ইউরোপীয়েরা চুক্তিবদ্ধ মজুরদিগকে 'কুলী' বলিত। কুলী মানে মুটে। এই 'কুলী' কথাটার এত বেশী ব্যবহার হইত যে, চুক্তিবদ্ধ মজুরেরাও নিজেদিগকে কুলী বলিত। শত শত ইউরোপীয়েরা, ভারতীয় উকীল বা বেপারীদিগকে 'কুলী-উকীল', 'কুলী বেপারী' বলিত। অনেক ইউরোপীয় ছিল, যাহারা জানিত না যে ঐ কথায় কোনও অসম্মান করা হয়, আবার অনেকেই ঐ বাক্য ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞা দেখাইবার জন্যই ব্যবহার করিত। স্বাধীন ভারতীয়েরা সেই জন্য নিজেদিগকে চুক্তিবদ্ধ মজুর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিত। এই সকল কারণে এবং ভারতবর্ষের অবস্থার বিশেষত্বের জন্য, চুক্তিবদ্ধ ও মুক্ত মজুরদের মধ্যে এবং স্বাধীন ভারতীয়দের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করার চেষ্টা ছিল।

উপরের বর্ণিত অত্যাচার সমূহের প্রতিকারের জন্য স্বাধীন ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ মুসলমান বেপারীরা চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সেজন্য চুক্তিবদ্ধ বা মুক্ত মজুরদের সাহায্য লওয়ার কোনও সাক্ষাৎ চেষ্টা ছিল না। হয়ত তাহাদের সমর্থন পাওয়ার ধারণা কাহারও হয় নাই, হয়ত বা ধারণা হইলেও তাঁহারা একথা ভাবিতেন যে, উহাদিগকে ইহার সহিত জড়াইয়া

লইলে ক্ষতি হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। সকলেই ইহা মনে করিতেন যে, স্বাধীন বেপারীরাই ইউরোপীয়দের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। সেই জন্য আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টাও এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এই প্রতিরোধ কার্য্যে তাঁহাদের বিঘ্ন ছিল নানা প্রকারের। তাঁহারা ইংরাজী জানিতেন না। ভারতবর্ষে তাঁহারা এই ধরণের জন-সাধারণের সেবার কাজ করার অভিজ্ঞতাও পান নাই। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা বেশ ভাল কাজই করিয়াছিলেন, একথা বলা যায়। তাঁহারা ইউরোপীয় ব্যারিষ্টারের সাহায্য লইয়া দরখাস্ত আদি লেখাইতেন, কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিতেন, কখনো বা ডেপুটেশন (প্রতিনিধি সঙ্ঘ) গঠন করিয়া পাঠাইতেন। এই ভাবে তাঁহারা যথা-শক্তি প্রতিকারের চেষ্টা করিতেন। ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে।

পাঠকেরা কতকগুলি তারিখ মনে রাখিলে সুবিধা হইবে। ১৮৯৩ সালের পূর্ব্বেই ভারতীয়দিগকে অরেঞ্জ ফ্রী-ষ্টেট্ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ট্রান্সভালে ১৮৮৫ সালের ৩ আইন কার্য্যকরী ছিল। নাতালে কেবল চুক্তিবদ্ধ মজুর রাখিয়া, আর সকল ভারতীয়কে তাড়াইয়া দেওয়ার কল্পনা চলিতেছিল, আর সেইজন্য স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারও লওয়া হইয়াছিল।

আমি ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করি। প্রবাসী ভারতবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না। আমি ব্যবসা সম্পর্কেই সেখানে যাই। পোর বন্দরের মেমানদের এক খ্যাতনামা ব্যবসাদার, "দাদা আব্দুল্লা" নামে ডারবানে ব্যবসা-কার্য্য করিতেছিলেন। "তায়েব হাজি খান মহম্মদ" নামে সমান ধনশালী আর একজন বেপারী প্রিটোরিয়াতে বেপার করিতেছিলেন। ইঁহারা পরস্পর প্রতিযোগী ছিলেন এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ ইঁহাদের মধ্যে একটা

গুরুতর মোকদ্দমা চলিতেছিল। "দাদা আব্দুল্লা"র কারবারের এক জন অংশীদার তখন পোর বন্দরে ছিলেন. তিনি মনে করেন যে, আমাকে নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাইলে তাঁহাদের মোকদ্দমার সাহায্য হইবে। তখন আমি সবে ব্যরিষ্টার হইয়াছি এবং ব্যবসার কিছুই জানিতাম না। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মোকদ্দমার হানি হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না, কেননা তাঁহাদের মোকদ্দমার ভার দক্ষিণ আফ্রিকার যোগ্য ব্যারিষ্টারদের হাতে ছিল। কোর্টের কোনও কাজে নহে ব্যারিষ্টারকে সাহায্য করার জন্যই তাঁহারা আমার আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। আমার নূতনত্ব ভাল লাগিত। আমার নূতন স্থান দেখিতে ও নূতন অভিজ্ঞতা পাইতে ইচ্ছা হইত। আমাকে এখানে যাহারা মোকদ্দমা দিত, তাহাদিগকে কমিশন দেওয়া আমার পক্ষে বড় বিরক্তি-জনক ব্যাপার ছিল। কাথিয়াওয়াড়ের চক্রান্ত-পূর্ণ আবহাওয়ায় আমার যেন শ্বাসরোধ হইয়া যাইতেছিল। আমাকে কেবল এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হয়। ঐ কার্য্য গ্রহণ করায় আমি কোনও বাধা দেখি না। আমার ক্ষতি হওয়ার কিছুই ছিল না, কেননা তাঁহারা আমাকে যাতায়াতের ব্যয়, সেখানে থাকার সমস্ত ব্যয় ও তদুপরি একশত পাঁচ পাউণ্ড দিবেন বলিয়াছিলেন। আমার দাদা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি আমার পিতার ন্যায় ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছাই আমার নিকট আদেশ ছিল। তিনি আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়া পছন্দ করেন, এজন্য আমি ১৮৯৩ সালের মে মাসে ডারবানে গিয়া উপস্থিত হই।

আমি ত ছিলাম ব্যারিষ্টার। আমার ধারণা অনুযায়ী ভাল পরিধেয় দ্বারা সজ্জিত হইয়া, আমার নিজের সম্বন্ধে "আমি একটা কিছু" এই ধারণা লইয়া ডারবানে অবতীর্ণ হইলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমার মোহ দূর হইল।

দাদা আব্দুল্লার যে অংশীদার আমাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি নাতালের সম্বন্ধে আমাকে একটা ধারণা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যাহা চাক্ষুষ দেখিলাম, তাহা তাঁহার দেওয়া ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি সরল, অকপট লোক ছিলেন, ভিতরের খবর কিছু জানিতেন না। নাতালে ভারতীয়দের যে কি দুর্গতি, তাহা তিনি জানিতেন না। যে সকল অবস্থা অতীব অপমানকর, তাহা তাঁহার নিকট সে প্রকার মনে হয় নাই। আমি যেদিন পঁহুছিলাম সে দিনই দেখিলাম যে, ইউরোপীয়েরা ভারতবাসীদিগের প্রতি অতিশয় অপমান-সূচক ব্যবহার করে।

পঁহুছিবার পনের দিনের মধ্যেই আমি কোর্টে যে সকল দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ করি, রাস্তায় রেলে চলিতে যে অসুবিধায় পড়ি, পথে যাইতে যে মার খাই, হোটেল যোগাড় করিতে যে অসুবিধা ভোগ করি সে সকল কথা এখানে বর্ণনা করিব না।

এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট যে, ঐ সব ব্যবহার আমার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছিল। আমি সেখানে একটিমাত্র মোকদ্দমার জন্য অনেকটা কৌতূহল বশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেইজন্য প্রথম বৎসরটায় আমি কেবল এই সকল অত্যাচারের ভোক্তা ও সাক্ষীমাত্র হইয়াছিলাম। তাহার পর আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়। আমি দেখিলাম যে, স্বার্থের দিক দিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কোনও আকর্ষণ নাই। যেখানে অপমানিত হইতে হয়, সেখানে বাস করিতে বা টাকা রোজগারের জন্য থাকিতে, আমার কেবল অনিচ্ছা নয়, একটা বিতৃষ্ণা ছিল। আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমার কাছে দুইটি পথ ছিল। একটি হইতেছে, দাদা আব্দুল্লাকে একথা জানানো যে, নাতাল সম্বন্ধে আমি যে ধারণা পাইয়াছিলাম এস্থান সে প্রকার নহে এবং সেই জন্য তাঁহার সহিত

চুক্তি হইতে মুক্তি লইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসা। দ্বিতীয় পথ ছিল, যতই কষ্ট হোক্ তাহা সহ্য করিয়া, যে কাজ করিতে আসিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাওয়া। আমাকে মরিৎসবর্গে একটা পুলিশের পাহারা-ওয়ালা ট্রেণ হইতে ঘাড়-ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেয় ও ট্রেণ চলিয়া যায়, আমি সেই প্লাটফর্ম্মে তীব্র শীতে ওয়েটিংরুমে বসিয়া কাঁপিতে ছিলাম। আমার মালপত্র কোথায় রাখিয়াছে জানিতাম না। জিজ্ঞাসা করিতে গেলে পাছে আবার অপমান করে ও আবার মার লাগায় সেই জন্য জিজ্ঞাসাও করিতে পারি নাই। নিদ্রা আমার সম্ভবই ছিল না। আমার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। রাত্রির শেষভাগে আমার সঙ্কল্প স্থির হইল যে, এ অবস্থায় ভারতবর্ষে পলাইয়া যাওয়া ভীরুর কার্য্য হইবে। যে কাজ হাতে লইয়াছি, তাহা শেষ করিতেই হইবে। অপমানই হই আর মারই খাই, আমাকে প্রিটোরিয়া পঁহুছিতে হইবেই। প্রিটোরিয়াতে মোকদ্দমা হইতেছিল, সেইখানে পঁহুছিতে হইবে। আমি মনে করিলাম যে, মোকদ্দমার কার্য্য করিতে করিতে যদি সম্ভবপর হয়, তবে প্রতিবিধানের জন্য কিছু করিব। এই সঙ্কল্প আমাকে কতকটা শান্ত করিল ও শক্তি দিল, কিন্তু রাত্রে আর ঘুমাইতে পারিলাম না।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি দাদা আব্দুল্লাকে ও রেলের জেনারেল ম্যানেজারের নিকট তার করিলাম। দুইজনের নিকট হইতেই জবাব পাইলাম। দাদা আব্দুল্লা ও তাঁহাদের অংশীদার শেঠ আব্দুল্লা হাজি আদম জাভেরী যথাসাধ্য করিলেন। তাঁহারা রেলপথে বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের এজেন্টদিগের নিকট তার করিলেন, যেন তাঁহারা আমার যত্ন লন। তাঁহারা জেনারেল ম্যানেজারের সহিত দেখা করিলেন। দাদা আব্দুল্লার তার পাইয়া মরিৎসবর্গের স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ আমার সহিত ষ্টেশনে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহারা আমাকে সান্ত্বনা

দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহাদের সকলের অভিজ্ঞতাই ঐ প্রকার পীড়াদায়ক। তবে তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া আর উহাতে কিছু মনে করেন না। ব্যবসা করা, আর এদিকে মান অপমান বোধ এক সঙ্গে চলে না। তাঁহারা সেই জন্য যেমন টাকা পকেটস্থ করেন, তেমনি অপমানও পকেটস্থ করিতেই স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন যে, রেল ষ্টেশনে প্রধান প্রবেশ-দ্বার দিয়া তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন না, তাঁহাদের টিকিট কিনিতেই মহা বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সেই রাত্রিতেই আমি প্রিটোরিয়ার পথে রওনা হই। সকলের হৃদয়ের সঙ্কল্প যিনি জানেন, সেই ঈশ্বর আমাকে আরও পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন। প্রিটোরিয়ার পথে আমি আরো অপমানিত হই এবং আরো মার খাই। কিন্তু এই সকল আমাকে আমার সঙ্কল্পে আরও দৃঢ় করে।

১৮৯৩ সালেই আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের যে কি অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রিটোরিয়াস্থ ভারতীয়দিগের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করা ছাড়া আর কিছু কার নাই। আমার বোধ হইয়াছিল যে, মোকদ্দমা লইয়া থাকা, আর ভারতীয়দের অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করা, এই দুই কার্য্য এক সঙ্গে করিতে পারিব না। আমি এ কথা বুঝিয়াছিলাম যে, এই দুই কাজ এক সঙ্গে করিতে গেলে উভয়ই নষ্ট হইবে। ১৮৯৪ সাল আসিয়া পড়িল, আমি ভারতবর্ষে রওনা হওয়ার জন্য ডারবানে আসিলাম। আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্য যে উৎসব হইয়াছিল, সেখানে একখণ্ড "নাতাল মার্কারি" সংবাদ-পত্র আমার হাতে পড়ে। উহা আমি পড়িয়াছিলাম। আমি দেখিলাম যে, নাতাল ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে "ভারতীয় ভোটাধিকার" সম্বন্ধে কয়েক লাইন আছে।

স্থানীয় সরকার ভারতীয়দিগকে ভোটাধিকার-চ্যুত করার জন্য এক বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। ভারতীয়েরা যে অল্পস্বল্প অধিকার ভোগ করিত, তাহা শেষ করার জন্য এই প্রথম পদক্ষেপ। সেই সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহাতে সরকারের যে কি ইচ্ছা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না। যে সমস্ত বেপারী ও অন্য লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে আমি ঐ রিপোর্ট পড়িয়া শুনাই এবং অবস্থা সম্বন্ধে আমার যথা-সাধ্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিই। সমস্ত বিবরণ আমার জানা ছিল না। আমি তাঁহাদিগকে বলি যে, ভারতীয়েরা তাঁহাদের নিজেদের অধিকারের উপর এই আক্রমণ যেন বিশেষ দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করেন। তাঁহারা আমার কথা মানিয়া লন, কিন্তু তাঁহাদের ঐ কার্য্যের জন্য অক্ষমতার কথা জানাইয়া আমাকে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। আমি মাসখানেক অথবা আর কিছু বেশীদিন থাকিয়া যাইতে স্বীকৃত হই। ইতিমধ্যে এই বিষয়টা চুকিয়া যাওয়ার কথা। সেই রাত্রেই, আমি ব্যবস্থা-পরিষদে দাখিল করার জন্য একখানা দরখাস্ত লিখিয়া ফেলি। গবর্ণমেণ্টকে একটা টেলিগ্রাম করিয়া ঐ বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। তখনই হাজি আদমকে সভাপতি করিয়া একটা কমিটি গঠিত হয় এবং টেলিগ্রাম তাঁহারই স্বাক্ষরে যায় দুই দিনের জন্য ঐ বিলের আলোচনা মুলতুবী থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয়দের এই প্রথম দরখাস্ত গেল। ইহাতে একটা কিছু প্রভাব হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিল পাশ হওয়া যে বন্ধ হয় নাই, সে কথা চতুর্থ অধ্যায়েই বলিয়া গিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের এই প্রকার আন্দোলনের এই প্রথম অনুভূতি। ইহাতে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা উৎসাহের ঢেউ বহিয়া গেল। প্রতিদিনই সভা হইতে আরম্ভ হইল এবং সভাতে ক্রমশঃই বেশী লোক আসিতে লাগিল।

যত টাকা লাগিতে পারে তাহার অপেক্ষা বেশী টাকা সংগৃহীত হইল। অনেক স্বেচ্ছাসেবক কোনও প্রতিদান না লইয়া দরখাস্তের নকল করা, স্বাক্ষর সংগ্রহ করা ইত্যাদি কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিয়া গেল। অন্য অনেকে ঐ ফণ্ডে টাকা দিল এবং কার্য্যতঃ সাহায্য করিল। মুক্ত মজুরদিগের সন্তানগণ আনন্দের সহিত এই আন্দোলনে যোগ দিল। তাহারা ইংরাজী জানিত, হাতের লেখাও বড় সুন্দর ছিল। তাহারা দিবারাত্র সন্তুষ্টচিত্তে নকল করার কাজ করিতে লাগিল। এক মাসের ভিতর দশ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন লর্ড রিপনের নিকট পাঠানো হইল। আমি যে কার্য্য হাতে লইয়াছিলাম, ইহাতে তাহা সমাপ্ত হইল।

আমি দেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিলাম। কিন্তু এই আন্দোলন ভারতীয়দের মধ্যে এমন একটা উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল যে, তাঁহারা আমাকে ছাড়িতে চাহিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "আপনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগকে সমূলে নষ্ট করার চেষ্টার এই প্রথম সূচনা। আমাদের আবেদনের উত্তরে উপনিবেশের সেক্রেটারী সন্তোষজনক উত্তর দিবেন কিনা কে জানে? আপনি আমাদের উৎসাহ দেখিয়াছেন। আমাদের কার্য্য করিতে ইচ্ছা আছে, আমরা কাজ করিতেই চাই। আমাদের অর্থও আছে। কেবল এক পরিচালকের অভাবে, যাহা সামান্য কিছু করা হইয়াছে তাহাও ব্যর্থ যাইবে। আমরা ত বুঝি যে আপনার এখানে থাকিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।" আমি ভাবিলাম যে, যদি ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য কোনও স্থায়ী সংস্থা গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে ভাল হয়। কিন্তু আমি কোথায় থাকিব, কেমন করিয়াই বা থাকিব? তাঁহারা আমাকে বেতন দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আমি তাহা লইতে পরিষ্কার ভাবে অস্বীকার করি। জন-সেবার কাজের জন্য বেশী

টাকা লওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া আমি একাজ নূতন প্রবর্ত্তন করিতে-ছিলাম। তখনকার দিনে আমার যেমন মনের ভাব ছিল, তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম যে, দশজনা ব্যারিষ্টার যেমন থাকে আমারও তেমনি জাকজমকের সহিত থাকা সঙ্গত। কিন্তু তাহাতে ব্যয়ও অনেক। আমি বুঝিয়াছিলাম, যে সংস্থার নিজের জন্যই টাকা তুলিতে হইবে, এমন সংস্থার উপর নিজের ব্যয়ের জন্য নির্ভর করায় আমার কার্য্য-শক্তি কমিয়া যাইবে। এই সকল এবং অন্যান্য হেতু বশতঃ আমি অর্থ লইয়া সাধারণের সেবার কাজ করিতে সাফ্ অস্বীকার করিলাম। তাঁহাদিগকে বলি যে, যদি তাঁহাদের মামলা আমাকে দেন এবং আমাকে তাঁহাদের ঘরোয়া উকীল করিয়া বাঁধা রাখার অর্থ দেন, তাহা হইলে আমি থাকিয়া যাইতে পারি। তাঁহারা এক বৎসরের জন্য এই ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমরা এক বৎসর এইভাবে কাজ করিয়া ফলাফল দেখিয়া তাহার পর উভয়পক্ষের ইচ্ছা হইলে ঐ ব্যবস্থা বহাল রাখিতে পারা যাইবে। সকলেই এই কথা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন।

আমি নাতাল সুপ্রীমকোর্টে এডভোকেট হওয়ার জন্য আবেদন করিলাম। নাতাল আইনজীবি-সমিতি আমার আবেদনের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, কোনও কালো লোক সেখানে আইন ব্যবসা করিবে, ওকালতী আইনের সে উদ্দেশ্য ছিল না। খ্যাতনামা এডভোকেট এবং এটর্নি জেনারেল এবং পরবর্ত্তীকালে নাতালের প্রধানমন্ত্রী মিঃ এস্কম্ব আমার পক্ষ লইয়াছিলেন। সেখানকার রীতি এই ছিল যে, কোনও ব্যারিষ্টার ঐ ধরণের আবেদন বিনা ফীতে আদালতে উপস্থিত করিবেন। মিঃ এস্কম্ব আমার দরখাস্ত দাখিল করেন। দাদা আবদুল্লাদেরও তিনি সিনিয়র ব্যারিষ্টার ছিলেন। কোর্ট বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া আমার দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। আইন-সমিতির বিরোধ আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে

জাহির করিয়া দিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সংবাদপত্র সমূহ আইন-সমিতিকে উপহাস করেন, কেহ কেহ আমাকে অভিনন্দিতও করেন।

যে অস্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছিল, উহাকে স্থায়ীরূপ দেওয়া হয়। আমি কখনো ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে উপস্থিত হই নাই। তবে উহার সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম। আমি কংগ্রেসের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলাম এবং কংগ্রেসের নাম জন-প্রিয় হোক্ এই ইচ্ছা রাখিতাম। আমি অনভিজ্ঞ ছিলাম বলিয়া আমাদের সভার জন্য একটা নূতন নাম দেওয়ার চেষ্টা করিলাম না। ভুল করিয়া ফেলিতে পারি বলিয়া ভয়ও ছিল। সেইজন্য আমি বন্ধুদিগকে পরামর্শ দিলাম যে, আমাদের সভার নাম 'নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস' রাখা হোক্। আমার ভারতীয় মহা-সভার সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ ধারণা ছিল, তাহাই কোনও প্রকারে আমার বন্ধুদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। যাহা হোক্ নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস ১৮৯৪ সালের মে মাসে স্থাপিত হইল। ভারতীয় কংগ্রেস ও নাতাল কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্য একটা এই ছিল যে, নাতাল কংগ্রেস সারা বৎসরই কার্য্য করিত এবং ইহার বার্ষিক চাঁদা কমপক্ষে তিন পাউণ্ড করিয়া ছিল। তিন পাউণ্ডের অধিক অর্থও চাঁদা বলিয়া গ্রহণ করা হইত। প্রত্যেক সভ্যের নিকট হইতে যত বেশী চাঁদা পাওয়া যায় তাহা লওয়ার চেষ্টা করা হইত। জনাছয় সভ্য বৎসরে ২৪ পাউণ্ড চাঁদা দিতেন, বৎসরে ১২ পাউণ্ড চাঁদা দিতেন এমন অনেক সভ্য ছিলেন। একমাসের মধ্যে প্রায় তিন শত সভ্য হয়। এই সভ্যের মধ্যে হিন্দু মুসলমান পার্শী ও খৃষ্টান ছিলেন ও ভারতবর্ষের যত প্রদেশের লোক নাতালে থাকে, সে সকল প্রদেশের লোকই ইহাতে ছিলেন। প্রথম বৎসরটা ধরিয়াই খুব জোরের সহিত কাজ চলে। অবস্থাপন্ন বেপারীরা নিজ নিজ গাড়ীতেই দূরদূরান্তরের গ্রামে গিয়া সভ্য করিয়া ও চাঁদা

সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেন। সকলেই চাওয়া মাত্রই কিছু চাঁদা দিত না। কাহাকেও কাহাকেও অনুরোধ করিতে হইত। এই অনুরোধ করার কার্য্যের মধ্য দিয়াও রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়ারই ফল হইত। ইহাতে লোকে অবস্থাটা ঠিক বুঝিতে পারিত। প্রতিমাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত। উহাতে সকল দফার হিসাব দেওয়া ও গ্রহণ করা হইত। সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে বিবরণ জানানো হইত ও মিনিট বুকে লেখা হইত। সভ্যেরা নানা প্রশ্ন করিতেন। ইহাতে নূতন নূতন বিষয় আলোচনা করা হইত। তাহাতে লাভ এই হয় যে, যাঁহারা এই সকল সভায় কখনো কিছু বলিতেন না, তাঁহারাও বলার অভ্যাস করেন। বক্তৃতাও রীতি অনুযায়ী হওয়া চাই। এ সমস্তই এক নূতন অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল। সম্প্রদায় ইহাতে খুব আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে এই সুসংবাদটা পঁহুছিল যে, লর্ড রিপণ ভোটাধিকার লোপকারী বিল প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহাতে সকলের কাজে উৎসাহ বাড়িয়া গেল—আত্মপ্রত্যয়ও বাড়িল।

বাহ্যিক আন্দোলন চালানোর সাথে সাথেই অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্য্যও হাতে লওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাময় ইউরোপীয়েরা ভারতীয়দের জীবন যাত্রার ধরণের কথা লইয়া বিরুদ্ধ আন্দোলন চালাইতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেন,—"ভারতীয়েরা বড়ই অপরিচ্ছন্ন ও কৃপণ। যেখানে দোকান করে সেইখানেই থাকার ব্যবস্থা রাখে। বাড়ী ঘরগুলি সব কুটির মাত্র। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও তাহারা ব্যয় করিতে চায় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুক্তহস্ত ইউরোপীয়েরা এই প্রকার অপরিচ্ছন্ন ও কঞ্জুষ লোকদের সহিত কেমন করিয়া ব্যবসায় প্রতিযোগিতা করিবে?" সেই জন্য বক্তৃতা দেওয়া হইত, তর্কসভা চালানো হইত এবং কংগ্রেস সভাতেও গৃহের স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, বাড়ীর ও দোকানের ঘর পৃথক রাখার আবশ্যকতা, অবস্থাপন্ন বেপারীদের নিজ অবস্থানুরূপ ভাবে থাকার কথা আলোচিত

হইত, এ বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইত। গুজরাটী ভাষাতেই সভার কার্য্য চালানো হইত।

পাঠকেরা বুঝিবেন যে, ভারতীয়দের রাজনৈতিক শিক্ষা ও ব্যাবহারিক শিক্ষাই বা ইহাতে কি পরিমাণ হইতেছিল। কংগ্রেসের সংযোগে "নাতাল ভারতীয় শিক্ষা পরিষৎ" সৃষ্ট হয়। ইহাতে মুক্ত ভারতবাসীর সন্তানগণ, যাহারা নাতালেই জন্মিয়াছিল ও ইংরাজী ভাষায় কথা বলিত, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার সভ্যরা নামমাত্র একটা চাঁদা দিতেন। এই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যুবকদের জন্য একটা মিলা-মিশার স্থানের সৃষ্টি করা, তাঁহাদের মনে মাতৃভূমির জন্য ভালবাসার উদ্রেক করা এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সাধারণ জ্ঞান দেওয়া। আরও এই একটা অভিপ্রায় ছিল যে, তাঁহারা যেন বুঝিতে পারেন যে, স্বাধীন ভারতীয়েরা তাঁহাদিগকে আপনার জন মনে করেন—স্বাধীন ভারতীয়দের ভিতরেও যেন ইহাদের জন্য সম্মানের ভাব দেখা দেয়। কংগ্রেসের ফণ্ডে সমস্ত খরচা কুলাইয়াও উদ্বর্ত্ত থাকার মত অর্থ ছিল। এই টাকা দিয়া জমি কেনা হয় এবং এখনো তাহা হইতে আয় হইতেছে।

আমি ইচ্ছা করিয়াই এই সকল বিবরণ দিতেছি। ইহা না জানিলে পাঠকেরা, সত্যাগ্রহ কেমন করিয়া আপনা আপনি আরম্ভ হইয়াছিল ও কেমন করিয়া সত্যাগ্রহের জন্য সম্প্রদায় ইহার ভিতর দিয়াই স্বাভাবিক ভাবে প্রস্তুত হইয়া যাইতেছিল, তাহা ধরিতে পারিবেন না। কংগ্রেসের পরবর্ত্তীকালের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমি বর্ণনা বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেছি। কেমন করিয়া ইহার অসুবিধা উৎপন্ন হইয়াছিল, কেমন করিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা ইহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া অনাহত হইয়া কংগ্রেস এই আক্রমণের মধ্যে টিকিয়াছিল—এসকল কথা এখানে বলিব না। কেবল একটা কথা বলিয়া রাখি, সম্প্রদায় যাহাতে

অত্যুক্তি করার অভ্যাস ত্যাগ করে, সেজন্য সতর্কতা লওয়া হইত। সম্প্রদায়ের নিজের দোষের দিকে দৃষ্টি দিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করা হইত। ইউরোপীয়দের যুক্তির ভিতর যতটা সত্য ছিল, তাহা স্বীকার করা হইত। যখনই ইউরোপীয়দের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ও আত্মসম্মানের সহিত একত্র হইয়া কাজ করার অবকাশ পাওয়া যাইত, সে অবকাশ আগ্রহের সহিত কাজে লাগানো হইত। সংবাদপত্র সমূহে যত ভারতীয় সংবাদ প্রকাশ হইতে পারিত, সে সকলই যোগানো হইত। যখনই সংবাদপত্রে ভারতীয়েরা অন্যায় ভাবে আক্রান্ত হইত, তখনই তাহার জবাব দেওয়া হইত।

ট্রান্সভালেও নাতাল ভারতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্ট হয়। এই উভয় সংস্থার গঠনের যে পার্থক্য ছিল, সে সকল কথায় আমাদের এখন কাজ নাই। আবার কেপ্-টাউনেও একটা সংস্থা ছিল, যাহা নাতাল ও ট্রান্সভালের সংস্থা অপেক্ষা ভিন্ন ছিল। কিন্তু এই তিন সংস্থার কার্য্যক্রম একই ধরণের ছিল।

১৮৯৫ সালের মধ্যভাগে নাতাল কংগ্রেসের প্রথম বৎসর পূর্ণ হয়। আমার এডভোকেট হিসাবে কাজ আমার মক্কেলদের পছন্দ হয়। আমার নাতালে থাকার কাল বাড়িয়া যায়। আমি ১৮৯৬ সালে সম্প্রদায়ের নিকট অনুমতি লইয়া ছয় মাসের জন্য ভারতবর্ষে যাই। এই ছয় মাস কাল পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম পাই যে, আমাকে নাতালে তখনি ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি ফিরিয়া যাই। ১৮৯৬-৯৭ সালের ঘটনাবলী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

———

সপ্তম অধ্যায়

প্রাথমিক দ্বন্দ্বের আলোচনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নাতালে ভারতীয় কংগ্রেস এইভাবে স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইল। রাজনৈতিক কার্য্যে নাতালে আমার প্রায় আড়াই বৎসর কাটিয়া গেল। আমি দেখিলাম যে, যদি আমাকে আরো বেশীদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমার পরিবারবর্গকে ভারতবর্ষ হইতে লইয়া আসিতে হয়। এই সঙ্গে আমার এ ইচ্ছাও ছিল যে, ভারতবর্ষে গিয়া একবার ঘুরিয়া সেখানকার নেতাদিগকে নাতালের ও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য যায়গার প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থার সম্বন্ধে অবহিত করি। কংগ্রেস আমাকে ছয় মাসের ছুটী দেয়। এই সময় আদমজী মিঞা খাঁ আমার স্থলে সেক্রেটারীর কাজ করিবেন স্থির হয়। তিনি অত্যন্ত কুশলতার সহিত তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষা জ্ঞান মন্দ ছিল না এবং ব্যাবহারিক প্রয়োগ দ্বারা উহা আরও মার্জ্জিত হইয়াছিল। তিনি সাধারণভাবে গুজরাটী শিখিয়াছিলেন। তাঁহাকে জুলুদের সহিত কাজ করিতে হইত বলিয়া তিনি জুলু ভাষা শিখিয়াছিলেন এবং জুলুদের আচার নীতি সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি খুব শান্ত ও অমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি বেশী কথা বলিতেন না। আমি এই সকল কথা এইজন্য বলিতেছি যে, ইহা হইতে পাঠকেরা যেন বুঝিতে পারেন যে, দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিতে ইংরাজী জানা, কি বইপড়া বিদ্যার বিশেষ আবশ্যক নাই। আবশ্যক কেবল সত্যবাদিতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস এবং ব্যাবহারিক বুদ্ধি।

জন-সেবার কার্য্যে উক্ত গুণগুলির অবর্ত্তমানে কেবল লেখাপড়ার জ্ঞান কোনও কাজে আসে না।

১৮৯৬ সালের মধ্যভাগে আমি ভারতবর্ষে আসি। তখন নাতাল হইতে বোম্বে-গামী জাহাজ অপেক্ষা কলিকাতা-গামী জাহাজই বেশী পাওয়া যাইত বলিয়া আমি কলিকাতা-গামী এক ষ্টীমারেই উঠি। 'গিরমিটিয়া'রা বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকেরা মাদ্রাজ অথবা কলিকাতা হইতেই যাত্রা করিত। কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে আমি এলাহাবাদে ট্রেণ ফেল করি বলিয়া সেখানে একদিন কাটাইতে হয়। এই স্থানেই আমি কাজ আরম্ভ করিয়া দিই। আমি 'পাইওনিয়ার' সংবাদপত্রের মিঃ চেজনীর সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি ভদ্রভাবে আমার সহিত ব্যবহার করিলেন এবং অকপটে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার সহানুভূতি ইউরোপীয়দের দিকেই রহিয়াছে। তিনি তবুও একথা স্বীকার করেন যে, যদি আমি কিছু লিখিয়া পাঠাই, তবে তিনি তাহা পাঠ করিবেন এবং সে বিষয়ে তাঁহার কাগজে মন্তব্য করিবেন। আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ছিল।

ভারতবর্ষে থাকা কালে আমি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের অবস্থার সম্বন্ধে এক পুস্তিকা লিখি। প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রেই উহার আলোচনা হইয়াছিল এবং উহার দুইবার মুদ্রাঙ্কন হয়। ভারতবর্ষের নানাস্থানে পাঁচহাজার পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছিল। এই সময় ভারতবর্ষে ভ্রমণকালে আমি মাননীয় নেতৃবর্গের সহিত দেখা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সার ফিরোজশা মেহ্‌তা, জষ্টিস বদরুদ্দীন তৈয়বজী, জষ্টিস মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এবং বোম্বের অন্যান্য নেতার, লোকমান্য তিলক ও তাঁহার বন্ধুবর্গ, প্রফেসর ভাণ্ডারকর, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও তাঁহার পুণাস্থ বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আমি বোম্বাই মাদ্রাজ ও পুণাতে বক্তৃতা দিই।

এই বিষয়ের সহিত খুব বেশী সম্পর্ক না থাকিলেও এই স্থানে পুনার একটা পবিত্র স্মৃতির কথা বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। লোকমান্য তিলক সার্ব্বজনিক সভার পরিচালক ছিলেন, আর গোখলে ছিলেন ডেকান সভার পরিচালক। আমি প্রথমে তিলক মহারাজের সহিত দেখা করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি গোপাল রাও-এর সহিত দেখা করিয়াছি কি না। কাহার কথা বলিলেন আমি তাহা বুঝিলাম না। তিনি সেইজন্য আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি মিঃ গোখলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি কিনা এবং তাঁহার সহিত আমার পরিচয় আছে কিনা।

আমি বলিলাম—"আমি তাঁহার সহিত এখনো দেখা করি নাই, তাঁহাকে নামে জানি। তাঁহার সহিত দেখা করিব।"

লোকমান্য বলিলেন—"আপনি দেখিতেছি ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রের সহিত পরিচিত নহেন।"

আমি বলিলাম—"আমি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া অল্পদিনই ভারতবর্ষে ছিলাম। তখন রাজনীতি আমার ক্ষমতার বহির্ভূত মনে করিয়া উহার চর্চ্চা করি নাই।"

লোকমান্য বলিলেন—"তাহা হইলে আপনাকে কিছু খবর দিব। এখানে দুইটা দল আছে, একটা সার্ব্বজনিক সভার, আর একটা ডেকান সভার দল।"

আমি বলিলাম—"এবিষয়ে আমি কিছু কিছু শুনিয়াছি।"

লোকমান্য—"এখানে সভা করা সহজ। আমার মনে হয় যে, আপনি আপনার বক্তব্য সকল পক্ষকেই শুনাইয়া সকলের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে চাহেন। আপনার এই ইচ্ছা আমার নিকট ভাল মনে হয়। কিন্তু যদি সার্ব্বজনিক সভার কোনও সভ্য আপনার সভায় সভাপতি

হন, তাহা হইলে ডেকান সভার কোনও সভ্য তাহাতে যোগ দিবেন না। তেমনি যদি ডেকান সভায় কেহ সভাপতি হন, তবে সার্ব্বজনিকের কোনও সভ্য উপস্থিত হইবেন না। সেইজন্য একজন মধ্যস্থ ব্যক্তিকেই আপনার সভাপতি করা উচিত। আমি আপনাকে এ বিষয়ে কেবল আভাস দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনও সাহায্য করিতে পারিব না। আপনি কি প্রফেসর ভাণ্ডারকরকে জানেন? যদি নাও জানেন, তবুও তাঁহার সহিত দেখা করিবেন। তাঁহাকে মধ্যস্থ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন না, তবে আপনি হয়ত তাঁহাকে আপনার সভায় সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে রাজি করাইতে পারিবেন। মিঃ গোখলেকে একথা বলিবেন এবং তাঁহার পরামর্শও লইবেন। সম্ভবতঃ তিনিও আপনাকে এই পরামর্শই দিবেন। যদি প্রফেসর ভাণ্ডারকরের মত লোক সভাপতি হন, তবে উভয় পক্ষই চেষ্টা করিবেন যাহাতে সভা ভালরূপ হয়। সে যাহা হোক্, আপনি আমাদের সম্পূর্ণ সহায়তা পাইবেন, একথা জানিবেন।"

তখন আমি মিঃ গোখলের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে, আমি কেমন করিয়া এই প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহাকে ভাল-বাসিয়া ফেলিয়াছিলাম।

যাঁহাদের কৌতুহল আছে, তাঁহারা এবিষয় নবজীবন বা 'ইয়ংইণ্ডিয়া' পত্র খুঁজিয়া দেখিতে পারেন। লোকমান্য যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, গোখ্‌লে তাহা অনুমোদন করিলেন। তখন আমি মাননীয় প্রফেসর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি মনোযোগের সহিত নাতালে ভারতীয়দের দুঃখের কাহিনী শুনিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখুন, আমি রাজনীতি চর্চ্চা করি না, তারপর বৃদ্ধও হইতেছি। কিন্তু আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার হৃদয় মথিত হইতেছে। আপনি

যে সকল দলের সাহায্য-প্রার্থী ইহা আমার নিকট ভালই লাগিয়াছে। আপনি যুবক, এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার খবর রাখেন না। আপনি দুই দলের লোককেই বলিবেন যে, আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব। তাঁহাদের কেহ আমাকে সংবাদ দিলেই, আমি গিয়া উপস্থিত হইব ও সভাপতিত্ব করিব।" পুণাতে ভাল সভা হয়। উভয়দলের নেতারা উপস্থিত হইয়া আমাকে সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দেন।

তারপর আমি মাদ্রাজে যাই। সেখানে গিয়া আমি সার (তখন জষ্টিস্) সুব্রহ্মণ্যম্ আয়ার, মিঃ পি আনন্দচার্লু, 'হিন্দুর' সম্পাদক শ্রীযুক্ত জি, সুব্রহ্মণ্যম্, 'মাদ্রাজ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' সম্পাদক পরমেশ্বর পিলাই, খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রী ভাষ্যম আয়েঙ্গার, মিঃ নর্টন এবং অন্যান্য জন-নায়কদের সহিত সাক্ষাৎ করি। একটা খুব বড় সভা হয়। মাদ্রাজ হইতে আমি কলিকাতায় গিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, 'ইংলিশম্যানের' সম্পাদক স্বর্গগত মিঃ সাণ্ডার্স এবং অন্যান্য লোকের সহিত দেখা করি। কলিকাতায় একটা জন-সভা করার যখন ব্যবস্থা হইতেছিল, আমি তখন ফিরিয়া যাওয়ার জন্য নাতাল হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম। ইহা ১৮৯৬ সালের নভেম্বর মাসের ঘটনা। আমি ধরিয়া লইলাম যে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কিছু আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই এই টেলিগ্রাম আসিয়াছে। আমি সেইজন্য কলিকাতার কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই বোম্বে আসিলাম এবং সেখান হইতে যে ষ্টীমার প্রথমে পাইলাম তাহাতেই সপরিবারে রওনা হইলাম। দাদা আবদুল্লা কোম্পানী তখন "কুরল্যাণ্ড" ষ্টীমারখানা কিনিয়া লইয়া নাতাল হইতে পোরবন্দর পর্য্যন্ত যাত্রী লাইন চালাইবার নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা খুব অগ্রণী বেপারী ছিলেন। এই কার্য্য তাঁহাদের কুশলতার অন্যতম পরিচয়। পার্শিয়ান ষ্টীম

নেভিগেশন কোম্পানীর 'নাদেরী' ষ্টীমারখানাও ইহার সঙ্গে সঙ্গেই নাতাল যাওয়ার জন্য রওনা হইয়াছিল। এই দুই ষ্টীমারে প্রায় ৮০০ যাত্রী ছিল।

ভারতবর্ষে যে আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে প্রধান প্রধান সমস্ত সংবাদপত্রেই উহার আলোচনা হইয়াছিল এবং রয়টারও এ সম্বন্ধে বিলাতে তারযোগে সংবাদ পাঠান। আমি নাতালে পঁহুছিয়া এই সংবাদ পাই। রয়টারের বিলাতের সংবাদদাতা সেখান হইতে নাতালে আমার বক্তৃতাদির সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যুক্তি পরিপূর্ণ বিবরণ টেলিগ্রাম করিয়া পাঠান। ইহা নূতন কিছু নহে। এই প্রকারের অত্যুক্তি অনেক সময় ইচ্ছাকৃত নহে। ব্যস্ত-সমস্ত লোকেরা যখন তাড়াতাড়ি কোনও বিষয়ের চুম্বক করে, তখন তাহাদের সে বিষয়ে নিজেদের অনুরাগ বা বিরাগ থাকিলে, কতকটা তাহাদের কল্পিত বিবরণই প্রস্তুত করিয়া ফেলে। ভিন্ন স্থানে এইপ্রকার সংক্ষিপ্ত সংবাদের ভিন্ন অর্থ হয়। এই ভাবে কাহারও ইচ্ছা না থাকিলেও ঘটনার বিবরণ বিকৃত হইয়া যায়। জনসাধারণের কার্য্যের ভিতর এ একটা ঝক্কি রহিয়াছে এবং কার্য্যের সীমাও ইহা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। আমি ভারতবর্ষে থাকা কালে নাতালবাসী ইউরোপীয়দের সমালোচনা করিয়াছি। এগ্রিমেণ্ট বদ্ধ বা 'গিরমিটিয়া' মজুরদের উপর যে তিন পাউণ্ড টেক্স বসানো হইয়াছে, জোরের সহিত তাহার বিরুদ্ধে বলিয়াছি। সুব্রহ্মণ্যম্ নামে একজন লোকের মনিব তাহাকে যে ভাবে, মারিয়াছিল আমি তাহার জীবন্ত বর্ণনা করিয়াছি, কেননা আমি তাহার আঘাত স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম ও তাহার মামলা আমার হাতে ছিল। যখন নাতালের ইউরোপীয়েরা আমার বক্তৃতা সমূহের বিকৃত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িল, তখন তাহারা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। ইহার ভিতরে অদ্ভুত বিষয় এই যে, আমি নাতালে যাহা লিখিয়াছি, যে

বিবরণ সমূহ দিয়াছি, তাহা ভারতবর্ষে যাহা বলিয়াছি তদপেক্ষা অনেক অধিক তীব্র। ভারতবর্ষে আমার বক্তৃতায় অনুমাত্রও অতিশয়োক্তি ছিল না। আমি একথা জানিতাম যে, নূতন লোকের কাছে কিছু বলিলে তাহাদিগকে যতটা বলা হয়, তদপেক্ষা অধিক অনুমান করিয়া লয়। সেই জন্য ভারতবর্ষের বক্তৃতায় বস্তুতঃ যত জোর করিয়া বলা আবশ্যক, আমি তদপেক্ষা নরম করিয়াই বলিতাম। তবে আমি নাতালে যাহা বলিতাম ও লিখিতাম তাহা আর কে পড়িতে যাইবে, কেই বা তাহা গ্রাহ্য করে? কিন্তু ভারতবর্ষে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা অন্য ধরণের হইয়া পড়ে, কেননা হাজার হাজার লোক রয়টারের তারের সংবাদ পড়িবেই। ইহা ব্যতীত, তারে যে খবর দেওয়া হইয়াছে তাহাই ঘটনাটার নিজস্ব যে গুরুত্ব তাহা অপেক্ষা তাহাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিল। নাতালের ইউরোপীয়েরা ভাবিল যে, আমার ভারতবর্ষের কার্য্যের গুরুত্ব তাহারা যেমন অনুমান করিতেছে সেই মতই হইবে। উহার ফলে চুক্তিবদ্ধ বা 'গিরমিটিয়া' মজুর আমদানি বন্ধ হইবে। উহার ফলে শতশত কৃষিক্ষেত্রের মালিকদের অসুবিধা হইবে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের চক্ষে তাহাদিগকে হীন করা ত হইলই।

যখন নাতালে ইউরোপীয়দের মনের অবস্থা এইরূপ, তখন তাহারা সংবাদ পাইল যে, আমি সপরিবারে 'কুরল্যাণ্ড' জাহাজে ১০০।৪০০ শত ভারতীয় যাত্রী সহ আসিতেছি, আবার "নাদেরী" জাহাজও ঐ পরিমাণ ভারতীয় লইয়া আসিতেছে। ইহাতে তাহারা আরো উত্তেজিত হয়। তাহাদের ক্রোধ ফাটিয়া পড়ে। নাতালের ইউরোপীয়েরা বড় বড় সভা করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রধান লোকই উপস্থিত থাকিতেন। ভারতীয় যাত্রীরা, বিশেষ করিয়া আমি তাঁহাদের আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিলাম। "কুরল্যাণ্ড" ও "নাদেরী"র

আগমন নাতাল 'আক্রমণ' বলিয়া ঘোষিত হইতেছিল। বক্তারা বলিতে-ছিলেন যে, আমি সঙ্গে করিয়া ৮০০ লোক আনিতেছি। ভারতবর্ষ হইতে লোক লইয়া নাতাল ছাইয়া ফেলার উদ্যমের ইহাই আরম্ভ। সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ঐ জাহাজের সমস্ত যাত্রীকে ও আমাকে নাতালে নামিতে দেওয়া হইবে না। যদি নাতালের সরকার এই কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ হন, তাহা হইলে এই সভায় যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটি নিজেরাই কর্ত্তা হইয়া বলপূর্ব্বক ভারতবাসীর প্রবেশ বন্ধ করিবে। দুইখানা ষ্টীমার একই দিনে ডারবানে পহুঁছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ১৮৯৬ সালেই বিউবোনিক প্লেগ ভারতবর্ষে প্রথম দেখা দেয়। আমাদিগের নাতালে প্রবেশ বন্ধ করিতে নাতাল সরকারের অসুবিধা ছিল, কেননা ভারতীয় ইমিগ্রেসন আইন তখনও পাস হয় নাই। কিন্তু সরকারের সহানুভূতি সর্ব্বতোভাবে উক্ত কমিটির প্রতিই ছিল। মিঃ এস্কম্ব, সরকারের একজন বিশেষ ব্যক্তি হইয়াও এই কমিটিতে যাহারা প্রধানতম স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের একজন ছিলেন। তিনিই ইউরোপীয়দিগকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। সকল বন্দরেই একটা নিয়ম আছে যে, যদি ষ্টীমারে কোনও সংক্রামক রোগ হয়, অথবা যে বন্দরে সংক্রামক রোগ হইয়াছে ষ্টীমার সেই স্থান হইতে আসে, তাহা হইলে তাহাকে কিছুকাল 'কোয়ারেণ্টাইন' বা 'সূতিকায়' থাকিতে হয়। এই ব্যবস্থা কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই অবলম্বন করা যাইতে পারে। নাতালের সরকার এই স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। যদিও ষ্টীমারে কাহারও পীড়া ছিল না, তথাপি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা অনেক বেশী দিন ষ্টীমারগুলিকে আটকাইয়া রাখা হয়। উহাদিগকে তেইশ দিন পর্য্যন্ত যাত্রী নামাইতে দেওয়া হয় নাই। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় কমিটি স্বকার্য্য করিতেছিল। দাদা আব্দুল্লা

কোম্পানী 'কুরল্যাণ্ডের' মালিক ছিলেন এবং 'নাদেরীর' এজেন্ট ছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া খুব টানাটানি করা হয়। যদি তাঁহারা যাত্রীসহ ষ্টীমার ফেরৎ পাঠান, তবে সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে, আর যদি ফেরৎ না পাঠান, তবে তাঁহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি করা হইবে বলিয়া ধমকি দেখানো হয়। কিন্তু ঐ বেপারের অংশীদারেরা ভীরু ছিলেন না। তাঁহারা জবাব দেন যে, এই জন্য যদি তাঁহাদের সর্ব্বনাশও হয়, তথাপি তাঁহারা গ্রাহ্য করিবেন না এবং তাঁহারা এই যাত্রীগুলিকে বলপূর্ব্বক ফেরৎ পাঠানোর দুষ্কর্ম্ম কখনও করিতে সম্মত না হইয়া বরঞ্চ শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়া দেখিবেন। স্বদেশ-প্রেমের সহিত তাঁহারা অপরিচিত ছিলেন না। এই বেপারীদের পুরানো এডভোকেট মিঃ লাফটন কে-সিও সাহসী লোক ছিলেন।

ভাগ্যক্রমে জষ্টিস্ নানাভাই হরিদাসের ভাগিনেয়, সুরাটের মনসুখলাল নজর এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় পঁহুছিলেন। আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, তাঁহার আসার কথাও জানিতাম না। ইহাও বলাই বাহুল্য যে, ঐ দুই জাহাজে যে সকল যাত্রী আসিয়াছিল, তাহাদিগকে লইয়া আসার মধ্যে আমার এতটুকুও হাত ছিল না। যাত্রীদের অধিকাংশই দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী। অনেক ট্রান্সভাল যাত্রীও ছিল। ইউরোপীয়ানদের কমিটি এই যাত্রীদের উপরও ভয় দেখাইয়া ইস্তাহার পাঠাইতেছিল, ষ্টীমারের কাপ্তানেরা তাহা যাত্রীদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। এই সব ইস্তাহারে ইহাই সাফ্ করিয়া লেখা থাকিত যে, নাতালের ইউরোপীয়েরা খুব বদমেজাজে আছে এবং যাত্রীরা যদি তাহাদের নিষেধ না শুনিয়াও ষ্টীমার হইতে নামে, তাহা হইলে তাহাদের এক এক জনকে ধরিয়া ঠেলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। আমি এই ইস্তাহারের অর্থ 'কুরল্যাণ্ডের' যাত্রীদিগকে পড়িয়া শুনাই। একজন ইংরাজী জানা 'নাদেরী'র যাত্রী তাঁহার সহযাত্রীদিগকে উহা পড়িয়া বুঝান। বুঝানো সত্ত্বেও প্রত্যেক যাত্রী

ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিল। উহারা জবাব দিল যে, তাহাদের অনেকে ট্রান্সভালে ফিরিয়া যাইতেছে, অনেকে নাতালের পুরানো বাসিন্দা। আর যাহাই হোক্, তাহাদিগকে নাতাল সরকার নামিতে দিতে বাধ্য। কমিটির ভয় দেখানো সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য নামিয়া দেখিবে।

নাতাল সরকারের বুদ্ধিতে কুলাইতেছিল না। কতদিন ধরিয়া এমন অন্যায় ভাবে বাধা দান করা চলে? তেইশ দিন গত হইল, দাদা আব্দুল্লাও দমিলেন না, যাত্রীরাও ভয় পাইল না। ২৩ দিন পর 'সুতিকা' তুলিয়া লওয়া হয়, ষ্টীমারগুলিকে বন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে মিঃ এস্কম্ব উত্তেজিত ইউরোপীয় কমিটিকে শান্ত করিতেছিলেন। একটা সভায় তিনি বলেন—"ডারবানের ইউরোপীয়েরা প্রশংসার্হ ঐক্য ও সাহস দেখাইয়াছেন। আপনারা যাহা করার তাহা করিয়াছেন। সরকারও আপনাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। ভারতীয়দিগকে ২৩ দিন আটক রাখা হইয়াছে। আপনাদের মনোভাবের এবং সাধারণের হিতার্থে প্রচুর চেষ্টার পরিচয় আপনারা দিয়াছেন। ইম্পিরিয়াল সরকারের উপর ইহার খুবই প্রভাব হইবে। আপনাদের কার্য্যে নাতাল সরকারের পথ খোলসা হইয়াছে। এক্ষণে যদি আপনারা একজন ভারতীয় যাত্রীকেও বলপূর্ব্বক নামিতে না দেন, তাহা হইলে আপনাদেরই স্বার্থ হানি হইবে এবং গবর্ণমেণ্টকেও বিপদে ফেলিবেন। আর তাহা ছাড়াও আপনারা ভারতীয়দিগের অবতরণ অকারণে বন্ধ করিতে পারিবেন না। যাত্রীদের কোনও দোষ নাই। তাহাদের মধ্যে বালক ও স্ত্রীলোকও আছে। তাহারা যখন বোম্বাই হইতে রওনা হয়, তখন তাহারা আপনাদের মনোভাবের কথার কিছু খবর রাখিত না। আমি সেই জন্য আপনাদিগকে এক্ষণে ভিড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতে অনুরোধ করি এবং

যাত্রীদিগকে বাধা দিতে নিষেধ করি। ভবিষ্যতে যাহাতে আর এই প্রকার যাত্রী না আসিতে পারে, সেজন্য নাতাল সরকার ব্যবস্থা পরিষৎ দ্বারা আইন গঠন করিয়া লইবেন।" মিঃ এস্কম্বের বক্তৃতার ইহাই সারাংশ। তাঁহার শ্রোতারা ইহাতে নিরাশ হয়। তবে নাতালের ইউরোপীয়দের উপর তাঁহার খুব প্রভাব ছিল, তাহারা তাঁহার কথায় ভিড় ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায় এবং দুইখানা ষ্টীমারই ঘাটে আসিয়া লাগে।

মিঃ এস্কম্বের নিকট হইতে আমি এক সংবাদ পাই—তাহাতে আমাকে তখন নামিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি যেন অপেক্ষা করি, তখন তিনি জল-পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা আমাকে বাড়ী পঁহুছিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। আমার পরিবার যখন ইচ্ছা নামিতে পারেন। এই পত্রখানা আইন অনুযায়ী আদেশ পত্র নহে। উহা কেবল কাপ্তানকে আমাকে নামিতে না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া মাত্র। এইরূপে, বিপদে পড়ার সম্ভাবনা আমার যে আছে, সে বিষয়েও আমাকে সতর্ক করানো হইয়াছিল। আমি জোর করিয়া নামিলে কাপ্তান ঠেকাইতে পারিত না। আমি স্থির করিলাম যে, আমি এই কথা মানিয়া চলিব। আমার পরিবার আমার বাড়ীতে না পাঠাইয়া আমার পুরাতন বন্ধু ও মক্কেল পার্শী রোস্তমজীর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া বলিলাম যে, আমি সেইখানেই গিয়া মিলিত হইব। যাত্রীরা জাহাজ হইতে নামার পর দাদা আব্দুল্লা কোম্পানীর এডভোকেট এবং আমার ব্যক্তিগত বন্ধু মিঃ লাফটন আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি তখনও কেন নামি নাই জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে মিঃ এস্কম্বের পত্রের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, আমার ঐভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মত বা অপরাধীর মত সহরে প্রবেশ করা তিনি পছন্দ করেন না।

যদি আমি সাহস করি, তবে এখনই তাঁহার সহিত যেন নামিয়া পড়ি এবং যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবেই হাটিয়া সহরে প্রবেশ করি। আমি বলিলাম—"আমার ভয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মিঃ এস্কম্বের কথা না রাখা ভদ্রতায় বাধে কিনা। আর ষ্টিমারের কাপ্তানের এ বিষয়ে কি দায়িত্ব, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। মিঃ লাফটন হাসিয়া বলিলেন—"মিঃ এস্কম্ব আপনার জন্য কি করিয়াছেন যে, আপনাকে তাঁহার অনুরোধ পালন করিতে হইবে? আপনার একথা মনে করার কি হেতু আছে যে, আপনার প্রতি দয়াপরবশ হইয়াই তিনি ঐ পত্র লিখিয়াছেন এবং বস্তুতঃ তাঁহার অন্য কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য নাই? আপনার অপেক্ষা আমি বেশী জানি যে শহরে কি ঘটিতেছে এবং মিঃ এস্কম্ব তাহাতে কি করিতেছেন।" আমি মাথা ঝাঁকাইয়া তাঁহার কথায় বাধা দেওয়ায় তিনি বলিলেন—"ভাল, ধরিয়া লওয়া যাক্ যে মিঃ এস্কম্বের উদ্দেশ্য ভালই, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি আপনি তাঁহার কথামত চলেন, তবে আপনার এ ক্ষেত্রে নিজেকেই অপদস্থ করা হইবে। সেই জন্য আমি বলি যে, যদি আপনি প্রস্তুত থাকেন তবে চলুন এখনি চলিয়া যাই। কাপ্তান আমাদের লোক, তাঁহার দায়িত্ব আমাদেরই দায়িত্ব। তাঁহার কার্য্যের জন্য তিনি কেবল দাদা আব্দুল্লার নিকটই দায়ী। তাঁহারা এ বিষয়ে কি ভাবিবেন, তাহা আমি জানি। তাঁহারা এই ব্যাপারে খুবই সাহস দেখাইয়াছেন।" আমি বলিলাম—"তবে চলুন যাওয়া যাক্। তৈরী হওয়ার কিছু নাই, আমার পাগড়ীটা লইলেই হইল। কাপ্তানকে বলিয়া রওনা হওয়া যাক্।" আমরা কাপ্তানের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

মিঃ লাফটন ডারবানের পুরাতন ও খ্যাতনামা এডভোকেট। ভারতবর্ষে ফিরিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

কোনও কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে আমি তাঁহার পরামর্শ লইতাম এবং আমার সিনিয়র নিযুক্ত করিতাম। তিনি বীর পুরুষ ছিলেন, শরীরের গঠনও শক্ত ছিল।

আমাকে ডারবানের প্রধান রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে। আমরা অপরাহ্ন প্রায় সাড়ে চারিটার সময় রওনা হই। আকাশে অল্প মেঘ ছিল। সূর্য্য দেখা যাইতেছিল না। হাঁটিয়া রস্তমজী শেঠের বাড়ী যাইতে ঘণ্টাখানেক লাগিবে। ষ্টীমার ঘাটের কাছাকাছি সাধারণতঃ যে প্রকার লোক থাকে, তদপেক্ষা বেশী লোক ছিল না। আমরা নামার পরেই কতকগুলি বালক আমাদিগকে দেখিতে পাইল। ভারতীয়দের মধ্যে আমি একপ্রকার বিশেষ ধরণের পাগড়ী পরিতাম। সেই জন্য তাহারা আমাকে তখনই চিনিয়া ফেলিল। তাহারা "গান্ধী, গান্ধী," "মার মার" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল ও আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। কেহ কেহ ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল। কয়েকজন বয়স্ক ইউরোপীয় বালকদিগের সহিত যোগ দিল। দাঙ্গাকারীদের দল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। মিঃ লাফটন দেখিলেন যে, হাঁটিয়া যাওয়ায় বিপদ আছে। তিনি একটা রিক্সা ডাকিলেন। মানুষ-টানা গাড়ীতে বসিতে আমার বড়ই বিতৃষ্ণা বলিয়া আমি এ যাবৎ কখনো রিক্সায় চাপি নাই। কিন্তু তখন রিক্সা চড়াই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। আমি জীবনে ৫।৭ বার দেখিয়াছি যে, যাহাকে ঈশ্বর বাঁচান, সে ইচ্ছা করিলেও তাহার পতন হইতে পারে না। আমি যে পতিত হই নাই তাহার জন্য কিছু মাত্র আমার কৃতিত্ব নাই। রিক্সা নিগ্রোরা টানিয়া থাকে। ছেলেরা ও বড়রা রিক্সাওয়ালাকে ভয় দেখাইল যে, রিক্সায় আমাদিগকে চাপাইলে তাহাকে মারিবে ও রিক্সা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। ইহাতে রিক্সাওয়ালা আমাদিগকে লইবে না বলিয়া চলিয়া গেল, আমার রিক্সা চাপা হইল না।

এখন হাটিয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমাদের পিছনে ভিড় লাগিয়া রহিল। যেমন আমরা চলিতে লাগিলাম ভিড়ও তেমনি বাড়িতে লাগিল। যখন বড় রাস্তায় পড়িলাম, তখন শত শত ছেলে-বুড়ো জড় হইয়া গেল। একজন সামর্থশালী লোক মিঃ লাফটনের হাত ধরিয়া টানিয়া আমার নিকট হইতে সরাইয়া ফেলিল। এখন তিনি যে আর আমার কাছে আসিবেন, এরূপ অবস্থা রহিল না। ভিড় হইতে আমার উপর গালিবর্ষণ হইতে লাগিল, এবং ইট পাটকেল যাহা যে হাতের কাছে পাইল তাহাই ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। আমার পাগড়ী ফেলিয়া দিল। এই সময় একজন মোটা মত লোক আসিয়া আমাকে থাপ্পর ও লাথি মারিল। আমি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম, একটা বাড়ীর আঙ্গিনার রেলিং ধরিয়া ফেলিলাম। দাঁড়াইয়া নিশ্বাস লইয়া মাথা খাড়া করিয়া চলিতে লাগিলাম। জীবন্ত অবস্থায় পঁহুছার আশা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু একথা আমার স্মরণ আছে যে, এ সময়েও যাহারা মারিতেছিল তাহাদের প্রতি আমার লেশমাত্রও রোষ ছিল না।

আমার পথ-যাত্রা যখন এইরূপ ভাবে চলিতেছিল, তখন ডারবানের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রী এই ব্যাপার দেখিতে পান। আমরা পরস্পরকে ভালরকমেই চিনিতাম। তিনি সাহসী মহিলা ছিলেন। যদিও তখন বৃষ্টি হইতেছিল না, অথবা সূর্য্যের তেজ ছিল না, তথাপি তিনি তাঁহার ছাতা খুলিয়া আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমার পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের অপমান, তারপর আবার ডারবানের বহু পুরাতন, লোক-প্রিয় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্ত্রীর অপমান গোরারা করিতে পারিল না। তাঁহাকে আঘাত করিতেও পারে না, সেইজন্য তাঁহাকে বাঁচাইয়া আমাকে মার দেওয়ায় মারের ভিতর তেমন জোর আর ছিল না। ইতিমধ্যে দাঙ্গার

সংবাদ পুলিশের নিকট পঁহুছায়, সেখান হইতে একটি দল আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। আমাদের থানার নিকট দিয়াই যাইতে হইত। সেখানে গিয়া দেখিলাম—পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে থানাতেই আশ্রয় লওয়ার পরামর্শ দেন। আমি বলিলাম—"আমি গন্তব্য স্থানেই যাইব। ডারবানের লোকের ন্যায়পরতা ও আমার নির্দোষিতার উপর আমার বিশ্বাস আছে। আপনি পুলিশ পাঠাইয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার পত্নী মিসেস আলেকজাণ্ডারও আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

অতঃপর ভালভাবেই রুস্তমজী শেঠের বাড়ী পঁহুছিলাম। পঁহুছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। 'কুরল্যাণ্ডের' ডাক্তার দাদীবর্জোর তখন রুস্তমজী শেঠের বাড়ীতেই ছিলেন, তিনি আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আঘাতগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, আঘাত বেশী হয় নাই। একটা আঘাতে রক্ত জমিয়া খুব ব্যথা দিতেছিল। কিন্তু তখনও শান্তি পাওয়া অদৃষ্টে ছিল না। রুস্তমজী শেঠের বাড়ীর সাম্‌নে হাজার হাজার গোরা একত্র হইল। রাত্র হইয়াছিল বলিয়া অসচ্চরিত্র ও বদমাইস লোকেরাও ইহার মধ্যে জড় হইয়া গিয়াছিল। জনতা রুস্তমজী শেঠকে বলিতেছিল যে—"গান্ধীকে আমাদের কাছে ছাড়িয়া দাও, নচেৎ তোমাকে শুদ্ধ তোমার দোকান ও বাড়ী পোড়াইয়া ফেলিব।" তিনি ভয় দেখাইলেই ভয় পাওয়ার লোক ছিলেন না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডার সংবাদ পাইয়া ডিটেকটিভ পুলিশ লইয়া প্রথমে ভিড়ের ভিতর মিশিয়া যান এবং পরে একটা বেঞ্চ আনিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া থাকেন। এইরূপে লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলার অছিলায় রুস্তমজীর বাড়ীর ফটক তিনি দখল করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যাহাতে কেহ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারে। উপযুক্ত স্থানে তিনি ডিটেকটিভ পুলিশও রাখিয়াছিলেন। তিনি

পঁহুছিয়াই একজন ডিটেকটিভকে মুখে রং মাখাইয়া ভারতীয় বেপারী সাজাইয়া আমার সহিত দেখা করিতে পাঠান। তিনি তাহার মারফৎ এই খবর আমার কাছে পাঠান যে, "যদি আপনি আপনার মিত্রের, তাঁহার অতিথিদিগের ও আপনার পরিবারের ধন ও প্রাণ রক্ষা করিতে চান, তবে আপনাকে ভারতীয় সিপাহীর পোষাক পরিয়া, পার্শীর গুদামের ভিতর দিয়া, আমার লোকের সহিত ভিড়ের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া থানায় গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। এই গলির মুখেই আপনার জন্য গাড়ী তৈরী থাকিবে। আপনাকে ও অন্য সকলকে বাঁচাইবার এই একটা মাত্র পথই আমার আছে। ভিড় এত উত্তেজিত হইয়া আছে যে, উহাকে আটকাইয়া রাখার আর কোনও উপায় আমার হাতে নাই! আপনি বিলম্ব করিলে এই বাড়ী ত ভস্মসাৎ হইবেই, জিনিষপত্র ও জীবনের যে কত হানি হইবে তাহা বলিতে পারি না।"

আমি তখনই অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গেই সিপাহীর পোষাক পরিয়া সেই লোকের সহিত বাহির হইয়া গিয়া নিরাপদে থানায় পঁহুছিলাম। ইতিমধ্যে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তামাসা করিয়া, গান করিয়া, ভিড়ের মন যোগাইতেছিলেন। যখন তিনি সঙ্কেতে বুঝিতে পারিলেন যে, আমি থানায় পঁহুছিয়া গিয়াছি, তখন তিনি সত্যকার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

"তোমরা কি চাও?"

"আমরা গান্ধীকে চাই।"

"তাহাকে লইয়া কি করিবে?"

"তাহাকে পোড়াইয়া মারিব।"

"কেন সে কি করিয়াছে?"

"হিন্দুস্থানে আমাদের নামে মিথ্যা দোষ দিয়াছে, আর হাজার হাজার লোক আনিয়া এখানে ফেলিতে চাহিতেছে।"

"কিন্তু সে যদি বাহিরে না আসে তবে কি করিবে?"

"তাহা হইলে এই বাড়ীটা জ্বালাইয়া দিব।"

"এখানে তাহার স্ত্রী-পুত্র, অন্য স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে আছে। স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে পোড়াইয়া মারিতে তোমাদের লজ্জা হইবে না?"

"সে ত আপনারই দোষ। আপনি যদি আমাদিগকে বাধ্য করেন তবে আমরা কি করিব? আমরা ত আর কাহাকেও সাজা দিতে চাই না। গান্ধীকে আনিয়া দিলেই চুকিয়া যায়। দোষীকে আমাদের হাতে ফেলিয়া দিবেন না, আর তাহাকে সাজা দিতে গেলে যদি অপরের ক্ষতি হয়, সে দোষ আমাদের—এ কোন্ ন্যায্য কথা হইল?"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাল্কাভাবে হাসিয়া উত্তর দিলেন যে, গান্ধী তাহাদের মধ্য দিয়াই অন্যত্র গিয়া নিরাপদে পঁহুছিয়াছে। লোকে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া—"মিছে কথা—মিছে কথা" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন—"তোমরা যদি তোমাদের বুড়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথা না বিশ্বাস কর, তবে তোমাদের মধ্য হইতে তিন চার জন লোকের কমিটি করিয়া দাও। কথা দাও যে, বাড়ীতে আর কেহ ঢুকিবে না, আর যদি তোমাদের কমিটি গান্ধীকে খুঁজিয়া না পায়, তবে তোমরা খুব শান্তভাবে ফিরিয়া যাইবে। তোমরা আজ উত্তেজিত হইয়া পুলিশের কথা রাখ নাই, ইহাতে পুলিশের দোষ নাই, তোমাদেরই দোষ হইয়াছে। সেই জন্য পুলিশ তোমাদের সহিতও চালাকী খেলিয়াছে। তোমাদের মধ্য দিয়াই তোমাদের শিকার লইয়া পলাইয়া গিয়াছে।

তোমরা হারিয়া গিয়াছ। ইহাতে পুলিশকে দোষ দিও না। তোমরাই যে পুলিশ রাখিয়াছ, এইরূপে সে পুলিশ তাহাদের নিজের কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছে।"

এই সমস্ত কথাবার্ত্তা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এত মিষ্টভাবে, এত হাসিয়া হাসিয়া অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, লোকে তাহাতেই স্বীকৃত হয়। কমিটি নিযুক্ত হইল। তাহারা শেঠ রস্তমজীর বাড়ীর কোণায় কোণায় খুঁজিয়া দেখিল। তাহারা আসিয়া বলিল—"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথাই ঠিক। তিনি আমাদিগকে হারাইয়াছেন।" লোকেরা নিরাশ হইল, কিন্তু কথা রাখিল, কোনও লোকসান না করিয়া নিজ নিজ ঘরে চলিয়া গেল। ১৮৯৭ সালের ১৩ই জানুয়ারী এই ঘটনা হয়।

যে দিন প্রাতঃকালে 'সুতিকা' উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল, সেইদিনই ডারবানের একখানা সংবাদপত্রের রিপোর্টার আমার কাছে জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সমস্ত অবস্থা জানিয়া লন। আমার উপর আরোপিত দোষ সমূহ স্খালন করা সহজ ছিল, সমস্ত প্রমাণ দ্বারা আমি বুঝাইয়া দিয়াছিলাম যে, আমি তিলমাত্র অতিশয়োক্তি করি নাই। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা করা আমার কর্ত্তব্য ছিল। না করিলে আমি মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারিতাম না। পরদিন এই সমস্ত কথাই পুরাপুরি প্রকাশ হইয়া যায়। সমজদার গোরারা নিজের দোষ স্বীকার করিলেন। সংবাদপত্র সমূহ নাতালের ইউরোপীয়দের অবস্থার প্রতি নিজেদের সহানুভূতি জানায়, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার কার্য্যও সঙ্গত হইয়াছে বলে। ইহাতে আমার প্রতিষ্ঠা বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাও বাড়িয়া যায়। একথাটাও প্রমাণ হইয়া যায় যে, ভারতীয়েরা গরীব হইলেও কাপুরুষ নয়, এবং ভারতীয়

বেপারীরা ব্যবসার প্রয়োজন ছাড়াও নিজেদের মানের জন্য ও দেশের জন্য লড়িতে পারে।

ইহাতে যদিও সম্প্রদায়ের এক দিক দিয়া দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছিল, দাদা আব্দুল্লাকে খুব লোকসান সহ্য করিতে হইয়াছিল, তবুও এই দুঃখের ফলে লাভই হইয়াছিল বলিয়া আমি মনে করি।

সম্প্রদায় নিজের শক্তির পরিমাপ করিতে পারিয়াছিল এবং সম্প্রদায়ের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়াছিল, আমারও খুব অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। আমি যখনই এই দিনের কথা ভাবি, তখনই মনে হয় যে, ঈশ্বর আমাকে সত্যাগ্রহের জন্যই প্রস্তুত করিতেছিলেন।

নাতালের এই ঘটনার প্রভাব বিলাত পর্য্যন্ত পঁহুছে। মিঃ চেম্বারলেন টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, যাহারা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের নামে মোকদ্দমা চালাইতে হইবে। যাহাতে আমার প্রতি ন্যায় হয় তাহাও যেন করা হয়।

মিঃ এস্কম্ব বিচার বিভাগের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি মিঃ চেম্বারলেনের টেলিগ্রামের কথা বলেন। আমার যে লাঞ্ছনা হইয়াছিল তজ্জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। আমি যে বাঁচিয়া গিয়াছি সেজন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন,—“আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আপনার বা আপনার সম্প্রদায়ের দণ্ড হোক্ —এই ইচ্ছা আমার মোটেই নাই। আপনাকে উৎপীড়ন করিবে বলিয়া আমার ভয় হইয়াছিল, সেই জন্য আপনাকে রাত্রে ষ্টীমার হইতে নামার কথা বলিয়াছিলাম। আমার কথা আপনার পছন্দ হয় নাই, আপনি মিঃ লাফ্‌টনের কথায় নামিয়াছিলেন বলিয়া আমি আপনাকে দোষ দিতে ইচ্ছা করি না। আপনার যাহা ভাল লাগে তাহা করায় আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মিঃ চেম্বারলেন যাহা করিতে চাহেন নাতাল

সরকারের তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। দোষীর সাজা হোক্ আমি এই ইচ্ছাই করি। দাঙ্গাকারীদের কাহাকেও কি আপনি চিনিতে পারিবেন ?”

আমি উত্তর দিলাম—“সম্ভবতঃ আমি দুই একজনকে চিনিতে পারি। কিন্তু এ কথা লইয়া আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই আমি বলিয়া রাখি যে, আমি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছি—আমার উপর কোনও অত্যাচার হইলে আমি কাহারও নামেই আদালতে নালিশ করিব না। যাহারা দাঙ্গা করিয়াছে তাহাদের দোষও আমি দেখি না। তাহারা ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের নেতাদের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছে, তাহার ভাল মন্দ সম্বন্ধে তাহারা বিচার করিতে পারে না। আমার সম্বন্ধে তাহারা যাহা শুনিয়াছিল তাহা যদি সত্য হইত, তবে উত্তেজিত হইয়া ক্রোধের বশে অকার্য্য করিয়া ফেলায় আমি তাহাদের দোষ দেখি না। উত্তেজিত জনতা এইভাবেই যাহা ন্যায্য মনে করে তাহা করিয়া থাকে। যদি ইহাতে কাহারও দোষ থাকে, তবে এ বিষয়ে নিযুক্ত কমিটির দোষ, আপনার নিজের দোষ এবং নাতাল সরকারের দোষ আছে। রয়টার যেমন টেলিগ্রামই পাঠাইয়া থাকুক না কেন, আমি যখন এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছিলাম, তখন আমার সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়াছিলেন তাহা আমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা আপনার ও কমিটির কর্ত্তব্য ছিল। আমার জবাব শুনিয়া তাহার পর যাহা উচিত তাহা করিতে পারিতেন। এখন আমার উপর দাঙ্গা করার জন্য আমি আপনার কি আপনার কমিটির নামে মোকদ্দমা চালাইতে পারি না। আর যদি তাহাও সম্ভব হইত, তবুও কোর্টের মারফতে এই প্রতিকার গ্রহণ করিতে আমি চাই না। আপনার যাহা ভাল বোধ হইযাছে, সেই অনুযায়ী গোরাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যাহা করা দরকার তাহা আপনি

করিয়াছেন, উহা রাজনীতির বিষয়। এ সম্বন্ধে আপনার সহিত আমাকে লড়িতে হইবে। আপনাকে ও গোরাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা বড় অংশ হিসাবে, গোরাদের ক্ষতি না করিয়া আমরা কেবল নিজেদের সম্মান ও অধিকার বজায় রাখিতে ইচ্ছা করি।"

মিঃ এস্কম্ব বলিলেন,—"আপনার কথা আমি বুঝিতেছি, আমার নিকট উহা উত্তম বোধ হয়। আপনি যে মোকদ্দমা চালাইতে চাহেন না, একথা শুনিতে আমি প্রত্যাশা করি নাই। আপনি যদি মোকদ্দমা করিতে চাহেন, তবে আমি এতটুকুও দুঃখিত হইব না। কিন্তু আপনি যখন কেন নালিশ করিতে চাহেন না তাহার হেতু দর্শাইলেন, তখন আমি বলিতে চাই যে, আপনার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। আপনি এই সংযম দ্বারা আপনার সম্প্রদায়ের বিশেষ সেবা করিলেন। এই কথাও আমাকে বলিতে হয় যে, আপনার এই সঙ্কল্পের জন্য নাতাল সরকারকে এক বিষম স্থিতি হইতে বাঁচাইলেন। আপনি ইচ্ছা করিলেই এখন আমাদের ধরপাকড় আরম্ভ করিতে হইত। কিন্তু আপনাকে হয়ত একথা বলিতে হইবে না যে, এই সব করিতে গেলে গোরাদের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিবে, নানা রকম সমালোচনা হইবে। কোনও সরকারই ইহা পছন্দ করে না। যদি আপনি নালিশ না চালানোই একেবারে স্থির করিয়া থাকেন, তবে সেই মর্ম্মে আমাকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিবেন। আমাদের কথাবার্ত্তার উল্লেখ করিয়াই মিঃ চেম্বারলেনের কাছে আমাদের সরকারকে বাঁচাইতে পারিব না। আপনার চিঠির ভাবার্থই আমাকে টেলিগ্রাম করিতে হইবে। কিন্তু এই চিঠি আপনি এখনই দিন—একথা আমি বলিতেছি না। আপনি মিত্রদের সহিত পরামর্শ করুন, মিঃ লাফটনের পরামর্শ গ্রহণ করুণ। তারপর আপনার যদি ইচ্ছা হয়

তবে চিঠি লিখিবেন। কিন্তু আপনাকে এটুকু জানাইতেছি যে, নালিশ না করার দায়িত্ব স্পষ্ট ভাবেই আপনার নিজের উপর লইতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"এ বিষয়ে আমার কাহারও সহিত পরামর্শ করার নাই। আমি এখানে আসার সময় জানিতে পারি নাই যে, আপনি এইজন্য আমাকে ডাকিয়াছেন, কিন্তু এই বিষয় লইয়া কাহারও সহিত আমার পরামর্শ করার ইচ্ছা নাই। আমি যখন মিঃ লাফ্‌টনের সহিত হাঁটিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তখনই মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছিলাম যে, যদি আহত হই তবে আমি যেন মনে মনে কাহারও দোষ না দিই। ইহার পর আর নালিশ করিবার কি থাকে? এই বিষয়টা আমার নিকট ধর্ম্ম হিসাবে কর্ত্তব্য। আপনি যেমন বলিলেন আমিও তাহাই মনে করি যে, এই সংযম দ্বারা আমি আমার সম্প্রদায়ের সেবাই করিব। উপরন্তু আমার বিশ্বাস আমার নিজেরও ইহাতে লাভ হইবে। সেইজন্যই আমার নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব লইয়া এইখানেই পত্র লিখিয়া দিতে চাই।" তখনই আমি তাঁহার নিকট হইতে সাদা কাগজ লইয়া পত্র লিখিয়া দিলাম।

অষ্টম অধ্যায়

প্রাথমিক দ্বন্দ্বের আলোচনা (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক

গত অধ্যায়ে পাঠকেরা দেখিয়া থাকিবেন যে, কষ্ট করিয়া অথবা সহজেই সম্প্রদায় নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য কি চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ইহাও দেখিয়াছেন যে, সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বত্র নিজ অবস্থার উন্নতির জন্য যেমন চেষ্টা চলিতেছিল তেমনি ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড হইতে সাহায্য পাওয়ার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছিল। ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখিয়াছি, বিলাত হইতে সাহায্য পাওয়ার জন্য কি করা হইয়াছিল তাহা এখন উল্লেখ করার দরকার। কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটির সহিত সম্বন্ধ অবশ্য রাখিতেই হইবে। সেইজন্য প্রত্যেক সপ্তাহে দাদাভাইকে ও উইলিয়াম ওয়েড়ারবার্ণকে পত্র দিয়া অবস্থা জানানো হইত। আবেদনাদি করিতে তাহার ব্যয় ও অন্যান্য সামান্য খরচার জন্য কম পক্ষে দশ পাউণ্ড করিয়া পাঠানো হইত।

এখানে দাদাভাই-এর পবিত্র স্মৃতির কথা লিখিতেছি। দাদাভাই এই কমিটির সভাপতি ছিলেন না। তাহা হইলেও আমাদের মনে হইয়াছিল, তাঁহার নিকট টাকা পাঠানোই ঠিক, তিনি আমাদের হইয়া ঐ টাকা সভাপতিকে দিবেন। কিন্তু তিনি প্রথম বারের টাকা ফেরৎ পাঠান এবং জানান যে, টাকা পয়সা ইত্যাদি সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণের নিকটই যেন পাঠানো হয়। তিনি সাহায্য অবশ্যই করিবেন। কিন্তু সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণের দ্বারা কাজ করিলেই কমিটির প্রতিষ্ঠা বাড়িবে।

আমি দেখিয়াছিলাম যে, দাদাভাই এত বৃদ্ধ হইলেও চিঠি-পত্রাদির বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন। যদি বিশেষ কিছু না লেখারও থাকিত, তথাপি ফেরতা ডাকে পত্রের প্রাপ্তি স্বীকারটা অন্ততঃ থাকিত। এই প্রকার চিঠি তিনি নিজে হাতেই লিখিতেন এবং 'টিস্যু পেপারে' নকল রাখিতেন।

পূর্ব্বের অধ্যায়ে আমি লিখিয়াছি যে, কংগ্রেসের নাম আমরা গ্রহণ করিলেও আমাদের অভিযোগগুলি একদেশদর্শী করার ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্য আমরা অপর পক্ষের সহিতও পত্র ব্যবহার করিতাম এবং আমরা যে ঐ প্রকার করিতেছি তাহা দাদাভাইকে জানাইতাম। ইঁহাদের মধ্যে দুই জন ব্যক্তিই প্রধান ছিলেন। একজন সার ম্যাঞ্চরজী ভবনাগরী আর দ্বিতীয় সার উইলিয়ম উইলসন্ হাণ্টার। সার ম্যাঞ্চরজী ভবনাগরী এই সময় কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে খুব সাহায্য পাওয়া যাইত এবং তিনি প্রায়ই আমাদিগকে পত্র লিখিতেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্বে বুঝিতে ও সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার। তিনি টাইম্‌সের ভারতীয় বিভাগের সম্পাদক ছিলেন।

তাঁহার নিকট প্রথম পত্র লেখার পর হইতেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যকার অবস্থা ঐ পত্রে প্রকাশ করিতেন। যেখানে উপযুক্ত বোধ করিয়াছেন, সেইখানেই নিজে বিশেষ করিয়া সেই প্রশ্ন বিষয়ে ব্যক্তিগত পত্র লিখিতেন। যখন কোনও গুরুতর বিষয়ে আলোচনা চলিত, তখন প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁহার পত্র আসিত। তিনি যে প্রথম পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, "আপনি যে অবস্থার কথা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমার দুঃখ হইতেছে। আপনাদের কর্ত্তব্য আপনারা বিনয়ের সহিত, শান্তির সহিত এবং সম্পূর্ণভাবে করিয়া

যাইতেছেন। আমার সহানুভূতি সম্পূর্ণ আপনাদিগের দিকেই রহিয়াছে। এই বিষয়ে আমি ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা এবং প্রকাশ্যভাবে যাহা করার তাহা করিব স্থির করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে আমরা এতটুকুও দাবি ত্যাগ করিতে পারি না। আপনাদের দাবি এত কম যে, কেহই—কোনও নিষ্পক্ষপাত লোকই উহা কমাইবার কথা বলিতে পারেন না।" এ বিষয়ে প্রায় এই কথাগুলিই তিনি তাঁহার প্রথম পত্রে 'টাইম্‌সে' লেখেন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত এই ভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। লেডী হাণ্টার তাঁহার মৃত্যুর পর এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ভারতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রবন্ধমালা লেখার জন্য সংক্ষিপ্তসার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

গত প্রবন্ধে মনসুখলাল নাজরের কথা লিখিয়াছি। সম্প্রদায়ের বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে বিলাতে পাঠানো হইয়াছিল এবং যাহাতে তিনি বিলাতের উভয় পক্ষের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া কার্য্য করিতে পারেন, সে প্রকার করিতে বলা হইয়াছিল। যখন তিনি বিলাতে ছিলেন, তখন সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার, সার ম্যাঞ্চরজী ভবনাগরী ও বৃটিশ কমিটির সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। তিনি ভারতীয় পেন্সনভোগী কর্ম্মচারীদের সহিত, ভারতীয় সেক্রেটারী আফিসের সহিত এবং উপনিবেশের আফিসের সহিত যোগ রাখিতেন। এইভাবে আমরা কোনও দিকেই চেষ্টা করিতে বাকি রাখি নাই। এই সকলের পরিণামে এই হয় যে, প্রবাসী ভারতবাসীদের বিষয়ে প্রশ্ন ইম্পিরিয়াল সরকারের নিকট একটা বড় জিনিষ হইয়া পড়ে। অন্য উপনিবেশের উপর ইহার ভাল ও মন্দ প্রভাব দুই-ই হইয়াছিল। অর্থাৎ যেখানেই ভারতীয়েরা বাস করিত, সেইখানেই ভারতীয়েরা ও গোরারা উভয়েই জাগ্রত হইয়া পড়িল।

নবম অধ্যায়

বুয়ার যুদ্ধ

যাঁহারা পূর্ব্বের অধ্যায়গুলি ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাই ভারতীয়দের অবস্থা বুয়ার যুদ্ধের প্রাক্কালে কেমন হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই সকল অসুবিধা দূর করার কি চেষ্টা হইতেছিল তাহাও জানিয়াছেন। ১৮৯৯ সালে ডাঃ জেমিসন সোণার খনির মালিকগণের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া জোহানেসবর্গের উপর চড়াও করেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, জোহানেসবর্গ অধিকার করার পরে বুয়ার সরকার এ বিষয় জানিতে পারিবেন।

এইভাবে হিসাব করায় ডাক্তার জেমিসন ও তাঁহার মিত্রগণ বড় একটা ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহারা আর একটা ভুলও এই করেন যে, যদি এই ষড়যন্ত্র ধরাও পড়িয়া যায়, রোডেশিয়ার শিক্ষিত বন্দুকধারীদের বিরুদ্ধে বুয়ার চাষারা কিছুই করিতে পারিবে না। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, জোহানেসবর্গের অধিকাংশ বাসিন্দাই তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনার সহিত গ্রহণ করিবেন। এ হিসাবটাতেও তাঁহাদের ভুল হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার সময়মত সমস্ত সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় ধীরভাবে, কুশলতার সহিত ও গোপনে ডাক্তার জেমিসনকে প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে তৈরী হইয়াছিলেন। সেইজন্য ডাক্তার জেমিসন জোহানেসবর্গের নিকটে পঁহুছার পূর্ব্বেই বুয়ার সৈন্যদের গুলি দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন। এই সৈন্যের বিরুদ্ধে তিষ্ঠিবার শক্তি ডাঃ জেমিসনের ছিল না। জোহানেসবর্গেও কেহ যাহাতে বিরুদ্ধাচরণ করিতে

না পারে সে জন্যও তাঁহারা তৈরী ছিলেন। বস্তুতঃ সেইজন্য জোহানেস-বর্গে কেহ মাথাও তুলিতে পারে নাই। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের ক্ষিপ্রতায় জোহানেসবর্গের ক্রোড়পতিরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। এত ভাল রকমে প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া এই কার্য্যে খুব কম ব্যয় হয়, জীবন হানিও খুব কমই হয়।

ডাক্তার জেমিসন এবং তাঁহার মিত্র খনির মালিকগণ শীঘ্রই গ্রেপ্তার হইলেন এবং তাঁহাদের বিচারের দ্রুত ব্যবস্থা হইল। কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হইল। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ক্রোড়পতি ছিলেন। ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট ইহাতে কি আর করিতে পারেন? তাঁহারা দিবালোকে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের মূল্য হঠাৎ বাড়িয়া গেল। মিঃ চেম্বারলেন দীনভাবে তার করিয়া তাঁহার দয়া ভাব জাগ্রত করিয়া এই সকল লোকের জীবন ভিক্ষা করিলেন। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার নিজের খেলা ভাল খেলিতে জানিতেন। তিনি জানিতেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন কোনও শক্তি নাই যে, তাঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারে। ডাক্তার জেমিসন ও তাঁহার সহযোগীগণের হিসাবে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র বেশ পাকা-পোক্ত করিয়াই করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের হিসাবে উহা ছেলে খেলা ছিল। তিনি সেইজন্য মিঃ চেম্বারলেনের অনুরোধ রক্ষা করিয়া কাহাকেও ফাঁসী দিলেন না, তাঁহাদের সকলকেই ছাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু এভাবে বেশীদিন চলে না। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার জানিতেন যে, ডাক্তার জেমিসনের আক্রমণ একটা বিষম ব্যাধির লক্ষণ মাত্র। জোহানেসবর্গের ক্রোড়পতিরা যে এই অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা করিবে না, তাহা হইতেই পারে না। তারপর যে সকল সংস্কার করিবার জন্য ডাক্তার জেমিসন এই আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বলা

হয়, সে সকলের কোনই প্রতিকার হয় নাই। ক্রোড়পতিদের চুপ করিয়া থাকার কথা নয়। তাহাদের দাবির প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ বৃটিশ হাই-কমিশনারের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। মিঃ চেম্বারলেনও ডাক্তার জেমিসন আদির প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করার জন্য প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া আবশ্যকীয় সংস্কারের দিকেও প্রেসিডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকলেই জানিতেন যে, একটা লড়াই অবশ্যম্ভাবী। খনির মালিকদের দাবি এমন ছিল যে, তাহা পূরণ করিলে ট্রান্সভালে বুয়ারদের প্রাধান্য নষ্ট হয়। উভয় পক্ষই বুঝিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সেইজন্য উভয় পক্ষই তৈরী হইতে লাগিলেন। এই সময়কার শব্দ-যুদ্ধও দেখার মত ছিল। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার যখন বেশী করিয়া অস্ত্র শস্ত্র আনার অর্ডার দিলেন, তখন বৃটিশ সরকারকেও কিছু সৈন্য আনাইয়া ফেলিতে হইল। যখন বৃটিশ সৈন্য পহুঁছিল, তখন প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার পরিহাস করিলেন এবং যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতঃ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার যখন পুরাপুরি তৈয়ারী হইলেন, তখন দেখিলেন যে, এখন বসিয়া থাকা মানে শক্রর হাতে গিয়া পড়া। বৃটিশ সরকারের অর্থের ও পশুবলের অক্ষয় ভাণ্ডার ছিল। সেই জন্য তাঁহাদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে তৈরী হওয়ারও সুবিধা ছিল। প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকেও তাঁহারা বলিয়া যাইতে পারিতেন যে, অভিযোগের প্রতিকার করা হোক্ এবং অবশেষে প্রতিকার না করার জন্য বাধ্য হইয়াই যুদ্ধ করিতে হইতেছে ইহাও জগতকে দেখাইতে পারিতেন। বস্তুতঃ এই অবকাশে তাঁহারা এমন ভাবে এত প্রস্তুত হইয়া লইতে পারিতেন যে, যুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের জয়ের সম্ভাবনা থাকিত না এবং দীনভাবে

বৃটিশ সরকারের দাবি মানিয়া লইতে হইত। যে জাতির ১৮ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর বয়স্ক সকলেই যুদ্ধে কুশল, যাহাদের স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিতে পারে, যাহারা জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা একটা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া গণ্য করে, সে জাতি চক্রবর্ত্তী-রাজের বলের কাছেও ঐ প্রকার দীন-দশা স্বীকার করে না। বুয়ার প্রজারা এমনি বাহাদুর।

অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটের সহিত প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার পূর্ব্বেই পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই দুইটি বুয়ার রাজ্য একই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। বৃটিশ সরকারের দাবি মানিয়া লইতে, অথবা খনির মালিকদের সন্তোষ হয় অন্ততঃ ততটা স্বীকার করিতেও প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্য এই দুই রাজ্যই এ বিষয়ে একমত হইল যে, যখন যুদ্ধ করিতেই হইবে তখন যত সময় দেওয়া যাইবে বৃটিশ সরকার ততই প্রস্তুত হইয়া পড়িবে। এইজন্য প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার বৃটিশ সরকারকে নিজের অন্তিম সঙ্কল্প ও অন্তিম দাবি লর্ড মিলনারের মারফৎ জানাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী ষ্টেটের সীমায় সৈন্য বসাইয়া দিলেন। ইহার একটিমাত্রই পরিণাম হইতে পারে। বৃটিশের ন্যায় চক্রবর্ত্তী-রাজ্য ধমকে ভয় পাইতে পারে না। 'আল্টিমেটামে'র সময় পূর্ণ হইলেই বিদ্যুৎ বেগে বুয়ার সৈন্য অগ্রসর হইল। লেডিস্মিথ, কিম্বারলী ও মেফিকিং অবরুদ্ধ হইল। এইভাবে ১৮৯৯ সালে এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। পাঠকেরা জানেন যে, লড়াইয়ের অন্যান্য কারণের মধ্যে, বৃটিশ তরফ হইতে, বুয়ার রাজ্যে ভারতীয়দের দুরবস্থাও একটা কারণ ছিল এবং ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতিরও একটা দাবি তাঁহারা করিয়াছিলেন।

এই অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের কর্ত্তব্য কি? এই মহাপ্রশ্ন তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইল। বুয়ারদের মধ্যে সকল পুরুষই

যুদ্ধে বাহির হইয়া পড়িল। উকীলেরা ওকালতী ছাড়িল, কৃষকেরা কৃষিকর্ম্ম ছাড়িল, বেপারী বেপার ছাড়িল, চাকর চাকুরী ছাড়িল। ইংরাজদের দিকে ওরূপ না হইলেও, কেপ্-কলোনি নাতাল ও রোডেশিয়ার সাধারণ লোকেদের মধ্য হইতে অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হইল। অনেক বড় ইংরাজ উকীল ও বেপারী স্বয়ং-সেবকদলে যোগ দিলেন। যে আদালতে আমি ওকালতী করিতাম সেখানে এখন অল্পসংখ্যক উকীলই দেখিতে পাইলাম। বড় উকীলদের সকলেই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। ভারতীয়দিগের উপর যে সকল দোষারোপ করা হইত তাহাদের মধ্যে একটি এই যে, "ভারতীয়েরা কেবল অর্থের সন্ধানেই দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে, তাহারা ইংরাজদিগের বোঝা স্বরূপ। কাষ্ঠের ভিতর যেমন উই প্রবেশ করিয়া তাহাকে ফোঁপ্রা করিয়া দেয়, তেমনি এই ভারতীয়েরা আমাদের (ইংরাজদের) কলিজা কুড়িয়া খাইতে আসিয়াছে। যদি দেশের উপর আক্রমণ হয়, যদি ঘর বাড়ী লুট হইতে থাকে, তবে তাহারা আমাদের কোনও কাজে আসিবে না। তখন আমাদের কেবল নিজেদের বাঁচিলেই হইবে না, এই লোকগুলিকেও তখন আমাদেরই রক্ষা করিতে হইবে।"

আমরা ভারতবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সম্বন্ধে সকলেই আলোচনা করিতেছিলাম। আমাদের অনেকেরই মনে হইল যে, এই অভিযোগের মূলে যে কোনই ভিত্তি নাই তাহা প্রমাণ করার এই সুন্দর অবসর। কিন্তু অপর দিকে নিম্নোক্ত আলোচনাও কেহ কেহ করিলেন।

"বৃটিশ ও বুয়ার উভয়েই আমাদিগের উপর সমান নির্য্যাতন করে। ট্রান্সভালেই আমাদের দুঃখ আছে, আর নাতালে, কেপ্-টাউনে নাই এমন ত নয়। প্রভেদ যাহা আছে তাহা কেবল পরিমাণের। বলিতে

গেলে, আমরা এক রকম ক্রীতদাসেরই মত। বুয়ারেরা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করিতেছে। আমরা কেন তাহাদের ধ্বংসের নিমিত্তভূত হই? ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে দেখিলে বুয়ারেরা যে হারিবে এরূপ মনে হয় না। যদি তাহারা জয় লাভ করে, তবে আমাদের উপর প্রতিশোধ তুলিতে কি তাহারা ছাড়িবে?"

আমাদের ভিতরে একদল ছিলেন, যাঁহারা দৃঢ়ভাবে এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি নিজেও এই সকল যুক্তির গুরুত্ব বুঝিতে পারিতাম। উহা অগ্রাহ্য করার মত নয়। আমি উহাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতাম। তাহা হইলেও ঐ সকল যুক্তি আমার মনঃপূত ছিল না। সেইজন্য ঐ সকল যুক্তির জবাব আমি নিজের কাছে ও সম্প্রদায়ের কাছে এই ভাবে দিতাম—দিয়াছিলাম :—

"দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের অস্তিত্ব বৃটিশ প্রজা হিসাবে রহিয়াছে। প্রত্যেক দরখাস্তেই আমরা বৃটিশ প্রজার অধিকার দাবী করি। বৃটিশ প্রজা হওয়া সম্মানজনক মনে করি। অন্ততঃ উহাতে সম্মান আছে, একথা শাসনকর্ত্তাদিগকে ও জগতকে জানাইয়া থাকি। শাসনকর্ত্তারাও আমাদের অধিকার বৃটিশ প্রজা হিসাবেই রক্ষা করিয়া থাকেন। এক আধটুকু যে সুবিধা পাই তাহাও বৃটিশ প্রজা হিসাবেই। যখন বৃটিশের এবং আমাদের সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা উপস্থিত, সেই সময় ইংরাজেরা আমাদিগকে দুঃখ দেয় বলিয়া হাত পা গুটাইয়া থাকা, মনুষ্যত্বের কার্য্য হয় না। ইহা এই দুঃখের উপর আরও দুঃখ বাড়াইবার হেতু হয়। আমাদের উপর যে দোষারোপ হয় তাহা আমরা অন্যায় মনে করিয়া থাকি এবং যখন উহা অন্যায় বলিয়া প্রমাণ করার অবকাশ আসিয়াছে, তখন সেই অবকাশ পরিত্যাগ করার অর্থ—সেই দোষারোপ যে সত্য নিজেরাই তাহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া। ইহার পর যদি আমাদের দুঃখ আরো

বাড়ে, যদি ইংরাজেরা বেশী করিয়া কটাক্ষ করে, তাহা হইলে তাহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু থাকিবে না। এই ক্ষেত্রে দোষ সম্পূর্ণ আমাদের বলিয়া গণ্য হইবে। ইংরাজেরা আমাদের উপর যে দোষারোপ করে তাহার কোনও ভিত্তি নাই, তাহা তর্ক করারও উপযুক্ত নয়—একথা বলা ও নিজেদিগকে ঠকানো একই কথা হইবে। আমরা যে বৃটিশ সরকারের অধীনে গোলামের মত হইয়া আছি, সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা হইলেও সেই সরকারের অধীনে থাকিয়াই গোলামী-মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করিতেছি। ভারতবর্ষে নেতারাও এইভাবেই চলিতেছেন। আমরাও এই প্রকারই করিয়া আসিতেছি। যদি আমরা বৃটিশ রাজ্যের অংশভূত থাকিয়াই আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিতে এবং উন্নতিসাধন করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের শরীর মন ও ধন দ্বারা সাহায্য করার এই সুবর্ণ সুযোগ। বুয়ারদের পক্ষ যে ন্যায়ের পক্ষ, ইহা অনেক অংশেই বলা যায়। কিন্তু কোনও রাজতন্ত্রের ভিতরে থাকিয়া প্রত্যেক প্রজার নিজ নিজ স্বাধীন বিচার প্রত্যেক কার্য্যে প্রয়োগ করা চলে না। শাসনকর্ত্তারা যাহা কিছু করেন তাহাই যে ঠিক—এমন নহে। তাহা হইলেও, প্রজারা যতক্ষণ কোনও শাসন স্বীকার করিয়া লয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাধারণভাবে সেই শাসন কার্য্যের অনুকূল থাকা ও সাহায্য করা প্রজা সাধারণের স্পষ্টই কর্ত্তব্য। প্রজাদের মধ্যে কেহ যদি রাজতন্ত্রের কোনও কার্য্য ন্যায়-বিগর্হিত বলিয়া মনে করে, তবে সেই সময় উক্ত কার্য্যে বাধা দেওয়া, অথবা সাহায্য করার পূর্ব্বে তাহাদের জীবন বিপদাপন্ন করিয়াও সরকারকে সেই অধর্ম্ম কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত হইবে। আমরা এমন কিছুই করি নাই। এই প্রকার ধর্ম্ম সঙ্কট আমাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই। আমরা যে এই প্রকার কোনও সার্ব্বজীবন ও সর্ব্বব্যাপক কারণে যুদ্ধে যোগ দিতে চাই না একথাও কেহ বলেন নাই, আর বলা চলেও

না। সেই হেতু প্রজা হিসাবে আমাদের সাধারণ ধর্ম্মই হইতেছে, এখন যুদ্ধের দোষ গুণ বিচার না করিয়া যখন যুদ্ধ হইতেছে তখন যথাশক্তি সাহায্য করা। শেষকালে যদি বুয়ারদিগেরই জয় হয়, জয় হইবে না একথা মনে করার কোনও হেতু নাই, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হইবে একথা মনে করিলে বীর বুয়ারদের প্রতি এবং আমাদের নিজেদের প্রতিও অন্যায় করা হয়। ইহা কেবল আমাদের কাপুরুষতারই চিহ্ন বলা যাইতে পারে। এই প্রকার চিন্তা করাতেও বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়। কোনও ইংরাজ কি মুহূর্ত্তের জন্যও এই ভাবনা ভাবিতে পারে যে, যদি হারিয়া যাই তবে কি হইবে? যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া কোনও লোক নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন না দিয়া এমন কথা ভাবিতে পারে না।"

আমি ১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই যুক্তি প্রয়োগ করিতেছিলাম এবং আজও আমার এই যুক্তিতে পরিবর্ত্তন করার কিছু নাই। আমি তখন বৃটিশ সরকারের উপর যে প্রকার মোহগ্রস্ত ছিলাম, বৃটিশ শাসনাধীনে স্বাধীনতা পাওয়ার যে আশা পোষণ করিতেছিলাম, আজ যদি তাহা করিতাম, তবে আজও এই যুক্তি দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতাম এবং তেমন ঘটনা উপস্থিত হইলে, ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও উহা প্রয়োগ করিতাম। এই যুক্তির বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতে ও বিলাতে শুনিয়াছি। কিন্তু তাহা শুনিয়াও আমার বিচার বদলাইবার কোনও কারণ হয় নাই। আমি জানি যে, আজ আমি যাহা ভাবি তাহার সহিত উক্ত বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহা হইলেও দুইটা উপযুক্ত কারণে আমি ইহার উল্লেখ করিতেছি। এক কারণ হইতেছে এই যে, পাঠকেরা তাড়াতাড়ি এই বহি শেষ করিয়া উঠিতে চাহিবেন, তাঁহারা যে ইহার বিচারের ধারা ধৈর্য্যের সহিত এবং মনোযোগের সহিত ওজন

করিয়া পড়িবেন, এ প্রকার আশা করার আমার কোনও অধিকার নাই। এই প্রকারের পাঠকের নিকট আমার আজকালকার আন্দোলনের সহিত আমার পূর্ব্বোক্ত মতের সামঞ্জস্য সাধন করা মুস্কিল হইতে পারে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই বিচার ধারার মধ্যে সত্য লাভের জন্য আগ্রহ রহিয়াছে। আমরা অন্তরে যাহা, বাহিরেও তাহাই দেখাইব এই ধর্ম্মের আচরণ যে শেষকালে করা কর্ত্তব্য তাহা নহে, প্রথম হইতেই এই ধর্ম্মের আচরণ করা চাই। এই প্রকার ভিত্তি না থাকিলে ধর্ম্ম জীবন গড়িয়া তোলা অসম্ভব।

এক্ষণে আমরা পরবর্ত্তী ঘটনার বিষয় বলিব। আমার এই যুক্তি অনেকের ভাল লাগিল। আমি পাঠকদিগকে একথা বলিতে চাই না যে, এই যুক্তি কেবল আমার একারই ছিল। তাহা ছাড়া এই প্রকার আলোচনা করার পূর্ব্বেও, অনেকে যুদ্ধে যোগ দেওয়াই চাই এরূপ স্থির করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই ব্যাবহারিক প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, যুদ্ধের যে ঝড়ের গর্জ্জন উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে ভারতীয়দের ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি কে শুনিবে? ভারতীয়দের এই সাহায্য করার মূল্য কি? আমরা ত কেহ কখনো অস্ত্র ধারণ করি নাই! অস্ত্রের ব্যবহার ব্যতীত লড়াইয়ের অন্য যে সকল কাজ করা যায়, তাহার জন্যও শিক্ষা আবশ্যক। আমরা কুচ করিয়া চলিতেও জানি না। নিজ নিজ মোট বহিয়া লম্বা মার্চ্চ করার শক্তিই কি আমাদের আছে? গোরারা যে আমাদিগকে 'কুলি' বলিয়া গণ্য করিবে, অপমান করিবে ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে, তাহাই বা কি করিয়া সহ্য করা যাইবে? যদি সৈন্যদল-ভুক্ত হইতেই চাই, তবে তাহা কি করিয়া গ্রাহ্য করানো যাইবে? অবশেষে আমরা সকলেই এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিলাম যে, যুদ্ধে গ্রহণ করাইবার জন্য খুব প্রবল চেষ্টা করিব, আর পরিশ্রম করিতে করিতেই অভ্যাস হইবে। যদি ইচ্ছা থাকে,

তবে ঈশ্বর শক্তি দিবেন; কাজ কেমন করিয়া করিব সে ভাবনা করিব না, যতটা পারি শিক্ষা গ্রহণ করিব, আর একবার সেবা-ধর্ম্ম স্বীকার করার পর মান অপমানের বিচার ত্যাগ করিব, যদি অপমান হই তবে তাহাও সহ্য করিয়া সেবা করিয়া যাইব।

আমাদের প্রার্থনা স্বীকার করাইতে অনেক মুস্কিল হইয়াছিল। তাহার কাহিনী যদিও মনোরম, তথাপি উহা এখানে বর্ণনা করার স্থান নহে। কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রধান প্রধান সকলেই আহত ও পীড়িতের শুশ্রূষা করার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলাম। আমরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইলাম। আমরা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিলাম। আমাদের এই আবেদনের এবং যে আগ্রহ হইতে উহার উৎপত্তি তাহার খুব ভাল প্রভাব হইয়াছিল। পত্রের উত্তরে সরকার ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে বুয়ারদের শক্তি বাড়িয়া যাইতেছিল। তাহারা বন্যার স্রোতের ন্যায় অগ্রসর হইতেছিল এবং তাহাদের নাতালের রাজধানী ডারবানে আসিয়া পঁহুছিবারও আশঙ্কা ছিল। অনেক লোক আহত হইল। এদিকে আমরাও বরাবরই চেষ্টা করিতেছিলাম। অবশেষে 'এ্যাম্বুল্যান্স কোর' (আহতদিগকে লইয়া যাওয়া ও শুশ্রূষা করার দল) বলিয়া আমাদিগকে সরকার গ্রহণ করিলেন। আমরা ত হাসপাতালের পায়খানা সাফ করার বা ঝাড়ুদারের কাজও চাহিয়াছিলাম। সে স্থলে 'এ্যাম্বুল্যান্সের' কার্য্য পাওয়ায় যে ধন্য হইয়াছিলাম, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা স্বাধীন ও গিরমিট-মুক্ত ভারতীয়দিগকে লওয়ার জন্যই বলিতেছিলাম, ইহাও জানাইয়াছিলাম যে, গিরমিটিয়াদিগকেও দলভুক্ত করিতে ইচ্ছা করি এই সময় সরকার যত লোক পান তাহাই চাহিতেছিলেন। সেইজন্য

প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্র-স্বামীর নিকটই লোকের জন্য অনুরোধ পাঠাইয়াছিলেন। অবশেষে ১১০০ ভারতীয় দ্বারা গঠিত বিশাল দল ডারবান হইতে রওনা হইল। ইহাদিগকে রওনা করার সময় পাঠকের পূর্ব্ব-পরিচিত মিঃ এস্কম্, যিনি এক্ষণে স্বেচ্ছাসেবকদের কর্ত্তা হইয়াছিলেন, আমাদিগকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ দিলেন।

ইংরাজ সংবাদপত্রের কাছে এ সকলই আশ্চর্য্যজনক ঠেকিয়াছিল। ভারতীয় সম্প্রদায় যুদ্ধে কোনও অংশ লইবে, এ আশা কেহ করেন নাই। একজন ইংরাজ লেখক কোনও প্রধান সংবাদপত্রে স্তুতিপূর্ণ এক কবিতা ছাপাইয়া দিলেন, তাহার ধুয়া ছিল—"আমরা, সকলেই একই সাম্রাজ্যের সন্তান।"

এই দলে প্রায় তিন চারি শত গিরমিট-মুক্ত হিন্দুস্থানী ছিল, স্বাধীন ভারতীয়দের চেষ্টায় ইহারা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৩৭ জন নেতা ছিলেন। ইঁহাদের স্বাক্ষরেই গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত গিয়াছিল এবং ইঁহারাই সকলকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নেতাদের মধ্যে ব্যারিষ্টার ও হিসাব-রক্ষক ইত্যাদিও ছিলেন, অপরাপর সকলে রাজমিস্ত্রী, স্থতার ইত্যাদি কারিগর ছিল এবং সাধারণ মজুর ছিল। এই দলের ভিতরে হিন্দু মুসলমান মাদ্রাজী উত্তর ভারতীয় লোক প্রভৃতি সকল জাতির এবং সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। বেপারীরা এই দলে বড় কেহ ছিলেন না, কিন্তু তাহারা খুব টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সাধারণ সামরিক ব্যবস্থায় যে খরচা পাওয়া যাইত তাহাতে এই দলের সকল প্রয়োজন মিটিত না, সেইজন্য অতিরিক্ত কিছু খাদ্যাদি পাইলে ক্যাম্প জীবনের ক্লেশের কিছু লাঘব হইত। এই অভাব মিটাইবার কাজ বেপারীরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা আহত তাহাদিগকে শুশ্রূষা করিতে হইত, বেপারীরা তাহাদের জন্যও মিঠাই,

সিগারেট ইত্যাদি দিতেন। যখনই আমরা সহরের নিকট ছাউনী করিয়াছি, তখনই বেপারীদের এই প্রকারের সাহায্য পাইয়াছি।

আমাদের সহিত যে 'গিরমিটিয়ারা' আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে তাহাদের কারখানা বা ক্ষেত্র হইতে ইংরাজ পরিদর্শকও আসিয়াছিল। কিন্তু এই 'গিরমিটিয়াদে'র ও আমাদের কাজ একই ছিল। যখন তাহারা দেখিল যে, আমাদের সঙ্গে একত্র থাকিতে পারিবে, তখন তাহাদের খুব আনন্দ হইল এবং স্বভাবতঃই সমস্ত দলের ব্যবস্থার ভার আমাদের উপরেই আসিয়া পড়িল। এই হেতু এই সমস্ত 'কোর'টার (দল) নামই 'ভারতীয় কোর' হইয়াছিল এবং এই দুলের কার্য্যের জন্য প্রশংসা ভারতীয় সম্প্রদায়ই পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে 'গিরমিটিয়াদে'র কার্য্যের জন্য প্রশংসা ভারতীয়দের প্রাপ্য না হইয়া কুঠীওয়ালাদেরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, একবার দল গঠন হইয়া গেলে সমস্ত সুব্যবস্থার জন্য প্রশংসা ভারতীয় সম্প্রদায়েরই প্রাপ্য ছিল এবং জেনারেল বুলার তাহার সরকারী পত্রে একথা স্বীকারও করিয়াছেন। রোগীদিগকে শুশ্রূষা করিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ডাক্তার বুথ আমাদের দলে ছিলেন। তিনি একজন ধর্ম্মভীরু পাদরী ছিলেন। যদিও তাঁহার কার্য্য প্রধানতঃ ভারতীয় খৃষ্টানদের সম্পর্কেই ছিল, তথাপি ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের সহিতই তিনি মিশিতেন। উল্লিখিত ৩৭ জন নেতার প্রায় সকলেই তাঁহার নিকটেই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহার সঙ্গেই একটা ইউরোপীয় 'এ্যাম্বুল্যান্স কোর'ও ছিল। দুই 'কোর'ই পাশাপাশি একই স্থানে কাজ করিত।

আমরা গবর্ণমেণ্টকে যে পত্রে সাহায্য দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে সর্ত্ত বর্জ্জিত ছিল। কিন্তু সরকার আমাদের কর্ম্ম গ্রহণ স্বীকার করিয়া যে পত্র দেন, তাহাতে আমাদিগকে গোলাগুলির সীমার

মধ্যে কার্য্য করা হইতে বাদ দিয়াছিলেন। স্থায়ী 'এ্যাম্বুল্যান্স কোর' যাহা সৈন্যদের সহিত থাকে, তাহার আহত সৈন্যদিগকে বহন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়া যাওয়ার কথা। জেনারেল হোয়াইট লেডীস্মিথে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। জেনারেল বুলার অবরোধ উত্তোলন করার জন্য মহাপ্রযত্ন করিতেছিলেন। এই প্রয়াসে অনেক সৈন্য আহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সৈন্যদের সহিত যে স্থায়ী 'এ্যাম্বুল্যান্স' থাকে তাহাতে কুলাইবে না,এই আশঙ্কায় জেলারেল বুলার ভারতীয়দিগের ও গোরাদিগের অস্থায়ী 'এ্যাম্বুল্যান্স কোর' গঠন করাইয়াছিলেন। যে স্থান দিয়া যুদ্ধ হইতেছিল সেখান হইতে কেন্দ্র স্থলে আসার কোনও পাকা রাস্তাদি ছিল-না, সেইজন্য আহতদিগকে সাধারণ যান বাহনের সাহায্যে কেন্দ্রে লইয়া আসা সম্ভব ছিল না। কেন্দ্রস্থল সাধারণতঃ রেল ষ্টেশনের নিকটেই স্থাপিত করা হইত। রণক্ষেত্রের ৭।৮ মাইল হইতে ২৫ মাইল পর্য্যন্ত দূরে কেন্দ্রস্থল থাকিত।

আমরা শীঘ্রই কাজ পাইলাম। যাহা মনে করিয়াছিলাম কাজ তাহা অপেক্ষা কঠিন ছিল। আহতদিগকে লইয়া ৭।৮ মাইল চলা ত আমাদের সাধারণ কার্য্যক্রমের ভিতরেই ছিল। কিন্তু কখনো কখনো আমাদিগকে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত সৈন্য ও কর্ম্মচারীদিগকে ২৫ মাইল পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত। সাধারণতঃ প্রাতে আটটায় যাত্রা সুরু হইত। পথে রোগীকে ঔষধাদি দিতে হইত, অপরাহ্ণ ৫টায় আমাদের পঁহুছান চাই। এ কাজ খুবই কঠিন ছিল। একবার মাত্র আহতদিগকে লইয়া আমাদের একদিনে ২৫ মাইল যাইতে হইয়াছিল। আবার এদিকে বৃটিশ সৈন্য যুদ্ধের প্রথম দিকটায় পরাজয়ের পর পারাজয় লাভ করিতে লাগিল, সেইজন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে অধিক সংখ্যক লোক আহত হইতে লাগিল। এইজন্য কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে গোলাগুলির সীমানার

মধ্যে লইবেন না বলিয়া যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আমাদের সহিত যে সর্ত্ত ছিল, ইহা তাহার বহির্ভূত বলিয়া জেনারেল বুলার জানান যে, তিনি আমাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে বাধ্য করিবেন না, কিন্তু যদি আমরা করি তবে উপকৃত হইবেন। আমরা ত বিপদের মধ্যে গিয়া কার্য্য করিতেই ইচ্ছা করিতেছিলাম। আমরা যে দূরে থাকিতাম তাহা আমাদের পছন্দ হইত না। আমরা সেইজন্য এই সুযোগ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমাদের কেহই গুলিতে বা অন্য প্রকারে আহত হয় নাই।

এই 'কোরে' অনেক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল কথা এখানে লিখিতে ইচ্ছা করি না। মাত্র এইটুকু উল্লেখ করিব যে, 'কোর' যদিও আমাদের এই 'গিরমিটিয়া' পর্য্যন্ত সাধারণ লোকদিগের লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং যদিও ইংরাজ সৈন্য ও ইংরাজ স্বেচ্ছাসেবকের 'কোরের' সহিত কাজ করিতে হইত, তথাপি একদিনও ইহা কেহ অনুভব করে নাই যে, ইউরোপীয়েরা আমাদিগের সহিত অবজ্ঞা ভরে অথবা অভদ্র ভাবে ব্যবহার করিতেছেন। অস্থায়ী ইউরোপীয় 'এ্যাম্বুল্যান্স কোর' দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ইউরোপীয়দিগের দ্বারাই গঠিত ছিল। ইহারাই যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় বিরোধী আন্দোলন চালাইত। কিন্তু আজ তাহাদের দুর্দ্দিনে ভারতীয়েরা গত ঘটনা ভুলিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে, এই অনুভূতি সে সময়ের জন্য তাহাদের মন গলাইয়া দিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের কার্য্যের কথা জেনারেল বুলার তাঁহার সরকারী পত্রে (ডেস্‌প্যাচে) উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমাদের ৩৭ জন নেতাকে মেডেলও দেওয়া হইয়াছিল।

লেডীস্মিথের উদ্ধার সম্পর্কে জেনারেল বুলারের কার্য্য যখন শেষ হইল তখন, অর্থাৎ প্রায় দুই মাসের মধ্যে আমাদের ও ইউরোপীয়দের

'এ্যাম্বুল্যান্স কোর' ভাঙ্গিয়া দেওয়ার হুকুম হইল। যুদ্ধ অবশ্য ইহার পরও দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। আমরা সকল সময় পুনরায় যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলাম এবং সরকারও আমাদের দল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার সময় একথা জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, যদি আবার ব্যাপক ভাবে কার্য্যের আবশ্যক হয়, তখন দলকে পুনরায় নিযুক্ত করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা এই যুদ্ধে যে সাহায্য করিয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। তাহাদের কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। তবুও সাহায্য করার জন্য একটা আন্তরিক ইচ্ছা অপর পক্ষকে প্রভাবিত না করিয়া পারে না, বিশেষতঃ যেখানে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য করা হয়। যুদ্ধকালটাতে ভারতীয়দের জন্য এই প্রকার সদ্ভাব বর্ত্তমান ছিল।

এই অধ্যায় শেষ করার পূর্ব্বে একটি প্রয়োজনীয় ঘটনার উল্লেখ করিব। যখন লেডীস্মিথ অবরুদ্ধ হয়, তখন ইংরাজদের সহিত কতকগুলি ছুট্‌কো ভারতবাসীও অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাদের কতক ছিল বেপারী, আর বাকি সকল ছিল মজুর—রেলে অথবা ইউরোপীয় গৃহস্থদের বাড়ীতে চাকুরী করিত। ইহাদের মধ্যে প্রভুসিং নামে একজন লোক ছিল। লেডীস্মিথের অধিনায়ক প্রত্যেক শহরবাসীকেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য দিয়াছিলেন। এই 'কুলি' প্রভুসিংকে সব চাইতে বেশী গুরুতর ও সব চাইতে বেশী বিপদসঙ্কুল কার্য্য দেওয়া হইয়াছিল। লেডীস্মিথের নিকটবর্ত্তী এক পাহাড়ের উপর বুয়ারেরা একটা 'পম্ পম্' তোপ বসাইয়াছিল। উহার গোলা অনেক গৃহাদি নষ্ট করিয়াছিল, কিছু প্রাণহানিও করিয়াছিল। তোপের মুখ হইতে গোলা বাহির হওয়ার পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িতে এক বা দুই মিনিট সময় লাগিত। যদি অবরুদ্ধেরা এতটুকু সময় পূর্ব্বেও সাবধান হইতে পারে, তবে নিরাপদ স্থানে মাথা গুঁজিয়া বাঁচিতে পারে। যখনই ঐ তোপ চলিত তখন প্রভুসিং একটা গাছের উপর চড়িয়া বসিয়া থাকিত।

সে তোপের দিকে তাকাইয়া থাকিত এবং যেমন তোপের মুখে আগুনের হল্কা দেখিত তখনই একটা ঘণ্টা বাজাইত। ঘণ্টা শুনিয়াই লেডীস্মিথের বাসিন্দারা জানিত যে, গোলা আসিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত স্থানে আশ্রয় লইত।

লেডীস্মিথের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই অমূল্য সাহায্য করার জন্য প্রভুসিংকে প্রশংসা করার সময় একথা বলিয়াছিলেন যে, ঘণ্টা বাজাইতে প্রভুসিং একটি বারও ভুল করে নাই। বলাই বাহুল্য প্রভুসিং-এর জীবনের আশঙ্কা সকল সময়েই ছিল। প্রভুসিং-এর বীরত্বের কাহিনী নাতাল পঁহুছে এবং সেখান হইতে ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের কানে আসে। তিনি প্রভুসিং-এর জন্য একটা কাশ্মিরী পোষাক উপহার পাঠান এবং নাতাল সরকারকে অনুরোধ করেন যে, তাহাকে এই সম্মান-দান কার্য্য যেন যথা সম্ভব বিজ্ঞাপিত করিয়া সম্পন্ন করা হয়। ডারবানের মেয়রের উপর এই কার্য্য করার ভার পড়িয়াছিল। তিনি এই উদ্দেশ্যে টাউন হলে সভা আহ্বান করেন। এই ঘটনা হইতে আমরা দুইটা জিনিষ শিক্ষা করার মত পাইতেছি। প্রথমতঃ, কোনও লোককে, সে যতই দীন ও নগণ্য হোক্ না কেন, অবজ্ঞা করিতে নাই। দ্বিতীয়, মানুষ যতই ভীরু হোক্ না কেন, যখন অবসর উপস্থিত হয় তখন সে সাহসী হইয়া যাইতে পারে।

দশম অধ্যায়

যুদ্ধের পরে

যুদ্ধের গুরুতর অংশ ১৯০০ সালেই শেস হইয়া যায়। ইতিমধ্যে লেডীস্মিথ, কিম্বারলী, ও মেফিকিং অবরোধ-মুক্ত হয়।

জেনারেল ক্রাঞ্জী পারডিবার্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। বৃটিশ রাজ্যের যে সকল অংশ বুয়ারেরা দখল করিয়াছিল তাহা পুনরায় কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে কেবল গরিলা যুদ্ধ চলিতেছিল। লর্ড কিচেনার ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেট দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

আমি মনে করিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কাজ শেষ হইয়াছে। যেখানে একমাস মাত্র থাকিব মনে করিয়াছিলাম, সেখানে ছয় বৎসর হইয়া গেল। আমাদের সম্মুখে যে কাজ করার ছিল তাহার ধাঁচ মোটামুটি নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তবু দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অনুমতি না পাইলে আমি দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িতে পারি না। আমার সাথীদিগকে ভারতবর্ষে গিয়া আমার জন-সেবা করার ইচ্ছার কথা জানাইলাম। স্বার্থ সিদ্ধি করার পরিবর্ত্তে কেমন করিয়া সেবা করা যায়, সে শিক্ষা আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় পাইয়াছিলাম এবং এই কার্য্য করার জন্য আমার হৃদয় তৃষিত ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় মনসুখলাল নাজর ছিলেন, মিঃ খানও ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই জন্মিয়া বড় হইয়াছে এমন জন কতক যুবকও ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই সকল কারণে আমার দেশে ফিরিয়া আসা কোনও ক্রমেই অন্যায় হইত না।

এই সকল যুক্তি দাখিল করা সত্বেও আমাকে একটা সর্ত্ত করিয়া লইয়া তাঁহারা ভারতবর্ষে ফিরিতে অনুমতি দিলেন। সর্ত্তটি এই, যদি আমার অবর্ত্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন কোনও অবস্থার উদ্ভব হয় যাহার জন্য আমার উপস্থিতি আবশ্যক, তাহা হইলে সম্প্রদায় যে কোনও সময় আমাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। এই অবস্থায় আমার আসার ব্যয় ও দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার ব্যয় তাঁহারাই বহন করিবেন।

আমি স্থির করিলাম যে, আমি বোম্বাইতেই ব্যারিষ্টারী করিব। ইহাতে প্রধানতঃ গোখলের তত্ত্বাবধানে জন-সেবার কার্য্য করিতে পারিব এবং গৌণতঃ এইভাবে আমার জীবিকা উপার্জ্জনের কার্য্যও চলিবে। সেই অনুসারে আমি আফিস ও বাড়ী ভাড়া লইলাম এবং কিছু কিছু ওকালতী কাজ পাইতে আরম্ভ করিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজের জন্য যাঁহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইয়াছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাকে এত কাজ দিলেন যে, কেবল তাহাতেই আমার সংসার খরচা চলিয়া যাইত। কিন্তু জীবনে শান্ত হইয়া বসিয়া যাওয়া আমার অদৃষ্টে ছিল না। কেবল মাস তিনেক বোম্বাইতে স্থির হইয়া বসিয়াছি, এমন সময় দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম যে, সেখানকার অবস্থা গুরুতর। মিঃ চেম্বারলেন শীঘ্রই আসিবেন এবং আমার উপস্থিতি আবশ্যক।

আমি বোম্বাইয়ের বাড়ী ও আফিস উঠাইয়া দিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা-গামী প্রথম ষ্টিমারেই রওনা হইয়া গেলাম। এই ঘটনা ১৯০২ সালের শেষ দিকে হয়। ১৯০১ সালের শেষভাগে আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলাম ও ১৯০২ সালের মার্চ্চে বোম্বাইয়ে আফিস খুলিয়াছিলাম। টেলিগ্রামে বিশদ বিবরণ ছিল না। আমি অনুমান করিলাম যে, ট্রান্সভালে গোল বাধিয়া থাকিবে। আমি এইবার পরিবার না লইয়াই

দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলাম, কেননা ৪।৫ মাসেই ফিরিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। আমি ডারবানে পঁহুছিয়া সমস্ত শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। আমাদের অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বত্র আমাদের অবস্থা যুদ্ধের পর ভাল হইবে। আমরা ত ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেটে কোন গোলই আশা করি নাই, কেননা লর্ড ল্যান্সডাউন, লর্ড সেলবোর্ণ এবং আরো বড় বড় রাজনীতি-বিশারদেরা যুদ্ধ আরম্ভের সময় বলিতেছিলেন যে, ট্রান্সভালে বুয়ারেরা ভারতীয়দের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করে তাহা যুদ্ধের অন্যতম কারণ। প্রিটোরিয়ার বৃটিশ এজেন্ট আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন যে, ট্রান্সভাল বৃটিশ কলোনি হওয়া মাত্রই সেখানে ভারতীয়দের যে সকল অসুবিধা ছিল, সে সমস্তই দূর হইয়া যাইবে। ইউরোপীয়েরাও বিশ্বাস করিতেন যে, ট্রান্সভালের পুরাণো আইন সকল বৃটিশ অধিকারের পর আর চলিবে না। এই সংস্কার এতটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, পূর্ব্বে জমির নিলামে নিলামকারীরা ভারতবাসীর ডাক গ্রহণ না করিলেও, এখন প্রকাশ্যভাবে ভারতীয়দের নিলামের ডাক গ্রহণ করিত। এইভাবে অনেক ভারতীয় জমি কিনিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাহা রেজেষ্ট্রী করার জন্য দেওয়া হইল, তখন রেজিষ্ট্রার ১৮৮৫ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি করিতে অস্বীকার করিলেন। আমি ডারবানে পঁহুছিয়াই এই সকল সংবাদ পাইলাম। নেতারা বলিলেন যে, মিঃ চেম্বারলেন প্রথম ডারবানে আসিবেন এবং আমরা এইখানেই নাতালের কথা তাঁহাকে শুনাইব। এই কার্য্য হইয়া গেলে আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ট্রান্সভাল যাইব।

নাতালে মিঃ চেম্বারলেনের নিকট ডেপুটেশন বা প্রতিনিধিদল গেলেন। তিনি ভদ্রভাবে তাঁহাদের বক্তব্য শুনিলেন এবং আবেদনের বিষয়ে নাতাল সরকারের সহিত আলোচনা করিবেন বলিলেন।

নাতালে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার যে শীঘ্র পরিবর্ত্তন হইবে এ আশা আমার ছিল না। অন্য এক অধ্যায়ে এই সকল আইনের কথা আলোচনা করা হইয়াছে।

পাঠকেরা জানেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যে কোনও ভারতবাসী যে কোনও সময়ে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে পারিত। আমি দেখিলাম যে, সে দিন আর নাই। প্রবেশে বাধা ইউরোপীয় ও ভারতবাসী সকলের উপরই অবশ্য প্রযুজ্য ছিল। যুদ্ধের পর সমস্ত দোকান না খোলায় অবস্থা এমন ছিল যে, হঠাৎ অনেক লোক এক সঙ্গে প্রবেশ করিলে অন্নবস্ত্রের অনটন পড়িবে। ' দোকানে যে সকল জিনিষপত্র ছিল তাহা পূর্ব্বের বুয়ার গবর্ণমেণ্ট অনাড়ম্বরে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, প্রবেশ সম্বন্ধে বাধা সাময়িক এবং তাহাতে ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু যেভাবে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইত তাহাতে ভারতবাসীতে ও ইউরোপীয়তে প্রভেদ করা হইতেছিল বলিয়াই আশঙ্কার কারণ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরে পাশ দেওয়ার আফিস খোলা হইয়াছিল। কার্য্যতঃ কোনও ইউয়োপীয়ান চাওয়া মাত্রই পাশ পাইতেন, আর ভারতীয়দের জন্য ট্রান্সভালে আলাদা একটা এশিয়াটিক বিভাগ খোলা হয়। এই নূতন বিভাগের সৃষ্টি চিরাচরিত পদ্ধতির বহির্ভূত। ভারতীয়দিগকে প্রথমতঃ এই বিভাগের কর্ত্তার নিকট আবেদন করিতে হইত। তিনি মঞ্জুর করিলে তারপর তাহারা ডারবানে অথবা অন্য বন্দরে প্রবেশের পাস পাইত।

যদি আমাকে এই সকল উপায়ে অনুমতি পাইতে হয়, তবে ততদিন মিঃ চেম্বারলেন ট্রান্সভাল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। ট্রান্সভালের ভারতবাসীদের শক্তি ছিল না যে, আমার জন্য পাশ যোগাড় করিয়া দিতে পারেন আমি পাস দেওয়ার কর্ত্তাকে চিনিতাম না। আমি পুলিশের

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানিতাম। আমি তাঁহাকে আমার নিমিত্ত পাস লইয়া দেওয়ার জন্য, আমার সহিত 'পারমিট আফিসে' আসিতে বলিলাম। তিনি স্বীকার করিলেন ও 'পারমিট' অফিসারের নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়, তাহা দিলেন। আমি যে ১৮৯৩ সালে এক বৎসর প্রিটোরিয়াতে ছিলাম সেই জোরেই পাস পাইয়া প্রিটোরিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রিটোরিয়ার আবহাওয়া বিশেষ শঙ্কাজনক দেখিলাম। এশিয়াটিক বিভাগ যে কেবল ভারতীয়দিগকে পীড়ন করার এক যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে ইহা আমি দেখিতে পাইলাম। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্যদলের সঙ্গে যে ভাগ্যান্বেষীরা আসিয়াছিল এবং ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সুযোগ খুঁজিতে যাহারা সেইখানেই বসবাস করিতেছিল, এই বিভাগের তাহারাই ছিল আমলা। তাহাদের ভিতর কেহ কেহ দুশ্চরিত্র ছিল। দুইজন ঘুষ লওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। জুরী তাহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিলেও তাহাদের অপরাধের সম্বন্ধে কোনও সংশয় না থাকাতে তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। পক্ষপাত করাই রীতি হইয়াছিল। যখন নূতন একটা বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং অধিকার সঙ্কোচ করাই যখন সে বিভাগের কাজ হয়, তখন নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এবং তাহারা যে ভাল কাজ করিতেছে ইহা দেখাইবার জন্য, কর্ম্মচারীরা যে সময় সময় নূতন প্রকারের বাধার সৃষ্টি করিতে থাকিবে, তাহার মধ্যে কিছুই আশ্চর্য্য হওয়ার নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল।

আমি দেখিলাম যে, আমার গোড়া হইতে কাজ আরম্ভ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আমি যে কি করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলাম তাহা এশিয়াটিক বিভাগ ধরিতে পারিলেন না। আমাকে সোজা জিজ্ঞাসা করার সাহসও তাঁহাদের ছিল না। আমার মনে হয় যে তাঁহারা

ভাবিয়াছিলেন যে, আমি গোপনে প্রবেশ করিয়াছি। তাঁহারা গৌণ ভাবে সংবাদ লন যে, কি করিয়া আমি পাস পাই। প্রিটোরিয়াতে এক ডেপুটেশনের মিঃ চেম্বারলেনের সহিত দেখা করার কথা ছিল। যে আবেদন করা হইবে তাহার খসড়া আমি প্রস্তুত করি। কিন্তু এশিয়াটিক বিভাগ আমাকে ডেপুটেশন হইতে বাদ দিয়া দেন। ভারতীয় নেতারা সেজন্য স্থির করেন যে, আমাকে বাদ দেওয়ায় তাঁহারা মিঃ চেম্বারলেনের সহিত দেখা করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন। আমি এই যুক্তি পছন্দ করি না। আমি তাঁহাদিগকে বলি যে, এই অপমান আমি গ্রাহ্যই করিব না। তাঁহাদিগকেও গ্রাহ্য না করিতে বলি। আবেদন পত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন বাকি ছিল কাহারও তাহা মিঃ চেম্বারলেনকে পড়িয়া শুনানো। ভারতীয় ব্যারিষ্টার মিঃ জর্জ গডফ্রে তখন সেখানে ছিলেন, তিনিই পড়িয়া শুনাইবেন স্থির হয়। ডেপুটেশন মিঃ চেম্বারলেনের সহিত সাক্ষাৎ করে। আমার নাম উল্লেখ করায় তিনি বলিলেন—"আমি মিঃ গান্ধীর সহিত নাতালে সাক্ষাৎ করিয়াছি, সেইজন্য এখানে তাঁহার সহিত দেখা করিতে অস্বীকার করিয়াছি। এখানে আমি নিজে সাক্ষাৎ ভাবে আপনাদের নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি।" আমার মতে এই কথা কাটা ঘায়ে লবন দেওয়ার মত হইল। এশিয়াটিক বিভাগ মিঃ চেম্বারলেনকে যাহা শিখাইয়াছিল, তিনি তাহাই বলেন। ভারতবর্ষে যে প্রকার আবহাওয়া, এই বিভাগ সেই বাতাস এখানেও প্রবাহিত করিতেছিলেন। সকলেই জানেন যে, বৃটিশ অফিসারেরা বোম্বের লোককেও যদি চম্পারণে দেখেন, তবে তাহাকে বিদেশী বলিয়া মনে করেন। সেই গণিত অনুসারেই আমি যখন ডারবানে থাকি, তখন ট্রান্সভালের সংবাদ আমি কি জানিতে পারি? এশিয়াটিক বিভাগ মিঃ চেম্বারলেনকে এই প্রকারেই শিখাইয়া পড়াইয়া রাখিয়াছিল।

মিঃ চেম্বারলেন জানিতেন না যে, আমি ট্রান্সভালে বাস করিতাম, আর যদি বাস না-ও করিয়া থাকি, আমি সেখানকার ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলাম। এই ডেপুটেশন গঠন বিষয়ে একটাই যথার্থ প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইতেছে এই যে, ট্রান্সভালে. ভারতীয়দের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা কে বেশী জানে। এই ভারতীয়েরা যে এইজন্যই আমাকে ভারতবর্ষ হইতে আনাইয়াছেন, তাহাতেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়া যায়। কিন্তু ক্ষমতাশালী লোকদিগের নিকট ন্যায়-সঙ্গত কথাই যে বিপরীত বোধ হয়, তাহা নূতন নহে। মিঃ চেম্বারলেন সে সময় স্থানীয় লোকের এত হাতের মুঠার ভিতর ছিলেন, অথবা তিনি স্থানীয় ইউরোপীয়দিগকে তুষ্ট করিতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে ন্যায্য বিচার পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তবুও তাঁহার নিকট ডেপুটেশন যায়। অবহেলার জন্যই হোক্ বা আত্মসম্মানে আঘাত লাগার জন্যই হোক্, আমাদের দুঃখ অপনোদনের চেষ্টার কোনও একটা পথও দেখিতে আমরা বাকি রাখিতে চাই নাই।

১৮৯৪ সালে আমার নিকট যে ধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এবার তদপেক্ষা কঠিন সঙ্কটে পড়িলাম। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে মিঃ চেম্বারলেনের ফিরিয়া যাওয়ার পরই আমার কার্য্য শেষ হইয়াছিল বলিয়া আমি ভারতে ফিরিতে পারি। অন্যদিকে আমি ইহাও দেখিলাম যে, যদি আমি এখন ভারতের বৃহৎ-ক্ষেত্রে সেবা করিব মনে করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্মুখে যে আসন্ন বিপদ রহিয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে যে সেবা ভাব আমি ধর্ম্ম বলিয়া পোষণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহাকে দূষিত করা হয়। আমি ভাবিলাম যে, যদি এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য আমাকে জীবনভরও দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকিতে হয়, তবুও যে পর্য্যন্ত এই আসন্ন মেঘ না দূরীভূত

হয় ততদিন, অথবা এই মেঘ এবং ঝড়ের মুখে শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা যতদিন না উড়িয়া যাই ততদিন, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়াই যাইতে হইবে। আমি ভারতীয় নেতাদিগকেও এই কথাই বলিয়াছিলাম। আমি ১৮৯৪ সালের ন্যায় এখনো ব্যারিষ্টারী করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করার সঙ্কল্প করিলাম। সম্প্রদায়ের কথা আর বলিব কি, তাঁহারা ইহাই চাহিতেন।

আমি শীঘ্রই ট্রান্সভালে ব্যারিষ্টারী করার জন্য দরখাস্ত করিলাম। আশঙ্কা ছিল যে, এখানেও আমার দরখাস্তের প্রতিবাদ হইবে, কিন্তু সে আশঙ্কা অমূলক হয়। আমি সুপ্রীম কোর্টের এটর্ণি শ্রেণীভুক্ত হইয়া জোহানেসবর্গে আফিস খুলিলাম। ট্রান্সভালের মধ্যে জোহানেসবর্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভারতীয়ের বাস, সেই জন্য সেইখানেই আমার জন-সেবার ও জীবিকা অর্জ্জনেরও সুবিধা বলিয়া আফিস করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইল। আমি প্রত্যহই এশিয়াটিক বিভাগের গলদের তিক্ত পরিচয় পাইতে লাগিলাম। ট্রান্সভালের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এখন প্রধান কার্য্য হইল, ইহার একটা কিছু প্রতিকার করা। ১৮৮৫ সালের ৩ আইনের রদ করা এখন দূরবর্ত্তী সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেল। আমাদের এখনকার হাতের কাজ হইল, এশিয়াটিক বিভাগের স্রোতোবেগ হইতে নিজদিগকে বাঁচাইয়া টিকিয়া থাকা। ভারতীয় ডেপুটেশন একাদিক্রমে অনেক ছোটবড় কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিল, যথা লর্ড মিলনার, লর্ড সেলবোর্ণ যিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ট্রান্সভালের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর সার আর্থার ললে যিনি পরে মাদ্রাজের গবর্ণর হন ইত্যাদি। আমরা এখানে সেখানে কিছু কিছু সুবিধা পাইলাম, কিন্তু এ সকলই জোড়াতালি দেওয়ায় কাজ হইয়াছিল। ডাকাতেরা সর্ব্বস্ব লুট করিয়া গেলে পরে গৃহস্থের কাতর অনুনয়ে তাহারা যদি কৃপা

করিয়া কোনও তুচ্ছ জিনিষ ফিরাইয়াদেয়, তখন যে অবস্থা হয়, আমাদের সেই অবস্থা হইয়াছিল। এই আন্দোলনের ফল-স্বরূপ সেই দুইজন এশিয়াটিক বিভাগের কর্ম্মচারী—যাহাদের কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল। ভারতীয়দের প্রবেশ সম্বন্ধে আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই সত্য হইল। এখন ইউরোপীয়দের জন্য আর পাস (পারমিট) আবশ্যক হইত না, কেবল ভারতীয়দেরই লাগিত। বুয়ার গবর্ণমেণ্ট কদাচ ভারতীয়দের বিরুদ্ধ আইনগুলি পূর্ণতার সহিত প্রয়োগ করিতেন না। ইহার হেতু তাঁহাদের উদারতা নহে, তাঁহাদের শাসন পদ্ধতি ঢিলা-ঢালা ছিল বলিয়া। একজন ভাল কর্ম্মচারী বুয়ার আমলে যতটা হিতকর কাজ করিতে পারিত, ইংরাজ আমলে তাহা করিতে পারিত না। ইংরাজের রাজকার্য্য-পদ্ধতি পুরাতন এবং বাঁধা-ধরা। উহার মধ্যে পড়িয়া কর্ম্মচারীদিগকে কলের মত কাজ করিয়া যাইতে হয়। তাহাদের কার্য্যের স্বাধীনতা, উত্তরোত্তর চাপ পড়িয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে থাকে। এই হেতু বৃটিশ পদ্ধতিতে যদি উদার নীতি অবলম্বিত হয়, তবে প্রজারা খুবই উদারতা ভোগ করিতে পারে, আবার অপরদিকে যদি ঐ নীতি অনুদার ও ক্লেশদায়ক হয়, তবে প্রজাদের ঘাড়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুদারতা ও ক্লেশের চাপ পড়ে। কিন্তু বুয়ার গণতন্ত্রের মত যে স্থানের শাসন-পদ্ধতি, সে স্থানে ইহার বিপরীত অবস্থাই ঘটে।

এখানে গবর্ণমেণ্টের নীতি যাহাই হোক্, উদারতা বা অনুদারতা কর্ম্মচারীর উপর অনেকটা নির্ভর করে। সেই জন্যই যখন বুয়ার শাসনের বদলে বৃটিশ শাসন-পদ্ধতি ট্রান্সভালে কার্য্যকরী হইল, তখন ভারতীয় বিরোধী সমস্ত আইনই দিনের পর দিন অধিক কঠোরতার সহিত প্রযুক্ত হইতে লাগিল। যেখানে যেখানে আইনের ফাঁক ছিল, তাহা যত্নসহকারে

বন্ধ করা হইল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এশিয়াটিক বিভাগের কার্য্য-পদ্ধতি কঠোর না হইয়া যায় না। সেই জন্য পুরাতন আইনগুলি রদ হওয়া এখন সম্ভাবনার বাহিরে চলিয়া গেল। এক্ষণে ভারতীয়দের কেবল ইহাই দেখার রহিল যে, কার্য্যতঃ ঐ সকল আইনের প্রয়োগে কঠোরতা কতটা কমানো যায়।

একটা নীতিবাদ লইয়া এইখানেই হোক্ বা পরেই হোক্, আলোচনা করিতে হইবেই। যদি এখন আলোচনা করি, তবে ভারতীয়দের দৃষ্টি-বিন্দু সহজে বুঝা যাইবে এবং ঘটনার অগ্রগতি পরবর্ত্তী কালে যে প্রকার হইয়াছিল তাহাও বুঝা যাইবে। ট্রান্সভাল ও ফ্রী-ষ্টেটে বৃটিশ রাজত্ব বসিবার পরেই লর্ড মিলনার একটা কমিটি গঠন করেন। তাহাতে বৃটিশ-পদ্ধতি-অনুমোদিত প্রজাদের স্বাধীনতার বিরোধী যে সকল আইনের বাধা নিষেধ ঐ দুই দেশের আইনে আছে, সেগুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করার কথা হয়। এই সংস্কার ভিতরে ভারতীয় বিরোধী বাধা নিষেধগুলিও স্বভাবতঃই পড়িতে পারিত। কিন্তু লর্ড মিলনারের ঐ কমিটি দ্বারা ইউরোপীয়দের অসুবিধা দূব করারই ইচ্ছা ছিল, ভারতীয়দের নহে। যে সকল আইন পরোক্ষভাবে ইংরাজদের পক্ষে ক্লেশকর ছিল, সেই সকল আইন শীঘ্র রদ করার জন্যই তিনি পথ খুঁজিতেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন এবং ছোট বড় অনেক আইন, যাহা দ্বারা ইংরাজদের স্বার্থের বিরোধিতা হইত, তাহা কলমের এক আঁচড়ে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

এই কমিটিই ভারতীয় বিরোধী আইনগুলির একটা তালিকা করেন। এই আইনগুলি সহজ-ব্যবহার-যোগ্য ম্যানুয়াল আকারে প্রকাশিত হয় এবং ইহার সদ্ব্যবহার—আমাদের দৃষ্টিতে অসদ্ব্যবহার—এশিয়াটিক বিভাগ করিতে থাকেন।

ভারতীয় বিরোধী যে সকল আইন ছিল, সেগুলিতে যদি ভারতীয়দের নাম করিয়া তাহাদের উপরই প্রযোজ্য হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ না থাকিত, যদি তাহার ভিতরে ভারতীয়, ইউরোপীয় সকলেই পড়িবে এইরূপ নির্দ্দেশ থাকিত, তবে যিনি প্রয়োগ করিবেন তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঐ আইন ভারতীয়দের প্রতি কঠোরভাবে প্রযুক্ত হইতে পারিত। তাহাতে শাসকদের অভিপ্রায় পূর্ণ হইলেও এই সকল আইনকে সাধারণ আইন বলা যাইত। এই আইনের প্রবর্ত্তনে কেহই অপমানিত বোধ করিত না। অবশেষে যখন কালক্রমে বর্ত্তমান তিক্ত সম্পর্ক কাটিয়া যাইত, তখন আর আইন পরিবর্ত্তিত না হইলেও চলিত, কেবল উহার উদার প্রয়োগ দ্বারাই নির্য্যাতিত সম্প্রদায়ের নির্য্যাতন দূর হইত। এই আইনগুলিকে যেমন সাধারণ আইন বলা যায়, ইহার বিপরীত আইনকে তেমনি অসাধারণ বা বিশেষ জাতিভেদমূলক আইন বলা যায়। উহা দ্বারা একটা বর্ণ-বাধা সৃষ্টি করা হয়, কেননা এগুলিতে প্রজার রং দেখিয়াই, ভারতীয়দের সম্মুখে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা অধিক বাধা স্থাপিত করা হয়।

যে সকল আইন প্রচলিত ছিল তাহার একটা লওয়া যাক্। পাঠকের স্মরণ আছে যে, নাতালে যে প্রথম ভোটাধিকার প্রত্যাহারকারী আইন হইয়াছিল এবং যাহা পরে বিলাতের সরকার পাস করার অনুমতি দেন নাই, তাহাতে এশিয়াবাসীদের এশিয়াবাসী বলিয়াই ভোটাধিকার হরণ করা হইয়াছিল। এক্ষণে এই প্রকারের আইনের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে জন-মত এমনভাবে গঠিত হওয়া চাই যে, অধিকাংশ লোক এশিয়াবাসীদের বিরোধী না হইয়া সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়। একবার যদি রং-এর বাধা সৃষ্ট হয়, তবে এই প্রকার প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা দূর হইতে পারে না। জাতিগত বা শ্রেণীগত ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত

আইনের ইহা একটা দৃষ্টান্ত। নাতালে ঐ আইন প্রত্যাহার করিয়া আর একটা আইন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অথচ তাহার ধারণা ছিল সাধারণ আইনের মত। উহা হইতে জাতি-ভেদের শূলটা দূর করিয়া ফেলা হইয়াছিল। উহার একটা দফার মর্ম্মার্থ এই প্রকার—"যে ব্যক্তি এমন দেশবাসী যে, সেখানে পার্লামেণ্টারী ফ্রাঞ্চাইজ, অর্থাৎ বৃটিশ পার্লামেণ্টের অনুরূপ মতাধিকারযুক্ত নির্ব্বাচন-মূলক পরিষদের শাসনাধিকার নাই, সে সকল দেশবাসীর নাম নাতালের ভোটারের তালিকাভুক্ত হইতে পারিবে না।" এখানে ভারতবাসী অথবা এশিয়াবাসী একথার উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষে নির্ব্বাচন-মূলক শাসন প্রতিষ্ঠান আছে কি নাই, ইহা লইয়া উকীলেরা মতভেদ করিতে পারেন। কিন্তু যদি ধরা যায় যে, ১৮৯৪ সালে অথবা আজও ভারতবর্ষে নির্ব্বাচন-মূলক শাসনাধিকার নাই, তাহা হইলেও যদি নাতালের ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকারী কর্ম্মচারী কোনও ভারতীয়ের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি একটা বে-আইনী কাজ করিয়াছেন, একথা কেহ চট করিয়া বলিতে পারে না। প্রজার স্বত্বাধি-কারের অনুকূল ধারণাই সাধারণতঃ করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে সেই দেশের সরকার ইচ্ছাপূর্ব্বক ভারতীয় বিরোধী না হইলে ঐ আইন থাকা সত্ত্বেও ভোটারের তালিকায় ভারতীয়দের নাম থাকায় কিছুই বাধে না। অর্থাৎ ভারতীয়দের প্রতি বিরুদ্ধভাব যদি কমিয়া যায়, যদি স্থানীয় সরকার ভারতীয়দের হানি করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে ঐ আইনের কিছু পরিবর্ত্তন না করিয়াও ভারতীয়দিগকে ভোটাধিকার দিতে পারেন। সাধারণ আইনের এই একটা সুবিধা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য কতকগুলি আইন হইতেও এই প্রকারের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বের অধ্যায় সমূহে এই প্রকারের আইনের উল্লেখ করা

হইয়া গিয়াছে। জাতি বা বর্ণভেদ সূচক আইন যত না করা যায় ততই ভাল, একেবারে না করাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। একটা আইন একবার হইয়া গেলে তাহার প্রত্যাহার করা কঠিন। দেশের জন-মত যখন সুস্পষ্ট হয়, তখনই আইন পরিবর্ত্তন বা রদ করা সম্ভবপর হয়। যে শাসন-পদ্ধতিতে আইন চট্ করিয়া প্রবর্ত্তন বা প্রত্যাহার করা হয়, সে সরকার স্থায়ী অথবা সুগঠিত—একথা বলা যায় না।

ট্রান্সভালে এশিয়াবাসীর বিরোধী আইন দ্বারা যে বিষয়ের উদ্ভব হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহা ভাল বুঝিতে পারিব। ঐ সমস্ত আইনই জাতিভেদ-মূলক ছিল। এশিয়াবাসীরা এশিয়াবাসী বলিয়াই ভোট দিতে পারিবে না, অথবা সরকার তাহাদের জন্য যে 'লোকেসন' বা বস্তিপাড়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহার বাহিরে জমি কিনিতে পারিবে না—যতক্ষণ ঐ আইনটা অপসৃত না হয় ততক্ষণ শাসকের কিছুই করিবার হাত নাই। লর্ড মিলনারের কমিটি যে সকল আইন সাধারণ নহে তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন। যদি এই সকল আইন সাধারণ আইন হইত তাহা হইলে, সেই সমস্ত সাধারণ আইন যাহা কেবল এশিয়াবাসীদের প্রতি বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইত, অন্যান্য আইনের সহিত রদ হইয়া যাইত। আর তাহা হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা একথা বলিতে পারিতেন না যে, তাঁহারা নিরুপায় এবং ঐ সকল আইন যে পর্য্যন্ত না প্রত্যাহৃত হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রয়োগ না করিয়া উপায় নাই।

যখন আইনগুলি এশিয়াটিক বিভাগের হাতে পড়িল, তখন তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত তাহা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আর যদি এই সকল আইন কার্য্যতঃ প্রয়োগ করার যোগ্যই হয়, তবে সরকারের আরও ক্ষমতা হাতে লইয়া ঐ আইন সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিতে যে সকল ছিদ্র আছে তাহাও বন্ধ করিতে হয়। তাঁহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। হয়ত ঐ সকল ছিদ্র

ইচ্ছা করিয়াই এশিয়াটিকদের সুবিধার জন্য রাখা হইয়াছিল, হয়তো বা ভুলেই রাখা হইয়াছিল। আইনগুলি যদি খারাপ হয়, তবে সেক্ষেত্রে আইন রদ করা আবশ্যক, আর আইনগুলি যদি ভাল হয়, সেক্ষেত্রে উহা প্রয়োগ করিতে যে সকল ছিদ্র আছে তাহা বন্ধ করিতে হয়। মন্ত্রীরা আইনগুলি কাজে লাগাইবার পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয়েরা ইংরাজের সহিত গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের বিপদ ভাগ করিয়া লইয়াছিল। তবে সেকথা এখন তিন চারি বৎসরের পুরাণো হইয়া গিয়াছে। প্রিটোরিয়ার ব্রিটিশ এজেণ্ট ভারতীয়দের পক্ষ লইয়া সরকারের বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন, কিন্তু সে পুরোণো দিনের কথা। ভারতীয়দের অভিযোগ যুদ্ধের একটা স্বীকৃত কারণ বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল; কিন্তু সে বিজ্ঞপ্তি সেই সকল অল্প-দৃষ্টি রাজনৈতিকেরাই করিয়াছিলেন, যাহাদের স্থানীয় অবস্থার বিষয় কিছুই জানা ছিল না। স্থানীয় কর্ম্মচারীরা সাফ সাফ বলিতে লাগিলেন যে, পূর্ব্বতন ট্রান্সভাল সরকার যে এশিয়াটিক বিরোধী আইন সমূহ করিয়া-ছিলেন, তাহা যথেষ্ট কড়া নহে এবং সুশৃঙ্খলিতও নহে। যদি ভারতীয়েরা যখন ইচ্ছা ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে পারে এবং যেখানে খুসী ব্যবসা করিতে পারে, তবে বৃটিশ বেপারীদের সমূহ ক্ষতি হইবে। এই সকল এবং এই ধরণের অন্যান্য যুক্তি ইউরোপীয়দিগের নিকট এবং তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ সরকারের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাহারা সকলেই অল্পতম সময়ের মধ্যে অধিকতম অর্থ সঞ্চয় করিতে চায়। যদি ভারতীয়দিগকে ইহার অংশীদার করিতে হয়, তবে কি করিয়া চলে? রাজনৈতিক আবশ্যকতাকে শঠতার সহিত যুক্ত করিয়া একটা চলনসহি মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বুদ্ধিমান ইংরাজদের নিকট স্বার্থ-সাধক এবং ব্যবসাদারী যুক্তি গ্রাহ্য হইত না। মনুষ্য-বুদ্ধি মিথ্যা যুক্তি রচনা করিয়া অন্যায় সমর্থন করিতে আনন্দ পাইয়া থাকে এবং দক্ষিণ

আফ্রিকার ইউরোপীয়েরা এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ছিলেন না। *জেনারেল স্মাটস্ এবং অন্য ইউরোপীয়েরা নিম্নের যুক্তি ব্যবহার* করিতেন।

"দক্ষিণ আফ্রিকা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিভূ এবং ভারতবর্ষ হইতেছে প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্র। আজ কালকার মনিষীগণ বলেন যে, এই দুই সভ্যতা একত্র চলিতে পারে না। যদি এই দুই সভ্যতার আদর্শে পরিচালিত ব্যক্তিরা ছোট ছোট দলেও একত্রিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে একটা কাটাকাটি না হইয়া যায় না। পশ্চিম দেশ হইতেছে সাদাসিধা ভাবের বিরোধী, আর পূর্ব্বদেশ সাদাসিধা ভাবকেই প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিষ মনে করে। এই দুই বিরুদ্ধভাব কেমন করিয়া এক হইয়া যাইতে পারে? রাজনৈতিকেরা ব্যবহার-কুশল ব্যক্তি। কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ তাহার মূল্য নির্দ্দেশ করা তাঁহাদের কাজ নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভাল হইতে পারে, নাও হইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয়েরা ঐ সভ্যতাই ধরিয়া থাকিতে চায়। এই সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাহারা অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ইহারই জন্য তাহারা নদীর স্রোতের ন্যায় রক্ত স্রোত বহিতে দিয়াছে। এই সভ্যতা রক্ষা কল্পে তাহারা অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছে। সেই জন্য আজ তাহাদের একটা নূতন পথ খুঁজিয়া লওয়ার সময় নয়। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয়দের সম্বন্ধে প্রশ্ন, জাতিগত বিদ্বেষ অথবা ব্যবসায়ে বিদ্বেষ—একথা বলা যায় না। এখানে প্রশ্ন হইতেছে, নিজেদের সভ্যতা বজায় রাখার, অর্থাৎ আত্মরক্ষার চরম কর্ত্তব্য সম্পাদন করা এবং তদনুরূপ কর্ম্ম করিয়া যাওয়া। কোনও কোনও বক্তা ভারতীয়দের দোষ দেখাইয়া দিয়া ইউরোপীয়দিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে চাহেন, কিন্তু রাজনৈতিকেরা একথা বিশ্বাস করেন ও বলিয়া থাকেন যে, ভারতীয়দের যাহা গুণ, দক্ষিণ

আফ্রিকায় তাহাই অপগুণ বলিয়া গণ্য। ভারতীয়েরা তাঁহাদের সাদাসিধা চলন, তাঁহাদের ধৈর্য্য, তাঁহাদের একনিষ্ঠা এবং পরমার্থ ব্রতের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় অপ্রীতিভাজন হন। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা উৎসাহী, অধীর, অভাব বাড়াইতে এবং অভাব মিটাইতে রত, আমোদ আহ্লাদ ভালবাসেন, এবং কায়িকশ্রম না করিতে ও ব্যয়-বাহুল্য করিতে ভালবাসেন। সেই জন্য তাঁহারা ভয় পান যে, যদি হাজার হাজার পূর্ব্ব-দেশীয়েরা আসিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য-দেশীয়দিগকে স্থান ছাড়িয়া যাইতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়েরা আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত নহেন এবং তাঁহাদের নেতারা তাঁহাদিগকে সেই অবস্থায় লইয়া ফেলিতে ইচ্ছুক নহেন।"

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে খুব চরিত্রবান লোকেরা যাহা বলিয়া থাকেন, আমার মনে হয় তাহাই আমি নিরপেক্ষভাবে সন্নিবেশিত করিতে পারিয়াছি। আমি তাঁহাদের যুক্তি মিথ্যা দার্শনিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তিগুলি অহেতুক নহে। কার্য্যতঃ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে অর্থাৎ সাময়িক স্বার্থের দৃষ্টিতে দেখিলে এই যুক্তির মধ্যে যথেষ্ট জোর রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখিলে উহা শুদ্ধ প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কোনও নিষ্পক্ষপাত ব্যক্তি এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং এই সকল যুক্তির সমর্থকেরা তাঁহাদের সভ্যতাকে যত দুর্ব্বল ও অসহায় বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, কোনও সংস্কারক তাঁহার রক্ষণীয় সভ্যতা যে এই অবস্থায় আছে, তাহা মানিয়া লইবেন না। যতদূর আমি জানি, কোনও প্রাচ্য দার্শনিক এ ভয় করেন না যে, যদি পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা প্রাচ্য দেশের লোকের সহিত অবাধে মিশে, তাহা হইলে প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত-প্রবাহে বালির মত ভাসিয়া

চলিয়া যাইবে। আমি প্রাচ্য চিন্তাধারা যতটা গ্রহণ করিতে পারি তাহাতে বুঝি যে, প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্যের সহিত নিকট-সংযোগকে ভয় ত করেই না, বরঞ্চ সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে। যদি ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে, তথাপি তাহাতে আমার সিদ্ধান্ত বদলায় না। কেন না ইহার সমর্থনকারী অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সে যাহাই হোক্, পাশ্চাত্য দেশের ভাবুকেরা মনে করেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিই হইতেছে 'জোর যাহার মুল্লুক তাহার' অর্থাৎ পশুবলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল—এই নীতির উপর। সেই জন্য এই সভ্যতার রক্ষকেরা পশুবল প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় করিয়া থাকেন। এই সভ্যতার দার্শনিকেরা একথা বলেন যে, যে জাতি নিজেদের অভাব বাড়ায় না, সে জাতি অবশেষে লোপ পাইয়া যায়। এই নীতি অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য জাতি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসিয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক সংখ্যক নিগ্রোদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। গরীব ভারতীয়দিগকে আবার তাহাদের ভয় কি? ভারতীয়দিগকে যে ইউরোপীয়েরা ভয় করে না তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই যে, যদি ভারতীয়েরা কেবল মজুর হইয়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন উপস্থিত হইত না।

এখন বাকি রহিল কেবল ব্যবসা ও বর্ণ সম্বন্ধে কথা। হাজার হাজার ইউরোপীয় একথা লিখিয়াছেন যে, ভারতীয়দের ব্যবসার জন্য ছোট ছোট ইংরাজ বেপারীর অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠিয়াছে এবং কালো রং-এর লোকদের বিরুদ্ধে একটা অসদ্ভাব ইউরোপীয়দের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। এমন কি আমেরিকার যুক্তপ্রদেশেও, (ইউনাইটেড ষ্টেটস্) যেখানে জন-সাধারণের আইনতঃ সমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে সেদিনও মিঃ বুকার, টি, ওয়াসিংটনের মত লোককে প্রেসিডেণ্ট

রুজভেল্টের দরবারে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। মিঃ বুকার ওয়াসিংটন সর্ব্বোচ্চ পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছেন, তিনি একজন অতিশয় চরিত্রবান খ্রীষ্টান এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। সেদিনও ইহা হইয়া গিয়াছে, আর আজও হয়ত তাঁহাকে দরবারে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। ইউনাইটেড ষ্টেটসের নিগ্রোরা পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা খৃষ্টান হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের চামড়ার কালো রং হইতেছে তাহাদের অপরাধ। আর যদি আমেরিকার উত্তর প্রদেশে তাহারা লাঞ্ছিত হয়, তবে দক্ষিণ প্রদেশের গোরারা তাহাদের অপরাধের আভাস মাত্রের অছিলায় তাহাদিগকে জীবন্ত পোড়াইয়া মারে। দক্ষিণ আমেরিকায় এই দণ্ডনীতির বিশেষ নাম পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। উহা আজ ইংরাজী ভাষায় প্রচলিত একটা শব্দ হইয়া গিয়াছে। এই শব্দটি "লিঞ্চ ল"। "লিঞ্চ-ল" মানে আগে সাজা দিয়া পরে অনুসন্ধান করার দণ্ডনীতি। লিঞ্চ নামধেয় যে ব্যক্তি প্রথম নিগ্রোদিগকে বশ করিয়াছিল, তাহারই নামানুসারে এই নামকরণ হইয়াছে।

পাঠক ইহা হইতেই বুঝিবেন যে, উল্লিখিত দার্শনিক তত্ত্বের ভিতর বিশেষ কোনও তত্ত্ব নাই। পাঠকেরা একথাও যেন না মনে করেন যে, সকলেই ঐ সকল যুক্তি মিথ্যা জানিয়াও উহা অবলম্বন করিয়া থাকেন। অনেকে আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের যুক্তি দার্শনিক তত্ত্ব-সম্মত। এমনও হইতে পারে যে, যদি আমরা এই অবস্থায় পড়িতাম তবে, হয়ত আমরাও এই যুক্তি অবলম্বন করিতাম। এই প্রকার কারণ হইতেই "বুদ্ধিকর্ম্মানুসারিণী' এইরূপ বাক্যের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা কে না দেখিয়াছেন যে, আমরা আমাদের আন্তরিক বৃত্তি অনুযায়ী যুক্তি করিয়া থাকি? আর যদি আমাদের যুক্তি অপরে স্বীকার না করে,

তবে আমরা অসন্তুষ্ট, অধীর এবং এমন কি রুষ্ট পর্য্যন্ত হইয়া থাকি।

এত সূক্ষ্মভাবে এই প্রশ্ন আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আলোচনা করিতেছি। আমি ইচ্ছা করি যে, পাঠকেরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি বুঝিতে শিক্ষা করেন এবং যদি এ পর্য্যন্ত তাহা না করিয়া থাকেন, তবে অন্যের দৃষ্টিকে সম্মান করিতে ও বুঝিতে যেন অভ্যাস করেন। সত্যাগ্রহের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে, বিশেষ করিয়া সত্যাগ্রহ-নীতি প্রয়োগ করিতে হইলে এই প্রকার উদারতা ও সহনশক্তির খুবই আবশ্যক। ইহা না হইলে সত্যাগ্রহ হইতেই পারে না। আমি কেবল লেখার জন্যই এই বই লিখিতেছি না। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের একটা দিক দেখানোও আমার অভিপ্রায় নহে। যে জন্য আমি বাঁচিয়া আছি, বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি, আর যে জন্য তেমনিভাবে মরার নিমিত্ত প্রস্তুত আছি, সেই জিনিষ কি করিয়া উৎপন্ন হইল, তাহার প্রাথমিক সমুদয় প্রয়োগ কি করিয়া করা হইয়াছিল, এই সকল কথা যাহাতে জন-সাধারণ জানে, বুঝে ও যদি পছন্দ করে তবে যাহাতে নিজের শক্তি অনুযায়ী উহা ব্যবহার করে সেই জন্য আমি এই বহি লিখিতেছি।

এক্ষণে আমাদের পূর্ব্বের কথায় ফিরিয়া আসিতেছি। আপনারা দেখিয়াছেন যে, বৃটিশ স্বত্বাধিকারীরা এই প্রকার স্থির করিয়াছিলেন যে, ট্রান্সভালে নূতন ভারতীয়ের প্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে এবং পুরানো যাহারা আছে তাহাদের অবস্থা এমন কঠিন করিয়া তোলা হইবে যে, তাহারা বাধ্য হইয়া ভয়েই ট্রান্সভাল ছাড়িয়া যায়। আর যদি না যায়, তবে প্রায় মজুরের মত হইয়াই যেন থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক মহামহা রাজপুরুষ একাধিকবার একথা বলিয়াছেন যে, ভারতীয়দিগকে এখানে কেবল জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজের জন্য চাকর

করিয়া রাখাই পোষায়। এশিয়াটিক বিভাগে মিঃ লিওনেল কার্টিস ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ছিলেন এবং ভারতে ডায়ার্কি বা বিভক্ত-দায়িত্ব-মূলক শাসন সংস্কারের প্রচারক রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি তখন—১৯০৫।৬ সালে কেবল যুবক। ইনি লর্ড মিলনারের বিশ্বাস-ভাজন ছিলেন। ইনি সমস্ত কার্য্যই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ করিতে চাহিতেন। তবে ইঁহার দ্বারা মহাভুলও সংঘটিত হইত। ইঁহার একটা ভুলের জন্য জোহানেস্‌বর্গ মিউনিসিপালিটির ১৪০,০০০ পাউণ্ড একবার জলে ফেলা হয়। ইনি বুদ্ধি বাহির করিলেন যে, যদি ট্রান্সভালে নূতন ভারতীয় আসা বন্ধ করিতে হয়, তবে পুরানো যাহারা আছে তাহাদের সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করা দরকার যে, একের পরিবর্ত্তে অপর কেহই প্রবেশ করিতে না পারে এবং যদি প্রবেশ করে তবে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। ইংরাজ অধিকারের পরে যাহাকেই পাস দেওয়া হইত, তাহার পাশে স্বাক্ষর থাকিত এবং লিখিতে না জানিলে আঙ্গুলের ছাপ লওয়া হইত। কোনও আমলা প্রস্তাব করিলেন যে, ফটোগ্রাফ দেওয়া চাই। এবং ইহার পর ফটোগ্রাফ, স্বাক্ষর ও টিপসহি এই তিনের তিনই লওয়া হইতে লাগিল। ইহার জন্য কোন আইন করার আবশ্যক ছিল না। সেইজন্য নেতারাও শীঘ্র ইহার খবর পান নাই। ধীরে ধীরে এই নূতন প্রথার বিষয় তাঁহারা জানিতে পারিলেন। তখন সরকারের কাছে আবেদন গেল, ডেপুটেশন গেল। কর্ত্তারা উত্তর দিলেন যে, যখন ইচ্ছা তখন, যে ইচ্ছা সে যে প্রবেশ করিবে, ইহা পোষায় না। সেই জন্য সকল ভারতীয়কে একই রকম পাস লইতে হইবে। তাহার ভিতরে এমন সকল বিবরণ থাকিবে যে, যাহার পাস সে ছাড়া আর কেহ না প্রবেশ করিতে পারে। আমার এবিষয়ে এই মত ছিল যে, আমরা

এই প্রকার পাস রাখিতে বাধ্য নহি, কেবল যতদিন "শান্তিরক্ষার অর্ডিনান্স" বলবৎ থাকিবে, ততদিনই সরকার উহা রাখিতে বলিতে পারেন। ভারতবর্ষে যেমন 'ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া' বা ভারতরক্ষা আইন হইয়াছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায় 'শান্তিরক্ষা' আইনও তাহাই। ভারতবর্ষে যেমন লোককে উৎপীড়ন করার জন্যই আবশ্যক উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ঐ আইন রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তেমনি ভারতীয়দিগকে উৎপীড়িত করার জন্যই ঐ আইন, প্রয়োজন অতীত হওয়ার অনেক পরেও খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল। একথা বলা যায় যে, গোরাদের উপর সাধারণতঃ এই আইন আদৌ প্রযুক্ত হইত না। পাস যদি লইতে হয়, তবে অবশ্য রক্ষকের পরিচয়ের কোনও চিহ্ন থাকা চাই। সেই জন্য যে স্বাক্ষর না করিতে পারে তাহার টিপসহি লওয়া ঠিক। পুলিশের কর্ত্তারা ইহা স্বীকার করেন যে, কোনও দুইজনের আঙ্গুলের রেখা একরকম হয় না। এই টিপের রেখার সংখ্যা ও স্বরূপ তাঁহারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন এবং দুইটা টিপসহি দেখিয়া তাঁহারা দুই এক মিনিটের মধ্যেই বলিতে পারেন যে, টিপের দাগ দুইটা একই ব্যক্তির, অথবা বিভিন্ন ব্যক্তির। ফটোগ্রাফ দেওয়া হয় ইহা আমার আদৌ পছন্দ হয় নাই। মুসলমানদের দৃষ্টিতে ইহাতে ধর্ম্মের হানি পর্য্যন্ত ঘটে।

এই সকল কথাবার্ত্তার পরিণাম এই হয় যে, পুরাতন ভারতীয়েরা তাহাদের পাস ফিরাইয়া দিয়া বদলাইয়া নূতন করিয়া লইবে এবং যাহারা নূতন আসিবে তাহাদিগকে নূতন ফরমেই লইতে হইবে। যদিও আইনতঃ ভারতীয়েরা এইরূপ করিতে বাধ্য ছিল না, তথাপি আবার নূতন কিছু বাঁধাবাঁধি পাছে হয়, এই আশঙ্কায় তাহারা এই পর্য্যন্ত করা মানিয়া লইয়াছিল। তাহাছাড়া তাহারা ইহাও আশা করিয়াছিল যে,

যাহারা নূতন আসিবে তাহাদিগকে শান্তিরক্ষার আইনের কবলে ফেলিয়া আর কষ্ট দেওয়া হইবে না। একথা বলা যায় যে, প্রায় সকল ভারতীয়ই এই নূতন ধরণের পাস লইয়াছিল। ইহা বড় যেমন তেমন কথা নয়। যে কার্য্য করিতে সম্প্রদায় আদৌ আইনতঃ বাধ্য নয়, তাহা একসঙ্গে, অতিশীঘ্র সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে সম্প্রদায়ের সত্য-পরায়ণতা, কুশলতা, উদারতা, ব্যবহারিক বুদ্ধি ও নম্রতার পরিচয় ছিল। এই কার্য্য দ্বারা সম্প্রদায় একথাও প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে, এখানকার কোনও আইনের, কোনও ব্যবস্থার লঙ্ঘন করার কোন ইচ্ছা তাহাদের নাই। ভারতীয়েরা ইহাই ভাবিয়াছিল যে, যে সম্প্রদায় সরকারের সহিত এমন সসম্মান ব্যবহার করিয়াছিল, বিচারশক্তি দেখাইয়াছিল, সরকার সে সম্প্রদায়ের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন এবং সম্প্রদায়কে নূতন অধিকার অর্পণ করিবেন। ট্রান্সভালের বৃটিশ সরকার এই বিবেকোচিত ও উদারতার কার্য্যের প্রতিদান কি করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখিব।

একাদশ অধ্যায়

উদারতার পুরস্কার—ঘাতকী আইন

পাশগুলির যখন রদ ও বদল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন ১৯০৬ সাল চলিতেছে। আমি ১৯০৩ সালে ট্রান্সভালে পুনঃ প্রবেশ করি। সেই বৎসরের প্রায় মধ্যভাগে আমি জোহানেসবর্গে আফিস খুলি। এই দুই বৎসর কেবল এসিয়াটিক বিভাগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেই কাটিয়া গেল। আমরা সকলেই একথা ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, পাশের একটা কিনারা হওয়ায় সরকারের সম্পূর্ণ সন্তোষ হইয়াছে, এবং সম্প্রদায়ও এখন কতকটা শান্তি পাইবে। কিন্তু সম্প্রদায়ের কপালে শান্তি ভোগ লেখা ছিল না। মিঃ লিওনেল কার্টিসের পরিচয় আমি গত অধ্যায়ে দিয়াছি। তিনি মনে করিলেন যে, ভারতীয় সম্প্রদায় নূতন পাশ লওয়াতেই ইউরোপীয়দের স্বার্থ সিদ্ধ হইল না। পরস্পর বোঝাপড়া করিয়া যদি কোনও মহান্ ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহা ইঁহার চক্ষে যথেষ্ট নয়। এই প্রকার কার্য্যের পশ্চাতে আইনের বল থাকিলেই তবে তাহা শোভা পায় এবং তাহা হইলে তাহার অন্তঃস্থ নীতি চিরকালের জন্য কায়েম থাকে—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। মিঃ কার্টিসের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তিনি ভারতীয়দিগকে হাতের মুঠার ভিতর রাখার মত এমন কিছু একটা ব্যবস্থা করিবেন, যাহার প্রভাব সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ছাপাইয়া যায় এবং অন্য উপনিবেশগুলির উপরেও পড়ে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় কোথায় কোনও ফাঁক থাকে, ততক্ষণ ট্রান্সভাল সুরক্ষিত হইতেছে না। তাঁহার দৃষ্টি অনুসারে সরকার ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে

ঐ শান্তিময় সম্পর্ক দ্বারা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাই বাড়িয়া যায় । মিঃ কার্টিসের ইচ্ছা ছিল ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠা বাড়ানো নয়, উহা কমানো। এই কার্য্যে ভারতীয়দের সম্মতির আবশ্যক ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, বাহির হইতে সম্প্রদায়ের উপর চাপ দেওয়ার মত এমন আইন করিবেন যে, তাহার দাপটে ভারতীয় সম্প্রদায় থরহরি কাঁপিবে। সেইজন্য তিনি একটা "এশিয়াটিক আইনের" মুসাবিদা খাড়া করিলেন। তিনি সরকারকে একথা বুঝাইলেন যে, যে পর্য্যন্ত এই প্রকার আইন না হয়, সে পর্য্যন্ত ভারতীয়েরা লুকাইয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিবেই। আর যদি একবার ঢুকিয়া পড়ে, তবে প্রচলিত আইনের সাহায্যে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ারও কোনও ব্যবস্থা নাই। মিঃ কার্টিসের যুক্তি এবং তাঁহার আইনের মুসাবিদা সরকারের পছন্দ হইল এবং ঐ মুসাবিদা অনুযায়ী আইন করিবার জন্য উহা "বিল" আকারে ট্রান্সভালের আইন পরিষদে উপস্থিত করার নিমিত্ত তাঁহারা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিলেন।

এই আইনের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করার পূর্ব্বে, গোটাকতক প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া লওয়া দরকার। আমিই সত্যাগ্রহের প্রবর্ত্তক বলিয়া আমার অবস্থা পাঠকের ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। ট্রান্সভালে যখন ভারতীয়দের উপর এই প্রকার নূতন চাপ দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছিল, সেই সময়ে নাতালে জুলু বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই কলহটাকে বিদ্রোহ বলা যায় কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল, আজও সন্দেহ আছে। তাহা হইলেও এই ব্যাপারটা নাতালে সাধারণতঃ বিদ্রোহ নামেই পরিচিত। এবারও নাতালের অনেক গোরা, স্বেচ্ছাসেবক-রূপে বিদ্রোহ শান্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন। আমি নিজেকে নাতাল-বাসী বলিয়াই গণ্য করিতাম। আমার সেইজন্য মনে হইল যে, আমারও এইজন্য সেবা দেওয়া সঙ্গত। তাই সম্প্রদায়ের অনুমতি লইয়া আমি

আহতদিগকে শুশ্রূষা করার জন্য একটা দল গঠন করিতে চাই বলিয়া সরকারকে জানাইলাম। সরকার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। তখন আমি ট্রান্সভালের বাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। নাতালের যে ক্ষেত্রে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান' ছাপা হইত, যেখানে আমার সহকর্মীরা থাকিতেন, সেইখানে ছেলেপিলেদিগকে আনিয়া রাখিলাম। অফিস চলিতে থাকিল। আমি জানিতাম, এই সেবাকার্য্যে আমার দীর্ঘকাল থাকা আবশ্যক হইবে না।

আমি ২০।২৫ জনের একটা ছোট দল সংগঠিত করিয়া ফৌজের সহিত যুদ্ধে গেলাম। এই ছোটদলের ভিতরও সকল প্রদেশের ভারতবাসীই ছিল। একমাস এই দলকে সেবা করিতে হয়। আমাদের হাতে এই কার্য্য পড়াটা ঈশ্বরের কৃপা বলিয়া সর্ব্বদা মানিয়া থাকি। আমি দেখিয়াছিলাম যে, যে সকল নিগ্রোর আমরা সেবা করিয়াছিলাম, তাহারা আমরা না গেলে অমনি পড়িয়া পড়িয়া ভুগিত। এই আহতদিগকে শুশ্রূষা করিতে কোনও গোরাই ইচ্ছুক ছিল না। যে ডাক্তারের অধীনে আমাদিগকে এই কাজ করিতে হইয়াছিল, তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। আহতদিগকে হাঁসপাতালে পঁহুছিয়া দেওয়ার পর তাহাদিগকে সেবা করা আমাদের কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু আমরা বুঝিয়া লইয়াছিলাম যে, যে কোন কার্য্যই আমাদিগকে দেওয়া হোক্ তাহাই আমাদের কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। সদাশয় ডাক্তার বলিলেন যে, তিনি গোরা শুশ্রূষাকারী পাইতেছেন না, কাহাকেও হুকুম করাইয়া কাজ করাইবার শক্তিও তাঁহার নাই। তবে আমরা যদি এই দয়ার কার্য্যের ভার লই, তবে তিনি উপকৃত হইবেন। আমরা সাদরে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। কতকগুলি নিগ্রোর পাঁচ ছয় দিন হইল ঘায়ে হাত দেওয়া হয় নাই, উহা পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। এই সকল কাজ আমাদের হাতে পড়ায় আমাদের খুব ভাল লাগিল।

জুলুরা আমাদিগের সহিত কথা বলিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিত না, কিন্তু তাহাদের ইসারা ও চক্ষু একথা বলিতেছিল যে, ভগবান আমাদিগকে তাহাদিগের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য আমাদিগকে কথনো কথনো দিনে চব্বিশ মাইল করিয়াও চলিতে হইত।

একমাসের মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। আমাদের সন্তোষ হইল। এই দলে তিনজন গুজরাটী ছিলেন। তাঁহারা সার্জ্জেণ্ট পদে কাজ করিতেন। তাঁহাদের নাম জানিলে গুজরাটীরা সুখী হইবেন। তাঁহাদের একজন উমিয়াশঙ্কর সেলট, অপর সুরেন্দ্র রায় মেড়, আর তৃতীয় হরিশঙ্কর যোশী। তিনজনের শরীরই খুব শক্ত ছিল। ইঁহারা খুব মেহনৎ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে একজন পাঠান ছিল, তাহার কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। তাহার সমান বোঝা আমরা সকলে বহন করিতে পারিতাম, কুচ করিয়াও সমান চলিয়া যাইতে পারিতাম, ইহাতে তাহার আশ্চর্য্যের শেষ ছিল না।

এই দলের কার্য্যের সম্পর্কেই দুইটা বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পরিপক্ক হইয়াছিল বলা যায়। এক হইতেছে এই যে, সেবা-ধর্ম্মকে যে ব্যক্তি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাহার ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই চাই, আর দ্বিতীয়তঃ সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিলে দারিদ্র্যও চিরকালের জন্যই বরণ করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলেই তাহার সেবাধর্ম্ম পালনে কথনও সঙ্কোচ বা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

যখন আমি এই দলে কাজ করিতেছিলাম তখনই, যেমন করিয়া পারি ট্রান্সভালে ফিরিয়া আসার জন্য পত্র ও তার আসিতে লাগিল। সেই জন্য ফিনিক্সে সকলের সহিত দেখা করিয়া আমি তথনই ট্রান্সভালে ফিরিয়া গেলাম। সেখানে গিয়া উপরে যে বিলের কথা লিখিয়াছি তাহা

পড়িলাম। যে গেজেটে এই বিল প্রকাশ হইয়াছিল, সেখানা আমি আফিস হইতে বাড়ী লইয়া গেলাম। বাড়ীর কাছেই একটা ছোট পাহাড়ের মত ছিল। একজন সাথীকে লইয়া সেখানে গিয়া বসিয়া 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' জন্য তরজমা করিয়া ফেলিলাম। যেমন যেমন আমি এই বিলের একটা করিয়া সর্ত্ত পড়িতেছিলাম, তেমন তেমন আমার কম্প আসিতেছিল। ইহার ভিতরে আমি ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। আমার বোধ হইল যে, যদি এই বিল পাস হইয়া যায় আর যদি ভারতীয়েরা উহা মানিয়া লয়, তবে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতীয়েরা ডালে মূলে উৎপাটিত হইবে। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা মরা-বাঁচার প্রশ্ন। আমার ইহাও বোধ হইল যে, এই বিষয়ে আবেদন নিবেদনে যদি কোনও ফল না হয়, তাহা হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা নয়। এই আইন স্বীকার করা অপেক্ষা মরাও ভাল। কিন্তু মরিব কেমন করিয়া? সম্প্রদায় এমন কি বিপদ এই আইনের জন্য ভোগ করিবে, অথবা ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হইবে যাহাতে, হয় জয়লাভ—নয় মৃত্যু, তৃতীয় আর কোনও পথ নাই? সম্মুখে যেন পর্ব্বত দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বোধ হইল, অগ্রসর হওয়ার কোনও রাস্তা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। যে আইন আমাকে এত বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছিল, পাঠকের জানা আবশ্যক যে তাহা কি। উহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিতেছি :—

ট্রান্সভালবাসী সকল ভারতীয় পুরুষ, স্ত্রী ও আটবৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক বালক বালিকাকে এশিয়াটিক বিভাগে গিয়া রেজেষ্ট্রী করিয়া পাস লইয়া আসিতে হইবে। এই পাশ লওয়ার সময় পুরাণো পাস ফেরৎ দিতে হইবে। দরখাস্তে নাম ধাম জাতি বয়স ইত্যাদি লিখিতে হইবে। যে আমলা দরখাস্ত লইবে, সে দরখাস্তকারীর দেহে প্রধান যে সকল পরিচয়

চিহ্ন আছে তাহা দেখিয়া লিখিয়া লইবে। দরখাস্তকারীর সকলগুলি আঙ্গুলেরই ছাপ লওয়া হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর যে স্ত্রী-পুরুষ এইভাবে রেজেষ্ট্রি না করাইবে, তাহার থাকিবার অধিকার লোপ পাইবে। দরখাস্ত না-করা আইন অনুযায়ী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার জন্য জেল দেওয়া যাইবে, অর্থদণ্ড করা যাইবে ও ট্রান্সভালের সীমার বাহিরে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া যাইবে। ছেলেপিলেদের জন্য মা-বাপ দরখাস্ত করিবে। তাহাদিগকে উপস্থিত করা ও নিশানী করাইয়া লওয়ার দায়িত্ব বাপ-মায়ের। যে সকল পিতা-মাতা এই প্রকার দরখাস্ত আদি কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিবে, তাহাদের সন্তানেরা ষোল বৎসর প্রাপ্ত হইলে নিজেরাই করিবে, যদি নিজেরা না করে তবে আইনের অনুযায়ী ঐ সকল দণ্ড পাইবে। যে পাস দেওয়া হইবে, তাহা যখন যেখানে পুলিশ দেখিতে চায় তখন সেইখানেই তাহা দেখাইতে হইবে। পাস না দেখানো অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোর্ট ইচ্ছামত জেল বা অর্থদণ্ড করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি রাস্তায় চলিতেছে তাহার নিকটও পাশ দেখিবার দাবি করা যাইতে পারিবে। পাস আছে কিনা দেখার জন্য আমলা লোকের বাড়ীতেও প্রবেশ করিতে পারিবে। ট্রান্সভালের বাহির হইতে কোন ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ যদি আসে, তবে তাহাদিগকে অনুসন্ধানকারী আমলার নিকট নিজেদের পাস দেখাইতে হইবে। যদি আদালতে কোনও মোকদ্দমা করিতে হয়, অথবা যদি টেক্স আফিসে কোনও টেক্স দিতে হয়, অথবা বাইসাইকেল রাখার লাইসেন্স চাওয়া হয়, তবে সে সময়েও কর্ম্মচারী পাস দেখিতে চাহিতে পারিবে। যদি কেহ কোনও সরকারী আফিসে কোনও কাজের জন্য যায়, তবে তাহার কোনও কথা শুনার পূর্ব্বে পাস দেখিতে চাহিতে পারা যাইবে। পাস দেখাইতে অস্বীকার করা অথবা আমলা যে সমস্ত

বিবরণ জানিতে চাহে তাহা দিতে অস্বীকার করা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার জন্যও কয়েদ ও অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

পৃথিবীর অন্য কোথাও স্বাধীন মানুষের জন্য এই প্রকার আইন আছে বলিয়া আমি জানি না। নাতালের 'গিরমিটিয়া' ভারতীয়দের পাসের সম্বন্ধে আইন খুব কঠিন বলিয়া আমি জানিতাম। কিন্তু সে বেচারিদিগকে ত স্বাধীন লোক বলা যায় না। তাহা হইলেও তাহাদের পাস সম্বন্ধে আইন, এই আইন অপেক্ষা সহজ বলা যাইতে পারে। এই আইন ভঙ্গ করার যে সাজা, তাহা নাতালের আইন ভঙ্গের সাজার সহিত তুলনাই করা যায় না। যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করিতেছে সে বেপারীও এই আইনের বলে নির্ব্বাসিত হইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশও এই আইন-ভঙ্গের জন্য হইতে পারে। ধৈর্য্যশালী পাঠক পরে দেখিবেন যে, এই আইন ভঙ্গ করার জন্য লোককে নির্ব্বাসিতও করা হইয়াছে। যাহারা স্বভাবতঃ অপরাধ করিয়া থাকে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য ভারতবর্ষে কতকগুলি কঠিন আইন আছে। এই আইন সেই সব আইনের সহিত সহজেই তুলনা করা যাইতে পারে এবং যদি দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশী কঠোর এই অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে এই আইন তাহা অপেক্ষা কোনও ক্রমেই খাটো নহে বলিয়া দেখা যাইবে। তারপর যেভাবে টিপসহি লওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাহা দক্ষিণ আফ্রিকাতেও নূতন। এই টিপসহি বিষয়ে সাহিত্য পড়িতে গিয়া দেখিলাম যে, মিঃ হেনরী নামে এক পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, কেবল অপরাধীর নিকট হইতেই এই প্রকার টিপসহি লওয়া হইয়া থাকে। সেই জন্য জবরদস্তী করিয়া দশ আঙ্গুলের টিপ লওয়া বড় ভয়ানক বলিয়া বোধ হইল।

স্ত্রীলোকদের ও ষোল বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বালিকাদের পাস লওয়ার প্রথা এই প্রথম প্রবর্ত্তন করা হইল।

পরদিনই আমি নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দিগকে একত্র করিয়া এই আইনটা অক্ষরে অক্ষরে বুঝাইয়া দিই। এই আইনের সর্ত্তগুলি পড়িয়া আমার যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাদেরও তাহাই হইল। একজন ত বলিয়া উঠিলেন "আমার স্ত্রীর নিকট যদি কেহ পাস দেখিতে আসে, তবে সেইখানেই তাহাকে সাবাড় করিব, তাহারপর আমার যাহা হওয়ার হইবে।" আমি তাহাকে শান্ত করিয়া সকলকে বলিলাম "এই বিষয়টা বড়ই গুরুতর। এই বিল যদি পাস হয়, আর যদি আমরা তাহা মানিয়া লই, তাহা হইলে সারা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ইহার অনুকরণ করা হইবে। আমার মনে হয় যে, আমাদিগের অস্তিত্ব লোপ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। এই আইনই শেষ নয়। আমাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দূর করিয়া দেওয়ার এই প্রথম ব্যবস্থা। সেই জন্য আমাদের দায়িত্ব কেবল ট্রান্সভালবাসী দশ-পনের হাজার ভারতীয়ের সম্পর্কে নহে, দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত ভারতীয়ের সম্বন্ধেই আমাদের দায়িত্ব রহিয়াছে। যদি এই আইনের সম্পূর্ণ মর্ম্ম আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে সারা ভারতবর্ষের সম্মান আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে দেখিতে পাইব। এই বিল হইতে কেবল আমাদেরই অপমান নহে, সমস্ত ভারতবর্ষেরই অপমান হইয়াছে বলা যায়। অপমান মানে—নির্দ্দোষ লোকের মান নাশ করা। আমরা যে এই আইনের যোগ্য একথা বলা যায় না। আমরা নির্দ্দোষ এবং একজন নির্দ্দোষ প্রজার অপমান সকল প্রজার অপমান বলিয়া গণ্য করা হয়। এই প্রকার গুরুতর বিষয়ে যদি আমরা তাড়াতাড়ি করি, যদি অধীর হই, যদি ক্রুদ্ধ হই, তাহা হইলে তাহাতেও এই অত্যাচার হইতে বাঁচোয়া নাই। কিন্তু যদি শান্তভাবে প্রতিকার অনুসন্ধান করিয়া

সময় মত প্রতিরোধ করি, সকলে একত্র হইয়া এই অপমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়া যে সকল দুঃখ হয় তাহা সহ্য করি, তবে আমি মনে করি, ঈশ্বর আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।” সকলেই বিলের গুরুত্ব বুঝিলেন। ইহাও স্থির হইল যে, এক সাধারণ সভা করিয়া তাহাতে কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পাশ করিয়া লইব। ইহুদীদিগের একটা নাট্যশালা ভাড়া লইয়া সেইখানে সভা করা স্থির হইল।

এখন পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, এই অধ্যায়ের শিরোনামায় “ঘাতকী আইন” কেন লিখিয়াছি। এই বিশেষণ এই অধ্যায়ের জন্য আমি সৃষ্টি করি নাই। সারা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই এই আইনকে এই বিশেষণে অভিহিত করা হইত।

দ্বাদশ অধ্যায়

সত্যাগ্রহের জন্ম

১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এই সভা হইল। ট্রান্সভালের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। কিন্তু, একথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, যে প্রস্তাব আমি উপস্থিত করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ অর্থ আমি নিজেই তখন জানি নাই, আর উহার কি পরিণাম হইবে তাহাও আমি এ সময়ে ঠিক ধরিতে পারি নাই। সভা হইল, থিয়েটার হলে আর লোক ধরে না। সকলেরই মুখে চোখে একই ভাব যে, একটা কিছু নূতন করিতে হইবে, একটা নূতন কিছু করিতে হইবে। ট্রান্সভালের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ আব্দুল গণি খুরশী সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ট্রান্সভালবাসী পুরাতন প্রধান স্থানীয় লোকদের মধ্যে ইনি একজন। 'মহম্মদ কাসিম কমরুদ্দীন' নামক ব্যবসায়ী ফার্ম্মের তিনি অংশীদার ছিলেন এবং উহার জোহানেসবর্গ শাখার ম্যানেজার ছিলেন। সভাতে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করার ছিল তাহা বাস্তবিক পক্ষে একটা মাত্র প্রস্তাবই ছিল। উহার মর্ম্ম এই ছিল,—সমস্ত প্রতিবাদ করার পরও যদি এই বিল পাশ হয় তাহা হইলেও ভারতীয়েরা তাহা মানিয়া লইবে না, আর মানিয়া না লওয়ার জন্য যে দুঃখই হোক্ তাহা সহ্য করিবে।

এই প্রস্তাব আমি সভায় ভাল করিয়া বুঝাইলাম। সকলে শান্ত ভাবে সে সকল কথা শুনিলেন। সভার কার্য্য হিন্দীতে বা গুজরাটী ভাষায় হওয়ায় কেহ না বুঝিতে পারে এমন ছিল না। যাহারা হিন্দী

ভাষা বুঝিত না, এমন তামিল ও তেলুগু-ভাষীদিগকে তাহাদের নিজ নিজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিয়মিত ভাবে প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হয়। সমর্থকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, শেঠ হাজি হবিব। ইনি ট্রান্সভালের খুব পুরাতন ও বহুদর্শী লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি অতিশয় আবেগময়ী বক্তৃতা করেন। তিনি আবেগের মুখে একথাও বলেন যে, আমরা যেন ঈশ্বর সাক্ষী করিয়াই এই প্রস্তাব গ্রহণ করি। আমরা যেন কখন কাপুরুষ না হই, কখনো যেন আইনের বশ্যতা স্বীকার না করি। নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা লইয়া তিনি বলেন যে, তিনি কদাপি এই আইন স্বীকার করিবেন না, এবং সমবেত সকলকে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা লইতে বলেন।

প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে গিয়া অপরেও তীব্র ও জোরালো বক্তৃতা দেন। যখন হাজি হবিব বলিতেছিলেন ও প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিতেছিলেন তখনই আমি চমকিয়া উঠিলাম ও সাবধান হইলাম। তখনই আমার নিজের ও সম্প্রদায়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল। আজ পর্য্যন্ত সম্প্রদায় অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং অধিকতর বিবেচনা করিয়া অথবা নূতন অবস্থায় তাহার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এমনও হইয়াছে যে, গৃহীত প্রস্তাব সকলে মানিয়া চলেন নাই। প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন, প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াও পরে অস্বীকার করা ইত্যাদি বস্তু সারা জগতেই জন-সাধারণের কার্য্যে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল প্রস্তাবে ঈশ্বরের নাম কেহ লয় না। বাস্তবিক সত্য দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে একটা সঙ্কল্প ও ঈশ্বরের নামে লওয়া প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। যদি কোনও বুদ্ধিমান লোক বিচার করিয়া কিছু সঙ্কল্প করে, তবে তাহা হইতে সে বিচ্যুত হইতে পারে না। তাহার কাছে তাহার সঙ্কল্পের

মূল্য ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করারই তুল্য। কিন্তু জগৎ কিছু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে চলে না। সাধারণ সঙ্কল্প ও ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞার মধ্যে সমুদ্রের মত একটা ব্যবধান রহিয়াছে। সাধারণ সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিতে লোকে লজ্জিত হয় না। কিন্তু, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে সে তাহা ভঙ্গ করিলে নিজেই লজ্জিত হয়, সমাজও তাহাকে পাপী বলিয়া গণ্য করে। এই বিষয়টা এতই গভীর ভাবে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে যে, আইন অনুসারেও প্রতিজ্ঞা করিয়া যে কথা বলা হয়, তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে প্রতিজ্ঞাকারীর অপরাধ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয় এবং তাঁহার কঠিন শাস্তি হয়।

প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে এই সমস্ত চিন্তা আমার তখন হইতেছিল, প্রতিজ্ঞার দ্বারা যে লাভ হয় তাহার আস্বাদ আমি নিজে লইয়াছি, আর সেই জন্য আমি উক্ত প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া ভীত হইয়া গেলাম। তাহার পরিণাম আমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই বুঝিয়া লইলাম। এই আশঙ্কা হইতেই আমার উত্তেজনা আসিল। এই সভায় যদিও আমি প্রতিজ্ঞা লইতে অথবা অপরকে প্রতিজ্ঞা লওয়াইতে আসি নাই, তথাপি শেঠ হাজি হবিবের প্রস্তাব খুব ভাল লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার একথাও মনে হইল যে, সকলকে এই প্রতিজ্ঞার পরিণামের কথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, প্রতিজ্ঞার অর্থ স্পষ্ট রূপে বুঝা চাই, এবং উহা বুঝিয়া যদি প্রতিজ্ঞা করিতে পারে বিলক্ষণ, আর যদি না পারে তবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, লোকে এখনো অন্তিম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এজন্য আমি সভাপতির নিকট অনুমতি লইলাম যে, শেঠ হাজি হবিবের বাক্যের রহস্য বুঝাইয়া দিতে চাই। আমি তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া দাঁড়াইলাম। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহার মর্ম্ম আজ যেমন মনে আছে তেমনি লিখিতেছি :—

"আমি এই সভাকে একথা বুঝাইতে চাই যে, এখানে এ পর্য্যন্ত আপনারা যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন ও যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত আজিকার প্রস্তাবের ও প্রস্তাব গ্রহণ করার রীতির পার্থক্য আছে। আজ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহার সম্পূর্ণ পালন করার উপর দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। আপনাদিগের নিকট ভাই সাহেব যে প্রস্তাব গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন, তাহা যেমন গুরুতর তেমনি নূতন। আমি নিজে এইভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে প্রস্তুত হইয়া সভায় আসিয়াছিলাম না। ইহার নূতনত্বের জন্য ধন্যবাদ তাঁহারই প্রাপ্য ও ইহার দায়িত্বের ভারও তাঁহারই উপর পড়ে। তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার কথা আমার কাছে খুব ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু যদি আপনারা এই ভাবেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার দায়িত্বেও আপনারা অংশীদার হইবেন। এই দায়িত্ব কি তাহা আপনাদের বুঝা চাই। সম্প্রদায়ের সেবক ও পরামর্শদাতা হিসাবে উহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

"আমরা সকলে একই ভগবানকে মানি। তাঁহাকে মুসলমান খোদা বলিয়া ডাকে, হিন্দু তাঁহাকে ঈশ্বর নামে ডাকিয়া থাকে, কিন্তু তিনি একই। তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া, তাঁহাকে মধ্যস্থ রাখিয়া আপনাদের প্রতিজ্ঞা লওয়া যে সে কথা নহে। যদি এই প্রকার প্রতিজ্ঞা লইয়া তাহা ভঙ্গ করি, তবে সম্প্রদায়ের নিকট, জগতের নিকট ও ঈশ্বরের নিকট আমরা অপরাধী হইব। আমার মত এই যে, যে ব্যক্তি বুঝিয়া শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করে, সে মনুষ্য নামের যোগ্য নহে। যেমন তামার পয়সায় পারা ঘসিলে তাহা টাকা হয় না, তাহার যেমন কোনও মূল্যই নাই, এবং এই মিথ্যা টাকার মালিক ধরা পড়িলে যেমন সাজার পাত্র

হয়, তেমনি মিথ্যা প্রতিজ্ঞা যে করে তাহার যে কেবল মূলাই থাকে না তাহা নহে, সে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সাজার পাত্র হয়। এই রকম প্রতিজ্ঞা লওয়ার কথা শেঠ হাজি হবিব বলিতেছেন। এই সভায় কোন ছেলেমানুষ বা অবোধ ব্যক্তি নাই। আপনারা সকলেই বয়স্থ, সংসার কি তাহা জানেন, আপনাদের অনেকে প্রতিনিধিও আছেন, অনেকেই ছোট বড় দায়িত্বের কাজ করিয়া থাকেন, সেই জন্য এই সভার একজন লোকও 'আমি না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা লইয়াছিলাম' একথা বলিয়া পার পাইতে পারিবেন না।

আমি জানি যে, প্রতিজ্ঞা, ব্রত ইত্যাদি বিশেষ অবস্থাতেই লওয়া হইয়া থাকে, লওয়া উচিত। যে ব্যক্তি যখন তখন প্রতিজ্ঞা করে, সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া ফেলে। কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবনে যদি কোনও অবস্থা প্রতিজ্ঞা লওয়ার উপযুক্ত বিবেচনা করিতে হয়, তবে ইহাই সেই অবসর। খুব সাবধানে ও ভয়ে ভয়ে এই ধরণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা বিজ্ঞের কার্য্য। কিন্তু সাবধানতা ও ভয়ের একটা সীমা আছে। আমরা সেই সীমায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সরকার সভ্যতার সীমা পার হইয়া গিয়াছেন। যখন আমাদের চারিদিকেই দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখনও যদি এই ত্যাগের ব্রত আমরা না লই, তখনও যদি কিছু না করিয়া বসিয়া থাকি, তবে আমরা অযোগ্য ও ভীরু বলিয়া গণ্য হইব। সেই জন্য এই অবস্থা যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করার মত, সে বিষয়ে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা লওয়ার শক্তি আমাদের আছে কি না, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের মত নিজে বিচার করিয়া লইতে হয়। এই ধরণের প্রস্তাব বহু-মত দ্বারা গ্রহণ করা চলে না। যে যে লোক প্রতিজ্ঞা করিবেন, তাঁহারাই কেবল প্রতিজ্ঞা দ্বারা বদ্ধ হইবেন। লোক দেখানোর জন্য এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিতে নাই।

এই প্রতিজ্ঞার প্রভাব এখানকার সরকারের, ভারত সরকারের, কি *বিলাতের সরকারের উপর কি প্রকার হইবে, ইহা কেহই যেন না* ভাবেন। প্রত্যেকেই নিজের বুকে হাত দিয়া হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, আর যদি অন্তরাত্মা জবাব দেয় যে প্রতিজ্ঞা লওয়ার শক্তি আছে, তবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন। আর তাহা হইলেই সে প্রতিজ্ঞায় ফল হইবে।

"এখন পরিণাম সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিব। খুব আশা করিয়াই একথা বলা যায় যে, যদি সকলে নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকে, যদি ভারতীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এই প্রতিজ্ঞা লয়, তবে এই আইন পাস হইবে না, হইলেও শীঘ্রই রদ হইবে। সম্প্রদায়ের বেশী দুঃখ সহ্য করিতে হইবে না এমনও হইতে পারে। এমনও হইতে পারে যে, কিছুই সহ্য করিতে হইল না। কিন্তু যাহারা প্রতিজ্ঞা লইবেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে, একদিক দিয়া আশা রাখা, আর অপর দিকে কোনও আশা না থাকিলেও প্রতিজ্ঞা লইতে প্রস্তুত হওয়া। সেই জন্য এই যুদ্ধে সব চাইতে কি দুঃখ-দায়ক পরিণাম ঘটিতে পারে, সে চিত্রও আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে, এখানে আমরা যাহারা উপস্থিত আছি, বেশী করিয়া ধরিলেও সেই তিন হাজার লোক প্রতিজ্ঞা লইলাম। বাকী ১০,০০০ লোক প্রতিজ্ঞা লইলেন না এমনটাও হইতে পারে। ইহাতে প্রথমেই আমরা উপহাসের পাত্র হইব। আবার এখন যতই সাবধান করি না কেন, হইতে পারে ইহাদের মধ্যে কতজন প্রথম পরীক্ষাতেই বসিয়া পড়িবেন। আমাদিগকে জেলে যাইতে হইবে। জেলে গিয়া অপমান সহ্য করিতে হইতে পারে, ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে হইতে পারে, উদ্ধত জেল-দারোগাদের নিকট মার খাইতে হইতে পারে। অর্থদণ্ড হইয়া মালপত্র ক্রোক হইয়া যাইতে পারে। যদি যোদ্ধা খুব কম হইয়া যায়, তবে আজ হাতে অনেক টাকা থাকিলেও পরে কাঙ্গাল হইয়া যাইতে পারি;

নির্ব্বাসন হইতে পারে; আবার ক্ষুধায়, জেলের কষ্টে কেহ পীড়িত হইয়া পড়িতে পারে, কেহ মারাও যাইতে পারে। এমনি সংক্ষেপতঃ যত দুঃখ আপনারা কল্পনা করিতে পারেন সে সমস্ত আমাদের সহিতে হইতে পারে, ইহাতে অসম্ভব কিছু নাই। বিজ্ঞের কাজ ত হইবে যে, এ সমস্তই সহ্য করিতে হইবে এই প্রকার মানিয়া লইয়াই তবে প্রতিজ্ঞা করা। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, এই যুদ্ধের অন্ত কখন হইবে, কেমন করিয়া হইবে, তবে বলিব যে, যদি আমরা সকলে সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া এই যুদ্ধে নামিয়া পড়ি ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই তবে যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যদি অনেকে ঝড়ের মুখে পলাইয়া যায়, তবে যুদ্ধ দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইবে। কিন্তু একথা আমি সাহস করিয়া ও নিশ্চয় পূর্ব্বকই বলিতে পারি যে, যে পর্য্যন্ত মুষ্টিমেয় মানুষও প্রতিজ্ঞায় স্থির হইয়া থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এই লড়াইয়ের একটা মাত্র অন্তিম ফলই হইতে পারে, তাহা হইতেছে জয়লাভ।

"এখন আমার নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। আমি যেমন আপনাদিগকে প্রতিজ্ঞা লওয়ার বিপদের কথা বলিতেছি, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা লইতেও আহ্বান করিতেছি। ইহাতে আমার দায়িত্বও আমি পুরাপুরি বুঝিতেছি। এমন হইতে পারে যে, আজকার আবেগে, উৎসাহে অনেক লোক প্রতিজ্ঞা লইলেন, আর বিপদের সময় তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া হটিয়া গেলেন, কেবল সামান্য সংখ্যক লোক শেষ পর্য্যন্ত দুঃখ তাপ সহ্য করার জন্য রহিয়া গেলেন। তাহা হইলেও আমার চোখের সম্মুখে একটা মাত্র রাস্তা আছে,—আমি মরিব তবু ঐ আইন মানিব না। আমি ত একথাও বলি যে, আপনারা ধরিয়া লউন—অবশ্য এমন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবুও ধরিয়া লউন—যে সকলেই ছাড়িয়া গেল, আমি একাই রহিলাম, তাহা হইলেও আমার

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। ইহা আমি নিশ্চয় করিয়াই বলিতে পারি। ইহা বলার হেতুও বুঝিয়া লইবেন। আমি অভিমানের বশে একথা বলিতেছি না, প্রধানতঃ যাঁহারা নেতৃস্থানীয়, যাহারা এই মঞ্চে বসিয়া আছেন, তাঁহা-দিগকে সাবধান করার জন্যই বলিতেছি। যদি আপনারা, মাত্র একজনে গিয়া ঠেকিলে তখন সঙ্কল্পে স্থির থাকিবার শক্তি থাকিবে না বলিয়া মনে করেন, তবে আপনাদের এই প্রতিজ্ঞা লওয়া উচিত হইবে না। যদি লোকের নিকট হইতে এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিজ্ঞা লওয়ানো হইতে থাকে, তবে আপনাদের অসম্মতির কথাও তাহাদিগকে জানানো হইবে এবং আপনারা নিজেরাও যেন সম্মতি না দেন। আমরা সকলে একত্র হইয়া এই প্রতিজ্ঞা লইতেছি তাহার অর্থ এমন নয় যে, সকলে যদি প্রতিজ্ঞা পালন না করে, অনেকেই যদি ত্যাগ করে, তবে বাকি যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা বন্ধন মুক্ত হইয়া পড়িবেন। নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পূর্ণ বুঝিয়া আলাদা আলাদা প্রতিজ্ঞা লওয়াই উচিত হইবে। অপরে যাহা খুসী করুক, তবুও নিজে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা পালন করিব—একথা বুঝিয়া লওয়া চাই।”

এই প্রকার বলিয়া আমি বসিলাম। লোকে অতিশয় শান্তির সহিত প্রত্যেক শব্দ শুনিল। অন্য নেতারাও বক্তৃতা করিলেন। সকলেই নিজের দায়িত্ব ও শ্রোতাদের দায়িত্বের কথা বলিলেন। সভাপতি মহাশয় দাঁড়াইলেন। তিনি সকলকে বুঝাইলে পরে সভায় সকলে দাঁড়াইয়া হাত উর্দ্ধে তুলিয়া ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, আইন পাস হইলেও তাহা স্বীকার না করার জন্য প্রতিজ্ঞা লইলেন। সেই দৃশ্য আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। লোকের উৎসাহের শেষ ছিল না। পরের দিন এই নাট্যশালা আকস্মিক ভাবে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়। তৃতীয় দিনে আমার নিকট এই সংবাদ আনিয়া দিয়া একজন বলিলেন যে, নাট্যশালা

পুড়িয়া যাওয়া শুভ চিহ্ন ; যেমন নাট্যশালা ভস্ম হইয়াছে, এই আইনও তেমনি ভস্ম হইয়া যাইবে। এই ধরণের চিহ্ন আমার উপর কোনও দিন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, সেই জন্য আমি এ বিষয়ে কিছুই মনে করিলাম না। লোকের শৌর্য্য ও শ্রদ্ধা কতখানি হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য একথার উল্লেখ করিলাম। এই উভয় গুণের অনেক পরিচয় পাঠক পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে পাইবেন।

এই মহতী সভা হওয়ার পর ভারতীয়েরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নাই। নানাস্থানে সভা হইতে লাগিল এবং সর্ব্বত্রই সর্ব্বসম্মতি অনুসারে প্রতিজ্ঞা লওয়া হইতে লাগিল। এখন হইতে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' প্রধান আলোচনার বিষয়ই হইল ঐ ঘাতকী আইন। অন্যদিক দিয়া সরকারের সহিত দেখা করার জন্যও ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এই বিষয় লইয়া উপনিবেশের মন্ত্রী মিঃ ডানকানের নিকট এক ডেপুটেশন গেল। তাঁহাকে আমাদের প্রতিজ্ঞা ও অন্যান্য বিষয়ের কথা বলা হইল। শেঠ হাজি হবিব এই ডেপুটেশনের একজন সভ্য ছিলেন। তিনি বলিলেন—"যদি কোনও অফিসার আসিয়া আমার স্ত্রীর টিপসহি লইতে উদ্যত হয়, তবে তাহা আমার পক্ষে অসহ্য। আমি সেইখানেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে মরিব।" মন্ত্রী মহাশয় ক্ষণকাল শেঠজীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি বলিলেন—"এই আইন স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইবে কিনা তাহা সরকার বিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু আমি এখনই ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে সর্ত্তগুলি পরিত্যাগ করা হইবে। এ বিষয়ে আপনাদের মনোভাব সরকার বুঝিতে পারেন এবং তাহার সম্মানও করেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সরকার দৃঢ় হইয়া আছেন এবং থাকিবেন। জেনারেল বোথা ইচ্ছা করেন যে, আপনারা ভাল করিয়া বিচার করিয়া এই আইন

মানিয়া লউন। গোরাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সরকার এই আইন আবশ্যক বোধ করিতেছেন। এই আইন বজায় রাখিয়া উহার ভিতরের বিবরণ সম্বন্ধে যদি কোনও কিছু প্রস্তাব থাকে, তবে তাহা সরকার বিবেচনা করিতে পারেন। ডেপুটেশনকে আমি এই পরামর্শ দিই যে, আইন স্বীকার করিয়া লইয়া উহার ভিতরস্থ বিবরণের মধ্যের অসুবিধা যদি দূর করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই আপনাদের হিত হইবে।" মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত যে সকল আলোচনা হইয়াছিল তাহা এখানে লিখিলাম না, কেননা সে সকল যুক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। যুক্তি সেই সকলই ছিল, কেবল মন্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় হয়ত কিছু তারতম্য হইয়া থাকিবে। ডেপুটেশন তাঁহাকে জানাইল যে, তাঁহার উপদেশ সত্ত্বেও তাহাদের ঐ আইন স্বীকার করিয়া লওয়া অসম্ভব। স্ত্রীলোকদিগকে বাদ দেওয়া হইবে শুনিয়া সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়া ডেপুটেশন প্রত্যাবর্ত্তন করিল। একথা বলা শক্ত যে, এই স্ত্রীলোকদিগকে বাদ দেওয়ার কথা সম্প্রদায়ের আন্দোলনের জন্যই হইয়াছিল, না সরকার নিজেই পুনরায় বিচার করিয়া মিঃ কার্টিসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক ব্যবহার পদ্ধতির পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকার পক্ষ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সম্প্রদায়ের আন্দোলনের জন্য এ পরিবর্ত্তন হয় নাই, স্বাধীন ভাবেই সরকার এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে যাহাই হোক্, সম্প্রদায় কাকতালীয় ন্যায় অনুসারে মানিয়া লইলেন যে, উহা কেবল সম্প্রদায়ের আন্দোলনেরই ফল এবং তাঁহাদের যুদ্ধের উৎসাহ বাড়িল।

সম্প্রদায়ের এই আন্দোলনকে কি নামে অভিহিত করা যায় তাহা আমি জানিতাম না। এই সময় আমি এই আন্দোলনকে প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স নামে অভিহিত করিয়াছিলাম। প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের সম্পূর্ণ মর্ম্ম আমি এই সময় জানিতাম না এবং বুঝিতাম না। একটা নূতন

জিনিষের জন্ম হইয়াছে ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যুদ্ধ যতই বাড়িয়া যাইতে লাগিল ততই নাম লইয়া গোল বোধ হইতে লাগিল এবং এই মহাপ্রয়াসকে একটা ইংরাজী নামে অভিহিত করিতে আমার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। এই বিজাতীয় বাক্যটি সম্প্রদায়ের মুখে চলাও কঠিন। সেইজন্য, এই যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল নাম যে বাছিয়া দিতে পারিবে তাহাকে একটা ছোট পারিতোষিক দেওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলাম। উহাতে কতকগুলি নাম পাওয়া গেল। এই সময় এই যুদ্ধের রহস্য লইয়া আমি ভাল রকমেই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে' চর্চ্চা করিতে-ছিলাম, সেইজন্য সকলেই নাম দেওয়ার মত ধারণার সহিত পরিচিত ছিল।

মগনলাল গান্ধীও এই প্রতিযোগিতায় নামিয়াছিলেন। তিনি 'সদাগ্রহ' এই নাম পাঠাইয়াছিলেন। এই শব্দ পছন্দ করা হইল এবং পছন্দ করার কারণ তাঁহাকে জানাইয়া লিখিলাম যে, সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন একটা বিশেষ আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই আগ্রহ সৎ অথবা শুভ, সেইজন্য ঐ নাম পছন্দ করা হইল। আমি যুক্তির সারাংশ সংক্ষেপেই লিখিলাম। আমি এই নাম পসন্দ করিলেও আমি যাহা ব্যক্ত করিতে চাহিতেছি তাহার সবটা ইহার ভিতরে ছিল না। সেইজন্য আমি সদ্-এর 'দ্'কে 'ৎ' করিয়া তাহার সহিত একটা য-ফলা যোগ দিয়া 'সত্যাগ্রহ' শব্দ তৈরী করিলাম। সত্যের মধ্যে শান্তিরও সমাবেশ রহিয়াছে, আর কোনও বস্তুর আগ্রহ করিলে তাহাতে বলও উৎপন্ন হয়, সেইহেতু আগ্রহ শব্দের ভিতর বলের সমাবেশ রহিয়াছে। ইহাতেই ভারতীয় আন্দোলনকে সত্যাগ্রহ বলা হইল। ইহাকে সত্য অর্থাৎ শান্তি হইতে উৎপন্ন বলের নাম দিয়াই পরিচিত করিতে আরম্ভ করিলাম এবং এই যুদ্ধ সম্পর্কে প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স শব্দ পরিত্যাগ করা

হইল। এমন কি ইংরাজীতেও অনেক সময়েই প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের বদলে সত্যাগ্রহ কিম্বা ঐ অর্থসূচক অন্য কোনও শব্দ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলাম। এমনি করিয়া, যে জিনিষকে আমরা সত্যাগ্রহ বলিয়া জানিতেছি তাহার জন্ম। প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স ও সত্যাগ্রহের মধ্যে প্রভেদ আর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই জানিয়া লওয়া দরকার। সেইজন্য পরের অধ্যায়ে এই পার্থক্যের আলোচনা করা হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সত্যাগ্রহ ও প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স

আন্দোলন যেমন বাড়িতে লাগিল তেমনি ইংরাজেরাও ইহাতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। একথাও জানানো দরকার যে, যদিও ট্রান্সভালের ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহের বেশীর ভাগই ঘাতকীআইনের পক্ষপাতী ছিলেন ও ইংরাজদের বিরোধিতার সাহায্য করিতেন, তথাপি যদি কোন পরিচিত ভারতীয় উহাতে কোনও লেখা পাঠাইত, তবে তাহাও তাঁহারা আগ্রহের সহিত ছাপাইতেন। সরকারের নিকট যে সকল দরখাস্ত ভারতীয়েরা পাঠাইতেন তাহাও পুরাপুরি ছাপিতেন, অস্ততঃ একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ত বাহির করিতেনই। যখন বড় সভা করা হইত তখন কখন কখন তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইতেন, আর তাহা না হইলে আমরা যে রিপোর্ট পাঠাইতাম তাহা সংক্ষিপ্ত হইলে তাহাও প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের এই প্রকার স্থবিবেচনা সম্প্রদায়ের খুব সহায়ক হইয়াছিল। আন্দোলন বাড়িলে অনেক গোরাও ইহাতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। এই গোরাদের মধ্যে জোহানেসবর্গের মিঃ হস্কিন নামে একজন লক্ষাধিপতি ছিলেন। ইহার মনে প্রথম হইতেই বর্ণ-বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই ইনি ভারতীয় প্রশ্নে বেশী করিয়া মন দিয়াছিলেন। জার্মিষ্টন নামে জোহানেসবর্গের সহরতলীর মত একটা পাড়া আছে। সেই স্থানের গোরারা আমার কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সভা করা হইল। মিঃ হস্কিন সভাপতি হইলেন, আমি বক্তৃতা করিলাম। এই সভায় মিঃ হস্কিন এই আন্দোলনের ও আমার

পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন, "ট্রান্সভালে ভারতীয়দের ন্যায্য ব্যবহার পাওয়ার অন্য সকল উপায় নিষ্ফল হওয়াতে, প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের পরীক্ষা করা হইতেছে। ভারতীয়দের মতাধিকার নাই, ইঁহারা সংখ্যায় কম, ইঁহারা দুর্ব্বল, ইঁহাদের নিকট অস্ত্র নাই, সেই জন্যই দুর্ব্বলের অস্ত্র স্বরূপ 'প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স' অবলম্বন করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমি যে বক্তৃতা করিব ভাবিয়াছিলাম ইহাতে তাহা ভিন্ন আকার ধারণ করিল। সেখানে মিঃ হস্কিনের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া আমি ইহাকে আত্মিক বল বলিয়া পরিচিত করিলাম। এই সভাতেই আমি দেখিলাম যে, প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স শব্দের ব্যবহার দ্বারা ভয়ানক ভুল বুঝানো হইতে পারে। এই সভাতে প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স ও আত্মিক বলের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা বুঝাইবার জন্য যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স—এই বাক্যটি ইংরাজী ভাষায় প্রথম ব্যবহার কে কখন করিয়াছিল তাহা আমার জানা নাই। ইংরাজদের মধ্যে যখন কোনও ছোট সমাজ কোনও আইনকে অপছন্দ করেন তখন, তাঁহারা বিদ্রোহ না করিয়া সেই আইন না মানার জন্য 'প্যাসিভ' অর্থাৎ মৃদুতর পথ অবলম্বন করেন এবং তাহার জন্য শাস্তি লওয়া পছন্দ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন পার্লামেণ্টে শিক্ষা সম্বন্ধে আইন পাস করা হয়, তখন 'নন্‌কন্‌ফরমিষ্ট' নামে খৃষ্টান সম্প্রদায় ডাক্তার ক্লিফোর্ডের নেতৃত্বে প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স অবলম্বন করেন। ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকেরা ভোটের অধিকারের জন্য খুব আন্দোলন করিয়াছিলেন, উহাও প্যাসিভ-রেজিষ্ট্যান্স নামে পরিচিত। এই উভয় আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়া মিঃ হস্কিন জানান যে, প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স দুর্ব্বলের এবং যাহাদের ভোটাধিকার নাই তাহাদের অস্ত্র। ডাক্তার ক্লিফোর্ডের পক্ষের

ভোটাধিকার থাকিলেও পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য না থাকায়, শিক্ষা আইন পাস করা তাঁহারা বন্ধ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষ সংখ্যায় দুর্ব্বল ছিল। তাঁহারা অস্ত্র ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, এমন নয়; কিন্তু অস্ত্র ব্যবহারে তাঁহাদের কার্য্য উদ্ধার হইত না। সুব্যবস্থিত শাসনতন্ত্রে হঠাৎ প্রত্যেক সময়েই বিদ্রোহ করিয়া বসিলে কাজ উদ্ধার হয় না। আবার অস্ত্র ব্যবহারের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও ডাক্তার ক্লিফোর্ডের পক্ষের কতকগুলি লোক অস্ত্র ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। স্ত্রীলোকদিগের আন্দোলনেও তাঁহাদের যে ভোটাধিকার ছিল না, এবং ইঁহারা যে সংখ্যায় ও শারীরিক বলে দুর্ব্বল, ইহাই মিঃ হস্কিনের যুক্তির পক্ষে ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের আন্দোলনে অস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় নাই। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক দল বাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছিলেন ও পুরুষদিগকেও আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে কাহাকেও খুন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এরূপ আমি মনে করি না। কিন্তু সুবিধা হইলে মার দেওয়া যাইতে পারে এবং এই ভাবে প্রতিপক্ষকে বিরক্ত করা যাইতে পারে, এরূপ ইচ্ছা তাঁহারা করিতেন। কিন্তু এই ভারতীয় আন্দোলনের কোথাও, কোনও অবস্থাতেই পশুবল প্রয়োগের স্থান নাই। পাঠকেরা অতঃপর দেখিতে পাইবেন যে, কঠিন দুঃখভোগ করিয়াও সত্যাগ্রহীরা শারীরিক বল প্রয়োগ করেন নাই—যে অবস্থায় বল প্রয়োগ করিয়া কাজ হইত, সে অবস্থাতে পড়িয়াও বল প্রয়োগ করেন নাই। বস্তুতঃ ভারতীয়দের ভোটাধিকার ছিল না, ও তাহাদের অস্ত্রবল ছিল না, এই দুই কথা সত্য হইলেও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনার সহিত উহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। একথা আমি বুঝাইতে চাই না যে, ভারতীয়দের যদি মতাধিকার থাকিত অথবা তাহাদের যদি অস্ত্রবল থাকিত তবুও তাহারা সত্যাগ্রহ করিত।

ভোটাধিকার থাকিলে বেশীর ভাগ স্থানে সত্যাগ্রহের আবশ্যকই হয় না। আর যদি অস্ত্রবল থাকিত, তবে অপর পক্ষ অবশ্যই সাবধান হইয়া চলিতেন। সেই জন্য অস্ত্রবলে বলীয়ানের সত্যাগ্রহ করার অবকাশই কম উপস্থিত হয়। আমার বক্তব্য এই যে, ভারতীয় আন্দোলনের পরিকল্পনায় অস্ত্রবল ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা আছে কি নাই, এ প্রকার প্রশ্ন আমার মনেই উঠে নাই, একথা আমি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি। সত্যাগ্রহ আত্মিক বল। যেখানে যে পরিমাণে অস্ত্রবল বা শারীরিক বল অর্থাৎ পশুবলের প্রয়োগ হয়, সেখানে সেই পরিমাণে আত্মিক বলের কম প্রয়োগ হয়। আমার মতে এই দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তি। আন্দোলন আরম্ভ করার সময়েই একথা আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল।

আমার এই মত ঠিক কি ভুল সে কথার বিচার এখানে করিব না। আমি কেবল সত্যাগ্রহ ও প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের মধ্যে কি প্রভেদ তাহাই বুঝাইতে চাহিতেছি। ইহা হইতে দেখা যায় যে, উভয় শক্তির মধ্যে মূলগত বৃহৎ ভেদ রহিয়া গিয়াছে। সেই জন্যই এই উভয়ের ভিতরের প্রভেদ না বুঝিয়া যাঁহারা নিজেদিগকে 'প্যাসিভ রেজিষ্টার' বা 'সত্যাগ্রহী' বলিয়া থাকেন, অথচ দুইটিই এক জিনিষ মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই অন্যায় করেন এবং তাহার পরিণামও খারাপ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স' শব্দ ব্যবহার করায় লোকে আমাদিগকে সেই সাফ্রেজিট স্ত্রীলোকদিগের মত সাহস বা আত্মত্যাগের অধিকারী বলিয়া প্রশংসা করিত না, বরঞ্চ সেই স্ত্রীলোকদিগের মত ধনপ্রাণ লোকসান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি বলিয়া মনে করিত। মিঃ হস্কিনের মত উদার চিত্ত, অকপট মিত্রও আমাদিগকে দুর্ব্বল মনে করিতেন। মানুষ নিজেকে যেমন মনে করে ক্রমে তাহাই হইয়া যায়, একথাটায় সার আছে।

যদি আমরা নিজেরা একথা মনে করি ও অপরকে মনে করিতে দিই যে, আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইলে আমাদের প্রতিরোধ দ্বারা আমরা আমাদের শক্তি বাড়াইতে পারিব না এবং যখনই সুবিধা হইবে তখনই এই দুর্ব্বলের অস্ত্র আমরা ফেলিয়া দিব। কিন্তু যদি আমরা সত্যাগ্রহী হই এবং নিজেদিগকে সবল মনে করিয়া সত্যাগ্রহ অস্ত্র ব্যবহার করি, তাহা হইলে ইহা হইতে দুইটি পরিষ্কার ফল হইতেই হইবে। আমরা বলবান এই বিশ্বাসে দিন দিন বল বাড়িয়া যাইতে থাকিবে এবং যেমন আমাদের শক্তি বাড়িতে থাকিবে তেমনি সত্যাগ্রহের তেজও বাড়িতে থাকিবে, আর এই শক্তি যত বাড়িবে ততই ইহা পরিত্যাগ করার পথ খুঁজিতে ইচ্ছা হইবে না। আবার 'প্যাসিভ-রেজিষ্ট্যান্সে' যেমন প্রেমভাবের স্থান নাই, তেমনি সত্যাগ্রহে বৈর ভাবেরও স্থান নাই, বরঞ্চ বৈর ভাব পোষণ করাই সত্যাগ্রহে অধর্ম্ম। প্যাসিভ-রেজিষ্ট্যান্সে যদি সুবিধা হয় তবে অস্ত্রবল প্রয়োগ করা চলে। সত্যাগ্রহে যদি অস্ত্র প্রয়োগের খুব উত্তম অবকাশও উপস্থিত হয়, তবু তাহা সর্ব্বতো-ভাবেই পরিত্যাজ্য। অনেক সময় প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স অস্ত্রবল প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত করে। সত্যাগ্রহ সে ভাবে ব্যবহার করাই যায় না। প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স পশুবলের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা যায়; সত্যাগ্রহ অথবা আত্মিক বল এবং অস্ত্রবল একে অন্যের বিরোধী বলিয়া এই দুই বল এক সঙ্গে প্রয়োগ করা যায় না। সত্যাগ্রহ প্রীতিভাজনদের প্রতিও প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের ব্যবহার প্রীতিভাজনদিগের প্রতি করা যায় না, বরঞ্চ যখন প্রীতিভাজনকে বৈরী বলিয়া গণ্য করা হয় তখনই প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স প্রয়োগ করা চলে। প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সে বিরুদ্ধ পক্ষকে দুঃখ দেওয়ার যাতনা দেওয়ার কল্পনা রহিয়াছে, এবং সেই দুঃখ দিতে গিয়া যদি নিজের দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তবে তজ্জন্য প্রস্তুত

থাকিতে হয়। সত্যাগ্রহে বিরুদ্ধ পক্ষকে দুঃখ দেওয়ার চিন্তামাত্র করারও, স্থান নাই। সত্যাগ্রহে নিজে দুঃখ সহ্য করিয়া, দুঃখ বহন করিয়াই বিরোধীকে বশীভূত করার ভাব থাকা চাই।

এই দুই শক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখাইলাম। তবে প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের যে সকল গুণ, আর না হয় বলুন যে সকল দোষ আমি দেখাইলাম, তাহা যে প্রত্যেক প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সেই দেখা যাইবে এমন কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের অধিকাংশ ব্যবহারেই ঐ দোষগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, একথা বলিতে পারি। পাঠকদিগকে আমি একথাও জানাইতে চাই যে, যিশু খৃষ্টকে অনেক খৃষ্টান প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের আদি নেতা বলিয়া গণ্য করেন। সে স্থলে প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স মানে, সত্যাগ্রহই জানিতে হইবে। এই অর্থে প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স প্রয়োগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। টলষ্টয় রাশিয়ার যে 'দুখোবর'-দিগের প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের উদাহরণ দেখাইয়াছেন তাহা এই জাতীয় 'প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স' বা সত্যাগ্রহ। যিশু খৃষ্টের পর হাজার হাজার খৃষ্টান যে অত্যাচার সহ্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে 'প্যাসিভ-রেজিষ্ট্যান্স' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় নাই, এজন্য আমি তাঁহাদের সেই সব নির্ম্মল উদাহরণকে সত্যাগ্রহ বলিয়াই পরিচিত করাইব। আর উহাই যদি 'প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সের' নমুনা বলেন, তবে প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্সে ও সত্যাগ্রহে কোনও ভেদ থাকে না। এই অধ্যায়ে আমি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইংরাজী ভাষায় 'প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স' বাক্যটি যে ভাবে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, তাহার সহিত সত্যাগ্রহের কল্পনার প্রভেদ কোথায়।

প্যাসিভ রেজিষ্ট্যান্স ব্যাখ্যা করার সময়, যাঁহারা উহা অবলম্বন করেন তাঁহাদের প্রতি যাহাতে অবিচার করা না হয়, সেজন্য আমি সকলকে

সাবধান করিয়াছি। আবার তেমনি একথাও জানানো দরকার যে, সত্যাগ্রহের গুণ বর্ণনা কালে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা সত্যাগ্রহী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁহারা সকলেই সত্যাগ্রহের বর্ণিত গুণের অধিকারী—এমন কথা আমি বলিতেছি না। একথা আমার অজ্ঞাত নয় যে, যাঁহারা সত্যাগ্রহী বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেই সত্যাগ্রহের গুণাবলীর সহিত সম্পর্ক রাখেন না। অনেকেই ইহাও মনে করেন যে, সত্যাগ্রহ কেবল দুর্ব্বলেরই অস্ত্র। অনেকের মুখ হইতে আমি একথাও শুনিয়া থাকি যে, সত্যাগ্রহ অস্ত্রবলের জন্য তৈরী হওয়ার পথ মাত্র। সুতরাং আমাকে আবারও একথা বলিতে হইতেছে যে, সত্যাগ্রহীরা কেমন গুণবান একথা আমি জানাইতে চাহি না, সত্যাগ্রহের কল্পনা কি এবং সেই অনুযায়ী সত্যাগ্রহীকে কি হইতে হয় তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়েরা যে শক্তির প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আমি তাহারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই শক্তির অর্থ স্পষ্ট বুঝিবার জন্য এবং যাহাতে ইহা প্যাসিভ রেজিষ্টান্স নামে পরিচিত শক্তির সহিত এক বলিয়া ভুল না করা হয়, সেজন্য এই শক্তির একটি নূতন নাম দিতে হইয়াছে। ঐ নামের মধ্যে সে সময় কি কি ভাব সমাবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ ইহাই আমার বক্তব্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিলাতে ডেপুটেশন

সেই ঘাতকী আইনের প্রতিকারের জন্য ট্রান্সভালে যাহা যাহা করা দরকার ছিল, সে সকল পথ অবলম্বন করা হইয়াছিল। ট্রান্সভালের ব্যবস্থাপক সভায় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রযোজ্য অংশ পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। বাকিটা, খসড়া যেমন ছিল প্রায় সেই ভাবেই পাস হইয়া আইন হইয়া যায়। সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সময় খুব সাহস ছিল। আবার তেমনি সকলেই একভাবে একমতে বদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া কেহই নিরাশ হয় নাই। তাহা হইলেও প্রতিকারের যে সকল বৈধ উপায় ছিল তাহার কোনটাই যে বাদ দেওয়া হইবে না, সে সঙ্কল্পও ঠিক ছিল। ট্রান্সভাল এই সময়ে 'ক্রাউন কলোনি' বলিয়া গণ্য ছিল। 'ক্রাউন কলোনির' শব্দার্থ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ। অর্থাৎ এই উপনিবেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থার. জন্য বিলাতের ইম্পিরিয়াল বা বড় সরকার দায়ী। এই উপনিবেশের ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল আইন পাশ হয় তাহা রাজার সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। রাজার সম্মতি কেবল একটা রীতি ও নাম-রক্ষার খাতিরেই লওয়া হয় না, মন্ত্রীমণ্ডলের পরামর্শ মত রাজা যে সকল আইন বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রথার বিরোধী তাহাতে সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন এবং এই প্রকার করার দৃষ্টান্তও আছে। ইহার বিপরীত অবস্থা 'রেসপনসিব্‌ল গবর্ণমেণ্ট' সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। সেখানকার সরকার যে আইন পাশ করেন তাহা কেবল নিয়ম রক্ষার জন্যই বড় সরকার পাস করিয়া থাকেন।

যদি বিলাতে ডেপুটেশন পাঠানো হয় তবে সম্প্রদায়ের দায়িত্ব বাড়ে, ইহা সম্প্রদায়কে আমারই বুঝাইবার ভার ছিল। সেইজন্য আমাদের এসোসিয়েসনের নিকট আমি তিনটি প্রস্তাব উপস্থিত করি: একটা হইতেছে এই যে, সেদিনকার নাট্যশালার সভায় যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইয়াছিল, প্রধান প্রধান ভারতীয়েরা সেই মর্ম্মে ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবেন। তাহাতে, যদি কাহারও সন্দেহ আসিয়া থাকে অথবা দুর্ব্বলতা আসিয়া থাকে তবে তাহা জানা যাইবে। এই প্রস্তাব করার আমার একটা হেতু ছিল। হেতুটি এই যে ডেপুটেশন যদি সত্যাগ্রহের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তাহা হইলে নির্ভয় হইয়া যাইবে, আর সেই নির্ভরতার জোরেই নিজেদের সঙ্কল্পের কথা বিলাতের উপনিবেশের ও ভারতের মন্ত্রীকে জানাইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ ডেপুটেশনের ব্যয়ের সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা চাই। তৃতীয় প্রস্তাব ছিল যে, ডেপুটেশনে যত কম লোক পাঠানো যায় তাহাই ভাল। একটা ভাব অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ডেপুটেশনে অধিক লোক গেলে অধিক উপকার হইবে। সেইজন্যই এই প্রস্তাব করার আবশ্যক ছিল। এ ভাবটাও এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, ডেপুটেশনে যিনি যাইবেন তিনি নিজের মানের জন্য যাইতেছেন না, কেবল সেবার জন্য যাইতেছেন, এবং অল্প লোক গেলে ব্যয়ও কম হইবে। এই তিন প্রস্তাবই গ্রাহ্য হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষর লওয়া হয়। অনেক স্বাক্ষর হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও আমি দেখিয়াছিলাম যে, যাহারা সভায় প্রতিজ্ঞা লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বাক্ষর করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। যে প্রতিজ্ঞা একবার লওয়া হইয়াছে, তাহা যদি পঞ্চাশ বার করিয়াও পুনরায় লইতে হয় তাহাতে সঙ্কোচ হওয়ার কারণ নাই। তাহা হইলেও একথা কে না জানে যে, লোকে বিবেচনা করিয়া প্রতিজ্ঞা লইয়াও

পরে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মুখে যে প্রতিজ্ঞা লইয়াছে তাহা লিখিয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করে? টাকা যেমন আন্দাজ করা গিয়াছিল সেই মতই সংগ্রহ হয়। সব চাইতে মুস্কিল হয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন লইয়া। আমার নাম ত ছিলই, কিন্তু আমার সাথে আর কে যাইবে? ইহা লইয়া কমিটির অনেক সময় গেল। কয়েক রাত্রিও কাটিল এবং সমাজের মধ্যে যে সকল দোষ আছে আমরা তাহারও সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। কেহ বলিলেন যে, আমি একা গেলেই সব গোল চুকিয়া যায়। ইহাতে আমি পরিষ্কারভাবে অসম্মতি জানাই। সাধারণতঃ একথা বলা যায় যে, দাক্ষণ আফ্রিকায় হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ে নাম মাত্রও ভেদ ছিল না একথা বলা যায় না। তবে যে এই ভেদ বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই তাহার কতকটা কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার স্থিতির বিশেষত্ব; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও নিশ্চিত কারণ হইতেছে এই যে, নেতারা একনিষ্ঠার সহিত ও অকপটে নিজেদের কর্ত্তব্য কাজ করিতে-ছিলেন এবং সেই ভাবে সম্প্রদায়কে পরিচালিত করিতেছিলেন। আমি পরামর্শ দিলাম যে, আমার সহিত একজন মুসলমান থাকা চাই এবং দুইজনের বেশী লোক যাওয়ার দরকার নাই। তখন হিন্দুর দিক হইতে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব আসিল যে, আমি ত সারা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সেইজন্য হিন্দুদের দিক হইতেও একজন থাকা চাই। কেহ ইহাও বলিলেন যে, ডেপুটেশনে একজন কোঙ্কানী মুসলমান ও মেমনদের দিক হইতে একজন আর হিন্দুদের ভিতর হইতে একজন পাটিদার ও একজন অনাভলা থাকা সঙ্গত। এই প্রকার নানা দাবি করার পর সকলে একমত হওয়ায় হাজি উজির আলী ও আমি নির্ব্বাচিত হইলাম।

হাজী উজীর আলীকে অর্দ্ধেক মালয়ী বলিয়া ধরা যায়। তাঁহার পিতা ভারতীয় মুসলমান ও মাতা মালয়বাসী ছিলেন। তাঁহার মাতৃভাষা

ডচ্ বলা যাইতে পারে। তিনি ইংরাজীও এরূপ জানিতেন যে, ইংরাজী ও ডচ্ সমান বলিতে পারিতেন। তিনি ইংরাজীতে অবাধে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সংবাদপত্রে চিঠি লিখিবার কলাও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন এবং দীর্ঘ দিন হইতেই জনসেবার কার্য্য করিতেছিলেন। হিন্দুস্থানীও খুব ভাল বলিতে পারিতেন। আমরা দুইজনে বিলাত পহুঁছিয়াই কাজে লাগিয়া গেলাম। মন্ত্রীর নিকট আবেদনপত্র ষ্টীমারেই তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলাম, উহা ছাপাইয়া ফেলিলাম। লর্ড এলগিন উপনিবেশের সেক্রেটারী ছিলেন। লর্ড মার্লি ছিলেন ভারতবর্ষের সেক্রেটারী। আমরা গিয়া ভারতবর্ষের 'দাদার' সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাঁহার মারফতে কংগ্রেস বৃটিশ কমিটির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কমিটিকে আমাদের মামলার কথা বলিলাম এবং জানাইলাম যে, আমরা সকল পক্ষকেই সঙ্গে লইয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। দাদাভাইও এই পরামর্শ দিয়াছিলেন। কমিটির কাছেও ইহা পছন্দ হইল। এইজন্য সার ম্যাঞ্চরজী ভবনাগরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাদিগকে খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ও দাদাভাই-এর পরামর্শ ছিল যে, লর্ড মার্লির নিকট যে ডেপুটেশন পাঠানো হইবে তাহার মুখ্য ব্যক্তি একজন নিরপেক্ষ খ্যাতনামা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হইলে ভাল হয়। সার ম্যাঞ্চরজী কতকগুলি নাম দিলেন। তাঁহার মধ্যে সার লেপেল গ্রিফিনের নাম ছিল। পাঠকদিগকে জানাইতে চাই যে, এই সময়ে সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার জীবিত ছিলেন না। তিনি বর্ত্তমান থাকিলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা তিনি ভালরকম জানিতেন বলিয়া তিনিই মুখ্য ব্যক্তি হইতেন, অথবা তিনিই লর্ডদিগের মধ্য হইতে কোন প্রতিপত্তিশালী নেতা বাছিয়া দিতেন।

আমরা সার লেপেল গ্রিফিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতেছিল, তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এই প্রশ্নে তিনি খুব অনুরাগ দেখাইলেন। আমাদেব ডেপুটেশনের তিনি অগ্রণী হইতে স্বীকার করিলেন। উহা কেবল ভদ্রতার খাতিরে নয়। যাহাতে আমাদের প্রতি ন্যায় আচরণ হয় তিনি সেই ইচ্ছা দ্বারাই প্রণোদিত হইয়াছিলেন। সমস্ত কাগজপত্র পড়িয়া তিনি বিষয়টির সহিত পরিচিত হইয়া লইয়াছিলেন। আমরা অন্য অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদিগের সহিতও দেখা করিয়াছিলাম। কমন্স সভার অনেক সভ্যের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। লর্ড এলগিনের নিকট ডেপুটেশন গেল। তিনি সমস্ত অবস্থা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, তাঁহার সমবেদনা জানাইলেন। এবং তাঁহার নিজের অসুবিধার কথা জানাইয়া তাঁহার যথাসাধ্য করিবেন বলিয়া কথা দিলেন। এই ডেপুটেশন লর্ড মর্লির সহিতও দেখা করিল। তিনিও সমবেদনা জানাইলেন। তাঁহার কথা আমি অন্যত্র বলিয়াছি। সার উইলিয়ম ওয়েড়ারবার্ণের চেষ্টায় হাউজ অফ কমন্সের ভারতীয় ব্যাপার বিষয়ক কমিটির এক সভা কমন্স গৃহের ড্রইংরুমে বসে। সেখানেও আমাদের বক্তব্য যথাশক্তি বুঝাইয়া বলিলাম। এই সময় আইরিশ পক্ষের নেতা ছিলেন মিঃ রেডমণ্ড, তাঁহার সহিতও আমরা দেখা করি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে কমন্স সভার যে সকল সভ্যের সহিত দেখা করা যাইতে পারে তাহাদের সহিত আমরা দেখা করিয়াছিলাম। বিলাতের কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটির সাহায্য আমরা খুব পাইয়াছিলাম। কিন্তু বিলাতের রীতি অনুসারে এই কমিটিতে বিশেষ পক্ষের বিশেষ মতের লোকই ছিলেন। এই কমিটিতে নাই অথচ আমাদিগকে খুব সাহায্য করিয়াছিলেন এমনও অনেকে ছিলেন। ইঁহাদের সকলের সমবেত চেষ্টা যদি এই কার্য্যে পাওয়া যায় তবে খুব ভাল হয়, এই বিবেচনা করিয়া

আমরা একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করা স্থির করিলাম। সকল পক্ষের লোকেরই ইহা ভাল বোধ হইল।

সকল অনুষ্ঠানই সেক্রেটারী বা সম্পাদকের উপর নির্ভর করে। সম্পাদক এমন লোক হওয়া চাই যে কর্ম্মের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং কার্য্যে সফলতা লাভের জন্য তিনি সমস্ত সময় দিতে প্রস্তুত আছেন। ইহার সহিত অবশ্য তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষমতাও থাকা চাই। মিঃ রিচ পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ছিলেন ও আমার আফিসে আর্টিকেল ছিলেন। ইনি এক্ষণে লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী করিতেছিলেন। সেক্রেটারী মন্ত্রী হওয়ার সমস্ত গুণই ইঁহাতে ছিল। তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন আর এই কাজ করবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। সেইজন্য কমিটি গঠিত করিবার সাহস করিলাম।

বিলাতে অথবা পশ্চিমে একটি রীতি আছে এবং আমার মতে রীতিটি অসভ্য। সে রীতিটি এই যে, কোনও বড় কাজ খাওয়ার নিমন্ত্রণের সময়ই সূচনা করা হয়। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ৯ই নভেম্বর ম্যানসন হাউস নামে বড় বেপারীদের বাড়ীতে তাঁহার বার্ষিক কার্য্যসূচী সম্বন্ধে ও ভবিষ্যতের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন, উহাতে লর্ড মেয়র মন্ত্রীমণ্ডলকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন, অপরেও নিমন্ত্রিত হন। সেখানে আহারের পর মদের বোতল খোলা হইতে থাকে। উপস্থিত সকলে ভোজদাতা ও নিমন্ত্রিতদের স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে মদ্যপান করেন আর যখন এই শুভ বা অশুভ (সকলেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী বিশেষণ বাছিয়া লয়) কার্য্য চলিতে থাকে তখন বক্তৃতা দেওয়া হয়। সেখানে মন্ত্রীমণ্ডলের আশীর্ব্বাদ (টোষ্টও) প্রস্তাবিত হয়। এই টোষ্টের জবাবে প্রধান মন্ত্রীর উল্লিখিত বক্তৃতা হয়। সার্ব্বজনিক ব্যাপারে তেমনি ব্যক্তিগত ব্যাপারেও কাহারও সহিত বিশেষ প্রয়োজনীয় আলোচনাও ভোজনের নিমন্ত্রণে করার রীতি। কখন

বা খাইতে খাইতে কখনও বা খাওয়ার পর আলোচনা হইয়া থাকে। আমাদের এই সময় একবার নয়, অনেকবার এই রীতি পালন করিতে হইয়াছিল। কেহ একথা মনে করিবেন না যে, এজন্য আমাদিগকে অখাদ্য খাইতে হইয়াছে। এমনিভাবে একবার আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনে সকল প্রধান সহায়কদিগকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। প্রায় একশত জনকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আমাদের সহায়কদিগকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য, তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লওয়ার জন্য এবং স্থায়ী কমিটি গঠন করার জন্যই এই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। রীতি অনুসারে বক্তৃতাও হইয়াছিল এবং কমিটির স্থাপনা হইয়াছিল। ইহাতে আমাদের আন্দোলনেরও খুব প্রচার হইয়াছিল।

প্রায় ছয় সপ্তাহ ইংলণ্ডে কাটাইয়া আমরা ফিরিলাম। ম্যাডিরা পহুঁছিতে মিঃ রিচের তার পাইলাম যে, লর্ড এলগিন প্রচার করিয়াছিলেন যে, এশিয়াটিক আইন নামঞ্জুর করিবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডল সম্রাটকে পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের আনন্দের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কি আছে? ম্যাডিরা হইতে কেপটাউন পহুঁছিতে ১৪।১৫ দিন লাগে। এই কয়দিন খুব শান্তিতে কাটাইলাম এবং ভবিষ্যতে অন্য অসুবিধাগুলি দূর করিবার আকাশ কুসুম রচনা করিতে লাগিলাম। দৈবগতি বিচিত্র, আমাদের আকাশ কুসুম কি করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিব।

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে দুই একটা পবিত্র স্মৃতির কথা না লিখিয়া পারি না। একথা বলা আবশ্যক যে, আমরা বিলাতে এক মুহূর্ত্ত সময় অপব্যয় হইতে দেই নাই। অনেক সার্কুলার ইত্যাদি পাঠাইতে হইত। উহা এক হাতে করিয়া উঠার মত কাজ নয়—লোকের সাহায্যের খুবই আবশ্যক হইয়াছিল। টাকা খরচ করিয়া এইপ্রকার

সাহায্য পাওয়া যাইত। কিন্তু শুদ্ধ চরিত্র স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা যেমন একাজ হয়, অপরের দ্বারা তেমন হয় না—ইহাই আমার ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা। সৌভাগ্য বশতঃ এইপ্রকার সাহায্য আমরা পাইয়াছিলাম। অনেক ভারতীয় যুবক এখানে পড়িতেছিল। তাহারা আমাদিগের কাছে সকল সন্ধ্যায় আসিত ও প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়া খুব সাহায্য করিত। যে রকমের কাজই হোক্, শিরোনামা লেখা, নকল করা, টিকিট লাগানো, ডাকে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ, কেহ ছোট মনে করিয়া করিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার পরিচিত এক ইংরাজ যুবক যে সাহায্য করিয়াছিল তাহা অপর সকলের সাহায্য ম্লান করিয়া দিয়াছিল। সে ভারতবর্ষেও আসিয়াছিল। তাহার নাম ছিল সাইমণ্ড। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে যে, দেবতারা যাহাকে ভালবাসে তাহাকে শীঘ্রই লইয়া যায়। এই পর-দুঃখকাতর ইংরাজকে ভরা যৌবনে যমদূত লইয়া গিয়াছে। তাহাকে পর-দুঃখ-কাতর প্রাণ বলার বিশেষ কারণ আছে। যখন বোম্বাইতে ১৮৯৭ সালের প্লেগের সময় লোক প্লেগে যেখানে সেখানে মরিতেছিল তখন সে ভারতবাসী রোগীদিগকে সাহায্য করে। সংক্রামক রোগীকে সাহায্য করিতে গিয়া লেশমাত্র মৃত্যুভয় না করা তাহার চরিত্রের মধ্যে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। তাহার ভিতরে জাতির বা বর্ণের বিদ্বেষের রেখা মাত্র ছিল না। তাহার চিত্ত অতিশয় স্বাধীন ছিল। তাহার একটা সিদ্ধান্ত ছিল যে, সংখ্যায় অল্প অথবা 'মাইনরিটি'র দিকেই সত্য থাকে। এই সিদ্ধান্তের বশীভূত হইয়াই সে জোহানেসবর্গে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। সে তামাসা করিয়া অনেক সময় আমাকে বলিত যে, "যদি আপনার দিকে মতাধিক্য কখনো হয়, তবে তখনি আপনাকে ছাড়িব, কেননা আমি বিশ্বাস করি যে, অধিকসংখ্যকের

(মেজরিটির) হাতে সত্য পড়িলেও তাহা অসত্যের স্বরূপ লইয়া থাকে। সে খুব পড়াশুনা করিয়াছিল। জোহানেসবর্গের এক ক্রোড়পতি— সার জর্জ ফেরারের সে প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল। সে সুদক্ষ সর্টহ্যাণ্ড টাইপিষ্ট ছিল। বিলাতে আমি উপস্থিত হইলেই সে আসিয়া দেখা করে। তাহার কোনও খবরই আমি রাখিতাম না। কিন্তু আমি সার্ব্বজনিক কাজে নিযুক্ত ছিলাম বলিয়া আমার নাম সংবাদপত্রে উঠিয়াছিল। সেই জন্য এই সদাশয় ইংরাজ আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করে। সে আমাদিগকে যে-কোনও প্রকারে সাহায্য করার ইচ্ছা জানায়। বলে আমাকে যদি চাপরাশির কাজ দেন তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি, আর যদি সর্টহ্যাণ্ড লেখার দরকার হয়, তবে আমার ন্যায় কুশলী দ্বিতীয় লোক যে খুঁজিয়া পাইবেন না তাহা ত জানেনই। আমাদের দুই রকমের সাহায্যেরই আবশ্যক ছিল। এই মহদাশয় ব্যক্তি বিনা পয়সায় আমাদের জন্য দিন রাত্রি খাটিয়াছিল একথা বলায় একটুও অত্যুক্তি হয় না। প্রায় প্রতিদিনই রাত বারটা একটা পর্য্যন্ত তাহাকে টাইপ করিতে হইত। সাইমণ্ড পত্রবাহকের কাজ করিত, চিঠি ডাকে ফেলিত, তার মুখে সকল সময়েই হাসি লাগিয়া থাকিত। তাহার মাসিক আয় প্রায় পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড ছিল। এই টাকার প্রায় সবটাই সে বন্ধু ও অন্যান্য লোককে সাহায্য করিতে ব্যয় করিত। সে অবিবাহিত ছিল এবং অবিবাহিত জীবন কাটাইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিল। আমি তাহাকে কিছু অর্থ লওয়ার জন্য জেদ্ করি, কিন্তু সে লইতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলে যে, এ কার্য্যের জন্য টাকা লইলে তাহার কর্ত্তব্য-চ্যুতি ঘটিবে। আমার মনে আছে, শেষের রাত্রে যখন আমরা কার্য্য গুটাইয়া জিনিষপত্র প্যাক করিতেছিলাম, তখন সে রাত তিনটা পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল। পরদিন সে আমাদিগকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া বিদায়

নয়, সে বিদায় বড়ই পীড়াদায়ক হইয়াছিল। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি যে, পরোপকার করাটা কেবল আমাদের দেশের লোকেরই বিশেষ বৃত্তি নয়।

যাহারা ভবিষ্যতে জনসেবার কাজ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের অবগতির জন্য একথা জানাইব যে, আমরা এই ডেপুটেশনের খরচার হিসাব রাখিতে এত যত্ন লইতাম যে, অতিক্ষুদ্র বিষয়, যেমন ষ্টীমারে সোডার দাম ইত্যাদিরও ভাউচার বা রসিদ সহ হিসাব লিখিতাম। আমরা টেলিগ্রাফের রসিদগুলিও রাখিয়া দিয়াছিলাম। বিশদ হিসাব লিখিবার সময় বিবিধ বলিয়া কোনও কিছুই ব্যয় লিখি নাই। বিবিধ হিসাব বলিয়া আমাদের কিছু খরচা ছিল না। যদি থাকে তবে দুই একখানার বিষয় হইতে পারে যাহার বিবরণ লেখার সময় মনে পড়িত না।

আমি এই জীবনে একথা বেশ পরিষ্কার লক্ষ্য করিয়াছি যে, আমরা বয়স্থ হওয়া মাত্রই ট্রষ্টি বা ন্যাস-রক্ষক হইয়া পড়ি। যতদিন বাপ-মার সঙ্গে থাকি ততদিন তাঁহাদের জন্য যে ব্যয় করি, বা যে কারবার করি তাহার হিসাব তাঁহাদিগকে দিতে হয়। তাঁহারা আমাদের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহারা হিসাব না চাহিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের দায়িত্ব ঘুচে না। যখন আমরা স্বাধীন গৃহস্থ হইয়া বসি, তখন আমাদের পরিবারের প্রতি দায়িত্বের উদ্ভব হয়। আমরা যাহা সংগ্রহ করি, আমরা নিজেরাই তাহার মালিক নহি, আমাদের পরিবারও আমাদের নিজেদের সহিত উহার যৌথ অংশীদার। তাহাদের জন্য উপার্জ্জনের প্রত্যেক পাইয়ের হিসাব দেওয়া দরকার। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেই দায়িত্ব যদি এই প্রকার হয় তবে সার্ব্ব-জনিক জীবনে দায়িত্ব আরো কত বেশী। আমি এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া

আসিয়াছি যে, স্বেচ্ছাসেবকরা যেন মনে করে প্রদত্ত টাকার বা কার্য্যের হিসাব দেওয়ার আবশ্যক নাই, কেননা তাহারা সম্পূর্ণভাবেই বিশ্বাসের যোগ্য। এইপ্রকার যুক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক। হিসাব রাখার আবশ্যকতার সহিত বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনও সম্বন্ধ নাই। হিসাব রক্ষা করা একটা স্বতন্ত্র কার্য্য এবং পরিষ্কার কার্য্য করিতে উহা অত্যাবশ্যক। যদি কোনও সংস্থার প্রধান কর্ম্মীরা একটা মিথ্যা লজ্জায় আমাদের নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাদেরও অপরাধ হয়। যদি কোনও বেতনভোগী ভৃত্য হিসাব দিতে বাধ্য থাকে, তবে স্বেচ্ছাসেবক আরও ডবল বাধ্য, কেননা স্বেচ্ছাসেবকের সেবা করার সন্তোষই তাহার বেতন। ইহা বড়ই গুরুতর বিষয় এবং অনেক সংস্থায় এবিষয়ে যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় না বলিয়াই এখানে, এসম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বক্রনীতি

আমরা কেপটাউনে পঁহুছামাত্র বুঝিলাম যে, আমরা ম্যাডিরাতে যে টেলিগ্রাম পাইয়াছিলাম তাহার মূল্য অযথা বেশী মনে করিয়াছিলাম। আমরা জোহানেসবর্গে গিয়া তাহা আরও বেশী বুঝিলাম। মিঃ রিচ্ টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এজন্য দায়ী নহেন। পাস না হইতে দেওয়ার সম্বন্ধে তিনি যতটুকু শুনিয়াছিলেন তাহাই জানাইয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ট্রান্সভাল তখন 'ক্রাউন কলোনি' ছিল। 'ক্রাউন কলোনি'র একজন এজেণ্ট বিলাতে থাকেন। তাঁহার কাজ হইতেছে, কলোনি সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারীকে সর্ব্ব বিষয়ে অবহিত রাখা। এই সময় ট্রান্সভালের খ্যাতনামা আইনব্যবসায়ী সার রিচার্ড সলমন এজেণ্ট ছিলেন। লর্ড এলগিন তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াই ঐ ঘাতকী আইনে অসম্মতি দিয়াছিলেন। ১৯০৭ সালের ১লা জানুয়ারী ট্রান্সভালকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়। লর্ড এলগিন সার রিচার্ডকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যদি ঠিক ঐ আইনই উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে রাজ-অনুমতি অস্বীকৃত হইবে না। কিন্তু ট্রান্সভাল যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'ক্রাউন কলোনি' আছে ততক্ষণ ঐ ধরণের আইনে জাতিবর্ণের ভেদ বৃটিশ রাজনীতির বিরুদ্ধ বলিয়া ইম্পিরিয়াল সরকার সম্মতি দিতে পারেন না। এবং তিনিও মহামান্য সম্রাটকে ঐ আইন প্রত্যাখ্যান করিতে পরামর্শ না দিয়া পারেন না।

যদি ঐ আইনটায় নামে মাত্র অসম্মতি দেওয়া হয়, অথচ যদি ট্রান্সভালে ইউরোপীয়দিগকে নিজ ইচ্ছামত চলিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যায়, তবে মিঃ সলমনের এমন সুন্দর বন্দোবস্তে আপত্তি করার কিছুই থাকিতে পারে না। আমি ইহাকে বক্রনীতি বলিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহাকে এতদপেক্ষা ন্যায়তঃ কঠোরতর বিশেষণে অভিহিত করা যায়। বড় সরকার 'ক্রাউন কলোনির' আইনের জন্য সরাসরি দায়ী, সেইজন্য উহার শাসন-পদ্ধতির মধ্যে জাতিবর্ণ ভেদ করার স্থান নাই, এ উত্তম কথা। একথাও বুঝা যায় যে, দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার প্রাপ্ত উপনিবেশের আইনের উপর বড় সরকারের কোনও হাত নাই। কিন্তু উপনিবেশের এজেন্টের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই রাজসম্মতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখা, বৃটিশ রাজ্যনীতির [illegible] যাহাদের স্বার্থ নষ্ট করা হইল তাহাদের প্রতি ইহা [illegible] না হয় তবে কি? বস্তুতঃ লর্ড এলগিন তাঁহার [illegible] ট্রান্সভালে ইউরোপীয়ানদিগকে তাহাদের ভারতীয় [illegible] হইতেই করিলেন। যদি তাহাই করা তাঁহার উদ্দেশ্য [illegible] কে সে কথা সোজাসুজিই বলা তাঁহার উচিত ছিল। [illegible] দায়িত্বপূর্ণ শাসনপ্রাপ্ত উপনিবেশেও, আইনের জন্য বড় [illegible] হইতে মুক্তি নাই। এই সকল উপনিবেশও বৃটিশ [illegible] সূত্রগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা [illegible] কোনও উপনিবেশই দাসপ্রথা আইন-সিদ্ধ করিতে [illegible] লর্ড এলগিন ঐ ঘাতকী আইন অন্যায় বলিয়াই [illegible] থাকেন, আর কেবল সেইজন্যই তিনি উহা প্রত্যাখ্যান [illegible] তাহা হইলে তাঁহার স্পষ্ট কর্ত্তব্য ছিল, সার রিচার্ড [illegible] ত ভাবে এই কথা বলা যে, দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকার

দেওয়ার পরেও এপ্রকার অন্যায় আইন ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তন করিতে পারেন না এবং উহা করাই যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয় তবে ট্রান্সভালকে উচ্চতর অধিকার দেওয়ার সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ বিচার করিবেন। অথবা তিনি সার রিচার্ডকে একথাও বলিতে পারিতেন যে, ভারতীয়দের স্বার্থ সুরক্ষিত হইলেই দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট দেওয়া যাইতে পারিবে। এই প্রকার সরল পথ না লইয়া লর্ড এলগিন ভারতীয়দিগের প্রতি বান্ধবতার একটা বাহ্য চেহারা দেখাইলেন, অথচ তখনই তিনি বস্তুতঃ পক্ষে ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিলেন এবং যাহাতে নিজে একবার অসম্মতি দিয়াছেন সেই আইন পাস করিতে বস্তুতঃ সহায়কই হইলেন। বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক বক্রনীতি গৃহীত হওয়ার এই প্রথম অথবা একমাত্র উদাহরণ নহে। যাঁহারা ইতিহাস ভাসা ভাসাও জানেন, তাঁহারাও এইরূপ আরো ঘটনার কথা বলিতে পারিবেন।

জোহানেসবর্গে প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল—লর্ড এলগিনের আমাদের ও ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের উপর এই চালাকী খেলার কথা। আমরা ম্যাডিরায় যেমন আনন্দিত হইয়াছিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকায় পঁহুছিয়া আমাদের নিরাশা তেমনি গভীর হইল। তবুও এই চালাকির তৎকালীন ফল এই হইল যে, সম্প্রদায় পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক উৎসাহান্বিত হইল। আমাদের সকলেই বলিলেন—আমাদের যুদ্ধ ত ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট কি সাহায্য করেন তাহার অপেক্ষা না রাখিয়াই চালানো হইবে; সুতরাং ভয়ের কোনও হেতুই নাই। আমরা সাহায্যের জন্য কেবল নিজেদের অন্তরের দিকেই চাহিব এবং যে ঈশ্বরের নামে আমরা প্রতিজ্ঞা লইয়াছি তাঁহার দিকে দেখিব। বক্রনীতিও সময়ক্রমে সরল হইয়া যাইবে, যদি আমরা নিজেদের কাছে ঠিক থাকি।

ট্রান্সভালে দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। নূতন পার্লামেণ্ট প্রথমেই বজেট পাস করিলেন। আর তাহার পরেই উহাতে এশিয়াটিক আইন পাস হইল। এই আইন পূর্ব্বের খসড়ারই অনুরূপ ছিল, কেবল একটা তারিখ, সময় চলিয়া যাওয়ার জন্য হঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ২১শে মার্চ্চ ১৯০৭ সালের একটা বৈঠকেই হুড়াহুড়ি করিয়া শেষ করিয়া ফেলা হয়। পূর্ব্বে যে রাজসম্মতি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল তাহা স্বপ্নের মত বিস্মৃতির গর্ভে প্রবেশ করিল। ভারতীয়েরা প্রথানুযায়ী আবেদন নিবেদন করিল, কিন্তু তাহাদের কথা কে শোনে? ১৯০৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ঐ আইন বলবৎ হওয়ার কথা। ভারতীয়দিগকে তদনুসারে ৩১শে জুলাই-এর পূর্ব্বে রেজেষ্টারী করিতে আদেশ করা হইল। এই সময়টা যে দেওয়া হইল তাহা ভারতীয়দের প্রতি দয়া করিয়া নহে, ঠেকিয়া পড়িয়াই উহা দেওয়া হইয়াছিল। রীতি মাফিক সম্রাটের অনুমোদন লইতে কতকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার কথা, আর আইন অনুযায়ী কর্ম্ম ইত্যাদি করিতে বিভিন্ন স্থানে পাস দেওয়ার আফিস খুলিতেও সময় অতিবাহিত হওয়া অপরিহার্য্য। তাই এই বিলম্বটা [illegible] সরকারের নিজের সুবিধার জন্যই করা হইয়াছিল।

ষোড়শ অধ্যায়

আমদ মহম্মদ কাছলীয়া

যখন এই ডেপুটেশনে বিলাত যাইতেছিলাম তখন আমি একজন ইংরাজের সহিত এশিয়াটিক আইন সম্বন্ধে কথা বলি। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতেছিলেন। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলেন যে, তাহা হইলে আমরা কুকুরের গলার কলারটা খুলিয়া ফেলিতে বিলাত যাইতেছি। তিনি ট্রান্সভালের পাস লওয়ার আইনকে কুকুরের কলারের সহিত তুলনা করেন। তিনি ঐ কথা বলিয়া ভারতবাসীদের প্রতি অবজ্ঞা এবং তাহাদের অপমানে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন, অথবা এ বিষয়ে তিনি যেমন তীব্রভাবে অনুভব করেন তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন তাহা আজ পর্য্যন্তও বুঝি নাই। কাহারও বাক্যের, তাহার প্রতি অবিচার না করা হয় এইপ্রকার অর্থ করার উত্তম রীতি অনুসরণ করিয়া আমি ধরিতেছি যে, তিনি তাঁহার তীব্র অনুভূতি ব্যক্ত করিতেই সে কথা বলিয়াছিলেন। সে যাহা হোক্, এক দিকে ট্রান্সভাল গবর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের গলায় এই কুকুরের কলার নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, অপর দিকে ভারতীয়েরা ট্রান্সভাল সরকারের এই দুষ্ট নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, এবং তাহাদের সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকার জন্য, ঐ কলার কোনক্রমেই না পরার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। আমরা ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে বন্ধুদিগকে পত্রদ্বারা এখানকার সমস্ত খবর দিতেছিলাম, যাহাতে তাঁহারা এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। কিন্তু সত্যাগ্রহ সংগ্রামে বাহ্যিক সাহায্য সামান্যই আবশ্যক হয়। কেবল অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাতেই উপকার হইতে

পারে। সম্প্রদায়ের প্রত্যেক অংশই যাহাতে যুদ্ধের উপযুক্ত হয় সেই জন্য নেতারা অধিক সময় দিতে লাগিলেন।

আমাদের বিশেষ একটা ভাবিবার বিষয় ছিল যে, কোন্ সভার সাহায্যে এই যুদ্ধ চালানো হইবে। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অনেক সভ্য ছিল। যখন ইহা স্থাপিত হয়, তখন সত্যাগ্রহের সৃষ্টি হয় নাই। এই সভা এতদিন কেবল এক আধটা নয়, অনেকগুলি খারাপ আইনের বিরুদ্ধে লড়িয়া আসিয়াছে, ভবিষ্যতেও লড়িবে স্থির করিয়াছিল। অন্যায় আইনের প্রতিরোধ করা ছাড়াও এই সভাকে আরও অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই সভার সকল সভ্যই সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়া ঘাতকী আইনের প্রতিরোধ করিতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন নাই। এই সভা যদি সত্যাগ্রহের সহিত যুক্ত হইয়া পড়ে, তাহাহইলে ইহার উপর যে বাহ্যিক চাপ আসিয়া পড়িবে সে কথাও ভাবিতে হয়। যদি গবর্ণমেণ্ট এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে রাজদ্রোহ বলেন ও ইহার সংশ্লিষ্ট সকল সভা সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া প্রচার করেন, তাহা হইলে কি হইবে? [illegible] সকল সভ্য সত্যাগ্রহী নয়, তাহাদের অবস্থা কি হইবে? [illegible] যখন সত্যাগ্রহের ধারণাও ছিল না, তখন যে-[illegible] অর্থ [illegible] হইয়াছে তাহারই বা কি হইবে? এ সমস্তই [illegible] সর্ব্বশেষে সত্যাগ্রহীরা ইহাও স্থির করিয়াছিল [illegible] যদি এই যুদ্ধ বিশ্বাসের অভাব বশতঃ অথবা দুর্ব্বলতা বশতঃ [illegible] না দিল, সত্যাগ্রহীরা তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ-[illegible] করিতে পারিবে না, তাহাদের সহিত প্রেমের ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া সত্যাগ্রহ ভিন্ন অন্য কার্য্যে তাহাদের সহিত [illegible] সঙ্গ দিবে।

এই সকল কারণ বশতঃ সম্প্রদায় এই স্থির করিলেন যে, পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত কোনোও সভা-সমিতির সাহায্য লইয়া সত্যাগ্রহ চালানো হইবে না এবং ঐ সমস্ত সভা-সমিতি, সত্যাগ্রহ ভিন্ন অন্য সমস্ত উপায়ে এই ঘাতকী আইনের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবে। সত্যাগ্রহের জন্য প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স এসোসিয়েশন নামে যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহা দ্বারাই কাজ চালানো হইবে। এই ইংরাজী নাম দেওয়ার হেতু এই যে, সভা যখন গঠিত হয় তখন সত্যাগ্রহ শব্দটা সৃষ্ট হয় নাই। নূতন সমিতির দ্বারা কাজ চালানো যে ভাল হইয়াছিল কালক্রমে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার সুপ্রতিষ্ঠিত কোনও সমিতির সহিত জড়িত হইয়া কাজ করিলে সত্যাগ্রহের হয়ত বাধা হইতে পারিত। অনেক লোক এই নূতন সমিতির সভ্য হইলেন এবং তাঁহারা মুক্ত হস্তে অর্থ দিলেন।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি ইহা দেখিতে পাইয়াছি যে, টাকার অভাবে কোনও আন্দোলন থামিয়া যায় না, অথবা মন্দা পড়ে না। ইহাতে একথা বুঝায় না যে, টাকা ছাড়া কোনও ঐহিক আন্দোলন চালানো যায়। যদি আন্দোলনের পশ্চাতে দক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ লোক থাকে, তবে আবশ্যকীয় অর্থ জুটিয়া যায়। আবার ইহার বিপরীত দিকে আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, যখন কোনও আন্দোলন অত্যধিক অর্থের বোঝার চাপে পড়ে, তখন তাহা খারাপ হইয়া যায়। সেই জন্যই যখন কোনও সার্ব্বজনিক সংস্থা স্থায়ী ফণ্ডের টাকার সুদ হইতে চালানো হয় তখন তাহাতে পাপ হয় একথা বলি না, তবে তাহাতে অত্যন্ত অসঙ্গত পথ অবলম্বন করা হয় বলিয়া মনে করি। জন সাধারণের নামে যে সংস্থা চলে, জন সাধারণই তাহার ব্যাঙ্ক এবং যদি সাধারণে ঐ প্রকার সংস্থা না চায় তবে তাহা সাধারণের নামে একদিনও চলা উচিত নয়।

যে সংস্থা সঞ্চিত ফণ্ডের টাকার সুদে চলে, সে সংস্থা লোকমতের উপর নির্ভর করে না এবং স্বেচ্ছাচারী ও আত্মাভিমানী হইয়া যায়। স্থায়ী ফণ্ডের টাকায় পরিচালিত সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সংস্থার দোষ দেখাইবার স্থান ইহা নয়। এই ব্যাপার এতই সাধারণ যে, যে ইচ্ছা করে সেই লক্ষ্য করিতে পারে।

আমরা আমাদের কথায় ফিরিয়া আসিব। আইন ব্যবসায়ী এবং ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরাই যে কেবল চুলচেরা তর্ক করিতে পারে তাহা নহে, আমি দেখিলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক ভারতবাসীও সূক্ষ্ম ভেদ ধরিতে ও সুন্দর বিতর্ক করিতে পারে। কেহ কেহ বলিলেন যে, সেই থিয়েটারে যে প্রতিজ্ঞা লওয়া হইয়াছিল তাহা প্রথমবার আইনে সম্মতি প্রত্যাহৃত হওয়ার পরেই শেষ হইয়া গিয়াছে। যাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল তাহারাই এই তর্কের আশ্রয় লইয়াছিল। এই যুক্তিতে জোর ছিল। কিন্তু যাহারা আইনের পশ্চাতে যে পাপপূর্ণ মতবাদ রহিয়াছে তাহারই প্রতিরোধকামী তাহাদের নিকট উক্ত তর্কের মূল্য ছিল না। তাহা হইলেও প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্বার করিয়া লইয়া নিরাপদ [illegible] বোধ করিয়াছিলাম। যদি দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা কি পরিমাণ হইয়াছে ইহাই তাহাও ইহাতে বুঝিতে পারা পথ ছিল [illegible] সভা করা হয়, অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া হয় ও নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করানো হয়। সম্প্রদায়ের তেজ পূর্ব্বের ন্যায় [illegible] আছে বলিয়া বুঝা গেল।

এদিকে জুলাই মাস শেষ হইয়া আসিতেছিল। ঐ মাসের শেষ তারিখে [illegible] রাজধানী প্রিটোরিয়াতে আমরা একটা বিরাট সভা [illegible] করিব বলিয়া স্থির করি। অন্যান্য স্থান হইতে [illegible] আসিতে নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রিটোরিয়ার মসজিদের

প্রাঙ্গণে এই সভা হয়। সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার পরে আমাদের সভায় এত লোক হইত যে, কোনও গৃহে সভা হওয়া অসম্ভব ছিল। ট্রান্সভালে সমুদয় ভারতীয়ের সংখ্যা ১৩০০০ হাজার-এর বেশী ছিল না। তাহার মধ্যে ১০,০০০ হাজার জোহানেসবর্গে বাস করিত। যেখানে সর্ব্বসাকুল্যে ১০,০০০ হাজার লোক বাস করে, সেখানে ২০০০ হাজার লোকের উপস্থিতি যে খুবই অধিক ও খুব সন্তোষ-জনক, ইহা যে কোনও সভা সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। অন্য কোনও উপায়ে সার্ব্বজনিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালানো সম্ভবই নহে। যেখানে যুদ্ধ অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে, সেখানে সকলে নিয়মানুবর্ত্তিতার শিক্ষা না লইলে যুদ্ধ চালানো যায় না। সেইজন্য এই প্রকার উপস্থিতি কর্ম্মীদিগের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই। প্রথম হইতেই উদ্যোক্তারা স্থির করিয়াছিলেন যে, খোলা স্থানেই সভা হইবে। ইহাতে একদিক দিয়া যেমন কোনও ব্যয় নাই, অপর দিক দিয়া তেমনি সভায় স্থানাভাব বশতঃ কাহারও ফিরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা নাই। এই সমস্ত সভা সাধারণতঃ খুবই শান্তভাবে পরিচালিত হইত। শ্রোতারা সমস্ত কথাই মনোযোগের সহিত শুনিতেন। যাহারা মঞ্চ হইতে অনেক দূরে থাকার জন্য শুনিতে পাইত না, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলার জন্য বক্তাকে অনুরোধ করিত। এই সকল সভায় যে চেয়ার থাকিত না, তাহা বলাই বাহুল্য। সকলেই মাটিতে বসিত। একটা ছোট মঞ্চ তৈয়ারী হইত, উহাতে কয়েকখানা চেয়ার বা টুল ও একটা টেবিল থাকিত, সভাপতি, বক্তা ও দুই একজন বন্ধুমাত্র সেখানে বসিতেন।

ইউসুফ ইস্মাইল মিঞা এই সভার সভাপতি হ'ন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সাময়িক সভাপতি ছিলেন। ঘার্ত্তকী আইনের

দাবি মত পাস লওয়ার সময় যত নিকট হইতে লাগিল, ভারতীয়েরা তাহাদের উৎসাহ সত্ত্বেও ততই চিন্তিত হইতেছিল। ওদিকে ট্রান্সভাল সরকারের সমস্ত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জেনারেল বোথা ও জেনারেল স্মাটস্ কিছু কম চিন্তিত ছিলেন না। একটা গোটা সম্প্রদায়কে উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবনমিত করিতে কেহ ইচ্ছা করে না। জেনারেল বোথা সেই জন্য এই সভায় আমাদিগকে উপদেশ দেওয়ার নিমিত্ত মিঃ উইলিয়াম হস্কিনকে পাঠাইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে এই মহোদয়ের সহিত পাঠকের পরিচয় হইয়াছে। সভায় তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের মিত্র। আমার একথা না বলিলেও চলে যে, এই বিষয়ে আমার সহানুভূতি আপনাদের দিকে। যদি আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আপনাদিগকে যাঁহারা প্রতিরোধ করেন, তাঁহাদের দ্বারা আমি আপনাদের কথা রাখাইতাম। আপনারা সকলেই জানেন যে, ট্রান্সভালের ইউরোপীয়েরা আপনাদের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কি প্রকার বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেন। আমি জেনারেল বোথার কথায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি আমাকে দিয়া তাঁহার বক্তব্য এই সভায় বলিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি আপনাদের প্রতি সম্মানের ভাব পোষণ করেন এবং আপনাদের এ বিষয়ে অনুভূতি কি প্রকার তাহাও বুঝিতে পারেন, কিন্তু তিনি নিরুপায়। ট্রান্সভালের সকল ইউরোপীয়ই এই প্রকার আইন চাহে এবং তিনি নিজেও ইহার আবশ্যকতা দেখিতেছেন। ট্রান্সভাল সরকার যে কত বড় শক্তিশালী তাহা ভারতীয়েরা অবশ্যই জানেন। এই আইনে আবার বিলাতের সরকারও সম্মতি দিয়াছেন। ভারতীয়েরা এ ক্ষেত্রে যাহা করার তাহা করিয়াছেন এবং মানুষের মত কাজ দেখাইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে যখন তাঁহাদের প্রতিরোধ

ব্যর্থ হইয়াছে এবং আইন পাস হইয়া গিয়াছে, তখন সম্প্রদায় এই আইন মান্য করিয়া তাঁহাদের রাজভক্তি ও শান্তিপ্রিয়তার পরিচয় দিলেই ভাল হয়। এই আইনের অন্তর্গত বিধি ব্যবস্থায় যদি আপনারা কোনও সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন, তবে জেনারেল স্মাটস্ তাহা খুব মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিবেন। আপনাদের নিকট আমার নিজেরও এই বক্তব্য যে, আপনারা জেনারেল বোথার ইচ্ছা পালন করিবেন। আমি একথা জানি যে, এই আইনের সম্বন্ধে ট্রান্সভাল সরকার দৃঢ়-সঙ্কল্প। এই আইনের বিরুদ্ধে গেলে কেবল প্রাচীরের গায় মাথা ঠোকার মত হইবে। আমি ইচ্ছা করি যে, আপনাদের সম্প্রদায় যেন নিরর্থক প্রতিরোধ দ্বারা নষ্ট না পান, অথবা নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া না আনেন।" আমি মিঃ হস্কিনের বক্তৃতা সভায় শব্দশঃ তরজমা করিয়া দিই। তারপর আমার নিজের তরফ হইতে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিই। মিঃ হস্কিন হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে আসন গ্রহণ করেন।

এইবার ভারতীয় বক্তাদের সভায় বলিবার পালা। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বর্গগত আমদ মহম্মদ কা[illegible]। [illegible] অধ্যায়ের নায়ক নহেন, এই সমস্ত বহিখানার [illegible] বলিয়া এবং একজন দোভাষী বলিয়া তাঁহাকে আমি তান [illegible]। তিনি ইহার পূর্ব্বে কখনো সাধারণের কাজে [illegible] নাই। [illegible] কাজ চালানোর মত ইংরাজী শিক্ষা করিয়[illegible] অভ্যাসের দ্বারা তিনি ইংরাজী ভাষাজ্ঞান এতটা বাড়াইয়া[illegible] যে, তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে যখন ইংরাজ উকীলদিগের নি[illegible] যাইতেন তখন দোভাষীর কাজ করিতেন। কিন্তু ঐ কা[illegible] ব্যবসা ছিল না, তিনি বন্ধুদিগকে সাহায্যের জন্য ঐ কা[illegible] করিতেন [illegible]

প্রথম কাপড় ফিরি করিতেন। তারপর তাঁহার ভাই-এর সহিত অংশে ছোট ব্যবসা করিতেন। তিনি সূর্ত্তি মেমান এবং তাহাদের সমাজে তাঁহার খুব নাম ছিল। তিনি গুজরাটী অল্পস্বল্প জানিতেন, কিন্তু ব্যবহারদ্বারা তাহাও ভালই শিখিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার মেধা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তিনি যাহা শুনিতেন তাহাই ধরিয়া লইতে পারিতেন। তিনি আইনের গোলমালের এত সুন্দর মীমাংসা করিতে পারিতেন যে, আমার আশ্চর্য্য লাগিত। তিনি উকীলদিগের সহিতও আইনের তর্ক করিতে দ্বিধা করিতেন না এবং তিনি যাহা বলিতেন তাহা উকীলদিগের বিবেচনার যোগ্য ছিল।

মিঃ কাছলীয়ার অপেক্ষা সাহসে অথবা দৃঢ়-নিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠতর একজন লোকও আমি এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা অথবা ভারতবর্ষে দেখি নাই। সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব তিনি হোম করেন। যে কথা দিতেন তাহা তিনি সব সময়েই রাখিতেন। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন ও সূর্ত্তি-মসজিদের তিনি একজন ট্রাষ্টি ছিলেন। তবুও তিনি হিন্দু মুসলমানের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি অন্ধভাবে মুসলমান পক্ষ লইয়া কখন হিন্দুর বিরোধিতা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি নাই। নির্ভীক ও নিষ্পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া তিনি কখনো হিন্দু বা মুসলমানদিগকে তাহাদের দোষের কথা বলিতে দ্বিধা করিতেন না। তাঁহার সরলতা ও নম্রতা অনুকরণীয় ছিল। তাঁহার সহিত অনেক বৎসরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করার পর আমার এই দৃঢ় মত যে, মিঃ কাছলীয়ার মত লোক যে কোনও সম্প্রদায়ে দুর্লভ।

প্রিটোরিয়ার সভায় তিনি একজন বক্তা ছিলেন। তিনি খুব অল্প কথায় বক্তৃতা শেষ করেন। তিনি বলেন—"এই ঘাতকী আইনের কথা প্রত্যেক ভারতীয়ই জানেন। ঐ আইনের যে কি অর্থ তাহা আমরা

সকলেই বুঝিয়াছি। মিঃ হস্কিনের বক্তৃতা আমি মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছি। আপনারাও শুনিয়াছেন। ঐ বক্তৃতায় আমাকে প্রভাবিত করিয়াছে। উহার প্রভাবে আমার প্রতিজ্ঞায় আমি আরও দৃঢ় হইয়াছি। ট্রান্সভালের সরকারের শক্তির কথা আমরা জানি। কিন্তু এই ঘাতকী আইন অপেক্ষা আর অধিক ভয়ের জিনিষের কথা কি কেহ বলিতে পারেন? আমাদিগকে জেলে দিবে, নির্ব্বাসিত করিবে, আমাদের মাল ক্রোক করিয়া বেচিয়া দিবে,—এ সকলই সহ্য করা যায় কিন্তু এ আইন সহ্য করা যায় না।" আমি লক্ষ্য করিলাম যে, এই সকল কথা বলিতে আমদ মহম্মদ কাছলীয়া খুব উত্তেজিত হইয়াছেন। তাঁহার চেহারা লাল হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার গলার ও কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছিল, শরীর কাঁপিতেছিল। নিজের ডাহিন হাতদ্বারা তাঁহার খোলা গলার উপর আঙ্গুল চালাইয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন "আমি ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, যদি ফাঁসিতেও যাই তবুও এই আইন মানিব না। আমি ইচ্ছা করি যে, এই সভাও যেন এই সঙ্কল্পই গ্রহণ করে।" এই কথা বলিয়া তিনি বসিয়া পরিলেন। তিনি যখন গলার উপর তাঁহার আঙ্গুল চালাইয়া দেখাইয়াছিলেন, তখন মঞ্চের উপর কেহ কেহ মুচ্‌কিয়া হাসিয়াছিলে[illegible] আমার [illegible] আমিও সেই হাসিতে যোগ দিয়াছিলাম। কথায় তিনি যেমন জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, কাজের বেলায়ও তিনি তেমনি জোর দেখা[illegible] পারিবেন কিনা, সে বিষয়ে আমার কিছু সন্দেহ ছিল [illegible] সে কথা মনে হইয়াছে তখনই এবং আজপর্য্যন্তও সে দিনের সেই [illegible] মনে করিয়া লজ্জা পাই। এই মহাযুদ্ধে যাঁহারা [illegible] প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন, মহম্মদ কাছলীয়া তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। কোনও দিন তাঁহার মধ্যে ক্লান্তি অ[illegible]

সভার সকলে তাঁহার এই বক্তৃতা হাততালির তুমল ধ্বনি দ্বারা সহর্ষে গ্রহণ করিয়া লইল। আমি তাঁহাকে যতটা জানিতাম, সে সময় তাহা অপেক্ষা অন্যে তাঁহার সম্বন্ধে অধিক জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, কাছলীয়া যাহা করিতে চায় তাহাই বলে এবং যাহা বলে তাহা করে। আরো উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা হইয়াছিল, কিন্তু আমি কেবল কাছলীয়ার বক্তৃতার কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি, কেননা তাঁহার এই বক্তৃতা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা দিয়াছিল। যাঁহারা সেদিন গরম গরম বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই শেষ পরীক্ষা পর্য্যন্ত টিকেন নাই। এই মহাপুরুষ এই মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার চার বৎসর পরে ১৯১৮ সালে দেহত্যাগ করেন।

আমি কাছলীয় শেঠের সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব, কেননা অন্যত্র সে কথা লেখার স্থান না হইতে পারে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাঠকগণ টলষ্টয় ফার্ম্মের কথা পড়িবেন। সেখানে কতকগুলি সত্যাগ্রহী পরিবার বাস করিতেন। শেঠ, তাঁহার ১০।১২ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, সে সেখানে সরল ও কর্ম্মময় জীবনগ্রহণ করিয়া অপরের আদর্শ স্বরূপ হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্য মুসলমানেরাও তাঁহাদের ছেলেদিগকে ফার্ম্মে পাঠাইয়াছিলেন। আলি নম্র, সত্যবাদী ও সরল বালক ছিল। ঈশ্বর তাহাকে, তাহার পিতা বাঁচিয়া থাকিতেই লইয়া যান। যদি ঈশ্বর তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতেন, তবে সে যে যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথম ভাঙ্গন

১৯০৭ সালের জুলাই শেষ হইল। পাস দেওয়ার আফিসগুলি খুলিল। সম্প্রদায়ের আদেশ ছিল যে, প্রত্যেক আফিসেই প্রকাশ্য ভাবে পিকেট করা হইবে। আফিসে যাওয়ার রাস্তায় স্বেচ্ছাসেবক থাকিবে। তাহারা অহিংস থাকিয়া যাহারা আফিসে যাইতে চাহিবে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে। প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকেরই ব্যাজ ছিল। সকল স্বেচ্ছাসেবককেই একথা শিখাইয়া দেওয়া হইত যে, পাস যাহারা কাটিতে যায় তাহাদের সহিত যেন অভদ্র ব্যবহার না করে। তাহারা তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিবে, আর যদি না বলে তবে বল-প্রকাশ করিবে না, অথবা অবিনয় দেখাইবে না। এই আইন দ্বারা কি অনিষ্ট হইবে তাহা বুঝাইয়া লেখা হ্যাণ্ডবিল, প্রত্যেক পাস-গ্রহণার্থীকে দিবে ও স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহাতে কি লেখা আছে বুঝাইবে এবং [illegible] ব্যবহার করিবে। পুলিশ যদি গালি দেয় বা [illegible] সহ্য করিবে। মার যদি সহ্য করিতে না [illegible] চলিয়া আসিবে, পুলিশ যদি গ্রেপ্তার করে তবে [illegible] জোহানেসবর্গে এইরূপ ঘটনা হইলে আমাকে [illegible] স্থানে হইলে সেই সেই স্থানের সম্পাদককে সংবা[illegible] নির্দে[illegible] মত কার্য্য করিবে। প্রত্যেক দলেরই কর্ত্তা নি[illegible] ছিল, [illegible] সেবকেরা তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলিবে.

সম্প্রদায়ের এই ধরণের কার্য্যের এই প্রথম [illegible]

ঊর্দ্ধ বয়স্ক সকলকেই পিকেট করিয়া লওয়া হইয়াছিল। ১২ হইতে ১৮ বৎসরের অনেক যুবক ভর্ত্তি হইয়াছিল। স্থানীয় কর্ম্মীর সহিত যাহার পরিচয় নাই, এমন লোককে লওয়া হইত না। এত সাবধানতার উপরেও প্রত্যেক সভায় এবং অন্য ভাবেও একথা বুঝানো হইত যে, যে ব্যক্তি স্বার্থ-হানির সম্ভাবনায় অথবা অন্য কারণে পাস লইতে ইচ্ছা করে, অথচ স্বেচ্ছা-সেবকের ভয় করে তাহাকে, সঙ্গে এক জন স্বেচ্ছাসেবক দিয়া নেতাদের পক্ষ হইতে পাস আফিসে পঁহুছিয়া দেওয়া হইবে, এবং তাহার কাজ হইয়া গেলে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে আবার নিরাপদে বাহির করিয়া দিবে। এই ব্যবস্থার সাহায্য কেহ কেহ লইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা অতিশয় উৎসাহের সহিত এই কার্য্য করিত। তাহারা সর্ব্বদাই নিজের কার্য্যে সতর্ক ও জাগ্রত থাকিত। সাধারণতঃ একথা বলা যায় যে, পুলিশের উৎপীড়ন বেশী ছিল না। কোথাও উৎপীড়ন হইলে স্বেচ্ছাসেবকেরা সহ্য করিয়া যাইত।

স্বেচ্ছাসেবকদের এই কাজে হাসি-তামাসা জুটিত। তাহাতে কখন কখন পুলিশও যোগ দিত। আমোদ করিয়া সময় কটাইবার জন্য তাহারা নানা উপায় উদ্ভাবন করিত। একবার রাস্তা আটকাইবার আইনে তাহাদের গ্রেপ্তার হয়। এই সত্যাগ্রহের সহিত অসহযোগ যুক্ত ছিল না, সেইজন্য আদালতে পক্ষ সমর্থনে বাধা ছিল না। সম্প্রদায়ের কার্য্যের জন্য উকীলের ফি না দিতে হয় সে ব্যবস্থাও অবশ্য করা হইয়াছিল। এই স্বেচ্ছাসেবকদিগকে আদালত নিরপরাধী বলিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহাতে তাহাদের উৎসাহ আরো বাড়িয়া যায়।

যদিও এই ভাবে যাহারা পাস লইতে চাহিত, তাহাদের উপর প্রকাশ্য অপমান বা বল-প্রয়োগ হইত না, তথাপি একথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আন্দোলন সম্পর্কে অন্য এক দল লোকের উদ্ভব হয় যাহারা

স্বেচ্ছাসেবক হইত না অথচ যে সব লোক পাস লইত, তাহাদিগকে মার-পিট বা অন্য ক্ষতি করার ভয় দেখাইত। ইহা পরিতাপের বিষয়। সংবাদ পাইয়া ইহা বন্ধ করার জন্য কড়া উপায় গ্রহণ করা হইয়াছিল। ফলে ভয় দেখানো বন্ধ হইলেও জিনিষটা নির্ম্মূল হইল না। ধমকের ভয়টা কাজ করিতেছিল, আর সেই পরিমাণে যে আমাদের আন্দোলনের ক্ষতি হইতে-ছিল তাহা আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। যাহাদের ভয় হইতেছিল তাহারা সরকারের সাহায্য চাহিল এবং গ্রহণ করিল। এই ভাবে কার্য্যের ভিতর বিষ সঞ্চারিত হইল। যাহারা দুর্ব্বল ছিল তাহারা আরও দুর্ব্বল হইল। ইহাতে বিষ বাড়িতেই লাগিল, কেন না দুর্ব্বলের ধর্ম্মই হইতেছে প্রতিশোধ লওয়া।

উপরি উক্ত মারপিটের ভয়ে বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু এক দিকে লোক নিন্দার ভয়, অপর দিকে স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতি বশতঃ লো[illegible] নিকট নামপ্রকাশ হওয়ার ভয়—এই উভয় ভয় খুব কাজ করিয়াছিল ঘাতকী আইন পছন্দ করিত এমন কেহই ছিল না। যাহারা পাস [illegible] তাহারা দুঃখ সহ্য করিতে অপারগ বলিয়াই লইত, আর সেই জন্য লইতে লজ্জাও পাইত।

এক দিকে যেমন লজ্জার ভয়, অপর দিকে তেমনি দোকানদারদিগের পক্ষে ব্যবসার ক্ষতি হওয়ার ভয়—এই দুই ভয় মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ভারতীয় পথ খুঁজিয়া করিলেন। তাঁহারা পাস আফিসের কর্ম্মচারীদের সহিত করিলেন যে, রাত্রি নয়টা দশটায় কোনও ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে আফিসের কর্ম্মচারীরা আসিবেন, এবং সেই সময় তাঁহারা পাস লইবেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, এরূপ করিলে তাঁহাদের পাস ল[illegible] সংবাদটা গোপন থাকিবে এবং তাঁহারা নেতা বলিয়া তাঁ[illegible]

দেখিয়া অপরেও এই আইন মানিয়া লইবে। তাহাতে তাঁহাদের লজ্জার ভারও কম হইবে এবং পরে লোকে যখন জানিয়া যাইবে তখন সে জন্য আর বেশী কিছু চিন্তা করিতে হইবে না।

কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের দৃষ্টি এত সতর্ক ছিল যে, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহা হইতেছে সে সংবাদ সম্প্রদায় পাইত। এশিয়াটিক আফিসেও এমন লোক ছিল যাহারা আসিয়া সত্যাগ্রহীদিগকে সংবাদ দিত। আবার এমন লোকও ছিল যাহারা নিজে দুর্ব্বল হইয়াও নেতারা যে দুর্ব্বল হইবে তাহা সহ্য করিতে পারিত না এবং নেতারা যদি দৃঢ় থাকে তবে তাহারাও থাকিতে পারিবে এই ভরসায় তাহারা সত্যাগ্রহীদিগকে সংবাদ বলিয়া দিত। এই প্রকার সতর্কতার জন্য সম্প্রদায় সংবাদ পাইল যে, অমুক রাত্রে, অমুক দোকানে, অমুক লোকেরা পাস করাইতে যাইবে। সেইজন্য সম্প্রদায় হইতে প্রথমতঃ তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইল। তাহা ছাড়া দোকানে পাহারা বসানো হইল। কিন্তু লোকে দুর্ব্বলতা আর কত দাবাইয়া রাখিবে? রাত্রি দশ এগারটার সময় ঐ ভাবেই কয়েকজন নেতা পাস করিয়া লইলেন। এই ভাবে ভাঙ্গন ধরিল। পরদিন সম্প্রদায় ইহাদের নাম প্রকাশ করিয়া দিলেন। কিন্তু লজ্জার সীমা আছে। যখন স্বার্থ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায় তখন লজ্জা সরম পলায় ও লোকে পথ-ভ্রষ্ট হয়। এই প্রাথমিক দুর্ব্বলতার আশ্রয়ে প্রায় পাঁচ শত লোক পাস করিয়া লইল। দিন কতক এই ভাবে পাস করার জন্য ব্যক্তিগত দোকান ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কিন্তু যেমন লজ্জার ভাব কমিয়া যাইতে লাগিল, তেমনি ইহারা প্রকাশ্যভাবেই আফিসে গিয়া পাস লইয়া আসিতেছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রথম সত্যাগ্রহী কয়েদী

যখন এত চেষ্টা করিয়াও পাঁচশতের বেশী লোককে দিয়া এশিয়াটিক বিভাগ পাস লওয়াইতে পারিল না, তখন কাহাকেও না কাহাকেও ধরিবে বলিয়া স্থির করিল। পাঠকেরা জার্মিষ্টনের নাম জানেন। সেখানে অনেক ভারতীয় বাস করিত এবং তাহাদের মধ্যে রামসুন্দর পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে দেখিতে যেমন বাহাদুর ছিল, কথাতেও তেমনি মজবুত ছিল। সে কিছু কিছু শ্লোকও আওড়াইতে জানিত। উত্তর ভারতবাসী বলিয়া সে কিছু রামায়ণের দোঁহা চৌপাই জানিত, আবার নামেও ছিল পণ্ডিত। কাজেই লোকের মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। সে বেশ বক্তৃতা দিতে পারিত, আর তাহার কথার মধ্যে তেজও ছিল। কতকগুলি অনিষ্টকামী লোক এশিয়াটিক বিভাগে জানাইল যে, যদি রামসুন্দর পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করা যায় তবে অনেক লোক আসিয়া পাস লইতে পারে। এই লোভে পড়িয়া কি আর রামসুন্দর পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার না করিয়া এশিয়াটিক বিভাগ থাকিতে পারেন? রামসুন্দর পণ্ডিত গ্রেপ্তার হইল। এই জাতীয় গ্রেপ্তারী এই প্রথম বলিয়া সরকারের এবং সম্প্রদায়ের উভয়ের মধ্যেই খুব চাঞ্চল্য দেখা দিল। যে রামসুন্দর পণ্ডিতকে কেবল জার্মিষ্টন জানিত, তাহাকে সারা দক্ষিণ আফ্রিকা এক মুহূর্ত্তেই জানিয়া গেল। একজন মহাপুরুষের বিচার আরম্ভ হইলে যাহা হইতে পারে, রামসুন্দরের মামলার বেলায় লোকের নজর তেমনি তাহার

উপর পড়িল। যদিও সরকারের শান্তি রক্ষার কোনও আয়োজন করার দরকার ছিল না তথাপি সে ব্যবস্থা করা হইল। রামসুন্দর যেন সামান্ত অপরাধী নয়, একজন প্রতিনিধি, আদালত এই ভাবে তাহাকে মর্য্যাদা দিলেন। আদালত উৎসুক ভারতীয়দের দ্বারা ভরিয়া গেল। রামসুন্দরের এক মাসের অশ্রম কারাদণ্ড হইল। তাহাকে জোহানেসবর্গের জেলে রাখা হইল। তাহার জন্ত ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে আলাদা কামরা দেওয়া হইল। তাহার সহিত দেখাশুনা করার কোনও অসুবিধাই ছিল না। বাহির হইতে খাত্ত দেওয়া চলিত বলিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাহাকে উত্তম খাত্ত পাক করিয়া পাঠানো হইত। তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই পাইত। তাহার জেল হওয়ার দিন সম্প্রদায় খুব ধুমধাম করে। কেহ হতাশ না হইয়া বরঞ্চ উৎসাহিতই হইয়াছিল। জেলে যাওয়ার জন্ত শত শত লোক প্রস্তুত হইল। এশিয়াটিক বিভাগের আশা সফল হইল না। জার্মিষ্টনের এক ব্যক্তিও পাস লইতে গেল না। সম্প্রদায়েরই লাভ হইল। এক মাস পূর্ণ হইল, গান বাজনা ও প্রসেসন সহকারে রামসুন্দরকে সভাস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। উৎসাহের সহিত বক্তৃতা হইল। রামসুন্দরকে ফুলের মালায় বোঝাই করিয়া ফেলা হইল। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহার সম্মানার্থে এক ভোজ দিল। এই রকম জেলে যাইতে পারিলে কি মজাই হইত ভাবিয়া মনে মনে শত শত ভারতীয় রামসুন্দরের সৌভাগ্যে ঈর্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু রামসুন্দর অচল পয়সা বলিয়া ধরা পড়িয়া গেল। একমাসের জন্ত জেলে না গিয়া তাহার উপায় ছিল না, কেন না তাহাকে হঠাৎ ধরা হয়। বাহিরে যে বাবুগিরি সে করিতে পারিত না, জেলে তাহার সে সকল জুটিয়াছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্যসনাসক্ত, সে জেলের ভিতরে যে একাকী থাকিতে হয়, এবং নানা খাত্ত পাইলেও যে সংযম সহ্য করিতে হয়,

তাহা পারে না। রামসুন্দর পণ্ডিতের সেই অবস্থা হইয়াছিল। সম্প্রদায়ের ও জেল-কর্ম্মচারীদের এত আদরেও তাহার জেল কষ্টকর লাগিয়াছিল। সে ট্রান্সভালকে এবং সত্যাগ্রহকে নমস্কার করিয়া চম্পট দিল। সব সম্প্রদায়েই এবং প্রত্যেক কার্য্যেই খেলোয়াড় লোক থাকে, আমাদেরও ছিল। ইহারা রামসুন্দরকে হাড়ে হাড়ে জানিত। কিন্তু তাহার দ্বারা সম্প্রদায়ের কিছু উপকার হইবে এই বিশ্বাসে সে উধাও হওয়ার পূর্ব্বে তাহার গুপ্ত ইতিহাস আমাকে কেহ জানিতে দেয় নাই। পরে জানিলাম যে, রামসুন্দর গিরমিটিয়া, গিরমিট পূর্ণ না করিয়াই পলাইয়া আসিয়াছে। সে যে গিরমিটিয়া ছিল সে কথা বলায় ঘৃণা প্রকাশ করা হইতেছে না। গিরমিটিয়া হওয়ায় পাপ নাই। পাঠকেরা শেষ দিকে দেখিবেন যে, গিরমিটিয়ারা এই আন্দোলনে অতিশয় শোভনীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করার একটা বড় অংশ তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল। রামসুন্দরের গিরমিট শেষ করিয়া না আসা অবশ্যই অন্যায় হইয়াছিল।

রামসুন্দরের এত কথা তাহার দোষ দেখাইবার জন্য লিখি নাই, উহাতে যে রহস্য ছিল তাহাই জানাইবার জন্য লিখিয়াছি। প্রত্যেক শুদ্ধ যুদ্ধের নেতাদের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা যেন শুদ্ধ লোককেই শুদ্ধ যুদ্ধে নিয়োগ করেন। কিন্তু সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও অশুদ্ধ লোক আটকাইয়া রাখা যায় না। কিন্তু যদি সঞ্চালক নির্ভীক ও খাঁটি হন, তবে অজ্ঞাতসারে অশুদ্ধ লোক প্রবেশ করিলেও অন্তিমে তাহাতে ক্ষতি হয় না। যখন রামসুন্দরের পরিচয় পাওয়া গেল, তখন সে নগণ্য হইয়া গেল। তখন পণ্ডিত উড়িয়া গিয়া কেবল রামসুন্দরই রহিল। সম্প্রদায় তাহাকে ভুলিয়া গেল, কিন্তু লড়াইয়ে জোর পাওয়া গেল। সে যে জেল ভুগিয়া গেল তাহার ফল হইয়াছিল। সে জেলে যাওয়ায় আন্দোলনে

যে জোর আসিয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইয়া রহিয়া গেল। আর তাহার অবস্থা দেখিয়া অন্য দুর্ব্বল লোকে নিজেরাই যুদ্ধ হইতে সরিয়া পড়িল। আরও এই প্রকার দুর্ব্বলতার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে, একথা ঠিক। তাহাদের নামধামের সহিত তাহাদের ইতিহাস দেওয়ার আবশ্যক নাই। তাহাতে কোনও প্রয়োজনও সাধিত হইবে না। সম্প্রদায়ের শক্তি কোথায় এবং দুর্ব্বলতা কোথায় ইহাই দেখাইবার জন্য একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, রামসুন্দর একজন নহে, অনেক ছিল। কিন্তু সকল রামসুন্দরই যুদ্ধে সেবাই করিয়া গিয়াছে।

পাঠক যেন রামসুন্দরের প্রতি বিদ্রূপের কটাক্ষ না করেন। সকল লোকই অসম্পূর্ণ, কিন্তু যখন কাহারও মধ্যে অপরের অপেক্ষা অধিক অপূর্ণতা দেখা যায় তখন লোকে তাহাকে দেখাইয়া দোষ দিয়া থাকে। বাস্তবিক ইহা ভুল। রামসুন্দর ত ইচ্ছা করিয়া দুর্ব্বল হয় নাই। মানুষ নিজের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারে, স্বভাবের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা সম্পূর্ণরূপ অন্য ভাবাপন্ন কে করিতে পারে? জগদীশ্বর এই স্বাধীনতাটা মানুষকে দেন নাই। বাঘের পক্ষে নিজের গায়ের ডোরা বদলানো যেমন অসম্ভব, মানুষের পক্ষেও তেমনি স্বভাবের বিচিত্রতা বদলানো অসম্ভব। পলাইয়া গেলেও, রামসুন্দরের দুর্ব্বলতার জন্য তাহার নিজের ভিতরে কতটা অনুতাপ হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? সে যে পলাইল, ইহাও তাহার অনুতাপের একটা বিশেষ প্রমাণ বলিয়াই বা কেন গণ্য হইবে না? সে যদি নির্লজ্জ হইত, তাহা হইলে তাহার পলাইবার প্রয়োজনই থাকিত না। সে যদি পাস করাইয়া লইত, তাহা হইলে তাহাকে ত আর জেলে যাইতে হইত না। আরো কিছু গুরুতর কার্য্যও সে করিতে পারিত, এশিয়াটিক বিভাগের দালাল হইয়া অপরকে ভুলাইতে পারিত,—

সরকারের নিকট গণ্য-মান্য একজন হইতে পারিত। এই সকল না করিয়া সে যে দুর্ব্বলতার জন্য সম্প্রদায়ের কাছে মুখও দেখাইতে চাহিল না এবং এতদ্বারা সম্প্রদায়ের যে সেবা করিল—এই প্রকার উদার ভাবে তাহার কার্য্য গ্রহণ না করার হেতু নাই।

উনবিংশ অধ্যায়

ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন

সত্যাগ্রহের যুদ্ধের জন্য সকল অস্ত্র—আন্তরিক ও বাহ্য অস্ত্র মাত্রেরই পরিচয় পাঠককে দেওয়া হইতেছে বলিয়া, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে যে সাপ্তাহিক এখন পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে, তাহার সহিত পরিচিত করানোর আবশ্যকতা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়-দের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র বাহির করার সম্মান মদনজিৎ ব্যবহারিক নামে এক গুজরাটি মহোদয়ের প্রাপ্য। কয়েক বৎসর ধরিয়া কষ্টেস্বষ্টে একটা ছাপাখানা চালাইবার পর, ইনি একখানা সংবাদপত্র বাহির করার ইচ্ছা করেন। তিনি স্বর্গগত মনসুখলাল নাজর ও আমার পরামর্শ লন। সংবাদপত্র ডারবান হইতে প্রকাশিত হইল। মনসুখলাল নাজর অবৈতনিক সম্পাদক হইলেন। সংবাদপত্রে প্রথম হইতেই লোকসান হইতেছিল। অবশেষে যাহারা কাজ করিত তাহাদিগকে অংশীদার অথবা অংশীদারের মত করিয়া, একটা গোলাবাড়ী কিনিয়া লইয়া, সেখানে সেই সকল লোকের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, সেইস্থান হইতেই কাগজ চালানো স্থির করিলাম। এই স্থান ডারবান হইতে ১৩ মাইল দূরে এক সুন্দর পাহাড়ের উপর অবস্থিত। উহা নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন 'ফিনিক্স' হইতে ৩ মাইল দূরে। সংবাদপত্রের নাম প্রথম হইতেই "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" আছে। একসময় উহা ইংরাজী, গুজরাটী, তামিল ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইত। তামিল ও হিন্দী অংশ শেষকালে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উহা নানারকমেই ভার-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। ফিনিক্সে থাকিতে চায় এমন কোনও তামিল

বা হিন্দী কম্পোজিং জানা লোক পাওয়া যাইতেছিল না, তেমনি লেখকও পাওয়া যাইতেছিল না, আর পাওয়া গেলেও সে লেখার উপর তত্ত্বাবধান রাখার উপায় ছিল না, এই সকল কারণেই ঐ দুই বিভাগ বন্ধ করিয়া ইংরাজী ও গুজরাটীতে চালানো হইতে থাকে। যখন সত্যাগ্রহ যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন এইভাবে ইহা চলিতেছিল। তখন ঐ স্থানে বাসিন্দাদের মধ্যে গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, তামিল ও ইংরাজ প্রভৃতি জাতি ছিলেন। মনসুখলাল নাজরের অকাল মৃত্যুর পর হাবার্ট কিচিন নামে এক ইংরাজ মিত্র সম্পাদক হইলেন। তাহার পর সদাশয় পাদ্রী ডোক কিছুদিন ছিলেন। এই সংবাদপত্রের সাহায্যে প্রতিসপ্তাহে ভাল করিয়া সমস্ত খবর দেওয়া যাইত। যে সকল ভারতীয় গুজরাটী জানিত না ইংরাজীর সাহায্যেও তাহারা সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কতকটা শিক্ষালাভ করিত, ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজদিগের জন্য 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' দ্বারা সাপ্তাহিক সংবাদসহ পত্র দেওয়ার কাজ চলিত। আমি এইরূপ মনে করি যে, আন্তরিক বলের উপর যে যুদ্ধ প্রধানতঃ নির্ভর করে, সে যুদ্ধ সংবাদপত্র ব্যতীতও চালানো যায়। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইবে যে, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' থাকার জন্য যে সুবিধা হইয়াছিল, সম্প্রদায়কে সহজে যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইতেছিল, পৃথিবীতে যেখানে যেখানে ভারতবাসী আছে সেখানে সেখানে যেমন ইহা দ্বারা প্রচার হইতেছিল, তাহা অন্য উপায়ে কখনো হইতে পারিত না। সেইজন্য একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, এই যুদ্ধে অন্যান্য অস্ত্রের মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নই' খুব উপযুক্ত ও শক্তিশালী অস্ত্র হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের জন্য এবং যুদ্ধ-কালে সম্প্রদায়ের যেমন পরিবর্ত্তন হইতেছিল, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'রও তেমনি হইতেছিল। এই সংবাদপত্রে প্রথমে

বিজ্ঞাপন লওয়া হইত। ছাপাখানাতেও বাহিরের কাজ লইয়া ছাপা হইত। আমি দেখিতে পাইলাম যে, এই দুই কাজে সব চাইতে ভাল ভাল লোকের লাগিয়া থাকিতে হয়। বিজ্ঞাপন লওয়াতে, কোন্‌টা গ্রহণ-যোগ্য আর কোন্‌টা গ্রহণ-যোগ্য নহে তাহা স্থির করিতে প্রায়ই ধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইত। একটা বিজ্ঞাপন হয়ত লওয়ার উপযুক্ত নয়, অথচ সেটা সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রেরিত, তাঁহার মনে দুঃখ দেওয়ার ভয়ে তখন অন্যায় বিজ্ঞাপন লওয়ার লালসায় পড়িতে হয়। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিতে ও তাহার দাম আদায় করিতে ভাল ভাল লোকের সময় যায়, তাহা ছাড়া খোসামুদি করিতে ত হয়ই। এই সকল কথার সহিত ইহাও ভাবিতে লাগিলাম যে, এই সংবাদপত্র অর্থ রোজগারের জন্য নয়, ইহা সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই। তাহা হইলে, এই সেবা জবরদস্তী করিয়া সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপানো ঠিক নহে, যদি সম্প্রদায় ইচ্ছা করে তবেই ইহা চালানো উচিত। সম্প্রদায়ের ইহা চালাইবার ইচ্ছার খাঁটি প্রমাণ ইহাই হইবে যে, ইহার গ্রাহক-সংখ্যা এত হইবে যে, ইহা স্বাবলম্বী হইতে পারে। অবশেষে আমাদের মনে হইল যে, সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদপত্র সম্বন্ধে তাহাদিগকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া সকলের পক্ষেই ভাল। কয়েকজন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের লোভে, সেবার নামে, তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে যাওয়া অপেক্ষা উপরোক্ত ব্যবস্থাই উত্তম মনে হইল। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা বিজ্ঞাপন লওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। ফলে, যাহারা বিজ্ঞাপনের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, তাহারা এখন কাগজখানার উন্নতির জন্য সময় দিতে পারিল। সম্প্রদায় শীঘ্রই একথা বুঝিতে পারিল যে, তাহারাই কাগজখানার মালিক এবং সেই জন্য চালাইবার দায়িত্বও তাহাদেরই। এইদিক দিয়া আমরা, যাহারা কাজ চালাইতাম,

নিশ্চিন্ত হইয়া গেলাম। কর্ম্মীদের এখন একমাত্র চেষ্টা রহিল যে, যদি সম্প্রদায় কাগজ চায়, তবে তাহার জন্য পুরাপুরি খাটিয়া খালাস হওয়া। সকলকেই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' পাঠক হওয়ার জন্য বলিতে আর কোন লজ্জাও রহিল না। বরঞ্চ ঐ প্রকার বলাই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র আন্তরিক বল বাড়িয়া গেল, কাগজের ভিতর দিয়া একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, উহা একটা প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হইল। সাধারণতঃ ১২০০।১৫০০ হাজার ছাপা হইত। দিন দিন ছাপার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। চাঁদাও বাড়াইতে হইয়াছিল। তবুও যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন জোর চলিতেছিল তখন ইহার ৩৫০০ হাজার গ্রাহক হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায়, যাহারা 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পড়িতে পারিত তাহাদের সংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশী ছিল না। সেই জন্য তিন হাজারের উপর কাটতি খুবই সন্তোষজনক বলিতে হইবে। সম্প্রদায় কাগজখানাকে এমনি আপনার করিয়া লইয়াছিল যে, যদি সময় মত কখনো জোহানেসবর্গে উহা না আসিয়া পঁহুছিত, তবে আমাকে রাশি রাশি অভিযোগ শুনিতে হইত। সাধারণতঃ কাগজখানা জোহানেসবর্গে রবিবার প্রাতে পঁহুছিত। আমি এমন অনেকের কথা জানি, যাহাদের হাতে কাগজখানা পড়িলেই গুজরাটী অংশটা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া তবে ছাড়িত। একজন পড়িত, আর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া শুনিত। যাহারা পড়িতে চাহিত, তাহারা সকলে চাঁদা দিতে পারিত না, এজন্য কয়েকজনে মিলিয়া উহার গ্রাহক হইত।

আমরা যেমন বিজ্ঞাপন লওয়া বন্ধ করিলাম, তেমনি ছাপাখানায় বাহিরের কাজ লওয়াও অনুরূপ কারণেই বন্ধ করিলাম। কম্পোজিটারদের হাত কতকটা ফাঁকা হইল। তাহাদের এই সময়টা পুস্তক প্রকাশের জন্য দিতে পারা গেল। এখানেও পুস্তক বিক্রয় করিয়া লাভের আশা রাখা

হয় নাই বলিয়া ও যাহাতে এই যুদ্ধের সাহায্য হয় সেই সকল বহি ছাপা হইতেছিল বলিয়া, বহিগুলির কাটতিও খুব হইয়াছিল। এইভাবে কাগজ ও ছাপাখানা দুই-ই এই যুদ্ধে তাহাদের দেয় সাহায্য করিয়াছিল। আবার, এদিকে সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যাগ্রহের ভাবও যেমন বদ্ধমূল হইতেছিল, তেমনি কাগজ ও প্রেসেরও সত্যাগ্রহের দৃষ্টিতে নৈতিক উন্নতি হইতেছিল।

বিংশ অধ্যায়

ধর পাকড়

রামসুন্দরকে জেলে দিয়া সরকারের কোনও সুবিধা হইল না—ইহা আমরা দেখিয়াছি। উপরন্তু সরকার দেখিলেন যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের উৎসাহ বাড়িতেছে। এশিয়াটিক বিভাগের কর্ম্মচারীরা মনোযোগের সহিত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পড়িতেন। এই আন্দোলন হইতে গুপ্তভাব একেবারে বর্জ্জন করা হইয়াছিল। আন্দোলনের অবস্থা কি রকম ছিল, আন্দোলনের শক্তি ও দুর্ব্বলতা কতখানি, তাহা 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র পাতায় পাতায় স্পষ্ট হইত, এবং উহা মিত্র, বিরোধী ও উদাসীনের কাছে সমানই প্রকট হইত। কর্ম্মীরা প্রথম হইতেই বুঝিয়া লইয়াছিল যে, এই আন্দোলনে লুকানো ছাপানোর কোনও স্থান নাই, কেননা এই আন্দোলনে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবে না, ইহাতে কপট আচরণ বা চালাকীর স্থান নাই, এবং ইহাতে জয়ের একমাত্র ভিত্তিই হইতেছে শক্তি। সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্যই ইহা একান্ত আবশ্যক ছিল যে, যদি দুর্ব্বলতা রোগ দূর করিতে হয়, তবে উহা ঠিক ঠিক কোথায় তাহা ধরিতে হইবে, এবং ধরিয়া ফেলিয়া উহা ভাল ভাবে প্রচার করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইবে। যখন কর্ম্মচারীরা দেখিলেন যে, ইহাই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' চালাইবার মূল মন্ত্র, তখন তাঁহাদের এই কাগজ হইতেই ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রকৃত অবস্থার চিত্র পাওয়ার কাজ চলিতে লাগিল। ইহা হইতেই তাঁহারা দেখিলেন যে, যতক্ষণ কতকগুলি নেতা জেলের বাহিরে আছেন ততক্ষণ এই আন্দোলনের শক্তি কোনও ক্রমেই খর্ব্ব

করা যাইবে না। সেইজন্য নেতাদের মধ্যে কয়েক জনের উপর ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে হুকুম দিলেন যে, তাঁহাদিগকে তাঁহার কোর্টে উপস্থিত হইতে হইবে। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই নোটিশ দিয়া সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীরা ভদ্রতাই দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ওয়ারেণ্ট দিয়াই নেতা কয়জনকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া নোটীশ দেওয়াতে তাঁহাদের ভদ্রতা দেখানো হইল, আর তাঁহারা যে বিশ্বাস করেন যে, নেতারা গ্রেপ্তার হইতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত তাহাও প্রমাণ হইল। ১৯০৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ ছিল; সেই দিন নেতারা কোর্টে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, যেহেতু তাঁহারা এতাবৎ পাস লন নাই, সেই হেতু তাঁহাদিগের প্রতি ট্রান্সভাল ত্যাগ করার হুকুম কেন দেওয়া হইবে না তাহার কারণ দেখাইতে হইবে।

ইহাদের মধ্যে মিঃ কুইন নামে চীনাদের একজন নেতা ছিলেন। এখানে প্রায় ৩০০।৪০০ শত চীনা ছিল, তাহারা অধিকাংশই ব্যবসাদার অথবা কৃষক। ভারতবর্ষ চাষের কার্য্যের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু আমার মনে হয় যে, কৃষিবিদ্যায় আমরা ভারতবর্ষে চীনাদের মত উন্নতি করিতে পারি নাই। আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে আধুনিক কৃষির উন্নতির বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু তাহাহইলেও ইহা সেখানে পরীক্ষার বিষয় মাত্র রহিয়াছে। এদিকে চীন ভারতবর্ষের মতই পুরাতন দেশ, সেইজন্য ভারতবর্ষের সহিত চীনের তুলনা করিলে উহা হইতে শিক্ষালাভ করা যাইবে। আমি জোহানেসবর্গের চীনাদের কর্ম্ম-পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়াছি। তাহাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনাও করিয়াছি। আর তাহা হইতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, চীনারা আমাদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান এবং অধিক কর্ম্ম-কুশল। আমরা

অনেক সময় জমি পতিত থাকিতে দিই, মনে করি উহাতে কোনও কাজ হইবে না, কিন্তু সেই জমিতেই চীনারা জমি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞান-বশতঃ ভাল ফসল আদায় করিতে পারে। এই ঘাতকী আইন চীনাদের উপরও প্রযোজ্য ছিল বলিয়া চীনারাও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। তবুও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই দুই সম্প্রদায়ের কার্য্য একত্র মিশাইয়া ফেলিতে দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র সংস্থার ভিতর দিয়া কাজ করিয়াছে। এই ব্যবস্থার শুভ ফল এই হইয়াছিল যে, যতক্ষণ দুই সম্প্রদায়ই নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবে ততক্ষণ একে অপরকে সাহায্য করিতে পারিবে। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কোনও এক দল যদি যুদ্ধ হইতে খসিয়া পড়ে, তাহাহইলে অপর দলের নৈতিক ক্ষতি হইবে না এবং অন্ততঃ একেবারে বসিয়া পড়া হইতে বাঁচিয়া যাইবে। চীনাদের নেতা মিথ্যা ব্যবহার করার পরেই তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে সরিয়া পড়িয়াছিল। যদিও সে নেতা এই আইন স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মত ছিল, তথাপি একদিন প্রাতে একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, চীনাদের দলপতি খাতাপত্র ও টাকা পয়সা না দিয়াই পলাইয়া গিয়াছে। নেতার অভাবে অনুবর্ত্তীগণের যুদ্ধ চালানো সর্ব্বত্রই কঠিন। তারপর নেতা যদি অপমানজনক কার্য্য করিয়া থাকে, তবে ফল আরও ভয়ঙ্কর হয়। কিন্তু যখন ধরপাকড় আরম্ভ হয় তখন চীনারা খুব উৎসাহিত ছিল। তাহাদের মধ্যে একজনও পাস লয় নাই, সেই জন্যই ভারতীয় নেতাদের সহিত মিঃ কুইনের উপরও হাজির হওয়ায় হুকুম আসিয়াছিল। কিছুকালের জন্য অন্ততঃ মিঃ কুইন ভালই কাজ করিয়াছিলেন।

প্রথম দলে যে সকল সত্যাগ্রহী নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম থাম্বি নাইডু। তাহার সহিত আমি পাঠকের এখন

পরিচয় করিয়া দিব। থাম্বি নাইডুর বাড়ী তামিল দেশে, সেখান হইতে তাহার বাপ মা মরিসাসে আসিয়াছিল। সে একজন সাধারণ বেপারী ছিল। সে স্কুল কলেজের কোনও বিদ্যা মোটেই শিখে নাই। কিন্তু দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা তাহার শিক্ষকের কাজ করিয়াছে। সে বেশ ভালই ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিত। তবে তাহার ব্যাকরণ ভুল হয়ত হইত। তেমনি করিয়াই সে তামিল ভাষাও শিখিয়াছিল। সে হিন্দী বুঝিতে ও বলিতে পারিত এবং তেলুগুও কিছু কিছু জানিত। এই সকল ভাষায় তাহার অক্ষর পরিচয়ও ছিল না। তারপর মরিসস্ দ্বীপে ক্রিয়োল বলিয়া একরকম বিকৃত ফ্রেঞ্চ ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা সে বেশ ভাল রকম জানিত, আর নিগ্রোদের ভাষা ত সে জানিতই। এতগুলি ভাষার সহিত কাজ চলার মত পরিচয় রাখা দক্ষিণ আফ্রিকায় নূতন কিছু ছিল না। শত শত লোক সেখানে এই সকল ভাষার সহিত পরিচয় দাবি করিতে পারিত। এই সকল লোক প্রায় বিনা চেষ্টাতেই ভাষাবিৎ হইয়া যাইত। বিদেশী ভাষার মারফতে শিক্ষা লাভ করিতে গিয়া তাহাদের মাথা ক্লান্ত হইয়া পড়ে নাই, তাহাদের স্মৃতি-শক্তি তীক্ষ্ণ রহিয়া গিয়াছে। যাহারা ঐ সকল ভাষা বলে তাহাদের সহিত কথা বলিয়া, ও অপরকে বলিতে লক্ষ্য করিয়া তাহারা এই সকল ভাষা শিখিত। ইহাতে তাহাদের মাথার বিশেষ শ্রম করিতে হয় না, বরঞ্চ এই সহজ মানসিক ক্রিয়ার ফলে তাহাদের বুদ্ধি বর্দ্ধিতই হয়। থাম্বি নাইডুর বেলায় ইহাই হইয়াছিল। তাহার বুদ্ধি-শক্তি প্রখর ছিল। সে নূতন বিষয় খুব সহজেই ধরিতে পারিত। তাহার বাক্‌পটুতা গুণ বিলক্ষণ ছিল। সে কখনো ভারতবর্ষ দেখে নাই, তথাপি তাহার স্বদেশের প্রতি অপার প্রেম ছিল, তাহার রক্তের কণায় কণায় দেশপ্রেম প্রবাহিত হইত। তাহার মনের দৃঢ়তার

ছাপ তাহার মুখের উপরও পড়িয়াছিল। তাহার শরীর খুবই সুগঠিত ছিল এবং তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম করার শক্তি ছিল। তাহাকে সভাপতির কার্য্য করিয়া লোকের নায়কত্বই করিতে হোক্, অথবা মুটের কাজই করিতে হোক্, সে উহা সমান দক্ষতার সহিত করিতে পারিত। রাস্তায় মোট বহিয়া লইতে তাহার লজ্জা ছিল না। কার্য্য হাতে লইলে সে দিন রাত জানিত না। সম্প্রদায়ের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব বলি দিতেও সে সকলের অগ্রণী ছিল। যদি থাম্বি নাইডু হঠকারী না হইত, যদি সে ক্রোধ-বিমুক্ত হইত, তাহাহইলে কাছলীয়ার অবর্ত্তমানে এই বীর পুরুষ সহজেই ট্রান্সভালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিতে পারিত। যখন ট্রান্সভালের যুদ্ধ চলিতেছিল তখনও তাহার ক্রোধ অনিষ্টকারী হইয়া পড়ে নাই। তাহার নানা সদ্‌গুণ মণি-মুক্তার ন্যায় উজ্জল ভাবে জ্বলিতেছিল। কিন্তু আমি শুনিয়াছিলাম যে, পরবর্ত্তী কালে তাহার হঠকারিতা ও ক্রোধ তাহাকে পাইয়া বসিয়া তাহার সদবৃত্তিগুলি ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সে যাহাই হোক্ থাম্বি নাইডুর নাম দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ যুদ্ধে চিরকালই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী দলের সঙ্গেই থাকিবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক মামলা আলাদা করিয়া বিচার করিলেন এবং সকলকেই ট্রান্সভাল ত্যাগ করার হুকুম দিলেন, কাহাকেও ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, কাহাকেও ৭দিন, কাহাকেও বা ১৪ দিনের মধ্যে।

এই সময় ১০ই জানুয়ারী উত্তীর্ণ হওয়ায় আমরা দণ্ডাদেশ গ্রহণ করার জন্য কোর্টে উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হইলাম।

আমাদের কাহাকেও পক্ষ সমর্থন করিতে হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ছিল যে, আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট দিনে হয় ট্রান্সভাল ত্যাগ করিতে হইবে, নয়ত পাস দেখাইতে হইবে। সে হুকুম মানি নাই বলিয়া সকলেই অপরাধ স্বীকার করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম।

আমি একটা ছোট উক্তি দাখিল করিতে চাই এবং অনুমতি পাইয়া বলি যে, আমার মোকদ্দমা আর আমার পরে যাহাদের মোকদ্দমা হইবে তাহার মধ্যে একটা পার্থক্য করার আবশ্যক আছে। আমি সেই মাত্রই শুনিয়াছিলাম যে, প্রিটোরিয়াতে আমার সহকর্ম্মীদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেট তিন মাসের কারাদণ্ড এবং মোটা রকম অর্থ দণ্ড করিয়াছেন, উহা না দিলে আরও তিন মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। আমি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অপরাধ করিয়াছি বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে খুব কঠিন দণ্ড দিতে অনুরোধ করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার অনুরোধ রাখিলেন না। আমাকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিলেন। যে আদালত গৃহে আমি অনেক সময়েই ব্যারিষ্টার হিসাবে উপস্থিত হইয়াছি, সেই গৃহেই আজ আসামী হিসাবে উপস্থিত হওয়ায় আমার একটু কেমন কেমন লাগিতেছিল। কিন্তু আমার বেশ স্মরণ আছে যে, আমি মনে মনে, ব্যারিষ্টাররূপে হাজির হওয়া অপেক্ষা আজকার অপরাধী হিসাবে উপস্থিতি অধিকতর সম্মানজনক ভাবিয়াছি। আর সেই জন্যই কয়েদীদের কাঠগড়ায় প্রবেশ করিতে আমি এতটুকুও দ্বিধা বোধ করি নাই।

আদালত গৃহে তখন আমার সম্মুখে শত শত ভারতীয় ও সমব্যবসায়ী ভাই উপস্থিত ছিলেন। দণ্ডাদেশ হওয়ার পর মুহূর্ত্তেই আমাকে সরাইয়া লওয়া হইল, আমি সম্পূর্ণ একাকী হইয়া পড়িলাম। পাহারাওয়ালা সেখানে কয়েদীদের বসিবার একটা বেঞ্চে আমাকে বসিতে বলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমার মনটা চঞ্চল ছিল। আমি গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলাম। আমার বাড়ী, যেখানে ব্যারিষ্টারী করিয়াছি সেই আদালত গৃহ—এ সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, এখন আমি বন্দী। এই দুই মাস কালে কি হইবে?

আমাকে কি এই পুরা সময়টাই জেলে থাকিতে হইবে? যদি লোকে অধিক সংখ্যায় নিজেদের প্রতিশ্রুতি মত জেলে আসিতে আরম্ভ করে, তবে পুরা দুইমাস জেলে থাকিতে হইবে না। কিন্তু যদি তাহারা জেলে না আসিতে থাকে, তবে এই দুই মাস কালই দুই যুগ বলিয়া মনে হইবে। এসকল কথা উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহার শতভাগের একভাগের মধ্যে আমার মনের উপর দিয়া এই সকল চিন্তা চলিয়া গেল। তারপরই আমার লজ্জা হইল। কত বড় মিথ্যাভিমান! এই আমিই না লোককে সরকারের কারাগৃহকে হোটেল বলিয়া মনে করিতে বলিয়াছি! আমিই না এই আইন অমান্যের জন্য দুঃখ ভোগকে সম্পূর্ণ আনন্দময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, আর এই আইনের প্রতিরোধের জন্য সর্ব্বস্ব হোম করা, জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করা একটা বিলাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি! এসকল জ্ঞান এখন কোথায় গেল? এই দ্বিতীয় চিন্তাস্রোত আমাকে স্থির করিয়া ফেলিল, আমার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় আমি হাসিতে লাগিলাম। আমার সহকর্ম্মীদের কি রকমের জেল দিবে, তাহাদিগকে কি আমার সঙ্গেই রাখিবে?—এই ধরণের ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় দরজা খুলিয়া গেল, পুলিশ আসিয়া আমাকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলিল। আমি চলিতে আরম্ভ করিলে সে আমাকে তাহার আগে আগে চলিতে বলিল এবং সে পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। সে আমাকে কয়েদীদের বন্ধ গাড়ীর নিকট লইয়া গিয়া উহাতে বসিতে বলিল। তারপর আমাকে জোহানেসবর্গ জেলের দিকে লইয়া চলিল।

জেলে লইয়া আমাকে আমার কাপড় খুলিয়া ফেলিতে বলিল। আমি জানিতাম যে জেলে লইয়া উলঙ্গ করা হয়। আমরা সকলেই স্থির করিয়াছিলাম যে, জেলে গিয়া যে সমস্ত ব্যবহার ব্যক্তিগত অপমানের

উদ্দেশ্যে করা হইবে না, অথবা যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে সে সকল নিয়ম ইচ্ছাপূর্ব্বক পালন করিব। ইহা সত্যাগ্রহীদের ধর্ম্ম বলিয়াই মানিতে হইবে। পরার জন্য যে কাপড় দিয়াছিল সেগুলি বড়ই ময়লা ছিল। উহা পরিতে মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। পরিতে দুঃখ হইলেও এখন কতকটা ময়লা সহ্য করিতে হইবে ভাবিয়া মনকে বশে আনিলাম। নামধাম লিখিয়া আমাকে একটা প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। সেখানে কিছুক্ষণ থাকিতেই আমার সাথীরা হাসিতে হাসিতে ও গল্প করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি চলিয়া আসার পর মোকদ্দমা কেমন চলিয়াছিল ও কি হইয়াছিল সে সকল কথা তাঁহারা আমাকে শুনাইলেন। আমার মোকদ্দমা হইয়া গেলে ভারতীয়েরা কালো নিশান হাতে লইয়া এক শোভাযাত্রা করিয়াছিল। কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়াছিল। পুলিশ শোভাযাত্রার মধ্যে পড়িয়া দু'চার জনকে মার দিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম। আমাদের সকলকে একই জেলে ও কামরায় রাখায় আমরা খুব সন্তুষ্ট হইলাম।

প্রায় ছয়টার সময় আমাদের দরজা বন্ধ করিতে আসিল। এখানে জেলের দরজায় গরাদে ছিল না—দরজা নিরেট ছিল। দেওয়ালের গায়ে খুব উঁচুতে হাওয়ার জন্য ফুকর ছিল। আমাদের মনে হইল যেন আমাদিগকে সিন্দুকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। পাঠকেরা মনে রাখিবেন, জেলের কর্ম্মচারীরা রামসুন্দরের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল, আমাদের সহিত তাহা করে নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই। রামসুন্দর প্রথম সত্যাগ্রহী কয়েদী ছিল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে তখনও ঠাহর করিতে পারেন নাই। আমরা যে দল আসিয়াছিলাম তাহা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। সরকারের আরো গ্রেপ্তার করার ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য আমাদিগকে নিগ্রো ওয়ার্ডে রাখা

হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় দুইটা বিভাগ ছিল—গোরাদের এবং কালো অর্থাৎ নিগ্রোদের। ভারতীয় কয়েদীদিগকে নিগ্রোদের সামিল ধরা হইত। আমার সাথীদিগের আমারই মত বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইয়াছিল। পরদিন সকালে জানিতে পারিলাম যে, বিনাশ্রমে দণ্ডিত কয়েদীদের নিজের কাপড় পরার অধিকার আছে, আর যদি কেহ তাহা না পরিতে চায়, তবে তাহাদের স্বতন্ত্র পোষাক আছে তাহাই দেওয়া হয়। আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে বাড়ীর কাপড় পরা ঠিক নয়, জেলের কাপড় পরাই ভাল। আমি কর্ত্তৃপক্ষকে ইহা জানাইয়া দিলাম। তখন আমাদিগকে অশ্রম কয়েদীদের পোষাক দেওয়া হইল। কিন্তু শত শত অশ্রম কয়েদী দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে ছিলই না, সেই জন্য যখন অন্য অশ্রম দণ্ডপ্রাপ্ত সত্যাগ্রহী কয়েদী আসিতে লাগিল, তখন সেরূপ কাপড় ফুরাইয়া গেল। আমাদেরও ইহা লইয়া তর্ক করার কিছু ছিল না সেই জন্য সশ্রম কয়েদীদের পোষাক পরিতে আপত্তি করি নাই। পরে যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই পোষাকের বদলে নিজেদের পোষাকই পরিয়াছিল। আমার ইহা সঙ্গত বোধ হয় নাই, কিন্তু ইহা লইয়া জেদ করার দরকার বোধ করিলাম না।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন হইতে সত্যাগ্রহী কয়েদীতে জেল পূর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিয়াছে। তাহাদের অনেকেই ফেরীওয়ালা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় গোরা বা কালো সকল ফেরীওয়ালাকেই পাস লইতে হয়। উহা সকল সময়ই সঙ্গে রাখিতে হয় ও পুলিশ দেখিতে চাহিলে দেখাইতে হয়। ইহাদের কাছে এখানে সাধারণতঃ প্রতিদিনই পুলিশ পাস দেখিতে চায় এবং যাহাদের পাস না থাকে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া পাঠায়। আমার গ্রেপ্তারের পর সম্প্রদায় স্থির করিল যে, জেল ভরিয়া ফেলিবে। এই কার্য্যে ফেরীওয়ালারা

অগ্রসর হইল। তাহাদের গ্রেপ্তার হওয়া সহজ ছিল। তাহারা পাস দেখাইতে অস্বীকার করিলেই গ্রেপ্তার হইত। এইভাবে ধরায় এক সপ্তাহের ভিতর একশতের বেশী কয়েদী হইয়া গেল। প্রতিদিনই কিছু কিছু আসিতেছিল বলিয়া সংবাদপত্রের অভাব তাহারাই মিটাইতে ছিল। প্রতিদিনের খবর এই ভাইরাই লইয়া আসিত। যখন বহু সংখ্যক সত্যাগ্রহী ধরা পড়িতেছিল তখন সকলকেই আর বিনাশ্রম না দিয়া, সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল। বিচারক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অথবা আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, উপর হইতে ঐরূপ করার হুকুম হইয়াছিল। আজও আমার বিশ্বাস যে, আমাদের অনুমানই ঠিক। প্রথম কয়েকজন ছাড়া, দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে সকলকেই সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে, এমন কি স্ত্রীলোকদিগকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। যদি কর্ত্তৃপক্ষের কোনও আদেশ না পাইয়া সকল স্থানের সকল ম্যাজিষ্ট্রেটেরই প্রত্যেককে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়াটা আকস্মিক ঘটনা হয়, তবে তাহা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতে হইবে।

জোহানেসবর্গ জেলে অশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীরা সকাল বেলায় মকাইয়ের আটার জাউ খাইতে পাইত। উহাতে লবন মিশাইয়া দেওয়া হইত না, প্রত্যেক কয়েদীকে আলাদা করিয়া একটু লবণ দেওয়া হইত। দুপ্রহরে দুই ছটাক ভাত, দুই ছটাক পাউরুটী, আধ ছটাক ঘি আর একটু লবণ দেওয়া হইত। সন্ধ্যাবেলায় মকাইয়ের জাউ, আর তাহার সহিত তরকারী হিসাবে সাধারণতঃ দুইটা বা বড় হইলে একটা আলু। এই খোরাকে কাহারও পেট ভরিত না। ভাত নরম করিয়া ফেলা হইত। আমরা জেলের ডাক্তারের কাছে কিছু মসলা চাহিলাম, ভারতীয় জেলে দেওয়া হয় বলিলাম। কড়া জবাব পাইলাম, এটা ভারতবর্ষের জেল নয়, কয়েদীরা খাওয়ার আস্বাদ পাওয়ার জন্য এখানে আসে না,

মসলা দেওয়া হইবে না। আমাদের জন্য ডাল চাহিলাম, কেন না যে খাদ্য দেওয়া হইত উহাতে স্নায়ুগঠনকারী কিছু ছিল না। তাহাতে ডাক্তার বলিলেন "কয়েদীর ডাক্তারী তর্ক করিতে নাই। স্নায়ুগঠনকারী খাদ্য দেওয়া হয়, কেন না সপ্তাহে দুইবার মকাইয়ের পরিবর্তে সিম দেওয়া হয়।" যদি আট দিনে অথবা পনের দিনে বিভিন্ন খোরাক হইতে পেট এক সাথে আবশ্যকীয় সার অংশ গ্রহণ করিতে পারিত, তবে ডাক্তারের যুক্তিটা ঠিক হইত। আসল কথা আমাদের কোনও সুবিধা করার ইচ্ছা ডাক্তারের ছিল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদিগকে আমাদের রান্না করিয়া লওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন। আমরা থাম্বি নাইডুকে প্রধান পাচক করিয়া লইলাম। রান্না লইয়া তাহাকে প্রায়ই ঝগড়া করিতে হইত। তরকারী ওজনে কম দেওয়া হইত, সে পুরা চাহিত। আমাদিগকে দুপুরে কেবল একবারমাত্র রাঁধিতে দিত। যে দুই দিন তরকারী থাকিত সপ্তাহে সেই দুই দিন দুইবেলা রান্না হইত। আমাদের হাতে রান্না আসার পর খাদ্য কতকটা সন্তোষজনক হইয়াছিল।

এই সকল সুবিধা হোক্ আর নাই হোক্, আমরা স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে, সুখে জেলে দিন কাটাইব। বাড়িতে বাড়িতে সত্যাগ্রহী কয়েদীর সংখ্যা দেড় শত হইয়া গেল। আমাদের অশ্রম দণ্ড ছিল বলিয়া এক ঘর সাফ্ করিয়া রাখা ছাড়া অন্য কোনও কাজ ছিল না। আমরা কাজ চাহিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন—"যদি আপনাদিগকে কাজ দিই, তবে তাহা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। আমি এবিষয়ে নিরুপায়। আপনাদের যতটা ইচ্ছা সাফ্‌সুফ্ করিয়া সময় কাটাইতে পারেন।" ড্রিল ইত্যাদি ব্যায়ামের কথা বলিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম যে, নিগ্রো সশ্রম কয়েদীদিগকে ড্রিল করানো হয়। "আপনাদের ওয়ার্ডার যদি আপনাদিগকে ড্রিল করায় তবে আমি

আপত্তি করিব না, কিন্তু আমি আদেশও দিব না। তাহার কাজ এমনি বেশী ছিল, আর আপনারা অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া পড়ায়, কাজ আরও বাড়িয়াছে—” এই প্রকার জবাব পাওয়া গেল। আমাদের ওয়ার্ডার বড় ভালমানুষ ছিল। তাহার ঐটুকু অনুমতিরই আবশ্যকমাত্র ছিল। সে আনন্দের সহিত প্রাতঃকালে আমাদিগকে ড্রিল করাইতে আরম্ভ করিল। আমাদের কামরার সাম্‌নের ছোট আঙ্গিনাতেই ড্রিল করিতে হইত। উহা কেবল চক্র ঘোরার মতন হইত। ওয়ার্ডার শিক্ষা দিয়া চলিয়া গেলে নবাব খাঁ নামে একজন পাঠান আমাদিগকে শিখাইতে থাকিত। সে ইংরাজী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ করিয়া আমাদিগকে হাসাইত। ‘ষ্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ’্‌কে সে বলিত ‘ঝাণ্ড্‌ লিজ’। দিনকতক ত আমরা বুঝিতেই পারি না যে ওটা কি রকম হিন্দী শব্দ। পরে বুঝিতে পারিলাম যে উহা নবাব-খানী ইংরাজী!

একবিংশ অধ্যায়

প্রথম মিটমাট

এইভাবে দিন পনের কাটার পর নূতন কয়েদী হইয়া যাহারা আসিতেছিল তাহাদের নিকট সংবাদ পাওয়া গেল যে, গবর্ণমেণ্টের সহিত মিটমাটের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। দুই তিন দিন পরে 'ট্রান্সভাল লিডার' নামক পত্রের সম্পাদক মিঃ এডোয়ার্ড কার্টরাইট আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তখন জোহানেসবর্গে সকল দৈনিক কাগজই সেখানকার সোণার খনির মালিকদের ছিল; খনির মালিকদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় ভিন্ন অন্য সকল বিষয়েই সম্পাদকেরা অবাধে সাধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে পারিতেন। খুব বিদ্বান ও খ্যাতনামা ব্যক্তিরাই সম্পাদক হইতেন। যেমন 'ষ্টার' নামক দৈনিকপত্রের সম্পাদক এক সময় লর্ড মিলনারের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তিনিই পরে বিলাতে 'টাইমস' পত্রের মিঃ বাক্‌লের স্থান প্রাপ্ত হইয়া 'ষ্টার' ছাড়িয়া যান। 'ট্রান্সভাল টাইম্‌সের' সম্পাদক মিঃ কার্টরাইট যেমন উদার, তেমনি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভারতীয়দের পক্ষেই লিখিতেন। তাঁহার সহিত আমার গাঢ় স্নেহের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল আমি জেলে আসিলে তিনি জেনারেল্ স্মাট্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেনারেল স্মাট্‌স্ তাঁহার মধ্যস্থতা স্বীকার করেন। তার পর মিঃ কার্টরাইট ভারতীয় নেতাদের সহিত দেখা করেন। তাঁহারা বলেন—আইনের গণ্ডগোলের কথা আমরা কিছু বুঝি না, গান্ধী যতক্ষণ জেলে আছেন ততক্ষণ মিটমাটের

কথা চলিতে পারে না। আমরা মিটমাট চাই। যদি গান্ধী জেলে থাকিতে সরকার মিটমাট করিতে চাহেন তবে আপনি জেলে গান্ধীর সহিত দেখা করিবেন। গান্ধী যে সর্ত্ত স্বীকার করিবেন আমরা সকলেই তাহাতে বদ্ধ থাকিব।

মিঃ কার্টরাইট সেইজন্য আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি সঙ্গে জেনারেল স্মাটসের দেওয়া অথবা অনুমোদিত মিটমাটের সর্ত্ত আনিয়াছিলেন। আমি সেই সর্ত্তগুলির অনির্দ্দিষ্ট ভাষা পছন্দ করি নাই, তবুও একটা পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ সর্ত্তে স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ছিলাম। আমি মিঃ কার্টরাইটকে জানাইলাম যে, জেলের বাহিরে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মত আছে তাহা না হয় ধরিয়া লইব, কিন্তু জেলের ভিতরে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সহিত কথা না বলিয়া ত স্বাক্ষর করিতে পারি না।

সর্ত্তগুলির ভাবার্থ এই ছিল যে, ভারতীয়েরা স্বেচ্ছায় তাহাদের পাস বদলাইয়া নূতন পাস লইবে। কোনও আইনের বলে এই কাজ করা হইতেছে বলিয়া ধরা হইবে না। পাসে কি কি লেখা থাকিবে তাহা ভারতীয়দের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকার স্থির করিবেন। যদি ভারতীয়েরা অধিকাংশই স্বেচ্ছায় পাস করাইয়া লয়, তবে সরকার ঘাতকী আইন রদ করিবেন। আর ঐ পাসগুলি আইন অনুযায়ী হইয়াছে বলিয়া একটা নূতন আইন পাস করাইবেন। ঘাতকী আইন রদ করার কথা এই খসড়ায় স্পষ্ট ছিল না। আমার দৃষ্টি অনুসারে উহা স্পষ্ট করার জন্য পরিবর্ত্তন করিতে বলি। আলবার্ট কার্টরাইটের নিকট তাহা পছন্দ হয় না। তিনি বলিলেন যে—"এই খসড়াটা জেনারেল স্মাট্‌স্‌ অন্তিম খসড়া বলিয়া মনে করেন। আমার নিজের ইহা পছন্দ হইয়াছে, আর একথা আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে,

যদি আপনারা সকলেই পাস গ্রহণ করেন তবে ঘাতকী আইন অবশ্যই রদ করা হইবে জানিবেন।" আমি জবাব দিলাম—"মিটমাট হোক্" বা না হোক্ আপনার সহানুভূতি ও আপনার সাহায্যের জন্য আমি সর্ব্বদাই উপকৃত থাকিব। আমি অনাবশ্যক কোনও পরিবর্ত্তনই করিতে ইচ্ছা করি না। সরকারের প্রতিষ্ঠা যাহাতে থাকে এমন ভাষা ব্যবহারেরও আমি বিরোধ করিব না। কিন্তু যেখানে উহার অর্থ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে সেখানে পরিবর্ত্তনের কথা আমাকে বলিতেই হইবে। আর যদি সত্যই নিষ্পত্তি করিতেই হয়, তবে দুই পক্ষেরই পরিবর্ত্তন করার অধিকার থাকা চাই। 'ইহাই অন্তিম সর্ত্ত' এই কথা বলিয়া জেনারেল স্মাট্স আমার সম্মুখে বন্দুক উচাইয়া ধরিলে লাভ নাই। তিনি ত ঘাতকী আইনের বন্দুক তুলিয়া ধরিয়াই আছেন, আর নূতন করিয়া ভয় কি দেখাইবেন?" মিঃ কার্টরাইট আমার এই যুক্তির উত্তরে কিছু বলিতে পারিলেন না। আমার প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনগুলি তিনি জেনারেল স্মাট্স্‌কে পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন। সাথীদিগের সহিত পরামর্শ করিলাম। তাঁহাদেরও উহার ভাষা পছন্দ হইল না। তবে যদি জেনারেল স্মাট্স পরিবর্ত্তিত খসড়া গ্রহণ করেন তবে মিটমাট করা যায় বলিলেন। বাহির হইতে যাহারা গ্রেপ্তার হইয়া আসিল, তাহাদের দ্বারা নেতারা সংবাদ দিলেন যে, যদি নিষ্পত্তি করিতে হয়, তবে তাঁহাদের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া আমি যেন নিষ্পত্তি করিয়া ফেলি। এই খসড়ায় আমিই মিঃ কুইনের ও থাম্বি নাইডুর স্বাক্ষর লইয়া আমাদের তিনজনের স্বাক্ষরিত কাগজ মিঃ কার্ট-রাইটকে দিই। দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে জোহানেসবর্গের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে জেনারেল স্মাট্সের নিকট লইয়া গেলেন। আমাদের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মিঃ কার্টরাইটের সহিত তাঁহার যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা তিনি বলিলেন। আমি জেলে

আসার পরেও যে সম্প্রদায় দৃঢ় আছে সেজন্য তিনি আমার আনন্দে সুখানুভব জানাইয়া বলিলেন—"আপনাদের সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি আমার অপ্রীতি নাই। আমিও ব্যারিষ্টার তাহা আপনি জানেন। আমার পড়ার সময় আমার সহিত কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রও ব্যারিষ্টারী পড়িতেন। কিন্তু আমাকে আমার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হয়। গোরারা এই আইন চাহিতেছে। আপনার নিকট ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রকার গোরাদের ভিতর বুয়ার অপেক্ষা ইংরাজই বেশী। জেনারেল বোথার সহিতও আমি কথাবার্ত্তা বলিয়া লইয়াছি। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, অধিক লোক পাস লইলেই এশিয়াটিক আইন রদ করা হইবে। স্বেচ্ছায় যে পাস লওয়া হইবে তাহা আইন সঙ্গত করার জন্য একটা আইনের খসড়া যখন তৈরী করিব, তখন সমালোচনার জন্য তাহার নকল আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। আবার যে এরূপ ব্যাপার হয় তাহা আমি ইচ্ছা করি না এবং আপনার লোকদের অনুভূতির সম্মানই রাখিতে চাই।" এই ধরণের কথা হওয়ার পর জেনারেল স্মাট্‌স্ উঠিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন আমাকে কোথায় যাইতে হইবে? আর আমার সাথী অন্য কয়েদীদেরই বা কি করা হইবে?" তিনি হাসিয়া বলিলেন "আপনি ত এখন হইতেই মুক্ত। আপনার সাথীদিগকে কাল সকালেই মুক্ত করার জন্য টেলিফোন করিয়া দিব। কিন্তু আমার অনুরোধ, যে আপনারা অনেক সভা ও হৈ-চৈ না করেন। ঐপ্রকার করিলে সরকারের অবস্থা সঙ্গিন হইয়া পড়িবে।" আমি বলিলাম—"কেবল সভা করার উদ্দেশ্যে একটা সভাও করা হইবে না, সে বিষয়ে আপনাকে কথা দিতেছি। কিন্তু মিটমাট কি ভাবে হইল, ইহার স্বরূপ কি, এক্ষণে ভারতীয়দের দায়িত্ব কত বাড়িল এ সমস্ত বুঝাইবার জন্য

ত আমাকে সভা করিতেই হইবে।" জেনারেল স্মাট্‌স্ বলিলেন—"এ প্রকার সভা যত করিতে হয় করিবেন। আমার অনুরোধ আপনি বুঝিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট।"

এই সময় সন্ধ্যা সাতটা বাজিয়া গিয়াছিল। আমার কাছে একটা পয়সাও ছিল না। জেনারেল স্মাটসের সেক্রেটারী আমাকে জোহানেসবর্গে যাওয়ার ভাড়া দিলেন। এই কথাবার্ত্তা প্রিটোরিয়াতে হইয়াছিল। প্রিটোরিয়ার ভারতীয়দের কাছেই তখন থাকিয়া এই সংবাদ প্রকাশ করার আবশ্যক ছিল না: প্রধান সকলেই জোহানেসবর্গে ছিলেন। কার্য্যের কেন্দ্র আফিসও জোহানেসবর্গে ছিল। জোহানেসবর্গে যাওয়ার শেষ ট্রেণখানাই ছাড়ার বাকি ছিল। আমি সেই ট্রেণে চলিলাম।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মিটমাটে বিরোধ ও আক্রমণ

আমি রাত্র নয়টায় জোহানেসবর্গে পঁহুছিয়া বরাবর সভাপতি শেঠ ইউসুফ মিঞার বাড়ীতে গেলাম। আমাকে যে প্রিটোরিয়াতে লওয়া হইয়াছে তাহা তিনি জানিতেন। সেই জন্য আমি আসিব এপ্রকার কতকটা আশা করিয়াছিলেন। তবুও পাহারাওয়ালা ছাড়াই আমাকে আসিতে দেখিয়া তিনি ও তাঁহার সাথীরা কতকটা চমকিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, তখনই যত অল্প সময়ের মধ্যে হয় একটা সভা আহ্বান করা আবশ্যক। সভাপতি ও অন্যান্য সকলে আমার কথায় সম্মত হইলেন। ভারতীয়েরা অধিকাংশই এক পাড়ায় থাকিতেন বলিয়া সভার সংবাদ দেওয়ায় অসুবিধা ছিল না। সভাপতির বাড়ী মসজিদের নিকটেই ছিল। মসজিদের প্রাঙ্গনেই সাধারণতঃ সভা হইত। সভার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ কিছু করার ছিল না। প্লাটফরমের উপর একটা আলো হইলেই চলিয়া যাইবে। সেইরাত্রেই এগারটা বারোটার সময় সভা হয়। এত অল্প সময়ের সংবাদেও এবং এত রাত্র হইলেও সভায় প্রায় এক হাজার লোক হইয়াছিল।

সভা বসিবার পূর্ব্বে আমি মিটমাটের সর্ত্ত সম্বন্ধে নেতাদের সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ মিটমাটের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আমার কাছে শুনিয়া সকলেই অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। সকলেরই মনে কিন্তু একটা সন্দেহ ছিল—"যদি জেনারেল স্মাট্‌স্‌ বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ঘাতকী আইন কার্য্যতঃ প্রযুক্ত না হইলেও

আমাদের মাথার উপর খাঁড়ার ন্যায় ঝুলিতেই থাকিবে। ইতিমধ্যে যদি আমরা পাস লইয়া ফেলি তবে শত্রুর হাতে গিয়া পড়া হইবে এবং আইনের প্রতিরোধ করিতে আমাদের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অস্ত্র তাহাই ত্যাগ করা হইবে। আগে ঐ আইন রদ করিয়া পরে আমাদের সহিত মিটমাট করিলেই ঠিক হইত।"

এই যুক্তি আমারও মনে ধরিয়াছিল। যাঁহারা এই যুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ব্যবহার-সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও নির্ভীকতাতে আমার গর্ব্বানুভব হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীদের এই রকম হওয়াই চাই। এই যুক্তির উত্তরে আমি বলিলাম—"আপনাদের কথা যথার্থ ও বিচার করার যোগ্য। যদি ঘাতকী আইন রদ করার পর আমরা স্বেচ্ছায় পাস লই, তবে তাহা অপেক্ষা আর ভাল কি হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে মিটমাট বলিয়া আমি মনে করি না। মিটমাট মানে যেখানে মূলনীতির প্রশ্ন নাই সে সকল স্থলে উভয় পক্ষকেই যথেষ্ট ছাড়িয়া দিতে হয়। আমাদের মূলনীতি এই হইতেছে যে, আমরা ঘাতকী আইন স্বীকার করিব না এবং সেইজন্য অন্যদিক দিয়া বিবেচনা করিলে যে কাজ করায় দোষ নাই সে কাজও করিব না। এই নীতি আমাদিগকে বজায় রাখিতেই হইবে। গবর্ণমেন্টের নীতি হইতেছে এই যে, ভারতীয়েরা যাহাতে অবৈধভাবে ট্রান্সভালে না আসিতে পারে, সে জন্য ভারতীয়েরা যাহাতে অদল বদল না করিতে পারে এমন পাস করাইয়া লইবে। ইহাতে গোরাদের সন্দেহ যাইবে ও তাহারা নির্ভয় হইবে। এই নীতি সরকার ত্যাগ করিতে পারে না। সরকারের এই নীতি আজ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ব্যবহার দ্বারা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। সেইজন্য ঐ কার্য্যও যদি আমাদের এখন ভাল না লাগে তাহা হইলে নূতন কোনও হেতু উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত উহার বিরোধ করিতে পারি না। আমাদের

যুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের ঐ নীতি পরিবর্ত্তন করার জন্য নয়। ঐ আইনের মধ্য দিয়া আমাদের উপর যে হীনতার ছাপ দেওয়া হইয়াছে তাহাই দূর করিবার জন্য। আমরা সত্যাগ্রহী বলিয়া আমাদের মধ্যে যে নূতন ও প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে যদি একটা নূতন বিষয়ের বিরোধে লাগাই তাহা হইলে সত্য ম্লান করা হইবে। সেইজন্য বাস্তবিক আমরা এই মিটমাটের প্রতিকূল আচরণ করিতে পারি না। আর একটা যুক্তি আছে যে যতক্ষণ না ঐ আইন রদ হইতেছে, ততক্ষণ আমরা অস্ত্র ত্যাগ করিব না। ইহার উত্তর সহজ। সত্যাগ্রহী ত ভয়কে দূর করিয়া দিয়াছে, সেইজন্য সে বিশ্বাস করিতে কখনো ডরায় না। সে বিশ বার বিশ্বাস করিলেও যদি শত্রু বিশ বারই তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে, তবুও একুশ বারের বারও সে তাহাকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত থাকিবে। সত্যাগ্রহী নিজের পথে বিশ্বাসের দ্বারাই থাকিতে পারে। তাহা হইলে যদি একথা বলা যায় যে, বিশ্বাস করিলে আমরা সরকারের হাতের মুঠার ভিতর পড়িব, তাহা হইলে সত্যাগ্রহের মূল নীতিতেই অনাস্থা দেখানো হয়। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে, আমরা স্বেচ্ছায় পাস লইলাম। তাহার পর সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন, ঘাতকী আইন রদ করাইলেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি তখন আমরা আর সত্যাগ্রহ করিতে পারিব না? এই সময় পাস কাটাইয়া যদি লই, আর তাহার পর যদি সত্যাগ্রহ করার সময় আসে, তখন কি আমরা সত্যাগ্রহ করিতে পারিব না? এই পাস এখন লইয়াও যদি আবশ্যক হইলে উহা দেখাইতে অস্বীকার করি, তবে পাসের কি মূল্য রহিল? তখন যদি হাজার লোক গুপ্তভাবে ট্রান্সভালে প্রবেশ করে তবে সরকার এই উভয়ের মধ্যে তফাৎ কি করিয়া খুঁজিয়া বাহির

করিবেন? সেইজন্য আইন থাকুক আর যাক্, আমাদের সাহায্য না লইয়া সরকার আমাদিগকে আইনের বশীভূত করিতে পারেন না। আইনের মানে ত এইমাত্র যে, সরকার যে অধিকার প্রয়োগ করিতে চান তাহা যদি আমরা স্বীকার না করি তবে আমাদিগকে সাজা দিবেন। সাধারণতঃ লোক সাজার ভয়েই আইন মানিয়া চলে। কিন্তু সত্যাগ্রহী এই সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে। সে যখন কোনও আইন মানিয়া চলে তখন সাজার ভয়ে তাহা করে না, মানিয়া চলাতেই লোকের কল্যাণ এই প্রকার জানিয়াই স্বেচ্ছায় আইন মানিয়া চলে। এই পাস করিয়া লওয়া সম্বন্ধেও ঠিক এই অবস্থা বর্ত্তমান আছে বলা যায়। সরকার যতই বিশ্বাসঘাতকতা করুন না কেন, এই অবস্থা বদলাইতে পারিবেন না। এই অবস্থা আমরাই উৎপন্ন করিয়াছি, আমরাই বদলাইতে পারি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহের অস্ত্র আমাদের হাতে আছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা স্বাধীন, আমরা নির্ভীক। আর যদি কেহ আমাকে একথা বলেন যে, আজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শক্তি দেখা দিয়াছে তাহা আর পরে থাকিবে না, তবে তাঁহাকে আমি এই জবাব দিব যে, তিনি সত্যাগ্রহী নহেন, সত্যাগ্রহ কি তাহা তিনি জানেন না। এ কথা বলার মানে ত এই হয় যে, আজ যে শক্তি দেখা দিয়াছে ইহা খাঁটি শক্তি নহে, উহা নেশার ন্যায় মিথ্যা ও ক্ষণিক। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে আমরা জিতিব না, আর যদি জিতিও তবে জেতার পর আবার হারিয়া যাইব। ধরিয়া নিন সরকার ঘাতকী আইন রদ করিলেন, তারপর আমরা স্বেচ্ছায় 'পাস' করাইলাম, তারপর সরকার আবার ঐ আইনই পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন এবং আমাদের রেজেষ্ট্রী করানো বাধ্যতামূলক করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সরকারকে কে আটকাইবে?

আজ যদি আমাদের বলের সম্বন্ধে আমাদের আশঙ্কা থাকে, তবে তখনও আমরা এই দুর্দ্দশাতেই পড়িব। এইজন্য যে দিক দিয়া ইচ্ছা মিটমাটের আলোচনা করুন না কেন, একথা সব প্রকারেই বলা যায় যে, এই মিটমাট দ্বারা সম্প্রদায়ের কোনও ক্ষতি হইতে পারে না, বরঞ্চ লাভই হইবে। আমি ত ইহাও মনে করি যে, আমাদের বিরোধীরা আমাদের নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা দেখিলে পরে বিরোধ ত্যাগ করিবে অথবা কম বিরোধ করিবে।" এইভাবে সেই ছোট দলের মধ্যে যে দুই একজন বিরোধী ছিলেন তাঁহাদিগকে ভাল করিয়াই ব্যাপারটা বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু মধ্যরাত্রের সভাতে যে তুমুল কাণ্ড হইবে স্বপ্নেও আমি তাহা ভাবি নাই। আমি সভাতে সমস্ত মিটমাটের কথা বুঝাইয়া বলিলাম ঃ—

"এই মিটমাটের জন্য সম্প্রদায়ের দায়িত্ব খুব বাড়িয়া গেল। আমরা ফাঁকি দিয়া অথবা লুকাইয়া একজনকেও ট্রান্সভালে আনিতে ইচ্ছা করি না, ইহাই দেখানোর জন্য স্বেচ্ছায় রেজিষ্ট্রী করাইয়া লওয়া দরকার। কেহ যদি না করে, তবে তাহার জন্য তাহার শাস্তি হইবে না। তবে তাহার অর্থ এই হইবে যে, সম্প্রদায় মিটমাট গ্রহণ করিতেছে না। আপনারা এক্ষণে হাত তুলিয়া মিটমাটে সম্মতি দিন, ইহা আবশ্যক। ইহা আমি আপনাদিগকে করিতে বলি। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে, আরও কিছু করিতে হইবে। নূতন পাস দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া মাত্রই, যাহারা হাত তুলিতেছেন তাঁহারা গিয়া নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া পাস লইবেন। আজ পর্য্যন্ত আপনারা যাহাতে কেহ পাস না লয় তাহা দেখার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিয়াছেন, এখন হইতে যাহাতে সকলে পাস লয় তাহা বুঝাইবার জন্য আপনাদের স্বেচ্ছাসেবক হইতে হইবে। এইভাবে আমাদের করণীয় অংশ পূর্ণ করিলেই আমাদের জয়ের পরিপূর্ণ ফল ঠিক মত দেখিতে পাইব।

এই বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্রই এক পাঠান ভাই দাঁড়াইয়া আমার প্রতি প্রশ্ন বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

"এই মিটমাটের ফলে আমাদিগকে কি দশ আঙ্গুলের টিপ দিতে হইবে?"

"হাঁ এবং না দুই-ই। আমার পরামর্শ যে সকলেই দশ আঙ্গুলের ছাপ দিবেন। কিন্তু যাঁহার ধর্ম্মের দিক দিয়া অথবা মানের দিক দিয়া আপত্তি আছে, তিনি যদি টিপ না দেন তবুও চলিবে।"

"আপনি নিজে কি করিবেন?"

"আমি দশ আঙ্গুলের টিপ দেওয়াই স্থির করিয়াছি; আমি নিজে না দিয়া অপরকে দিতে বলিব, একার্য্য আমার দ্বারা হওয়ার নয়।"

"আপনি দশ আঙ্গুলের টিপ সম্বন্ধে অনেক লিখিয়াছেন। টিপসহি অপরাধীর নিকট হইতে লওয়া হয়, ইহা আপনিই শিখাইয়াছেন। এই যুদ্ধ দশ আঙ্গুলের টিপের জন্যই হইতেছে—একথা আপনিই বলিয়াছিলেন। সে সকল কথা আজ কোথায় গেল?"

"আমি দশ আঙ্গুলের সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহা আমি এখনও সমর্থন করিতেছি। ঘাতকী আইন বিষয়ে দশ আঙ্গুলের টিপ কেন, সহি করিয়া দেওয়াও পাপ, ইহা আজও বলিতেছি। আমি দশ আঙ্গুল সম্বন্ধে অনেক জোর দিয়াছিলাম। উহা করিয়া সুবিবেচনার কার্য্যই করিয়াছিলাম বলিয়া এখনো মনে করি। ঘাতকী আইনের বিষয়-ভুক্ত ছোট খাট অন্যায় যাহা আমরা আজ পর্য্যন্তও সহিয়া আসিয়াছি, তাহার উপর জোর দেওয়ার অপেক্ষা দশ আঙ্গুলের মত নূতন ও বড় বিষয়ে জোর দিয়া সমাজকে জাগ্রত করা সহজ এবং আমার অভিজ্ঞতায় দেখিতেছি যে, উহা করা ভালই হইয়াছিল; বিষয়টা সম্প্রদায় সহজেই জানিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আজকার অবস্থা ভিন্ন রকম। যাহা করায় তখন অপরাধ হইত, আজ তাহা করাই ভদ্রতার লক্ষণ—একথা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি। আপনি যদি আমাকে দিয়া জোর করিয়া নমস্কার করাইতে চাহেন, আর আমি করি তাহা হইলে লোকের নিকট, আপনার নিকট ও আমার নিজের নিকটও আমি খাটো হইয়া যাইব। কিন্তু যদি আপনাকে ভাই বা সমান সমান গণ্য করিয়া স্ব-ইচ্ছায় সেলাম করি, তবে তাহাতে আমার নম্রতা ও ভদ্রতাই প্রকাশ পায়; আর ঈশ্বরের দরবারেও এই কথা আমার স্বপক্ষেই লেখা হইয়া থাকে। এই যুক্তিতেই আমি সম্প্রদায়কে দশ আঙ্গুলের ছাপ দিতে বলিতেছি।

"আমরা শুনিয়াছি যে, আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পনের হাজার পাউণ্ড জেনারেল স্মাট্‌সের নিকট হইতে লইয়া সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিক্রয় করিয়াছেন। আমি কখনও দশ আঙ্গুলের ছাপ দিব না এবং কাহাকেও দিতে দিব না। আমি ঈশ্বরের শপথ লইয়া বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি এশিয়াটিক আফিসে যাওয়ায় অগ্রণী হইবে আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিব।"

"পাঠান ভাইয়ের অনুভূতি আমি বুঝিতে পারিতেছি। আমার নিশ্চয় ধারণা যে, ঘুষ খাইয়া আমি সম্প্রদায়কে বিক্রয় করিব, একথা কেহ মনে করেন না। যে দশ আঙ্গুলের টিপ না দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে তাহাকে তাহা করিতে হইবে না, একথা আমি প্রথম হইতেই বুঝাইয়াছি। প্রত্যেক পাঠান বা আর কেহ আঙ্গুলের টিপ না দিয়া যদি পাস করাইতে চান, তবে তাঁহাকে তাহা করিতে আমি সাহায্যই করিব। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আঙ্গুলের টিপ না দিয়াই তাঁহারা স্বেচ্ছায় রেজিষ্ট্রী করিতে পারিবেন। মারিয়া ফেলার ধমক আমার কাছে ভাল লাগে নাই, একথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। কাহাকেও মারিয়া

ফেলার প্রতিজ্ঞা খোদার নামে করা যায় না, একথা আমি বলিব। আমি অবশ্য বুঝি যে, ক্রোধের বশেই এই ভাই মারিয়া ফেলার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তিনি কার্য্য করুন আর নাই করুন, এই মিটমাটের জন্য প্রধানতঃ আমিই দায়ী বলিয়া সম্প্রদায়ের সেবক হিসাবে আমার একান্ত কর্ত্তব্য যে, আমাকেই আঙ্গুলের ছাপ সর্ব্বাগ্রে দিতে হইবে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ঐ কার্য্য আমাকেই প্রথমে করিতে দেন। রোগে মরা বা ঐরূপ কোনও কারণে মরা অপেক্ষা, আমার কোনও ভাইয়ের হাতেই মৃত্যু লাভ করায় আমার দুঃখ নাই। আমি যদি সে সময় এতটুকুও না রাগ করি, যে মারিতেছে তাহার প্রতি দ্বেষ না করি, তবে আমি জানি যে, ভবিষ্যতে আমার ভাল গতিই হইবে; আর যে মারিবে সেও পরে বুঝিবে যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার হেতু কি তাহা বুঝানো দরকার। যাহারা ঐ ঘাতকী আইন মানিয়া লইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায়, কঠোর ভাষায় সভা-সমিতিতে ও 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে' বলা হইত। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষের ভাব ইহাতে থাকিত না। এইজন্য তাহাদের জীবন দুঃখময় হইয়াছিল। তাহারা কখনো ভাবে নাই যে, সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ঠিক থাকিবে ও সরকারের উপর এমন চাপ দিতে পারিবে যে, সরকারকে মিটমাট করিতে হইবে। যখন ১৫০ জনের বেশী সত্যাগ্রহী জেলে গেল, যখন মিটমাটের কথা চলিতে লাগিল, তখন যাহারা আইন মানিয়া লইয়াছিল তাহাদের আরও বেশী খারাপ বোধ হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ ছিল যাহারা মিটমাট চাহিত না, মিটমাট হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিত।

ট্রান্সভালে খুব অল্প সংখ্যক পাঠানই থাকিত। সর্ব্বসাকুল্যে পঞ্চাশ জনের বেশী হইবে না বলিয়া মনে করি। ট্রান্সভালে যুদ্ধের সময় যে সকল গোরা সিপাহী আসিয়াছিল তাহারা যেমন এখানেই বসবাস করিতেছিল, পাঠান সিপাহীরাও তেমনি এখানেই থাকিয়া গিয়াছিল। পাঠানদের ভিতর বেশীর ভাগই এইভাবে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার মক্কেলও ছিল। অন্য প্রকারেও আমি তাহাদের সহিত খুব পরিচিত হইয়াছিলাম। তাহারা স্বভাবতঃই ভোলা ধরণের। তাহারা অবশ্যই সাহসী, কাহাকেও মারা ও মরা তাহাদের কাছে সামান্য ব্যাপার। কাহারও উপর যদি তাহারা ক্রুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে মারপিট করে, কখন কখন মারিয়াও ফেলে। এ বিষয়ে তাহাদের আপন পরের জ্ঞান থাকে না। যদি সহোদর ভাই হয় তাহা হইলেও তাহার সহিত ঐ ব্যবহারই করিবে। তাহারা সংখ্যায় এত অল্প লোক থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে একটা কলহ হইলেই পরস্পর মারপিট করিত। আমাকে অনেকবার এইরকম ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনার কাজ করিতে হইয়াছে। পাঠানেরা যখন কাহাকেও বিশ্বাসঘাতক মনে করে, তখনই তাহাদের ক্রোধ দুর্দ্দমনীয় হয়। তাহাদের ন্যায় বিচারের রীতিই হইতেছে মার লাগানো। পাঠানেরা এই সত্যাগ্রহ যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভাবেই আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহারা কেহই ঐ আইন মানিয়া লয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে ভুলে ফেলাও সহজ ছিল। আঙ্গুলের টিপ লইয়া তাহাদের মনে একটা ভুল ধারণা করাইয়া দিয়া উত্তেজিত করা খুব সম্ভব ছিল। "যদি ঘুষ না খাইয়া থাকি তবে আঙ্গুলের টিপ দিতে বলিব কেন?"—এই একটা কথাই তাহাদের মন বিগড়াইয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ট্রান্সভালে আবার আর একটা দল ছিল। ইহারা লুকাইয়া ট্রান্সভালে

প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের প্রবেশের পাস ছিল না। ইহারা অপরকেও ঐ প্রকার ভাবে গোপনে, বিনা পাসে, অথবা মিথ্যা পাস দেখাইয়া আনাইয়া স্বার্থ সিদ্ধি করিত। এই দল একথা জানিত যে, মিটমাট হইলে তাহাদের স্বার্থের বিঘ্ন হইবে। যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন ত আর কাহাকেও পাস দেখাইতে হইবে না। এই জন্য এই দল নির্ভয়ে, যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিন জেলে যাওয়া এড়াইয়া ঐ ব্যবসা চালাইতে পারিবে। যত বেশীদিন এই যুদ্ধ চলে ততই তাহাদের পক্ষে ভাল। এই দলও হয়ত পাঠানদিগকে উত্তেজিত করিয়া থাকিবে। পাঠকেরা ইহার পর হয়ত বুঝিতে পারিবেন যে, পাঠানেরা কেন হঠাৎ এত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ঐ পাঠানের কথায় সভায় কোনও প্রভাব হয় নাই। আমি সকলকে মিটমাট বিষয়ে ভোট দিতে বলিয়াছিলাম। সভাপতি ও অন্যান্য নেতারা ঠিক ছিলেন। পাঠানের সহিত এই কথা কাটাকাটির পরে সভাপতি মহাশয় মিটমাটের কথা বুঝাইয়া এবং সকলের এই মিটমাট স্বীকার করিয়া লওয়ার আবশ্যকতা বুঝাইয়া বক্তৃতা দেন। তাহার পর তিনি সভার মত নির্দ্ধারণ করেন। দুইজন পাঠান ব্যতীত আর সকলে একমত হইয়া মিটমাট স্বীকার করে।

বাড়ী পহুঁছিতে আমার রাত দুইটা তিনটা হইয়া গেল। আমাকে খুব প্রত্যূষে উঠিয়াই জেলে যাইতে হইবে বলিয়া আর ঘুমানো গেল না। সকাল ৭টায় আমি জেলে পহুঁছি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টেলিফোনে আবশ্যকীয় নির্দ্দেশ পাইয়াছিলেন। তিনি কেবল আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সত্যাগ্রহী বন্দীরা মুক্ত হইল। সভাপতি ও অন্যান্য সকলে তাহাদিগকে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। জেল হইতে আমরা সকলে সভাস্থলে যাই এবং তখন আবার

একটা সভা হয়। সে দিন ও পরের দুই চার দিন ভোজ ইত্যাদিতে ও লোককে বুঝাইতে কাটিয়া গেল। যত দিন যাইতে লাগিল মিটমাটের রহস্য একদিকে যেমন লোকে বুঝিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি আবার অবুঝের দলও বাড়িতে লাগিল। উস্কাইয়া দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। ইহা ছাড়া জেনারেল স্মাট্‌সের নিকট লিখিত পত্রও ভুল বুঝিবার যথেষ্ট কারণ হইয়াছিল। যখন সত্যাগ্রহ চলিতেছিল তখন যত না মুস্কিল হইয়াছিল, এখন যে নানাপ্রকারের যুক্তি তর্ক উপস্থিত হইল, তাহা বুঝাইতে আমার তদপেক্ষা অধিক মুস্কিল হইতে লাগিল। যুদ্ধকালে বিরোধী পক্ষই আমাদিগকে কষ্ট দিয়া থাকে। তাহা অতিক্রম করা সহজ, কেন না তখন অভ্যন্তরীণ সমস্ত দ্বন্দ্ব বন্ধ থাকে, নিজেদের মধ্যের অমিল ও অবিশ্বাস হয় চাপা পড়ে, না হয় সাধারণ বিপদের সম্মুখে উহার তীব্রতা কমিয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হয়, অভ্যন্তরীণ দ্বেষ তখন পুনরায় আসিয়া দেখা দেয়। যদি শত্রুর সহিত একটা আপোষ হয়, তখন অনেকেই তাহাতে খুঁত ধরার ন্যায় সহজ ও প্রীতিকর কার্য্যে লাগিয়া যান। তখন সাম্প্রদায়িক বা গণতন্ত্র-মূলক সংস্থার ছোট বড় সকলকেই জবাব দিতে হয়, সন্তুষ্ট করিতে হয়। এইরূপ করাই উচিত। এই সময়ের মিত্রদ্রোহে অথবা আত্মকলহে লোকে যে শিক্ষা লাভ করে, শত্রুর সহিত যুদ্ধে সে শিক্ষা লাভ করা যায় না। বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত যুদ্ধ করায় একপ্রকার নেশা আছে, একপ্রকার উল্লাস আছে। কিন্তু মিত্রদের মধ্যে মনান্তর বা কলহ অসাধারণ বস্তু এবং তাহা সর্ব্বদাই দুঃখদায়ক। তাহা হইলেও ইহাই হইতেছে মানুষের পরীক্ষার সময়। আমি বরাবর এইরূপই দেখিয়া আসিয়াছি এবং আমার মনে হয় যে, এই প্রকার অবস্থায় পড়িয়াই আমি আমার সমস্ত আন্তরিক সম্পদ

বাড়াইয়া লইতে পারিয়াছিলাম। যুদ্ধ চলার সময় ইহার শুদ্ধ স্বরূপ যাহারা বুঝে নাই, তাহারা মিটমাটের সময় ও মিটমাটের পরে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। আমাদের বিরুদ্ধতা পাঠানদের মধ্যেই বদ্ধ ছিল।

এশিয়াটিক রেজিষ্ট্রার স্বেচ্ছায় পাস গ্রহণ করার ব্যবস্থা অনুযায়ী সার্টিফিকেট বা পাস দিতে শীঘ্রই প্রস্তুত হইলেন। সার্টিফিকেট কেমন ধরণের হইবে তাহা সত্যাগ্রহী নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকার ঠিক করিয়াছিলেন এবং উহা এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত আকারের হইয়াছিল।

১৯০৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা কয়েকজন সার্টিফিকেট লইতে প্রস্তুত হইলাম। সার্টিফিকেট লওয়ার কাজটা যে তাড়াতাড়ি শেষ করা বিশেষ প্রয়োজন একথা সম্প্রদায়কে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাও স্থির করা হইয়াছিল যে, নেতারা সকলেই প্রথম দিনেই গিয়া সার্টিফিকেট লইয়া আসিবেন। ইহাতে লোকের ভয় ভাঙ্গিবে, তাহাছাড়া এশিয়াটিক আফিসের আমলারা কেমন ব্যবহার করে, তাহাও দেখা যাইবে এবং সমস্ত ব্যবস্থাটা কেমন চলিতেছে তাহাও বুঝা যাইতে পারিবে।

আমার আফিসেই সত্যাগ্রহ আফিসও ছিল। যখন আমি আফিসে পঁহুছিলাম তখন দেখি মীর আলম কয়েকজন সঙ্গী লইয়া আফিসের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। মীর আলম আমার পুরাণো মক্কেল, তাহার সকল কার্য্যেই সে আমার পরামর্শ লইত। মীর আলম ঘাসের বা ছোবড়ার মাদুর তৈরী করাইয়া বিক্রয়ের ব্যবসা করিত। অনেক পাঠানই ঐ কাজ করিত। উহাতে বেশ লাভ ছিল। মীর আলম লম্বায় ছিল ছয় ফুটের উপর, আর তাহার শরীর বিশাল ও বলিষ্ঠ

ছিল। এই প্রথম আমি মীর আলমকে আফিসের ভিতরে না বসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। তাহার চক্ষুর সহিত আমার দৃষ্টি মিলিলেও এই প্রথমবার আমাকে সেলাম করা তাহার বাদ পড়িল। আমার রীতি অনুযায়ী আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেমন আছ?" আমার মনে হয় সে যেন—'ভাল আছি' কি তেমনি একটা কিছু জবাব দিল। কিন্তু অন্য দিনের মত আজ তাহার মুখের ভাব হাস্যময় ছিল না। দেখিলাম তাহার চোখ রোষে ভরা। মনে মনেই আমি উহা জানিয়া লইলাম। কিছু একটা ঘটিবে বলিয়া মনে হইল। আমি আফিসে প্রবেশ করিলাম। সভাপতি মিঃ ইসুফ্ মিঞা ও অন্যান্য মিত্রেরা আসিয়া পঁহুছিলেন। আমরা এশিয়াটিক আফিস অভিমুখে রওনা হইলাম। সাথে সাথে মীর আলম ও তাহার সঙ্গীরাও চলিল। আমার আফিস হইতে যে বাড়ীতে এশিয়াটিক আফিস ছিল উহা এক মাইলের কম। সেখানে যাইতে বড় রাস্তা ধরিয়া যাইতে হয়। সেখানে পহুঁছিতে আর মিনিট তিনেকের পথ আছে, এমন সময় মীর আলম আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইতেছেন?" আমি বলিলাম—"আমি দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়া রেজিষ্টারী সার্টিফিকেট আনিতে যাইতেছি। যদি তুমি আমার সহিত আস তবে তোমার ছাপ দিতে হইবে না। তোমার রেজিষ্ট্রী প্রথম করাইয়া পরে আঙ্গুলের ছাপ দিয়া আমি করিব।" আমি এই কথা বলিয়া শেষ করিতেছি, এমন সময় পিছন দিক হইতে আমার মাথায় একটা লাঠির ঘা পড়িল। আমি "হা রাম" বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম, পরে কি হইল জানি না। শুনিলাম—মীর আলম ও তাহার সঙ্গীরা আমাকে আরও লাঠি পেটা করে এবং লাথি মারে। ইসুফ্ মিঞা ও থাম্বি নাইডু কিছু মার আটকান। তাঁহাদের দুইজনের উপরও সেই জন্য কিছু মার পড়ে।

তারপর গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। যে সকল গোরা পথ চলিতেছিল তাহারা দাঁড়াইয়া যায়। মীর আলম ও তাহার সঙ্গীরা পলাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু গোরারা তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। ইতিমধ্যে পুলিশ আসিয়া পড়ে। উহাদিগকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। নিকটেই এক গোরার আফিস ছিল, সেখানে আমাকে উঠাইয়া লইয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে আমার জ্ঞান হইলে আমি দেখি যে, রেভারেণ্ড মিঃ ডোক আমার মাথার কাছে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কেমন আছেন?" আমি জবাব দিলাম—"আমি ভাল আছি, তবে আমার দাঁত ও পাঁজরায় ব্যথা আছে।" তারপরেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মীর আলম কোথায়?"

"তাহাকে ও তাহার সঙ্গের লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

"উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

"সে সব হইবে, এখানে আপনি অপর একজনের আফিসে পড়িয়া আছেন। আপনার ওষ্ঠ কাটিয়া গিয়াছে। পুলিশ আপনাকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত। কিন্তু যদি আপনি আমার ওখানে যান, তবে মিসেস ডোক ও আমি আমাদের সাধ্যমত সেবা করিতে পারি।"

"আমাকে আপনার ওখানে লইয়া চলুন। পুলিশকে ধন্যবাদ দিবেন, তাহাদিগকে বলিবেন—আপনার ওখানেই আমি যাইতে ইচ্ছা করি।"

ইতিমধ্যে এশিয়াটিক অফিসারও আসিয়া পঁহুছিলেন। এই থানকার পাদ্রী এক গাড়ী করিয়া আমাকে তাঁহার ওখানে লইয়া গেলেন। ডাক্তার ডাকিতে পাঠানো হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আমি এশিয়াটিক আমলা মিঃ চমনীকে বলিলাম—"আমার আশা ছিল আপনার আফিসে গিয়া দশ আঙ্গুলের ছাপ দিয়া সার্টিফিকেট লওয়া। ঈশ্বর সে

ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না। কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি এইখানেই কাগজপত্র লইয়া আসুন ও আমাকে রেজিষ্ট্রী করুন। আমি আশা করি, আমার পূর্ব্বে আর কাহাকেও রেজিষ্ট্রী করিবেন না।"

"এত তাড়াতাড়ি কিসের, এখনি ডাক্তার আসিবে। আপনি আরোগ্য লাভ করুন, সব ঠিক হইবে। অপরকে সার্টিফিকেট দিব, আপনার নামের জন্য উপরে ফাঁক রাখিয়া দিব।"

"কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, যদি জীবিত থাকি আর ঈশ্বর করেন, তবে আমিই সর্ব্বপ্রথমে সার্টিফিকেট লইব। সেই জন্যই আমার বিশেষ অনুরোধ যে, আপনি কাগজপত্র লইয়া আসুন।"

তিনি গেলেন, তাহার পর আমার দ্বিতীয় কাজ ছিল এটর্নী জেনারেল ও সরকারী উকীলকে টেলিগ্রাম করিয়া জানানো যে—"মীর আলম ও তাহার সঙ্গীরা আমাকে যে মারপিট করিয়াছে সেজন্য আমি তাহাদিগকে অপরাধী মনে করি না এবং আমি তাহাদের নামে, মোকদ্দমা চালাইতেও চাই না। আমার আশা আছে যে, আমার খাতিরে আপনারা উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন।"

এই টেলিগ্রামের উত্তরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে জানানো হইল।

কিন্তু জোহানেসবর্গের গোরারা এটর্নী জেনারেলকে এক কড়া পত্র লিখেন। "অপরাধীর শাস্তিদান বিষয়ে গান্ধীর মত যাহাই হোক্, এ মুল্লুকে তাহা চলিতে পারে না। অপরাধীরা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া এই আক্রমণ করে নাই। প্রকাশ্য রাস্তায় তাহারা এই অপরাধ করিয়াছে। কয়েকজন ইংরাজও এই ঘটনার সাক্ষী দিতে পারেন। অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করাই চাই।" এই আন্দোলনের ফলে সরকারী উকীল মীর আলম ও তাহার সাথীদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার করেন ও

তাহারা ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ড পায়। আমাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয় নাই।

এইবার আমার রোগীর গৃহের কথা। মিঃ চমনী কাগজ-পত্র আনিতে গেলেন, এই অবসরে ডাক্তার আসিয়া পঁহুছিলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, আমার উপরের ওষ্ঠ কাটিয়া গিয়াছিল, তাহা শেলাই করিয়া দিলেন। পাঁজরা ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া ঔষধ দিলেন আর যে পর্য্যন্ত শেলাই করিয়া না দেওয়া হয় সে পর্য্যন্ত কথা বলিতে মানা করিলেন এবং জলীয় পদার্থ ছাড়া আর কিছু খাওয়াইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, কোথাও সাংঘাতিক আঘাত হয় নাই। সপ্তাহের মধ্যেই শয্যাত্যাগ করিয়া আমি সাধারণ মত কাজ করিতে পারিব, তবে দুই একমাস বেশী শারীরিক শ্রম না করার জন্য উপদেশ দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমার কথা বলা এই ভাবে বন্ধ হইলেও আমি তখন হাত চালাইতে পারিতাম সভাপতির হাতে সম্প্রদায়ের জন্য একখানা ছোট চিঠি আমি লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। উহা নীচে দিতেছি :—

"আমার শরীর ভাল আছে, মিঃ ও মিসেস্ ডোক-এর হাতে আমি রহিয়াছি, আর অল্পদিনেই পুনরায় সেবা কার্য্য করিতে পারিব। যাহারা আমাকে মারিয়াছে তাহাদের উপর আমার রাগ নাই। তাহারা না বুঝিয়া এই কাজ করিয়াছে, তাহাদের নামে মোকদ্দমা চালানোর আবশ্যক নাই। যদি সকলেই শান্ত থাকে, তবে এই ঘটনা হইতে আমাদের লাভই হইবে।

"হিন্দুরা মনে এতটুকুও রোষ রাখিবেন না। ইহা হইতে যাহাতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব উপস্থিত না হইয়া মধুরভাব উপস্থিত হয়, ইহাই আমি ইচ্ছা করি ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।

"মার যাহা হইয়াছে, আর ইহার পর যদি আরো বেশী মার পড়ে তবুও আমার একটা পরামর্শ দেওয়ার আছে। সকলেই, অধিকাংশ লোকেই যদি দশ আঙ্গুলের ছাপ দেয় তবেই গরীবদের ভাল হইবে ও তাহাদিগকে রক্ষা করা হইবে।

"যদি আমরা খাঁটি সত্যাগ্রহী হই, তবে মার খাওয়ার অথবা ভবিষ্যতে ঠকিবার ভয় মোটেই করিতে পারি না। যাহারা দশ আঙ্গুলের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়াছে তাহাদিগকে আমি অজ্ঞান বলিয়া মনে করি।

"আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সম্প্রদায়ের ভাল করুন, সম্প্রদায়কে সত্য পথে রাখুন, আর হিন্দু মুসলমান যেন আমার এই রক্তপাত দ্বারা যুক্ত হয়।"

মিঃ চমনী আসিলেন, আমি কতকটা ব্যথা সহিয়াই আঙ্গুলের টিপ দিলাম। এই সময় তাঁহার চক্ষে আমি জলও দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাঁহার বিরুদ্ধে আমাকে কড়া কথাও লিখিতে হইত। তাঁহার সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা করাই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু ঘটনায় পড়িয়া লোকের হৃদয় কেমন নরম হয়, তাহার চিত্র আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। এই সকল কাজ হইয়া যাইতে কয়েক মিনিটের বেশী লাগে নাই। মিঃ ডোক ও তাঁহার পত্নী ইচ্ছা করিতেছিলেন যে, এই আক্রমণের পরে আমি যেন সম্পূর্ণ শান্ত ও সুস্থ হইয়া থাকি। কিন্তু আমার মানসিক ক্রিয়া যে ভাবে চলিতেছে তাহা দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইলেন। উহাতে আমার পীড়া বাড়িতে পারে বলিয়া তাঁহাদের ভয় হইতেছিল। এইজন্য ইসারা করিয়া ও অন্য উপায়ে আমার খাটের নিকট হইতে সকলকে লইয়া গেলেন, আমাকে লিখিতে, কি আর কিছু করিতে মানা করিলেন। আমি লিখিয়া জানাইলাম যে, তাঁহাদের

কন্যা অলিভ (সে তখন খুব ছোট ছিল) যদি আমাকে আমার প্রিয় ইংরাজী ভজন শুনায় তবে আমি শান্ত হইয়া পড়িব। নরসিংহ রাও তরজমা করাতে সকল গুজরাটীই এই ভজনের অর্থ জানেন। তাহার প্রথম লাইন এই রকম

"প্রেম-জ্যোতি তব দেখাও
মম জীবন পথ উজলিয়া"

আমার এই অনুরোধ মিঃ ডোকের খুব ভাল লাগিল। মধুর হাস্য দ্বারা তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও অলিভকে ইসারা করিয়া ডাকিয়া দরজার পাশে দাঁড় করাইয়া মৃদুস্বরে ভজন গাহিতে বলিলেন। এই কথা লিখিবার সময় এখনও সে সমস্ত দৃশ্যটা আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে, আর অলিভের মিষ্টি স্বরের ঝঙ্কার কানে আসিতেছে।

যে সকল কথা আমি অবান্তর মনে করি ও পাঠকও তাহাই মনে করিবেন, এমন অনেক কথা এই অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে। তবুও আর একটা কথা না লিখিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যায় না। এই সময়কার সকল স্মৃতিই এত পবিত্র যে, আমি তাহা বাদ দিয়া যাইতে পারি না। ডোক পরিবারের সেবার বিবরণ আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? জোসেফ ডোক ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের পাদ্‌রী ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসার পূর্ব্বে নিউজিল্যাণ্ডে ছিলেন। এই আক্রমণের ঘটনার মাস ছয়েক পূর্ব্বে তিনি আমার আফিসে আসিয়া কার্ড পাঠান। কার্ডে নামের পূর্ব্বে "রেভারেণ্ড" দেখিয়া আমি অন্যায় করিয়া ভাবিয়া লইলাম যে, ইনি হয়ত কোনও পাদ্‌রী হইবেন, আমাকে খৃষ্টান করার ইচ্ছায় আসিয়াছেন, অথবা সত্যাগ্রহ যুদ্ধ বন্ধ করিতে পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন, আর না হয়ত মুরব্বী হইয়া এই যুদ্ধে আমাদের সহিত সমবেদনা জানাইতে আসিয়াছেন। মিঃ ডোক প্রবেশ করার কয়েক

মিনিটের মধ্যেই আমার ভুল দেখিতে পাইয়া মনে মনে তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলাম। সেই দিন হইতে আমরা পরম বন্ধু হইলাম। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রত্যেক অবস্থার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। "এই যুদ্ধে আপনি আমাকে আপনাদের মিত্র বলিয়া জানিবেন। আমার দ্বারা যদি কোনও সেবা হইতে পারে তাহা করা আমার ধর্ম্ম মনে করিয়া করিতে চাই। যিশুর জীবন চিন্তা করিয়া যদি আমি কিছু শিখিয়া থাকি, তবে তাহা এই যে, দুঃখীর দুঃখের অংশ লইতে হয়।" আমাদের পরিচয় এইভাবে আরম্ভ হইয়া প্রতিদিনই ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বাড়িতে লাগিল। ডোকের নাম এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে পাঠক পরে অনেকবার পাইবেন। আমি ডোক পরিবারের নিকট হইতে যে সেবা পাইয়াছি তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। রাত্রে ও দিনে কেহ না কেহ আমার নিকট হাজির থাকিতেন। যতদিন আমি তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম ততদিন উহা ধর্ম্মশালা হইয়া গিয়াছিল। সকল রকম লোক ডোকের ঘরে সারে সারে আসিতে লাগিলেন। ভারতীয় সম্প্রদায়ের অনেকে ফিরিওয়ালা বা মজুরের মত ময়লা কাপড় চোপড় পরিয়া, হাঁটু সমান ধূলি পায়, পৌঁটলা পুঁটলি সমেত আসিত, আবার এদিকে সরকারের প্রধান মন্ত্রী পর্য্যন্ত আসিতেন। ইঁহারা সংবাদ লইতে আসিতেন এবং পরে ডাক্তার যখন দেখা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন তখন দেখা করিতে আসিতেন। সকলকেই তিনি সমান আদরের সহিত নিজের বৈঠকখানায় আনিয়া বসাইতেন। যতদিন সেখানে ছিলাম ততদিন হয় আমার পরিচর্য্যা, নয়ত শত শত লোককে অভ্যর্থনার কার্য্যেই তাঁহাদের সারাদিন কাটিয়া যাইত। রাত্রিতেও ডোক দুই তিনবার আমার কামরায় আসিয়া চুপে চপে দেখিয়া

যাইতেন। ইঁহাদের বাড়ীতে কখনো মনে করিতে পারি নাই যে, ইহা আমার বাড়ী নয়, অথবা আমার নিকটতম আত্মীয় আমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে পারিত। পাঠক একথা মনে করিবেন না যে, ভারতীয় সম্প্রদায়কে এইরূপ প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করার জন্য, অথবা আমাকে তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাঁহাকে কোন কষ্টই সহ্য করিতে হয় নাই। ইঁহাদের পল্লী গোরাদের এক গির্জ্জায় তিনি ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁহার জীবিকা ঐ পল্লী লোকের নিকট হইতেই আসিত। একথা মনে করা যায় না যে, সকলেরই মন উদার হইবে। ভারতীয়দের প্রতি সাধারণ অপ্রীতি তাঁহাদের মধ্যে অবশ্যই ছিল। ডোক তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। আমার পরিচয়ের প্রথমেই আমি এই সঙ্কোচের যোগ্য বিষয় লইয়া আলোচনা করি। তাঁহার উত্তর জানাইবার মত। তিনি বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, আপনি যিশুর ধর্ম্মকে কি মনে করেন? যে মানুষ নিজের ধর্ম্মের জন্য শূলে চড়িয়াছিলেন, যাহার প্রেম জগতের মতই বিশাল, আমি তাঁহারই অনুগামী। যে গোরারা আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন বলিয়া ভয় করিতেছেন তাঁহাদের নিকট আমি যিশুর অনুরক্ত হিসাবে যদি দাঁড়াইতে চাই, বা সেরূপ ইচ্ছা করিলে, আমার এই যুদ্ধে প্রকাশ্যভাবেই যোগ দেওয়া দরকার। আর যদি সেজন্য আমার মণ্ডলী আমাকে ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মোটেই দুঃখ করা উচিত হইবে না। আমার জীবিকা তাঁহারাই যোগান একথা সত্য, তবে একথা আপনি মনে করিবেন না যে, জীবিকার জন্যই আমি তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছি, অথবা তাঁহারাই আমার অন্নদাতা। আমার অন্ন ঈশ্বরই দিতেছেন। তাঁহারা নিমিত্ত মাত্র। তাঁহাদের সহিত আমার সম্পর্কের মধ্যে একটা অকথিত সর্ত্ত আছে যে, আমার ধর্ম্ম সংক্রান্ত স্বাধীনতায় তাঁহারা কেহ

হাত দিতে পারিবেন না। আমার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আমি ত ভারতীয়দের উপর দয়া করিয়া এই যুদ্ধে নামি নাই, আমার ইহাই ধর্ম্ম, এই জ্ঞানে আমি ইহাতে লাগিয়াছি। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, আমার ডীনের (গির্জ্জার প্রধান) সহিত আমি এবিষয়ে বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছি। তাঁহাকে আমি বিনয়ের সহিত জানাইয়াছিলাম যে, আমার ভারতীয়দের সহিত সম্পর্ক যদি তাঁহার পছন্দ না হয়, তবে তিনি ইচ্ছা হইলেই আমাকে বিদায় দিতে পারেন। তিনি অপর মিনিষ্টার রাখিতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করেন। উপরন্তু তিনি আমাকে উৎসাহও দিলেন। একথা মনে করিবেন না যে, সকল গোরাই আপনাদিগকে একই রকম বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে। পরোক্ষভাবে আপনাদের প্রতি অনেক গোরার সহানুভূতি আছে। আপনি তাহা না জানিতে পারেন, কিন্তু আমার ত সে অভিজ্ঞতা আছে, স্বীকার করিতে হইবে।

এইপ্রকার স্পষ্ট আলোচনার পর এ বিষয়ে আর কোনও দিন কথা বলি নাই। ইহার পরে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ডোক ধর্ম্ম কার্য্যে রোডেসিয়ায় গিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হ'ন। তখন তাঁহার গির্জ্জায় তাঁহার পন্থীরা তাঁহার স্মৃতি সভা করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বর্গীয় কাছলীয়াকে, অন্য ভারতীয়দিগকে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমাকে সেখানে কিছু বলিতেও অনুরোধ করিয়াছিলেন।

দিনদশেক পরে আমি একরকম চলাফেলা করিতে পারিতাম। এই অবস্থায় এই প্রেমময় পরিবারের নিকট হইতে বিদায় লই। আমাদের উভয়ের পক্ষেই এই বিচ্ছেদ দুঃখ-দায়ক হইয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গোরা সহায়কবর্গ

এই যুদ্ধে এত প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন গোরা ভারতীয়দিগের পক্ষ লইয়া কার্য্যে নামিয়াছিলেন যে, একস্থানে তাঁহাদের সকলের পরিচয় দেওয়া মন্দ নয়। যখন পরে যথাস্থানে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইবে, তখন তাঁহাদিগকে পাঠকের অপরিচিত বলিয়া মনে হইবে না এবং আমাকেও বক্তব্যের মাঝখানে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক হইবে না। নামগুলি একের পর এক করিয়া যে ভাবে সাজানো হইয়াছে তাহাতে যেন পাঠক একথা মনে না করেন যে, উহা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার বা সাহায্যের ক্রম অনুসারে করা হইয়াছে। যাঁহার সহিত যখন পরিচয় সেই সময়ের ক্রম অনুসারে অথবা যে কার্য্যে তাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যের ক্রম অনুসারে সাজানো হইয়াছে।

প্রথমেই হইতেছেন মিঃ এলবার্ট ওয়েষ্ট। এই যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। আমার সহিত পরিচয় তাহারও পূর্ব্বে হয়। যখন আমি জোহানেসবর্গে আফিস খুলি তখন আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিলেন না। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯০৩ সালে একটা টেলিগ্রাম পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া আসি। তখন আশা ছিল যে, এক বৎসরের মধ্যেই ফিরিব। যে নিরামিষ ভোজনাগারে আমি প্রত্যহ দুই বেলা ভোজন করিতাম, মিঃ ওয়েষ্টও সেইখানেই খাইতে যাইতেন। আমরা এইভাবে পরস্পরের সহিত পরিচিত হই।

১৯০৪ সালে জোহানেসবর্গে ভারতীয়দের মধ্যে একটা ভীষণ মড়ক দেখা দেয়। আমি সব সময়ই রোগীদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতাম বলিয়া হোটেলে আসা অনিয়মিত হইয়া পড়ে। যাহাতে আমার নিকট হইতে কাহারও ছোঁয়াচ লাগার ভয় না থাকে, সেইজন্য যখন হোটেলে লোক থাকিত না সেই সময় গিয়া খাইয়া আসিতাম। দুই দিন আমাকে উপর্য্যুপরি না দেখিতে পাইয়া ওয়েষ্ট শঙ্কিত হইয়া পড়েন। তিনি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলেন যে, আমি প্লেগ রোগীদের শুশ্রূষা করিতেছি। তৃতীয় দিন ছয়টার সময় আমি যখন হাতমুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতেছি তখনই ওয়েষ্ট আসিয়া আমার দরজায় ঘা দিলেন। আমি দরজা খুলিতেই ওয়েষ্টের হাসিমুখ সম্মুখে দেখিলাম।

তিনি আমাকে দেখিয়াই আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—"আপনাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আপনাকে ভোজনাগারে না দেখিয়া আমি শঙ্কিত হইয়াছিলাম। আমার দ্বারা যদি কোনও সাহায্য হইতে পারে তবে তাহা আমাকে অবশ্য বলিবেন।" আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"রোগীর শুশ্রূষা?"

"কেন নয়? আমি অবশ্যই প্রস্তুত আছি।" "আপনার নিকট হইতে অন্য কোনও উত্তর প্রত্যাশা করিতে পারি নাই। কিন্তু শুশ্রূষার জন্য আমার সঙ্গে যথেষ্ট লোক আছেন। আপনার নিকট হইতে উহা অপেক্ষাও অধিক কঠিন কাজ আমি প্রত্যাশা করি। মদনজিৎ এখানে রহিয়াছেন। "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" প্রেস দেখার কেহ নাই। মদনজিৎকে আমি প্লেগের কাজেই আটকাইয়া রাখিয়াছি। আপনি যদি ডারবানে যাইয়া প্রেসের ভার লন তবে খুব বড় সাহায্য করা হইবে। উহাতে প্রলোভিত হওয়ার মত কিছু নাই। আপনাকে আমি সামান্যই অর্থ দিতে পারিব। এই ধরুন,

মাসে দশ পাউণ্ড। আর যদি প্রেস হইতে কোন লাভ হয়, তবে তাহার অর্দ্ধেক আপনার থাকিবে।"

"কাজটা কিছু শক্ত বটে। আমার অংশীদারের অনুমতি লইতে হইবে। কিছু টাকা পাওনা আছে, কিন্তু সেজন্য চিন্তা নাই। আজকার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কি আপনি আমাকে সময় দিবেন?"

"হাঁ ছয়টার সময় পার্কে আপনার সহিত দেখা হইবে।"

"আমি ঠিক পঁহুছিব।"

সেই অনুসারে আমাদের দেখা হয়। তিনি অংশীদারের সম্মতি লইয়াছিলেন। যাঁহারা ধারিতেন তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায়ের ভার আমার উপরে অর্পিত হইল। পরের দিন সন্ধ্যার ট্রেণে তিনি রওনা হন। এক মাসের মধ্যে তাঁহার রিপোর্ট আসিল "এই ছাপাখানা হইতে লাভ ত হয়ই না, অনেক লোকসান হয়। অনেক টাকা ধার পড়িয়া আছে, খাতাপত্রও ঠিক নাই। গ্রাহকদের সকলের নাম নাই, ঠিকানা নাই। আরও অনেক অব্যবস্থা রহিয়াছে। এ সকল অভিযোগ হিসাবে আমি লিখিতেছি না। আমি লাভের জন্য এখানে আসি নাই, সেইজন্য একাজ যে ছাড়িব না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। কিন্তু এ কথা আপনাকে জানাইয়া দিতেছি যে, আপনাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকসান দিয়া যাইতে হইবে।"

মদনজিৎ জোহানেসবর্গে আসিয়াছিলেন। গ্রাহক করা ও আমার সহিত ছাপাখানার ব্যবস্থা লইয়া কথাবার্ত্তা বলার উদ্দেশ্য ছিল। প্রতিমাসেই আমাকে কিছু টাকা লোকসান ভরিতে হইত, কিন্তু আমাকে কত দিতে হইবে তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। পাঠকেরা জানেন যে, প্রথম হইতেই মদনজিতের ছাপাখানার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। সেইজন্য তাঁহার সহিত একজন অভিজ্ঞ লোক দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।

ইতিমধ্যে প্লেগ আরম্ভ হইল। এই ধরণের সেবাকার্য্যে তিনি খুব কুশল ও অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এখানে আটকাইয়া রাখিলাম। ওয়েষ্ট যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে, যাইতে স্বীকার করিলেন, তখন তাঁহাকে এই প্লেগের সময়টার জন্যই সেখানে যাইতে না বলিয়া বরাবরের জন্যই যাইতে হইবে একথা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। আর সেইজন্যই উপরোক্ত রিপোর্ট তিনি পাঠাইয়াছিলেন। পরে সংবাদপত্র ও ছাপাখানা দুই-ই ফিনিক্সে লওয়া হয়, সে কথা পাঠক জানেন। ওয়েষ্টের বেতন দশ পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে তিন পাউণ্ড হইল। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনেই তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। কি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন হইবে সে ভয় তাঁহার কোনও দিন ছিল না। তিনি ধর্ম্মপুস্তকাদি অধ্যয়ন না করিলেও তাঁহাকে আমি অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া জানি। তিনি অতিশয় স্বাধীনচেতা ছিলেন। যেটা যেমন দেখিতেন তাহাই তিনি বলিতেন। কালোকে কৃষ্ণবর্ণ বলিতেন না, কালোই বলিতেন। তাঁহার জীবনযাত্রা অতিশয় সরল ছিল। আমার সহিত যখন পরিচয় হয় তখন পর্য্যন্ত তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং আমি জানি যে, তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতেন। কিছুকাল পরে তিনি বিলাতে পিতামাতাকে দেখিতে যান এবং বিবাহ করিয়া ফিরেন। আমার পরামর্শমত মাকে, স্ত্রীকে ও কুমারী ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত সরলভাবে ফিনিক্সে ছিলেন এবং সব রকমেই ভারতীয়দিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। মিস্ ওয়েষ্টের এখন ৩৫ বৎসর বয়স, এখনো কুমারী আছেন এবং অতিশয় পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার দ্বারাও কম সেবা হয় নাই। ফিনিক্সের শিশুদিগকে দেখাশুনা করা, তাহাদিগকে ইংরাজী শেখানো, সার্ব্বজনিক পাকশালায় রান্না করা, বাড়ী পরিষ্কার রাখা, খাতাপত্র রাখা, ছাপাখানায় কম্পোজ ইত্যাদি

কাজ করা, এ সমস্তই এই মহিলা বিনা দ্বিধায় করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি ফিনিক্সে নাই। আমি চলিয়া আসার পর তাঁহার যে সামান্ত ব্যক্তিগত খরচার প্রয়োজন ছিল, তাহাও ছাপাখানা দিয়া উঠিতে পারিত না। ওয়েষ্টের শ্বাশুড়ীর বয়স এখন আশীর উপর হইবে। তিনি শেলাইয়ের কাজ খুব ভাল জানিতেন। এই বৃদ্ধা এই দিক দিয়া খুব সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে সকলেই ঠাকুরমা বলিয়া ডাকিত ও সেইরকমই মনে করিত। শ্রীমতী ওয়েষ্টের সম্বন্ধে কিছুই বলার আবশ্তক করে না। যখন ফিনিক্সের সকলেই জেলে চলিয়া গেল, তখন ওয়েষ্ট পরিবার মদনলালের সহিত ফিনিক্সের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেন। সংবাদপত্রের ও ছাপাখানার সমস্ত কার্য্যই ওয়েষ্ট করিতেন। আমার অথবা অন্তের অনুপস্থিতিতেও গোখলেকে যে টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইত, তাহা তিনি পাঠাইতেন। অবশেষে ওয়েষ্টকেও যখন গ্রেপ্তার করিল তখন গোখলে ভীত হইয়া এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনকে পাঠাইয়া দিলেন। ওয়েষ্ট অবশ্ত শীঘ্রই ছাড়া পাইয়াছিলেন।

আর একজন হইতেছেন রিচ। তাঁহার সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তিনি যুদ্ধের পূর্ব্বে আমার আফিসে প্রবেশ করেন। আমার পরে আমাদের কাজের ভার তিনি লইবেন বলিয়া ব্যারিষ্টার হওয়ার জন্ত বিলাতে গিয়াছিলেন। সেখানে কমিটির সকল দায়িত্বই তাঁহার উপরে ছিল।

তৃতীয় ব্যক্তি পোলক। পোলকের সহিতও ওয়েষ্টেরই মত ভোজন গৃহে আপনা আপনি পরিচয় হয়। তিনিও মুহূর্ত্তের মধ্যে 'ট্রান্সভাল ক্রিটিক' নামক পত্রের সহকারী সম্পাদকতা ত্যাগ করিয়া 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' কার্য্য গ্রহণ করেন। তিনি যে এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিলাতে ও সারা ভারতে ভ্রমণ করিয়াছেন, একথা সকলেই জানেন। রিচ

বিলাত যাওয়ার পরে তাঁহাকে ফিনিক্স হইতে আমার আফিসে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে আর্টিকল থাকেন এবং পরে উকীল হন ও বিবাহ করেন। মিসেস্ পোলককেও ভারতবাসীরা জানেন। তিনি তাঁহার স্বামীকে লড়াইয়ের কার্য্যে খুব সাহায্য করিতেন। তিনি কোনও দিন স্বামীর কার্য্যে বাধা দেন নাই। ভারতবর্ষের অসহযোগ আন্দোলনকে তাঁহারা আমাদের দৃষ্টিতে না দেখিলেও যথাশক্তি ভারতবর্ষের সেবা করিয়াছেন।

তারপর হার্মান কলেনবেক। যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইঁহার সহিত পরিচয় হয়। তিনি জাতিতে জার্ম্মান। যদি ইংরাজ-জার্ম্মান যুদ্ধ না হইত তবে আজ তিনি ভারতবর্ষে থাকিতেন। তাঁহার হৃদয় উদার ও শিশুর ন্যায় সরল। তাহার অনুভূতি অতিশয় তীব্র। তিনি শিল্পী বা আর্কিটেক্ট। এমন কোন কাজই ছিল না যাহা করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন। যখন আমি জোহানেসবর্গের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিলাম তখন তাঁহারই সহিত একত্র থাকিতাম। তিনি আমার খরচা যোগাইতেন। বাড়ী ত তাঁহার নিজেরই ছিল। খাওয়া দাওয়ার খরচ দেওয়ার কথা বলিলে তিনি রুষ্ট হইয়া বলিতেন যে, তাঁহাকে ব্যয়বাহুল্য করিয়া টাকা উড়াইয়া দেওয়া হইতে আমিই বাঁচাইয়া দিয়াছি। কথাটা বলার হেতু ছিল। সে যাহা হোক্ গোরাদের সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বর্ণনা করার স্থান ইহা নহে। যখন গোখলে আসিয়াছিলেন তখন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কলেনবেকের বাংলাতেই রাখা হইয়াছিল। তাঁহার এই বাড়ীটা গোখলের অতিশয় পছন্দ হইয়াছিল। তিনি আমার সহিত জাঞ্জীবার পর্য্যন্ত গোখলেকে ফিরিয়া পঁহুছাইতে আসেন। পোলকের সঙ্গেই তিনি গ্রেপ্তার হইয়া জেল ভোগ করেন। অবশেষে যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকা পরিত্যাগ করিয়া গোখলের

সহিত ইংলণ্ডে দেখা করিতে যাই, তখন কলেনবেক আমার সঙ্গে ছিলেন। যুদ্ধের জন্য তাঁহাকে আমার সহিত ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য জার্ম্মানের সঙ্গে তাঁহাকেও ইংলণ্ডে ইণ্টার্ণ বা নজরবন্দী রাখা হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে কলেনবেক দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাঁহার ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করেন।

এক্ষণে একজন মহদাশয়া বালিকার সহিত পাঠকের পরিচয় করাইব। তাঁহার নাম মিস সোঞ্জা শ্লেসিন। গোখলে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যে প্রকার মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকদিগকে শুনাইয়া দিতে চাই। গোখলের লোক চিনিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। আমি তাঁহার সহিত ডেলা গোয়া বে হইতে জাঞ্জীবার পর্য্যন্ত যাই। এই সমুদ্রযাত্রা-কালে আমাদের নিরিবিলি কথাবার্ত্তা বলার সুন্দর অবকাশ মিলে। দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রধান প্রধান লোকের সহিত গোখলের পরিচয় হইয়াছিল: এই যুদ্ধ-নাটকের প্রধান প্রধান অভিনেতাদের চরিত্র সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি প্রধান স্থান মিস্ শ্লেসিনকে দেন। "মিস শ্লেসিনের ন্যায় এমন পবিত্রতা, কার্য্যের প্রতি এমন একনিষ্ঠ অনুরাগ এবং এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি। তিনি কোনও পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়া ভারতীয়দের স্বার্থে তাঁহার সর্ব্বস্ব যেভাবে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। এতদুপরি তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও কার্য্যকুশলতার কথা ভাবিলে তাঁহাকে তোমাদের এই যুদ্ধে এক অমূল্য সম্পদ বলিয়া ধরিতে হয়। আমার একথা বলাই বাহুল্য ; তবুও বলিতেছি যে, তুমি অবশ্যই তাঁহাকে পালন করিবে।" মিস্ ডিক্ নাম্নী এক স্কচদেশীয় বালিকা আমার টাইপিষ্টের কাজ করিত। সে বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি ছিল। আমার জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছি, কিন্তু তেমনি

অনেক উদার-চরিত্র ইউরোপীয় ও ভারতবাসীকে সঙ্গীরূপে পাওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছি। মিস্ ডিকের বিবাহ হওয়ায় সে আমার কাজ ছাড়িয়া দিয়া যায়। তাহার পর মিঃ কলেনবেক মিস্ শ্লেসিনকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি বলেন, "এই বালিকার মা ইহাকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। এ খুব চতুর ও সৎ, কিন্তু বড় দুষ্টু ও উদ্দাম প্রকৃতির, হয়ত কিছু উদ্ধতও হইবে। দেখুন যদি ইহাকে দিয়া আপনার চলে। কেবল বেতনের জন্য আমি ইহাকে আপনার কাছে দিতেছি না।" আমি একজন ভাল টাইপিষ্টকে মাসিক কুড়ি পাউণ্ড করিয়া দিতেও প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু মিস্ শ্লেসিনের কর্ম্ম-কুশলতার সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। মিঃ কলেনবেক বলিলেন যে, তাঁহাকে প্রথম প্রথম মাসিক ছয় পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত হইলাম। মিস্ শ্লেসিনের ভিতরে যে দুষ্টামি ছিল তাহার পরিচয় শীঘ্র সে দিল। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সে আমার হৃদয় জয় করিয়া ফেলিল। দিনে রাত্রে সকল সময়েই সে কাজের জন্য প্রস্তুত থাকিত। তাহার পক্ষে কোনও কাজই শক্ত বা অসম্ভব ছিল না। তাহার বয়স তখন মোটে ষোল বছর। কিন্তু সে আমার মক্কেলদিগকে ও সত্যাগ্রহী সহকর্ম্মীদিগকে তাহার সেবার আগ্রহে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। আফিসের ভিতর সৎ নীতি ও এই যুদ্ধের ভিতর সৎ নীতি ও পবিত্রতার রক্ষয়িত্রী ও প্রতিপালিকা সেই হইয়া পড়িল। যে কাজ করিতে যাওয়া হইতেছে তাহার নৈতিক যৌক্তিকতার সম্বন্ধে যখনই তাহার কোনও সন্দেহ হইত, তখনই সে তাহা খোলাখুলি আমার সহিত আলোচনা করিয়া সন্তোষ না পাওয়া পর্য্যন্ত থামিত না। যখন সকল সত্যাগ্রহী জেলে গেল এবং একমাত্র কাছলীয়া বাহিরে থাকিলেন, তখন মিস্ শ্লেসিনের হাতে লক্ষ টাকা ব্যয় করার ও

তাহার হিসাব রক্ষার ভার পড়িল। নানা ধরণের লোকের ও কর্ম্মীর সহিত তাহার কাজ করিতে হইত। কাছলীয়াও তাঁহার আশ্রয় লইতেন, পরামর্শ লইতেন। আমরা সকলে জেলে গেলে ডোক্ 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'এর ভার লইলেন। কিন্তু এই পক্ককেশ বহু অভিজ্ঞ বৃদ্ধও 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' জন্য যাহা লিখিতেন তাহা এই বালিকাকে দিয়া দেখাইয়া পাস করাইয়া লইতেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মিস শ্লেসিন না থাকিলে তিনি নিজেকেই নিজের কার্য্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। সে যে সাহায্য করিয়াছে এবং যে পরামর্শ দিয়াছে, সে সকলের যে কি মূল্য, তাহা আমি বলিতে পারি না। অনেক সময়েই সে যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছে, সেগুলি যোগ্যই হইয়াছে একথা বলিতে পারি। পাঠান, পটেল, গিরমিটিয়া, সকল জাতের লোক তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত, তাহার পরামর্শ লইত এবং তাহার মত অনুসারে কাজ করিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণতঃ গোরারা ভারতীয়দের সহিত একগাড়ীতে বসে না। ট্রান্সভালে একগাড়ীতে চলা নিষেধ করাই আছে। সত্যাগ্রহীর রীতি অনুসারে তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীতেই চলিতে হইত। মিস্ শ্লেসিন ইচ্ছা করিয়া ভারতীয়দের গাড়ীতেই বসিত ও দরকার হইলে গার্ড বাধা দিলে, প্রতিরোধ পর্য্যন্ত করিত। আমার ভয় হইত কখন মিস্ শ্লেসিন গ্রেপ্তার হইয়া যায়। কিন্তু ট্রান্সভাল সরকার মিস্ শ্লেসিনকে ভাল করিয়া জানিলেও তাহার শক্তি, তাহার যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান, আর সত্যাগ্রহীর হৃদয়ের উপর তাহার অধিকার এই তিনটা কথা জানিয়া শুনিয়াও মিস শ্লেসিনকে গ্রেপ্তার না করিয়া স্থিরবুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান যে সরকারকে ত্যাগ করে নাই, সে পরিচয় দিয়াছেন। মিস্ শ্লেসিন মাসে যে ছয় পাউণ্ড করিয়া লইত তাহার বেশী কখনো

নেয় নাই। তাহার কতকগুলি অভাবের কথা জানিয়া তাহাকে আমি মাসিক দশ পাউণ্ড করিয়া দিতে আরম্ভ করি। সে দ্বিধার সহিত ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। "উহার উপর আমার আর আবশ্যক নাই, তবুও যদি আপনার নিকট হইতে লই, তাহা হইলে যে নিষ্ঠার সহিত আমি আপনার নিকট কাজ করিতেছি তাহা মলিন হয়।" এই জবাব পাইয়া আমি চুপ করিয়া গেলাম। কেপ ইউনিভারসিটির ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা সে পাস করিয়াছিল। ও প্রথম বিভাগের সার্টিফিকেট পাইয়াছিল। যুদ্ধের পব সে ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েট হইয়া ট্রান্সভালের কোনও সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী হয়।

হার্ব্বাট কিচন একজন ইংরাজ ছিলেন। তিনি ইলেকট্রিকের কাজ জানিতেন। তিনি বুয়ার যুদ্ধে আমার সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

উপরে যাঁহাদের কথা বলিলাম তাঁহারা কার্য্য-প্রসঙ্গে আমার সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহারা কেহ ট্রান্সভাল গোরাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় নহেন। তাহা হইলেও, তাঁহাদের খুব সাহায্য পাওয়া যাইত, একথা বলা যায়। তাঁহাদের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ যুদ্ধ সহায়ক গোরাদের এক স্থায়ী ক্লাব গঠন ও পরিচালন করা হয়। এই ক্লাব যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। যুদ্ধ বাধিয়া গেলে স্থানীয় সরকার কেমন করিয়া বিদ্রোহীদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবেন? অসহযোগের দৃষ্টিতে নয়, কিন্তু যাহারা সরকারের আইন ভাঙ্গিতেছে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে সরকার পারেন না। সেই সময় সরকার ও ভারতীয়দের মধ্যে গোরাদের সমিতিই মধ্যস্থতার কাজ করিতেন।

মিঃ এলবার্ট কার্টরাইটের সহিত আমি পূর্ব্বেই পাঠকের পরিচয়

করাইয়া দিয়াছি। তারপর ছিলেন রেভারেণ্ড চার্লস ফিলিপ্স। ইনি ডোকের মতই যোগ দেন ও সাহায্য করেন। মিঃ ফিলিপ্স অনেক দিন হইতে গির্জ্জার সাধারণ প্রার্থনার পাদ্রীর কার্য্য করিতেন। তাঁহার গুণবতী স্ত্রীও খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। আর একজন পাদ্রী সহায়ক ছিলেন মিঃ ডিউডনে ড্রু। ইনি পাদ্রীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া ব্লুমফনটেনের দৈনিক 'ফ্রেণ্ড' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপীয়দের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহার কাগজে ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করিতেন। তিনি একজন বক্তা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই রকমই অযাচিত সহায়ক আর একজন ছিলেন মিঃ ভেরেষ্টেণ্ট। তিনি 'প্রিটোরিয়া নিউজের' সম্পাদক ছিলেন। একসময় প্রিটোরিয়ার টাউনহলে ইউরোপীয়দের এক সাধারণ সভা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ঘাতকী আইনকে সমর্থন করা ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে নিন্দা করা। সেই সভায় ভারতীয় বিরোধীদের মধ্যে তিনি একা প্রতিবাদ করিতে দাঁড়ান এবং সভাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও বসিতে অস্বীকার করেন। ইউরোপীয়েরা তাঁহার গায় হাত তুলিবে বলিয়া ভয় দেখায়। তবুও তিনি সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া টাউন হলেই রহিলেন, তখন সভা আর প্রস্তাব পাস না করিয়াই ভাঙ্গিয়া গেল। এমন গোরাও ছিলেন যাঁহারা কোনও সমিতির সহিত যুক্ত না হইয়াও, সুবিধা পাইলেই ভারতীয়দিগকে সাহায্য করিতে ছাড়িতেন না। এমন অনেক গোরার নাম আমি দিতে পারি। তবে এক্ষণে আমি মাত্র তিন জন মহিলার কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন লর্ড হবহাউসের কন্যা মিস্ হবহাউস। বুয়ার যুদ্ধের সময় এই মহিলা লর্ড মিলনারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ট্রান্সভালে আসেন। লর্ড কিচেনার তাঁহার বিখ্যাত বা কুখ্যাত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প

করিয়াছিলেন। সেখানে বুয়ার স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ রাখা হইত। এই মহিলা একাকী তখন বুয়ার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ঘুরিতেন, সাহস দিতেন ও লর্ড কিচেনারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দৃঢ় হইয়া থাকিতে উপদেশ দিতেন। এই বুয়ার যুদ্ধে ইংরাজেরা যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সর্ব্বতোভাবে অধর্ম্মোচিত মনে করিতেন। তিনি সেই জন্য স্বর্গগত মিঃ ষ্টেডের ন্যায় ইচ্ছা করিতেন ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন যে, ইংলণ্ডের যেন এই যুদ্ধে পরাজয় হয়। বুয়ারদিগকে এই ভাবে সেবা করার পর তিনি শুনিলেন যে, সেই বুয়ারেরাই, যাহারা অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেই সর্ব্বশক্তি লইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, এখন অন্ধ অন্ধ সংস্কারবশে আবার একটা অন্যায় নিজেরাই করিতে চলিয়াছে। বুয়ারেরা তাঁহাকে খুব প্রীতি ও সম্মানের চক্ষে দেখিত। তিনি জেনারেল বোথার সহিত নিকট সম্পর্ক রাখিতেন। বুয়ারেরা যাহাতে ঐ ঘাতকী আইন উঠাইয়া দেয় সে জন্য তাঁহার যাহা সাধ্য তাহা তিনি করিতেন। অপর মহিলার নাম মিস্ অলিভ শ্রাইনার। তাঁহার কথা পূর্ব্বেই এক অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বিখ্যাত শ্রাইনার পরিবারের বিদুষী কন্যা। শ্রাইনার নাম এতই বিখ্যাত ছিল যে, যখন ইনি বিবাহ করেন তখন ইঁহার স্বামীই শ্রাইনার নাম লন, উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রাইনার পরিবারের সহিত যে তাঁহার সম্পর্ক আছে একথা সেখানকার গোরারা যেন বিস্মৃত না হন। তাঁহার তুচ্ছ আত্মাভিমান ছিল না। এই মহিলার সরলতা ও নম্রতা তাঁহার বিদ্যার ন্যায়ই তাঁহার ভূষণ হইয়াছিল। আমার মনে হয়, তাঁহার সহিত আমার ভাল পরিচয়ই ছিল। তাঁহার নিগ্রো চাকর ও তাঁহার নিজের মধ্যে কোনও ভেদ আছে, একথা তিনি কখনো মানেন নাই। যেখানেই ইংরাজী ভাষা প্রচলিত আছে, সেই খানেই তাঁহার 'ড্রিম্‌স্' নামক পুস্তকের আদর রহিয়াছে। ইহা গদ্য

হইলেও কাব্য স্থানীয়। ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য বহিও আছে। বহি লেখার মত তাঁহার কলমের উপর যথেষ্ট দখল থাকিলেও, তিনি নিজের ঘরে নিজে হাতেই রান্না করিতেন, সাফসুফ করিতেন, বাসন মাজিতেন, তাহাতে লজ্জা বোধ করিতেন না, কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তিনি একথা স্বীকার করিতেন যে, এই প্রকার কায়িক শ্রম, তাঁহার লেখার শক্তি না কমাইয়া বরঞ্চ তাহা বাড়াইয়া তুলিত, তাঁহার লেখার ভিতরে এবং যুক্তির ভিতরে একটা যথার্থতা ও ভালমন্দ বিচারশক্তি আনিয়া দিত। দক্ষিণ তিনি আফ্রিকার গোরাদের উপর তাঁহার সমস্ত প্রভাবই ভারতীয়দিগের পক্ষে প্রযুক্ত করেন।

তৃতীয় মহিলা মিস মোল্‌টিনো। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার পুরাতন মোল্‌টিনো বংশোদ্ভবা বয়স্থা নারী ছিলেন। তিনিও যথাশক্তি সাহায্য করেন।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এত সব গোরার সাহায্যের ফল কি হইয়াছিল? তাহা হইলে আমি জবাব দিব যে, কি ফল হইয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য এই অধ্যায় লিখি নাই। উপরে যে সকল কার্য্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই কোনও কোনও ফল পাওয়ার প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে। তবুও যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এই সকল হিতেচ্ছু গোরার এই সমস্ত কার্য্যের কি ফল হইয়াছিল, তবে তাহার উত্তর—এই যুদ্ধের ধরণই এই যে, যুদ্ধ করাতেই যুদ্ধ করার ফল থাকে। সত্যাগ্রহের যুদ্ধ স্বাবলম্বন, স্বার্থত্যাগ ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের যুদ্ধের ইতিহাসে গোরা সহায়কদিগের নাম দেওয়ার একটা কারণ এই যে, গোরারা যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আমি কিছু সকল গোরা সহায়কেরই নাম দিই নাই। কিন্তু যাঁহাদের নাম দিয়াছি

তাঁহাদের মধ্য দিয়াই যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়াছি। আরও একটা কারণ আছে। যদি শুদ্ধচিত্তে কোনও কার্য্য করা যায় তবে তাহার পরিণাম শুভ হয়। সে পরিণাম ফল চোখে দেখা যাক্ বা না যাক্, আমরা স্পষ্টভাবে পরিণাম না দেখিতে পাইলেও পরিণাম যে শুভ সেই বিশ্বাসের প্রতি সত্যাগ্রহী হিসাবে আমার শ্রদ্ধা প্রকট করাও এই নামোল্লেখের কারণ। তৃতীয় আর একটা কারণও আছে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কার্য্যে আপনা আপনিই শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ সহায়ককে আকৃষ্ট করে। যদি এই অধ্যায়ে এপর্য্যন্তও সেকথা স্পষ্ট না হইয়া থাকে, এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিব যে, সত্যাগ্রহের যুদ্ধ সত্যের প্রকাশের জন্য। এই সত্যের প্রকাশের জন্য প্রয়াস ব্যতীত, গোরাদের সাহায্য লওয়ার আর কোনও চেষ্টা করা হয় নাই। যুদ্ধের অন্তরে যে বল রহিয়াছে সেই বলেই আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

বিশেষ আভ্যন্তরীণ অসুবিধা

একবিংশতি অধ্যায়ে ভিতরের কতকগুলি অসুবিধার কথা বলিয়াছি। যখন আমার উপর আক্রমণ হয় তখন আমার পরিবার ফিনিক্সে ছিল। আক্রমণের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হইলেই অমনি রেলভাড়া করিয়া তাহাদের ফিনিক্স হইতে জোহানেসবর্গে আসা সম্ভবপর ছিল না। ভাল হওয়ার পর সেই জন্য আমারই যাওয়া দরকার ছিল। কাজের জন্য আমাকে নাতাল ও ট্রান্সভালের মধ্যে যাতায়াত করিতেই হইত। মিটমাট লইয়া নাতালেও খুব ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত হইয়াছে একথা আমার অজানা ছিল না। আমার নামে ও অপরের নামে পত্র আসিত, উহা হইতেই জানিতাম। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'ও মিটমাটে দোষারোপ করিয়া অনেক পত্র গিয়াছিল। তাহার এক তাড়া আমার নিকট ছিল। যদিও এপর্য্যন্ত সত্যাগ্রহ কেবল ট্রান্সভালেই করা হইয়াছিল, তথাপি নাতালের ভারতীয়দের সম্মতি ও সহানুভূতি ছিল। ট্রান্সভালের ভারতীয়েরা ট্রান্সভালের জন্য সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের হইয়াই লড়িতেছিল। সেই হেতু নাতালের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার জন্যও আমার নাতাল যাওয়ার প্রয়োজন ছিল।

নাতালের ভারতীয়েরা সাধারণ সভা করিলেন। কয়েকজন মিত্র আমাকে প্রথম হইতেই জানাইয়াছিলেন যে, আমার উপর আক্রমণ হইবে, সেইজন্য হয় আমার সভায় যাওয়া মুলতুবী রাখিতে হয়, নয়ত রক্ষা পাওয়ার

কোনও ব্যবস্থা করিতে হয়। এই দুইয়ের মধ্যে একটিও আমার দ্বারা হইবার মত ছিল না। মালিক যদি সেবককে ডাকে, আর সেবক যদি ভয়ে না যায়, তাহা হইলে তাহার সেবা-ধর্ম্ম নষ্ট হয়। আর, সেবক যদি মালিকের সাজাকেই ভয় করে তবে সে কেমন সেবক?

জনসেবা, সেবার জন্যই করা। ইহা তরবারির ধারের উপর দিয়া চলার মত কঠিন কাজ। জনসেবক যদি প্রশংসা লইতে প্রস্তুত থাকে তবে নিন্দার হাত হইতে কেমন করিয়া পলাইবে? আমি এইজন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইলাম। মিটমাট কেমন হইল সে বিষয়ে প্রশ্ন ছিল, আমি তাহার জবাব দিয়াছিলাম। রাত্রি আটটা আন্দাজ সময়ে এই সভা হইতেছিল। কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় এক পাঠান তাহার লাঠি লইয়া মঞ্চের উপর আসিল। সেই সময় বাতিও নিভিয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিলাম। সভাপতি শেঠ দাউদ মহম্মদ টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। আমাকে যাঁহারা বাঁচাইতে চান তাঁহারা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। রক্ষার জন্য আমি কোনও ব্যবস্থাই করি নাই, কিন্তু যাঁহারা আক্রমণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন পকেটে রিভলভার লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। ইতিমধ্যে পার্শী রুস্তমজী আক্রমণের আভাষ পাইয়া বিদ্যুৎ বেগে দৌড়াইয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডারকে খবর দিলেন। তিনি একদল পুলিশ পাঠাইয়া দিলেন। এই গণ্ডগোলের মধ্যে পুলিশ রাস্তা করিয়া আমাকে মাঝখানে রাখিয়া পার্শী রুস্তমজীর বাড়ীতে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকালে পার্শী রুস্তমজী ডারবানের পাঠানদের একত্র করিলেন ও তাহাদের আমার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ আছে তাহা বলিতে বলিলেন। আমি তাহাদের সহিত দেখা করিলাম। তাহাদিগকে শান্ত

করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় না, আমি শান্ত করিতে পারিয়াছিলাম। সন্দেহের প্রতিকার যুক্তি দ্বারা করা যায় না। তাহাদের বিশ্বাস, আমি সম্প্রদায়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। এই ময়লা যতক্ষণ তাহাদের মাথা হইতে সাফ্ না হইতেছে ততক্ষণ বুঝাইবার চেষ্টা মিথ্যা।

সেইদিনই আমরা ফিনিক্স পঁহুছিলাম। যে মিত্রেরা আমাকে পূর্ব্বরাত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাকে একা পাঠাইতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা ফিনিক্সে যাইবেন একথা বলিলেন। "আমি না চাহিলেও যদি আপনারা ফিনিক্সে আসেন, তবে আমি আপনাদিগকে ঠেকাইতে পারি না। সেথানে ত জঙ্গল, আর সেখানকার বাসিন্দারা যদি আপনাদিগকে থাইতেও না দেয় তবে কি করিবেন?" তাঁহারা জবাব দিলেন "আমাদিগকে ভয় দেখাইবার দরকার নাই। আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করিয়া লইব। যতক্ষণ আমরা সিপাহীর কাজ করিতেছি, ততক্ষণ আপনার ভাণ্ডার লুটিতে ঠেকাইবে কে?"

এই প্রকার আমোদ করিতে করিতে আমরা ফিনিক্সে গেলাম। এই দলের প্রধান ছিল জ্যাক মুডালী নামে ভারতীয়দের মধ্যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। সে তামিল পিতামাতার সন্তান, নাতালেই জন্মিয়াছে। সে বক্সিংএ (মুষ্টিযুদ্ধ) ওস্তাদ ছিল। সে এবং তাহার সঙ্গীরা মনে করিত যে, জ্যাক মুডালীকে হারাইতে পারে এমন গোরা অথবা কালো লোক দক্ষিণ আফ্রিকায় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি এক বর্ষাকাল ছাড়া বরাবরই খোলা জায়গায় শুইতাম। আজও তাহা পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেইজন্য স্ব-নিয়োজিত রক্ষকদল রাত্রে আমাকে পাহারা দেওয়া স্থির করিল। যদিও এই দলের সহিত ডারবানে তামাসা করিয়াছি, তাহাদিগকে আসিতেও নিষেধ করিয়াছি, তথাপি আমার এই

দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে যে, যখন তাহারা পাহারা দিতেছিল তখন মন অধিকতর নির্ভয় হইয়াছিল এবং মনে ইহাও হইয়াছিল যে, যদি ইহারা না আসিত তবে কি সত্যই এতটা নির্ভয় হইয়া শুইতে পারিতাম ? আমার মনে হয়, কোনও আওয়াজ হইলে আমি নিশ্চয়ই চমকিয়া উঠিতাম। আমি মনে করি যে, আমার ঈশ্বরের উপর অবিচল শ্রদ্ধা আছে। অনেক বৎসর হইতে আমার বুদ্ধি একথা মানিয়া লইয়াছে যে, মৃত্যু একটা বড় পরিবর্ত্তন মাত্র এবং যখনই আসুক উহা আদর করিয়া লওয়ার যোগ্য। হৃদয় হইতে মৃত্যুভয় ও অন্য ভয় দূর করিবার জন্য আমি মহা প্রযত্ন করিয়াছি।

আমার জীবনে এমন অবসরের কথাও স্মরণ হয়, যখন মৃত্যুপ্রাপ্তির চিন্তায় প্রিয়তম বন্ধুর দেখা পাইলে লোকে যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তেমনভাবে আনন্দিত হইতে পারি নাই। মানুষ বলবান হওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও দুর্ব্বল। যে জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে, অনুভবে প্রতিষ্ঠার অবসর আসিলে তাহাকে দিয়া বিশেষ কাজ পাওয়া যায় না। আবার যখন লোকে বাহ্য বলের আশ্রয় পায় ও তাহা স্বীকার করিয়া লয়, তখন নিজের অন্তরের বল বেশীর ভাগ স্থলেই খোওয়াইয়া বসে। সত্যাগ্রহীর এই ধরণের ভয় হইতে সর্ব্বদাই বাঁচা চাই।

ফিনিক্সে আমি একটা কাজ করিলাম। বুঝার ভুল দূর করিবার জন্য খুব লিখিতে লাগিলাম। সম্পাদক ও সন্দিগ্ধ পাঠকের মধ্যে একটা কল্পিত কথোপকথন লিখিয়া ফেলিলাম। উহাতে যত আশঙ্কার কথা আমি শুনিয়াছিলাম সে সমস্ত বিশেষভাবে আলোচনা করিলাম পরিণাম ভাল হইয়াছিল বলিয়া মনে করি। যাহাদের মধ্যে সন্দেহ থাকিলে খুব খারাপ হইত তাহারা যে সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহা প্রকাশ্যভাবেই দেখা গিয়াছিল। মিটমাট স্বীকার করিবে কি না একথা কেবল ট্রান্সভালবাসীদিগের জন্যই। সেইখানে কার্য্যতঃ তাহাদের পরীক্ষা

এবং নেতা ও সেবক হিসাবে আমার পরীক্ষা হইতেছিল। অল্পমাত্র ভারতীয়ই ছিল যাহারা স্বেচ্ছায় সার্টিফিকেট লয় নাই। সার্টিফিকেট লেখার আমলারা কাজ করিয়া উঠিতে পারিত না, এত লোক সার্টিফিকেট লইতে যাইত। অল্পদিনের মধ্যেই মিটমাটের সর্ত্তের যাহা ভারতীয়দিগের পূরণ করার কথা তাহা তাহারা পূরণ করিয়া ফেলিল। একথা সরকারকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আমি ইহাতে দেখিয়াছিলাম যে, সন্দিগ্ধ লোকেরা যদিও উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়াছিল তবু তাহাদের ক্ষেত্র খুব সঙ্কীর্ণ ছিল। কয়েকজন পাঠান যখন আইন নিজের হাতে লইয়া বলপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল তখন মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। কিন্তু যদি সেই চাঞ্চল্য বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, তাহার কোনও ভিত্তিই নাই। আর এই বলপ্রয়োগের ফল অনেক সময়েই ক্ষণিক হইয়া থাকে। তবুও জগতে আজ এই বলপ্রকাশ করাই একটা শক্তি বলিয়া গণ্য। খুন-খারাপি দেখিলে আমরা কাঁপিয়া উঠি। কিন্তু যদি ধৈর্য্যের সহিত বিচার করিতে বসা যায় তবে দেখা যাইবে যে, ভয়ের কোনই কারণ নাই। ধরুন যে, মীর আলম কেবল আমার শরীর জখম না করিয়া যদি আমাকে মারিয়া ফেলিত এবং তারপরও সম্প্রদায় শান্ত থাকিত তবে কি হইত? মীর আলম তাহার বুদ্ধিমত অন্য কিছুই করিতে পারিত না একথা মনে করিয়া সম্প্রদায় যদি তাহার প্রতি মিত্রভাব এবং ক্ষমার ভাব রাখিত, তাহা হইলে ইহাতে সম্প্রদায়ের ক্ষতি না হইয়া বরং প্রভূত লাভই হইত। সকল সন্দেহ দূর হইত। সম্প্রদায় নিষ্ঠার সহিত উৎসাহবশে নিজ প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়া থাকিত, নিজ কর্ত্তব্য পালন করিত। আমারও পুরাপুরি লাভই হইত। কেননা যে সত্যাগ্রহী নিজের সত্যের প্রতি আগ্রহ রক্ষা করিয়া সত্যাগ্রহের কারণেই অনায়াসে মৃত্যুলাভ করে, তাহার যে প্রকার মঙ্গলময় পরিণাম হইবে তেমন আর কিছুতেই কল্পনা

করা যায় না। উপরের যুক্তি সত্যাগ্রহের ন্যায় যুদ্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে, ইহাতে বৈরভাবের স্থানই নাই। আত্মশক্তি অথবা স্বাবলম্বনই একমাত্র মন্ত্র। এ যুদ্ধে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে না। ইহাতে নেতা কেহ নাই। আমরা বলিতে গেলে সকলেই সেবক, সকলেই নেতা। সেইজন্য একজন যোদ্ধার মৃত্যুতে, সে যতই বড় যোদ্ধা হোক্ না কেন, যুদ্ধের কিছু ক্ষতি হয় না। কেবল তাহাই নয় উহাতেই যুদ্ধকে বেগবান করে।

ইহাই সত্যাগ্রহের শুদ্ধ ও মূল স্বরূপ। কাজের বেলায় আমরা এমনটি দেখি না, কেননা সকলেই বৈর ত্যাগ করে না। সকলেই সত্যাগ্রহের রহস্য বুঝিয়াছে, অভিজ্ঞতায় ইহা পাওয়া যায় না। অল্প লোকেই সত্যাগ্রহের স্বরূপ দেখিতে পায়, অপরে তাহার অন্ধ অনুকরণ করে। সত্যাগ্রহের মূল-মন্ত্রের প্রয়োগ সামাজিকভাবে এবং জন-সাধারণের মধ্যে ট্রান্সভালেই প্রথম হইল। টলষ্টয় এই কথাই বলেন। আমি শুদ্ধ সত্যাগ্রহ প্রয়োগের ঐতিহাসিক উদাহরণ পাই নাই। আমার ইতিহাসের জ্ঞান অল্প বলিয়া এই বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারি না। বাস্তবিক দেখিতে গেলে এইপ্রকার উদাহরণের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। সত্যাগ্রহের মূল আমি যাহা বলিয়াছি তাহা স্বীকার করিয়া লইলে, উহার যে পরিণাম হওয়ার কথা আমি বলিয়াছি তাহাই হইবে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রয়োগ করা কঠিন বা অসম্ভব একথা বলিয়া এই অমূল্য বস্তুকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অস্ত্র বলের পরীক্ষা ত হাজার হাজার বৎসর ধরিয়াই হইয়াছে। তাহার কুফল আমরা চক্ষেই দেখিতে পাইতেছি। আর ভবিষ্যতেও তাহা হইতে মধুর পরিণাম হওয়ার আশা আছে বলা যায় না। যদি অন্ধকার হইতে আলো উৎপন্ন করা যায় তবেই বৈরভাব হইতে প্রেমভাব উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রস্তাবনা

পাঠকগণ জানেন যে, উপবাসাদির জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস কতকটা লেখার পর বন্ধ রাখিতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে উহা পুনরায় পূর্ব্বলিখিত অধ্যায়ের পর হইতে আরম্ভ করিতেছি। আমি আশা করি যে, এক্ষণে ইহা নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব।

আজ এই ইতিহাস স্মরণ করিয়া আমি দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষে আমাদের বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থায় এমন একটি জিনিষও নাই যাহা ছোট রকম ভিত্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুভূত না হইয়াছে—আরম্ভকালের সেই উৎসাহ, সেই সমর্পণ, সেই আগ্রহ; মধ্যকালের সেই নিরাশা, সেই অসুবিধা, পরস্পরের ভিতর ঝগড়া দ্বেষ ইত্যাদি, আর তাহা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় লোকের অবিচল শ্রদ্ধা, দৃঢ়তা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও নানাপ্রকার প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত বাধা। ভারতবর্ষে এই যুদ্ধের অন্তিমকাল এখনো উপস্থিত হয় নাই। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ যুদ্ধে অন্তিম জয় লাভ করিয়াছি। এখানেও আমি সে ফল পাওয়ার আশা রাখি। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের অন্তিমকাল এইখণ্ডে অতঃপর বর্ণনা করা হইতেছে। কেমনভাবে অযাচিত সাহায্য আসিয়া পড়িয়াছিল, কেমন অনায়াসেই উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়া অবশেষে ভারতীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে জয়ী করিয়াছিল পাঠক এসকল দেখিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যেমন হইয়াছিল ভারতবর্ষেও তেমনি যে হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কেননা তপশ্চর্য্যার উপর, সত্যের উপর, অহিংসার উপর আমার অখণ্ড শ্রদ্ধা রহিয়াছে। আমি ইহা অক্ষরে অক্ষরে মানি, যে সত্যের সেবকের সম্মুখে সারা জগতের সমৃদ্ধি পড়িয়া

রহিয়াছে, তাহার পক্ষে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লভ্য। অহিংসার সান্নিধ্যে বৈরভাব থাকিতে পারে না—এই বাক্য আমি প্রতি অক্ষরে সত্য বলিয়া জানি। যে দুঃখ সহ্য করে তাহার কিছুই অলভ্য নাই—এই নীতির আমি উপাসক। এই তিন পদার্থের সংযোগ আমি কত সেবকের মধ্যে দেখিতেছি। তাহাদের সাধনা নিষ্ফল হইবে না বলিয়াই আমার নিঃসংশয় অনুভব।

হয়ত কেহ কেহ বলিবেন যে,দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পূর্ণ জয় মানে তাহারা যেমন ছিল তেমনি থাকিয়া গেল। এপ্রকার যাহারা বলিবেন তাঁহারা কিছুই জানেন না। যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ যুদ্ধ না করা হইত, তবে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা কেন, সমস্ত উপনিবেশগুলিতেই ভারতীয়-দিগকে আর দাঁড়াইতে হইত না। একথাও বলা হয় যে, যদি সত্যাগ্রহ না করিয়া বোঝাপড়া করিয়া কাজ চালানো হইত তাহা হইলেও সেখানে আজকার যে অবস্থা তাহাই হইত। এই যুক্তির কোনও ভিত্তি নাই, আর যেখানে যুক্তি কেবল অনুমানমাত্র সেখানে কোন্ অনুমান যে উত্তম কে বলিবে? সকলেরই অনুমান করার অধিকার আছে। কিন্তু যে কথাটার উত্তর দেওয়া যায় না, তাহা হইতেছে এই যে, যে অস্ত্র দ্বারা যাহা অর্জ্জন করা যায় সেই অস্ত্র দ্বারা তাহা রাখাও যায়।

সেই বাণ সেই ধনুক হাতে,
অর্জ্জুনে আজ ডাকাত লুটে !

শিবকে যে অর্জ্জুন হারাইয়াছিলেন, কৌরবদিগের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুন যখন কৃষ্ণরূপী সারথি বর্জ্জিত হইলেন তখন তাঁহার হাতে গণ্ডীর ধনুক থাকিতেও একদল লুণ্ঠনকারীকে হারাইতে পারিলেন না। সেই অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের হইয়াছিল। এখনও তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু যে সত্যাগ্রহ দ্বারা তাহারা জয়লাভ

করিয়াছিল, সে অস্ত্র যদি তাহারা খোয়াইয়া বসে তাহা হইলে হারিতে হইবে। সত্যাগ্রহ তাহাদের সারথি ছিল, আর এই সারথিই তাঁহাদিগের সহায় হইতে পারে!

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

(নবজীবন, তাঃ ৫-৭-১৯২৫)

প্রথম অধ্যায়

জেনারেল স্মাট্‌সের বিশ্বাসঘাতকতা (?)

পাঠকেরা অভ্যন্তরীণ বিঘ্নের বিষয় জানেন, উহা অনেকটা আমার জীবনকাহিনীই হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা অনিবার্য্য, কেননা সত্যাগ্রহের জন্য আমার যাহা বিঘ্ন, সত্যাগ্রহেরও তাহাই বিঘ্ন। এক্ষণে আমরা বাহ্য বিঘ্নের কথা পাড়িব। এই অধ্যায়ের শীর্ষ লিখিতে আমার লজ্জা হয়, কেননা ইহাতে মানুষের স্বভাবের বক্রতারই বর্ণনা রহিয়াছে। ১৯০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় জেনারেল স্মাট্‌স্ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। আজও পৃথিবীর মধ্যে না হোক্, দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্ম-কুশল পুরুষ বলিয়া গণ্য। তাঁহার খুব শক্তি আছে, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নাই। তিনি যেমন বুদ্ধিমান উকীল, তেমনি দক্ষ সেনাপতি এবং তেমনি বিচক্ষণ রাজকার্য্য পরিচালক। ১৯০৭ সাল হইতে অনেক রাজনীতি-বিশারদ আসিয়াছেন ও গিয়াছেন। কিন্তু ১৯০৭ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজ্যপরিচালনার চাবি হাতের মুঠার ভিতরে রাখিয়াদিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দাঁড়াইতে পারে, এমন লোক দক্ষিণ আফ্রিকায় কেহ নাই। আমি আজ যখন ইহা লিখিতেছি তাহার নয় বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়াছি। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার লোক জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে কি বলে তাহা জানি না। জেনারেল স্মাট্‌স্-এর নিজ নাম হইতেছে জন্। দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা তাঁহাকে 'স্লিমজনী' বলিত। স্লিম মানে "পিচ্ছিল"—যাহা "হড়কাইয়া যায়।" আর যদি মিষ্টি বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত করিতে চাহেন, তবে স্লিম বলিতে 'চালাক' শব্দ মন্দ অর্থে ব্যবহার করা যায়। আমাকে

অনেক ইংরাজ মিত্র বলিয়াছিলেন "জেনারেল স্মাট্‌স্ এর সম্বন্ধে সাবধানে থাকিও। তিনি ভারী চালাক লোক, তাঁহার ফস্‌কাইয়া পলাইতে আটকায় না। তাঁহার কথার মানে তিনিই বুঝিতে পারেন। তিনি অনেকবার এমন-ভাবে কথা বলিয়াছেন যে, উভয়পক্ষই তাঁহার বাক্যের অর্থ নিজের অনুকূল করিয়া লইয়াছে। কিন্তু কাজের বেলায় এই দুই পক্ষের অর্থই তিনি একধারে রাখিয়া তৃতীয় অর্থ বুঝাইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন এবং নিজের সমর্থনে এমন সকল যুক্তি দিয়াছেন যে, তখনকার মত দুইপক্ষকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে যে, তাহাদেরই ভুল হইয়া থাকিবে, জেনারেল স্মাট্‌স্ ঠিকই বলিয়াছেন।" আমি যে বিষয়ে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করিতে যাই-তেছি সে বিষয়ে কিন্তু তৎকালেই আমরা তাঁহার কার্য্যকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়াই মানিয়াছিলাম ও বলিয়াছিলাম। আজও ভারতীয় সম্প্রদায় এবং আমি তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই গণ্য করি। তাহা হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশ্বাসঘাতক বিশেষণে আমি যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন প্রয়োগ করিতেছি তাহার কারণ বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার কাজটা হয়ত স্বেচ্ছাকৃত বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না। যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করার সঙ্কল্প নাই সেখানে বিশ্বাসঘাতকতা কেমন করিয়া বলা যায়? ১৯১০-১৪ সালে জেনারেল স্মাট্‌সের কার্য্য আমার নিকট তিক্ত বলিয়া বোধ হয় নাই, আর আজ এতদিন পরে আরও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়াও উহা তিক্ত বলা যায় না। ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, তাঁহার ১৯০৮ সালের ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহার, জ্ঞানপূর্ব্বক বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপার নাও হইতে পারে।

তাঁহার প্রতি ন্যায় আচরণ করার জন্য এবং তাহা সত্ত্বেও তাঁহার নামের সহিত বিশ্বাসঘাতক বিশেষণ যোগ করার জন্য এবং আমি যাহা বলিতে যাইতেছি তাহা বলার জন্য এই প্রস্তাবনা আবশ্যক ছিল। আমরা গত অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, ভারতীয়েরা ট্রান্সভাল সরকারের

কাছে সন্তোষজনক ভাবে স্বেচ্ছায় রেজিষ্ট্রী করিয়াছিল। অতঃপর এশিয়া-বাসীদের বিরুদ্ধে সেই খুনী আইন রদ করা সরকারের কর্ত্তব্য ছিল। সরকার উহা করিলেই সত্যাগ্রহ বন্ধ হয়। ইহার মানে এমন নয় যে, ট্রান্সভালে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যত কিছু আইন আছে সে সকলই রদ হইয়া যাইবে অথবা ভারতীয়দের সকল দুঃখ দূর হইবে। তাহা দূর করার জন্য প্রথম হইতে যে প্রকার নিয়ম মত যুদ্ধ চালানো হইতেছিল তাহা চালাইতেই হইত। সত্যাগ্রহ কেবল ঐ এশিয়াটিক আইন রদ করার জন্য করা হইয়াছিল। উহা আইন বলিয়া মান্য করিলে ভারতীয়েরা হীন হইত এবং প্রথমে ট্রান্সভাল হইতে ও পরে সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইত। কিন্তু ঐ সাংঘাতিক এশিয়াটিক আইন তাঁহারা রদ ত করিলেনই না, উপরন্তু জেনারেল স্মাট্স্ ভারতীয়দের উপর আরো নূতন অপমান নিক্ষেপ করিলেন। তিনি আবার নূতন এক আইনের খসড়া প্রকাশ করিলেন, তাহাতে সেই খুনী আইন বহাল রাখিলেন। স্বেচ্ছায় যে নাম রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে তাহা নিয়ম মাফিক বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং যাহারা রেজিষ্ট্রী করিয়াছে তাহারা যাহাতে সেই সাংঘাতিক আইনের ভিতরে পড়ে তজ্জন্য আইনের খসড়ায় ব্যবস্থা করিলেন। ইহার অর্থ ইহাই দাঁড়াইল যে, একই উদ্দেশ্যযুক্ত দুইটা আইন এক সাথে করা হইল, যাহাতে নূতন যাহারা আসিবে ও যাহারা স্বেচ্ছায় রেজিষ্ট্রী করে নাই তাহারা, সেই সাংঘাতিক আইনের কবলেই থাকে।

ইহা পড়িয়া আমি ত স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এখন ভারতীয় সম্প্রদায়কে আমি কি জবাব দিব! যে পাঠান ভাই মধ্য রাত্রিব সেই সভাতে আমার উপর দোষারোপ করিয়াছিল তাহার কি সুন্দর অবকাশ জুটিল? কিন্তু আমি বলিতে চাই যে, এই অকস্মাৎ আঘাতে সত্যাগ্রহের

উপর আমার বিশ্বাস চূর্ণ না করিয়া আরো বাড়াইয়া দিল। আমি কমিটির সভা করিয়া লোকদিগকে বুঝাইলাম। কেহ কেহ আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "আমরা ত আপনাকে বলিয়াই আসিতেছি যে, আপনি সহজেই গলিয়া যান। কেহ কিছু বলিলেই আপনি তাহা মানিয়া লন। আপনি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে এই প্রকার ভালমানুষী করায় কিছু বলার থাকে না, কিন্তু সম্প্রদায়ের কার্য্যে এই প্রকার অতি-বিশ্বাস ক্ষতির কারণ হয়। পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ আর ফিরাইয়া আনা আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়। আপনি কি আমাদিগকে জানেন না? আমরা ত সোডা ওয়াটারের বোতলের ন্যায়। অল্প সময়ের জন্য উথলাইয়া উঠি, সুতরাং সেই অবকাশেই যতটুকু করিয়া লওয়ার তাহা করা চাই। আর যদি উহা ব্যবহার না করা হয় ত সব গেল।" এই সকল শব্দ-বাণের মধ্যে বিষ ছিল না। অন্য ব্যাপারেও আমাকে এইরূপ শুনিতে হইয়াছে। আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—"যাহাকে আপনারা ভালমানুষী বলিতেছেন তাহা আমার সহিত একেবারে জড়িত। এই ভালমানুষী মানে বিশ্বাস। বিশ্বাস রাখা, আমি আমার ও আপনাদের সকলেরই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝি। আর যদি আপনারা ইহাকে আমার ত্রুটি বলিয়াই মনে করেন, তবে আমার সেবা দ্বারা যদি কোনও লাভ হইয়া থাকে সে লাভকে আপনারা যেমনভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এই ক্ষতিও আপনাদের সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। আপনারা যে সম্প্রদায়ের উৎসাহ সোডা ওয়াটারের মত বলেন সে কথা আমি মানি না, সম্প্রদায়ে আপনিও আছেন, আমিও আছি। আমাকে যদি এই বিশেষণ প্রয়োগ করেন, তবে আমি অবশ্যই তাহা অপমান বলিয়া মনে করিব, আর আমি ইহাও বিশ্বাস করি, আপনি নিজেও ইহা আপনার পক্ষে অপমানজনক বলিয়া মনে করিবেন। আর যদি আপনি ইহা

অপমান বলিয়া না মনে করেন, তবে আপনার নিজের মাপে আপনি সম্প্রদায়কে মাপিয়া সম্প্রদায়ের অপমানই করেন। এই মহাযুদ্ধের মধ্যে ত জোয়ার ভাটা আসিবেই। আবার ধরুন, যত সাফ্ বোঝাপড়াই করুন না কেন, প্রতিপক্ষ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে আপনি কি করিতে পারেন? আমাদের মধ্যেই এরূপ অনেকে আছেন, যাঁহারা প্রমিসারী নোটের উপর টাকার দাবী উশুল করিতে আমার নিকট আসেন। নিজের দস্তখৎ দিয়া যে কড়ার করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা স্পষ্ট স্বীকৃতি আর কি হইতে পারে? তাহা হইলেও যাহারা স্বাক্ষর দিয়া টাকা লইয়াছে তাহাদের নামে কোর্টে নালিশ ফরিয়াদ করিতে হয়, তাহারা বিরুদ্ধতা করে, অনেক কথা তৈরী করে, নিষ্পত্তি হয়, ক্রোক হয়, সময় নষ্ট হয়—এইরূপ অঘটন আর যাহাতে না হয় তাহার জন্য কি সাবধানতা লইতে পারেন? সেই জন্য আমার পরামর্শ এই, যে ঘটনা ঘটিয়াছে ধৈর্য্যের সহিত তাহার জন্য ব্যবস্থা করা। যদি আবার নূতন করিয়াই লড়িতে হয় তাহা হইলে আমাদের কি করিতে হইবে,---অর্থাৎ অপরে কি করে সে ভাবনা না ভাবিয়া প্রত্যেক সত্যাগ্রহী কি করিবে বা করা উচিত তাহাই বিবেচনা করা দরকার। আমার এই বিশ্বাস যে, আমরা যদি খাঁটি থাকি তাহাহইলে অপরেও খাঁটি থাকিবে, আর যদি কেহ দুর্ব্বলতা দেখায়, তাহাহইলে আমাদের সহিত মিশিয়া পড়ায় তাহার দুর্ব্বলতা চলিয়া যাইবে।”

আমার মনে হয় যাঁহারা লড়াই চালানোর শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আমার কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে কাছলীয়া শেঠের ভিতরে যে কত বড় শক্তি আছে তাহা দিন দিনই প্রকাশ হইতেছিল। সব ব্যাপারেই তিনি সব চাইতে কম কথায় নিজের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিতেন ও সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিতেন।

আমার এমন একটা ঘটনার কথাও মনে নাই যাহাতে তিনি দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন অথবা "শেষকালে কি হইবে" বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন ইউসুপ্ মিঞা উত্তাল সমুদ্রে সত্যাগ্রহ নৌকার হাল ধরিতে রাজি হইলেন না। সে সময়ে আমরা সকলেই একমত হইয়া কাছলীয়া শেঠকে কর্ণধার করি এবং সেই সময় হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি একবারও হালের কাছ ছাড়া হন নাই। কেবল ইহাই নয়, যে কষ্ট লোকে বড় একটা সহ্য করিতে পারে না, কাছলীয়া শেঠ তাহা নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে সহ্য করিয়াছেন। লড়াই যখন বাড়িয়া চলিয়াছিল তখন এমন এক সময় আসিয়াছিল যে, জেলে গিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, আরামের বিষয় ছিল। বাহিরে থাকিয়া প্রত্যেক বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করা, তাহার ব্যবস্থা করা, অনেক লোককে বুঝানো—এই সকল বড়ই মুস্কিলের কাজ ছিল। এমন দিন আসিল যখন গোরা পাওনাদারেরা কাছলীয়াকে ফাঁদে ফেলিল। ভারতীয় বেপারীদের ব্যবসা গোরাদের আশ্রয়ের উপর চলে। তাহারা লক্ষ লক্ষ টাকার মাল কেবল কথার উপর ভারতীয়দিগকে ধার দেয়। ভারতীয়েরা যে এই প্রকারে বিশ্বাসের ভাজন হইয়াছিল, ইহা তাহাদের স্বাভাবিক সাধুতার একটা প্রমাণ। অনেক ইংরাজ ব্যবসাদার কাছলীয়া শেঠের সহিত ধারে কারবার করিত। সরকারের সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষ প্ররোচনায় ইংরাজ বেপারীরা কাছলীয়ার নিকট হইতে পাওনা টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চাহিল। আবার এদিকে কাছলীয়াকে ডাকিয়া একথাও বলিল—"যদি তুমি সত্যাগ্রহ ছাড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়, তাহাহইলে তোমার টাকার জন্য আমাদের কোনও তাগাদা নাই। যদি সত্যাগ্রহ হইতে না বাহির হইয়া পড়, তবে আমাদের ভয় হয় যে, হয়ত তোমাকে গ্রেপ্তার করিবে, তখন আমাদের টাকার কি হইবে?

যদি লড়াই হইতে না ফিরিতে চাও তবে আমাদের টাকাটা অবশ্যই ফিরাইয়া দিতে হইবে।" এই বীরপুরুষ জবাব দিলেন—"লড়াই হইতেছে আমার ব্যক্তিগত কথা। উহার সহিত আমার ব্যবসার কোনও সম্বন্ধ নাই। এই লড়াইতেই আমার ধর্ম্ম, আমার নিজের মান, আমার ভবিষ্যৎ বংশের মান রহিয়াছে। তোমরা যে আমার সহিত ধারে কারবার করিয়াছ সে জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু তাহাহইলেও আমার ব্যবসাই আমার সব চাইতে বড় জিনিষ এরূপ আমি গণ্য করি না। তোমাদের যাহা পাওনা, তাহা তোমাদের হস্তে স্থিত সোণার মোহরের মত নিশ্চিত দ্রব্য মনে করিও। যদি আমার কিছু হয় তাহা-হইলে আমার পাওনাও ত লোকের নিকট রহিয়াছে, আর মালপত্রও রহিয়াছে, সে সকলই তোমাদের নিকট গচ্ছিত আছে জানিয়া লও। তোমরা এতদিন বিশ্বাস করিয়াছ, আমি ইচ্ছা করি যে, তোমরা আজও বিশ্বাস করিবে।" যদিও এই উক্তি সম্পূর্ণ ন্যায্য ছিল এবং কাছলীয়ার দৃঢ়তা দেখিয়া যদিও বেপারীদের আরো বিশ্বাস হওয়ার কথা, ফলে কিন্তু তাহা হইল না। ঘুমন্ত লোককে জাগানো যায়, কিন্তু জাগিয়া থাকিয়া যদি কেহ ঘুমের ভাণ করে তবে কেহ তাহাকে জাগাইতে পারে না। গোরা বেপারীদের অবস্থাও তাহাই ছিল। তাহারা চাহিয়াছিল কাছলীয়াকে চাপ দিতে। তাহাদের পাওনা টাকার সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কাই তাহাদের ছিল না।

আমার আফিসে পাওনাদারদের সভা হইল। তাহাদিগকে আমি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম যে, কাছলীয়ার উপর তাহারা যে চাপ দিতেছে তাহা ব্যবসাদারী নহে, রাজনৈতিক চাল। বেপারীদের ওরূপ করা শোভা পায় না। তাহারা একথায় উল্টা ক্রুদ্ধ হইল। শেঠ কাছলীয়ার যে মালপত্র ছিল ও তাঁহার যাহা বাকী পাওনা ছিল তাহার তালিকা

আমার নিকট ছিল, আমি তাহা দেখাইলাম। উহা হইতে আমি প্রমাণ করিয়া দেখাইলাম যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে টাকায় টাকা পুরাপুরি আদায় লইতে পারিবে। আর যদি কেহ তাহার ব্যবসা কিনিয়া লয় তাহাহইলেও শেঠ কাছলীয়া তাঁহার পাওনা ও দ্রব্যাদি সমস্তই পাওনাদারদিগকে দিতে প্রস্তুত আছেন। আর তাহা না হইলে যদি পাওনাদারেরা ইচ্ছা করে তবে বিক্রয় মূল্যে সমস্ত মাল উঠাইয়া লইতে পারে এবং যদি কোনও মালের দাম কমিয়া গিয়া থাকে তবে কম দামও ধরিতে পারে। পাঠকেরা দেখিবেন যে এই ধরণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে গোরা বেপারীদের কোনই ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। (মক্কেলদের দুর্দিনে তাহাদের জন্য এই ধরণের ব্যবস্থা আমি অনেক করিয়া দিয়া থাকি) কিন্তু এই ব্যাপারে বেপারী ন্যায্য দাবি পাইতে ইচ্ছা করে না, তাহারা কাছলীয়াকে দমাইতে চাহে। কাছলীয়া দমিলেন না। তাহারা তাঁহাকে দেউলিয়া করিল।

এই দেউলিয়া হওয়া কাছলীয়ার কলঙ্ক না হইয়া তাঁহার ভূষণ স্বরূপ হইল। সম্প্রদায়ের ভিতর তাঁহার প্রতিষ্ঠা বাড়িল এবং তাঁহার বাহাদুরী ও দৃঢ়তার জন্য সকলে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল। এই ধরণের বীরত্ব যে কত অলৌকিক তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবে না। দেউলিয়া হওয়া যে বস্তুতঃ দেউলিয়া হওয়া নয়, নিন্দার কারণ নয়, বরঞ্চ উহা যে সম্মান ও প্রশংসার কারণ ইহা সাধারণ লোকে ধরিতে পারে না। কিন্তু কাছলীয়ার নিকট ইহা স্বাভাবিক ছিল। অনেক বেপারী এই দেউলিয়া হওয়ার ভয়েই ঐ সাংঘাতিত আইন স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কাছলীয়া ইচ্ছা করিলেই দেউলিয়া হওয়া হইতে বাঁচিতে পারিতেন। লড়াই ছাড়িলে যে বাঁচিতে পারা যায় সে উপায় ত ছিলই। কিন্তু সে কথা তাঁহার মনেও উঠে নাই।

কাছলীয়ার অনেক ভারতীয় মিত্র ছিল। এই দুর্দ্দিনে তাহারা তাঁহাকে টাকা ধার দিতে পারিত। কিন্তু এইভাবে ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার ব্যবসা বাঁচাইয়া রাখায় বাহাদুরী ছিল না। সত্যাগ্রহী বলিয়া তাঁহাদের জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেইজন্য কোনও সত্যাগ্রহীর নিকট হইতে টাকা লইয়া গোরাদিগকে দেওয়া শোভা পাইত না। কিন্তু যে সকল বেপারী সত্যাগ্রহী হইয়াও আইন মানিয়া লইয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও কাছলীয়ার মিত্র ছিল। আমি জানিতাম, কাছলীয়া যে তাহাদের সাহায্য ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারেন, তাহা তিনি জানিতেন। আমার যতদূর স্মরণ আছে তাঁহার দুই এক জন মিত্র একথা তাঁহাকে বলিয়াও পাঠাইয়াছিল। তাঁহাদের সাহায্য লওয়া মানে এশিয়াটিক আইন স্বীকার করাই বিজ্ঞের কাজ—ইহা মানিয়া লওয়া। সেই জন্য ঐ ধরণের সাহায্য হইবে না বলিয়া আমরা উভয়েই স্থির করিলাম। আমরা ইহাও দেখিলাম যে, কাছলীয়া যদি দেউলিয়া হন, তবে তাহাতে অন্য সত্যাগ্রহী বেপারীরা দেউলিয়া হওয়া হইতে বাঁচিয়া যাইবে। দেউলিয়া হইলে সমস্ত পাওনাদার না হোক্ শতকরা নব্বই জন পাওনাদারই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। যদি শতকরা ৫০৲ টাকা পায় তাহা হইলেই খুসী হয়, আর যদি ৭৫৲ টাকা পায় তাহাহইলে পুরা টাকা পাইয়াছে মনে করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বেপারীরা সাধারণতঃ শতকরা ৬।• লাভ করে না, শতকরা ২৫৲ টাকাই লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য যদি শতকরা ৭৫৲ টাকা ফেরৎ পায় তবে ক্ষতি হয় নাই বলিয়াই গণনা করে। আর দেউলিয়া হইলে পুরাপুরি টাকা ত পাওয়াই যায় না। সেইজন্য কোনও পাওনাদার খাতককে দেউলিয়া করিতে ইচ্ছা করে না।

এইজন্য কাছলীয়া দেউলিয়া হওয়াতে গোরারা আর অন্য বেপারীকে

ধমক দিয়া ভয় দেখাইতে পারিবে না। কাজেও তাহাই হইয়াছিল। গোরাদের ইচ্ছা ছিল হয় কাছলীয়াকে ভয় দেখাইয়া সত্যাগ্রহ হইতে খসাইবে, আর না হয় ত শতকরা একশ টাকাই নগদ আদায় করিয়া লইবে। এই দুই-এর একটিও তাহারা করিতে পারিল না। বরঞ্চ ইহার ফল বিপরীত হইল। ভারতীয় বড় বেপারীদের মধ্যে এই প্রথমবার খুসী মনে একজনকে দেউলিয়া হইতে দেখিয়া গোরা বেপারীদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দিল। তাহারা বরাবরের জন্য শান্ত হইয়া গেল। এক বৎসরের ভিতর কাছলীয়া শেঠের মাল হইতেই গোরাদের শতকরা একশত টাকা আদায় হইয়া গেল। দেউলিয়ার নিকট হইতে শতকরা একশত টাকাই পাওয়া আমার জানার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই নূতন হইল। এইজন্য সত্যাগ্রহ চলিতে থাকিলেও গোরা বেপারীদের মধ্যে কাছলীয়ার মান খুব বাড়িয়া গেল। লড়াই চলিতে থাকিলেও তাহারা কাছলীয়াকে যত ইচ্ছা টাকার মাল ধারে দিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে কাছলীয়ার শক্তি প্রতিদিনই বাড়িয়া যাইতেছিল। লড়াই-এর রহস্য তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। লড়াই যে কত দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিবে একথা কেহ বলিতে পারিল না। সেইজন্য আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে, যতদিন লড়াই চলিবে ততদিন বড় ব্যবসার মধ্যে প্রবেশ করা ঠিক নহে। তিনি স্থির করিলেন যে, গরীবভাবে সংসার চালাইবার জন্য যতটুকু দরকার, ব্যবসা কতটুকু মাত্রই রাখা হইবে, লড়াইয়ের কালে উহা বাড়ানো হইবেনা। সেইজন্য গোরারা তাঁহাকে যে সুবিধা দিয়াছিল তাহা তাঁহার লওয়া হইল না। পাঠকেরা একথা মনে করিবেন না যে, কাছলীয়ার ব্যবসার সম্পর্কে যে ঘটনা বর্ণনা করিলাম ইহা কমিটির মিটিং-এর পরমুহূর্ত্তেই হইয়াছিল। এই ঘটনার আবৃত্তির ইহাই যোগ্য স্থান মনে করিয়া এইখানেই উহার উল্লেখ করিলাম।

ঐ মিটিং-এর কিছুদিন পরে কাছলীয়া সভাপতি হইয়াছিলেন, আর তাহারও কিছুদিন পরে দেউলিয়া হওয়ার ঘটনা হয়।

এক্ষণে সেই কমিটির সভার কি পরিণাম হইয়াছিল সে কথা বলিব। এই সভার পর আমি জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে পত্র দিই যে, তাঁহার নূতন আইনের প্রস্তাব দ্বারা চুক্তি ভঙ্গ হইতেছে। আমাদের মিটমাটের পর এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। সেই বক্তৃতায় তিনি এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন—"ইহারা (এশিয়াবাসীরা) আমাকে এশিয়াটিক আইন রদ করিতে বলিতেছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহারা স্বেচ্ছায় রেজিষ্ট্রী না করিতেছে সে পর্য্যন্ত আমি উহা রদ করিতে পারি না।" যে প্রশ্ন করিলে উত্তর দেওয়া কঠিন হয়, আমলারা সে প্রশ্নের উত্তর দেন না। উত্তর দিলেই গণ্ডগোল বাধে। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। যতই তাঁহাকে পত্র লেখ, যতই সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দাও, যে বিষয়ে জবাব দেওয়ার ইচ্ছা নাই সে বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে জবাব আদায় করিতে পারা যাইবে না। পত্র পাইলে তাহার যে উত্তর দেওয়াই চাই এই সাধারণ বিনয়ের তিনি ধার ধারিতেন না। সেইজন্য আমার পত্র সমূহের জবাবে কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না।

আমাদের মধ্যস্থ আলবার্ট কার্টরাইটের সহিত আমি দেখা করিলাম। তিনি স্তম্ভিত হইলেন ও আমাকে বলিলেন—"সত্য সত্যই আমি এই লোকটিকে বুঝিতে পারিতেছি না। এশিয়াটিক এ্যাক্ট রদ করার কথা আমার ত পরিষ্কার স্মরণ রহিয়াছে। আমার দ্বারা যতদূর হয় আমি করিব, কিন্তু আপনি জানিবেন যে, এই ব্যক্তি একবার সঙ্কল্প করিলে তাহা হইতে তাহাকে কিছুতেই নড়ানো যায় না। সংবাদপত্রে কি লেখা হয় তাহা ত তিনি গ্রাহ্যই করেন না। আমার সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে

যে, আমার সাহায্য আপনাদের কোনও কাজে আসিবে না।" হস্কিন ইত্যাদির সহিতও দেখা করিলাম তাঁহারাও জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে পত্র দিলেন। তাঁহারাও খুব অসন্তোষজনক জবাব পাইলেন। 'বিশ্বাস-ঘাতক' শীর্ষ দিয়া আমি "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে" আমার বক্তব্য প্রকাশ করিলাম। কিন্তু জেনারেল স্মাট্‌স্‌-এর তাহাতে কি? তাঁহাকে 'দার্শনিক' অথবা 'নিষ্ঠুর ব্যক্তি' যাহা ইচ্ছা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুই যায় আসে না। তিনি তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিয়া যান। উক্ত দুইটি বিশেষণের মধ্যে জেনারেল স্মাট্‌সের সম্বন্ধে কোনটা প্রযোজ্য তাহা আমি ঠিক জানি না। তাঁহার ব্যবহারের মধ্যে একটা দার্শনিকতা আছে, ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। আমার স্মরণ আছে যখন আমি তাঁহার নিকট চিঠিপত্র লিখিতেছিলাম, যখন সংবাদপত্রে লিখিতেছিলাম তখন আমি তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিয়াই কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু সেটা লড়াইয়ের প্রথম দিক, অর্থাৎ লড়াইয়ের দ্বিতীয় বৎসর ছিল। লড়াই আট বৎসর চলিয়াছিল, ইতিমধ্যে আমি তাঁহার সহিত অনেকবার দেখা করিয়াছি। পরে আমাদের কথাবার্ত্তা হইতে এই প্রকার মনে হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার চালাকী সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা আছে তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। দুইটা বিষয় তাঁহার সম্বন্ধে আমি পরিষ্কার বুঝিয়াছি। একটা হইতেছে যে, রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি ধারণা সম্পূর্ণ নীতিবিগর্হিত নহে। আর দ্বিতীয়তঃ ইহার সঙ্গে আমি ইহাও দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহার রাজনীতিতে চালাকীর এবং আবশ্যক হইলে অসত্য বলারও স্থান আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি

একদিক দিয়া যেমন জেনারেল স্মাট্স্‌কে তাঁহার সর্ত্ত পালন করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছিল, অপর দিক দিয়া তেমনি সম্প্রদায়কে জাগ্রত করার চেষ্টা চলিতেছিল। আমরা দেখিতে পাইলাম যে, সকল স্থানেই লড়াই করিতে ও জেলে যাইতে লোক তৈরী হইয়াছে। সমস্ত স্থানেই সভা করা হইতেছিল। সেখানে গবর্ণমেণ্টের সহিত যে চিঠি-পত্র চলিতেছিল তাহা বুঝানো হইতেছিল। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে' প্রতি সপ্তাহেই সপ্তাহের দৈনিক ঘটনাগুলি প্রকাশ করা হইতেছিল। লোকে বুঝিতেছিল যে, স্বেচ্ছায় কৃত রেজিষ্ট্রেশন নিষ্ফল হইয়াছে। যদি এখনই এশিয়াটিক আইন রদ না করা হয়, তবে ঐ রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতে সরকার বুঝিতে পারিবে যে, সম্প্রদায় সিদ্ধান্তে স্থির আছে ও জেলে যাইতে প্রস্তুত আছে। এই জন্য সমস্ত স্থানেই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হইতেছিল।

সরকারের দিক হইতে আইনের প্রস্তাবের কথা বলিয়াছি। উহা পাস করার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ট্রান্সভালের ব্যবস্থাপক সভা বসিল। সেখানে সম্প্রদায় হইতে দরখাস্ত পাঠানো হইল, কিন্তু তাহার ফল কিছুই হইল না। অবশেষে সত্যাগ্রহীদের চরমপত্র (আল্‌টিমেটাম্) দেওয়া হইল। লড়াইয়ের ইচ্ছা করিয়া যে পত্র লেখা হয় তাহাই আল্‌টি-মেটাম্, চরমপত্র অথবা ধমক দেওয়ার পত্র। আল্‌টিমেটাম্ শব্দটি সম্প্রদায় হইতে ব্যবহার করা হয় নাই। সম্প্রদায় হইতে সম্প্রদায়ের সঙ্কল্প

জানাইয়া পত্র দেওয়া হয়। জেনারেল স্মাট্স্ উহাকে আল্‌টিমেটাম বিশেষণ দিয়া ব্যবস্থাপক সভায় পরিচয় দেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যবস্থাপক সভাকে জানান যে—"যাহারা এই সরকারকে এই রকম ধমক দেখাইতে পারে তাহাদের সরকারের শক্তির সম্বন্ধে জ্ঞান নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, জনকতক আন্দোলনকারী (এজিটেটার) গরীব ভারতীয়দিগকে উস্কাইতেছে, গরীব লোকগুলি যদি উহাতে যোগ দেয় তবে নষ্ট পাইবে।" সংবাদপত্র এই বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিল যে, ব্যবস্থাপক সভায় অনেক সভ্য আল্‌টিমেটামের কথা শুনিয়া খুব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা জেনারেলের আইনের খসড়া খুব উৎসাহের সহিত পাস করিয়াছেন।

ঐ আল্‌টিমেটামে এই কয়টা কথাই ছিল—"জেনারেল স্মাট্সের সহিত যে সর্ত্ত হইয়াছিল তাহা পূরণ করিলে স্বেচ্ছায় যে রেজিষ্ট্রেশন হইয়াছে তাহা আইন দ্বারা গ্রাহ্য করিয়া লইয়া এশিয়াটিক আইন রদ করিয়া দেওয়া দরকার। ইহা সকলেই জানেন যে, ভারতীয়েরা আমলাদের সন্তোষদায়ক রূপেই স্বেচ্ছায় রেজিষ্ট্রী করাইয়াছে। এক্ষণে এশিয়াটিক এ্যাক্ট রদ করা উচিত। সম্প্রদায় এসম্বন্ধে জেনারেল স্মাট্সের সহিত অনেক পত্র ব্যবহার করিয়াছে। আইন অনুযায়ী এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য সম্প্রদায় সে সকলই করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সম্প্রদায়ের এই বিষয়ে সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পাস হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এই অবস্থায় অসন্তোষ ও বিরুদ্ধ জনমতের কথা সম্প্রদায়ের নেতাদের সরকারকে জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সর্ত্ত অনুযায়ী যদি এশিয়াটিক আইন রদ করানো না হয়, অথবা রদ করার সংবাদ সম্প্রদায়কে নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে না দেওয়া হয়, তবে সম্প্রদায় সমস্ত সংগৃহীত সার্টিফিকেট

পোড়াইয়া ফেলিবে এবং তজ্জন্য যে দুঃখ-কষ্ট সম্প্রদায়ের উপর আসিবে তাহা সম্প্রদায় বিনয়ের সহিত অথচ দৃঢ়তার সহিত সহ্য করিবে।”

এই পত্রকে একদিক হইতে এই জন্য আল্‌টিমেটাম্ বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এক কারণ এই যে, গোরারা সাধারণতঃ ভারতীয়দিগকে একটা অসভ্য সম্প্রদায় মনে করিয়া থাকে। যদি গোরারা ভারতীয়দিগকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করিত তাহাহইলে এই পত্রে বিনয়ই দেখিতে পাইত এবং এ সম্বন্ধে বিচারও করিত। কিন্তু গোরারা ভারতীয়দিগকে অসভ্য মনে করে বলিয়াই ঐ পত্র লিখিতে হইয়াছিল। সম্প্রদায়ের সম্মুখে দুইটা রাস্তা ছিল। এক হইতেছে, উহাদের দেওয়া অসভ্যতার ছাপ মানিয়া লইয়া নির্য্যাতিত হইয়া থাকা, অথবা যাহাতে অসভ্যতা অস্বীকার করা হয় সেই প্রকার উপায় গ্রহণ করা। এই ধরণের কার্য্য এই পত্রখানা দ্বারাই প্রথম সূচনা করা হইল বলা যাইতে পারে। যদি এই পত্রের পশ্চাতে ভারতীয়দের দৃঢ় সঙ্কল্প না থাকিত, তবে এই পত্রকে উদ্ধত বলা যাইত, আর সম্প্রদায় পূর্ব্বপশ্চাৎ বিচার না করিয়া কাজ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইত।

পাঠকেরা এই সন্দেহ করিতে পারেন যে, ১৯০৬ সালে যখন সত্যাগ্রহ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়, তখনই অসভ্যতার অস্বীকৃতি হইয়া গিয়াছে, আর তাহাহইলে এই পত্রে এমন কি নূতনত্ব আছে যাহার জন্য ইহাকে এত বিশেষত্ব দেওয়া হইতেছে? এই পত্রের সময় হইতেই যে অসভ্যতা অস্বীকার করা হইল একথা কেন বলা হইতেছে? এক দিক দিয়া এই প্রকার যুক্তি ঠিক মনে হইতে পারে। কিন্তু ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাস্তবিক অসভ্যতার অস্বীকার আরম্ভ হইয়াছে এই চরম-পত্র হইতেই পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞা

লওয়া ব্যাপারটা আপনা আপনি আসিয়া পড়িয়াছিল। আর তাহার পরবর্ত্তী জেলে যাওয়া ইত্যাদি উহার অনিবার্য্য পরিণাম। সম্প্রদায় অজ্ঞাতসারেই উহার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই চরম-পত্র লেখার সময় সম্প্রদায়ের যে মনুষ্যত্বজ্ঞান আছে ও সম্মানবোধ আছে ইহাই দাবি করিয়া লেখা হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য, পূর্ব্বের ন্যায় এশিয়াটিক আইনটা রদ করাই ছিল, কিন্তু এবারে ভাষার ধরণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কার্য্য উদ্ধারের জন্য অবলম্বিত পথের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—ইহাই ছিল দুইটার মধ্যে প্রভেদ। চাকর মনিবকে নমস্কার করে, মিত্র মিত্রকে নমস্কার করে। উভয় ক্রিয়াই নমস্কার হইলেও উভয়ের ভিতর এমন পার্থক্য আছে যে, কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি দেখিয়া একজনকে ভৃত্য আর একজনকে মিত্র বলিয়া চিনিতে পারিবে।

চরম-পত্র পাঠাইবার সময় আমাদের খুবই আলোচনা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব চাওয়া কি একটা অবিনয় বলিয়া গণ্য হইবে না? উহা লেখার জন্যই স্থানীয় সরকার দাবি স্বীকার করিতে চাহিলেও স্বীকার করিবে না, এমনটা হইবে না ত? সম্প্রদায়ের সঙ্কল্প একটু ঘুরাইয়া সরকারকে জানানোই কি যথেষ্ট নয়? এই সমুদয় বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা সকলে একমত হইয়া স্থির করি যে, যাহা আমরা সত্য ও উচিত বলিয়া অনুভব করিতেছি তাহাই করা যাক্। যদি আমাদিগকে অবিনয়ের দুর্ণাম দেওয়া হয় তবে তাহা মানিয়া লইব। যদি মিথ্যা রোষ করিয়া আমাদিগকে যাহা দেওয়ার তাহা না দেয় তবে সে সম্ভাবনাও মাথায় করিয়া লইব। মানুষ হিসাবে আমরা কাহারো অপেক্ষা খাটো নহি একথা যদি আমরা মানি ও যত দুঃখই যতদিন পর্য্যন্ত পাই না কেন তাহা সহ্য করার শক্তি আমাদের মধ্যে যদি থাকে, তবে যাহা উপযুক্ত পথ, যাহা সোজা পথ তাহাই গ্রহণ করা উচিত।

এক্ষণে হয়ত পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, এখানকার সঙ্কল্পের মধ্যে একটা নূতনত্ব ও বিশেষত্ব ছিল। এই পত্রের ঘাত প্রতিঘাত ব্যবস্থাপক সভার ও তাহার বাহিরের গোরাদের মধ্যেও গিয়া পঁহুছিয়াছিল। কেহ কেহ ভারতীয়দের সাহসের প্রশংসা করিল, কেহ কেহ খুব রাগ করিল ও ভারতীয়দের এই উচ্ছ্বাসের জন্য পুরাপুরি শিক্ষা দেওয়া দরকার এমন রবও তুলিল। উভয় পক্ষই ভারতীয়দের এই সঙ্কল্পের নূতনত্ব স্বীকার করিল। যখন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইয়াছিল তখনও লোকে ইহা দেখিয়াছিল যে, ইহা একটা নূতন জিনিষ, কিন্তু এই পত্রের পর তদপেক্ষা অধিক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার কারণও সুস্পষ্ট। সত্যাগ্রহ যখন আরম্ভ হয় তখন সম্প্রদায়ের শক্তির মাপ কেহই করিতে পারে নাই। সে সময় এই ধরণের পত্র অথবা ইহার ভাষা শোভা পাইত না। এখন সম্প্রদায়ের অল্প বিস্তর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সকলেই দেখিয়াছে যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দুঃখ সহ্য করার শক্তি আছে, আর সেই জন্যই চরম-পত্রের এই ভাষা স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছিল, উহাতে অশোভন কিছু ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহীত সার্টিফিকেটের বহ্ন্যুৎসব

যেদিন দ্বিতীয় এশিয়াটিক আইন পাস হওয়ার কথা সেইদিনই চরম-পত্রের শেষ দিন বলিয়া স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময় পার হওয়ার দুই একঘণ্টা পরে প্রকাশ্যভাবে সার্টিফিকেট পোড়াইয়া ফেলার জন্য জনসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। সত্যাগ্রহ কমিটি ইহাও ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে সময় মত অনুকূল জবাব পাওয়া যায় তাহাহইলেও সভা ব্যর্থ হইবে না, কেননা তাহাহইলেও এই সভাতেই সরকারের অনুকূল জবাব প্রচার করিয়া দেওয়া যাইবে।

কমিটি ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সরকার এই চরম-পত্রের কোনও জবাবই দিবেন না। আমরা অনেক পূর্ব্বেই সভার স্থানে পঁহুছিয়া গিয়াছিলাম। যদি সরকারের দিক হইতে কোনও টেলিগ্রাম আসে তাহাও তৎক্ষণাৎ সভায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলাম। সভার সময় বেলা চারিটা করা হইয়াছিল। সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, মসজিদের প্রাঙ্গণেই সভা করার স্থান স্থির হইয়াছিল। সভাস্থল ভারতীয়দিগের দ্বারা একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ওখানকার নিগ্রোরা ভোজন পাত্রের জন্য চার পায়া দেওয়া একরকম লোহার কড়াই ব্যবহার করিয়া থাকে। সার্টিফিকেট পোড়াইবার জন্য নিকটবর্ত্তী দোকান হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের ঐ রকম একটী কড়াই আনা হইয়াছিল। কড়াইটা এক কোণে উচ্চ বেদীর উপর বসানো হইয়াছিল।

সভার কার্য্য আরম্ভ করা হইবে এমন সময় একজন স্বেচ্ছাসেবক বাইসাইকেলে আসিয়া পঁহুছিল। তাহার হাতে টেলিগ্রাম ছিল। উহাই সরকারের জবাব। জবাবে লেখা ছিল যে, সরকার সম্প্রদায়ের সঙ্কল্পের জন্য দুঃখিত এবং সরকার নিজ সঙ্কল্প বদলাইতে অক্ষম। এই তার সভায় পড়িয়া শুনানো হইল। শুনিয়া সকলে হর্ষ প্রকাশ করিল। রকমটা যেন এই যে, যদি সরকার সম্প্রদায়ের দাবি স্বীকার করিত তাহা হইলে সার্টিফিকেট দহন করার শুভকার্য্য হাত হইতে ফস্কাইয়া যাইত! এই হর্ষোল্লাস হওয়া উচিত ছিল কি অনুচিত ছিল, ইহা স্থির করা মুস্কিল। যাহারা হাতে তালি দিয়া এই জবাবে হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারা কেন হাততালি দিয়াছিল তাহা না জানিলে ইহা উচিত কি অনুচিত সে কথা বলা যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে, সভার মধ্যে যে উৎসাহ বর্ত্তমান ছিল, এই হর্ষপ্রকাশ তাহার একটা সুন্দর নিদর্শন। সভায় নিজেদের শক্তির কতকটা পরিমাপ পাওয়া গেল।

সভা আরম্ভ হইল। সভাপতি সকলকে সাবধান করিলেন। সমস্ত অবস্থা বুঝাইলেন। তখনকার উপযুক্ত প্রস্তাব পাস করা হইল। যে সকল অবস্থা পর পর উপস্থিত হইয়াছিল আমি সে সকল বুঝাইলাম। আমি বলিলাম—"দেখুন আপনারা সকলে সার্টিফিকেট পোড়াইয়া ফেলিতে দিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেহ ইচ্ছা করেন তবে এখনও ফিরাইয়া লইতে পারেন। সার্টিফিকেটটা পোড়াইয়া ফেলিলেই কিছু সরকারের বিরুদ্ধে দোষাবহ কার্য্য করা হয় না। যাঁহারা জেলে যাইতে চাহেন তাঁহারা এই কার্য্যের ফলেই জেলে যাইতে পারিবেন না। সার্টিফিকেটখানা পোড়াইয়া ফেলিয়া আপনারা এই কথা প্রচার করিয়া দিতেছেন যে, আপনারা সেই এশিয়াটিক আইনের বশ্যতা

স্বীকার করিবেন না। সার্টিফিকেট দেখাইবার শক্তিও নিজের কাছে রাখিতে চাহেন না—ইহাই জানাইতেছেন। কিন্তু আজ যে ব্যক্তি সার্টিফিকেট পোড়াইবার কার্য্যে যোগ দিয়াছেন, কাল তিনি গিয়া সার্টিফিকেটের নকল লইয়া আসিতে পারেন—তাহাতে তাঁহার হাত পুড়িয়া যাইবে না। যাঁহার এই প্রকার দুষ্কর্ম্ম করার সম্ভাবনা আছে, অথবা যিনি পরীক্ষাকালে দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রাখেন, তাঁহার কিন্তু এখনই সার্টিফিকেট ফিরাইয়া লওয়া উচিত, ও তিনি তাহা লইতে পারেন। সার্টিফিকেট পোড়াইবার পূর্ব্বে এখন ফেরত চাহিয়া লইতে লজ্জা নাই, বরঞ্চ উহাতে এক রকম সৎসাহস আছে। কিন্তু ইহার পরে গিয়া সার্টিফিকেটের নকল লওয়ায় লজ্জা আছে এবং উহাতে দুর্নাম আছে। সম্প্রদায়েরও উহাতে ক্ষতি হইবে। এই সময় সম্প্রদায়ের একথাও বুঝিয়া রাখা চাই যে, এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে, ইতি-মধ্যেই আমাদের কতজন যুদ্ধে হার মানিয়াছেন, আর সেইজন্য যাঁহারা দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাদের কাজ আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনারা যেন বিচার করিয়া আজকার এই সাহসিক কাজে যোগ দেন।”

আমার বক্তৃতা কালেই সভা হইতে রব উঠিতেছিল ‘আমরা কেহ সার্টিফিকেট ফিরাইয়া লইব না, উহা পোড়াইয়া ফেলুন।’ আমরা তারপর প্রস্তাব করিলাম যে, যদি কেহ এই সঙ্কল্পের বিপক্ষে বলিতে চাহেন অথবা বিরোধ করিতে চাহেন তবে তিনি দাঁড়াইবেন। কেহই দাঁড়াইল না। এই সভায় মীর আলমও হাজির ছিল। সে প্রকাশ্যে বলিল যে, আমাকে মারা তাহার ভুল হইয়াছে ও তাহার আসল সার্টিফিকেট খানা পোড়াইতে দিল। সে স্বেচ্ছায় সার্টিফিকেট

লইতেও যায় নাই। আমি মীর আলমের হাত লইলাম ও আনন্দে উহা চাপিয়া ধরিলাম। আমি তাহাকে আবারও জানাইলাম যে, আমার মনে কোনও রোষ ছিল না। মীর আলমের এই কার্য্যে সভায় আনন্দের আর অন্ত রহিল না।

পোড়াইবার জন্য দুই হাজারের উপর সার্টিফিকেট কমিটির নিকট আসিয়াছিল। সে গুলি সমস্ত ঐ কড়াইতে ফেলা হইল। উহার উপরে কেরোসিন ঢালা হইল এবং অগ্নি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল ও যতক্ষণ জ্বলিতেছিল ততক্ষণ লোকে হাততালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া ময়দান ফাটাইয়া ফেলিতেছিল। এ পর্য্যন্তও কতক লোক সার্টিফিকেট পকেটে রাখিয়া দিয়াছিল। তাহারা মঞ্চের উপর আসিয়া উহা পোড়াইবার জন্য আগুনে ফেলিয়া দিতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত তাহারা কেন সার্টিফিকেট দেয় নাই জিজ্ঞাসা করাতে কেহ বলিল—"আগুন জ্বলিয়া উঠিলে দিতে ভাল লাগে ও অপরের উপর বেশী প্রভাব হয় বলিয়া দিই নাই"; আবার কেহ কেহ সোজা স্বীকার করিল যে, "আমাদের সাহস হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত মনে হইতেছিল যে, সার্টিফিকেট পোড়াইব না, কিন্তু এই বহ্ন্যুৎসব দেখার পর আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। যাহা সকলের হইবে, আমারও তাহাই হইবে।" এইরূপ খোলাখুলি কথা এই যুদ্ধের মধ্যে শুনিবার অনেক অবকাশ হইয়াছিল। এই সভায় ইংরাজী সংবাদপত্রের রিপোর্টার আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপর এই সমস্ত দৃশ্যের খুব প্রভাব হইয়াছিল। তাঁহারা নিজ নিজ কাগজে সভার হুবহু বর্ণনা দিয়াছিলেন। বিলাতের 'ডেলি মেল'-এর জোহানেসবর্গের সংবাদদাতা ঐ কাগজে এই সভার বর্ণনা পাঠাইয়াছিলেন। সেই সংবাদপত্রে ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার চিহ্ন

স্বরূপ যেদিন জাহাজে উঠিয়া আমেরিকা, চায়ের বাক্সগুলি সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিল সেই দিনের ঘটনার সহিত এই সার্টিফিকেটের বহ্ন্যুৎসবের তুলনা করা হইয়াছিল। ঐ ঘটনায় একদিকে সর্ব্ববিষয়ে কুশল লক্ষ লক্ষ আমেরিকান ইংরেজ, অপর দিকে বৃটিশ রাজ্যের সমস্ত শক্তি ছিল, আর বর্ত্তমান ঘটনায় ছিল একদিকে নিরুপায় সর্ব্বসামর্থ্য-শূন্য ১৩০০০ হাজার ভারতীয়, অপর দিকে প্রবল ট্রান্সভাল রাজ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার এই অবস্থা তুলনা করিয়া ঐ পত্রে ভারতীয়দের পক্ষে কোনও অতিশয়োক্তি যে 'ডেলি মেল' করিয়াছিলেন এরূপ মনে করি না। ভারতীয় সম্প্রদায়ের একমাত্র অস্ত্র ছিল সত্যের উপর ও ঈশ্বরের উপর শ্রদ্ধা, ইহা ছাড়া আর কোনও উপায়ই তাহাদের হাতে ছিল না। শ্রদ্ধাপরায়ণের পক্ষে এই অস্ত্র যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু জন-সাধারণের এই জ্ঞান এখনো হয় নাই, সেই জন্য নিরস্ত্র তেরহাজার ভারতীয়ের সহিত সমগ্র আমেরিকান ইউরোপীয়ানদের তুলনা অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বর নির্ব্বলেরই বল। সেই জন্যই জগৎ যে তাহাকে দুর্ব্বল মনে করে এ কথাও ঠিক।

চতুর্থ অধ্যায়

নূতন বিষয় আনার অভিযোগ

ট্রান্সভালের যে ব্যবস্থাপক সভায় এশিয়াটিক আইন (দ্বিতীয়) পাস হইয়াছিল, সেই সভাতেই জেনারেল স্মাটস্ আর একটা নূতন আইনের খসড়া দাখিল করেন। উহার নাম ছিল "ইমিগ্রেশন রেষ্ট্রিক্‌শন্ এ্যাক্ট"। যাহারা এ দেশে নূতন বাস করিতে আসিতে চায় ইহা তাহাদিগের প্রতি প্রযোজ্য আইন। ইহা সর্ব্বসাধারণের উপর প্রযোজ্য, কিন্তু ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করা। এই আইন, নাতালের তৎকালের এই ধরণের আইনের অনুরূপ ছিল। তবে তাহার উপর আর একটু বেশী এই ছিল যে, 'এশিয়াটিক এ্যাক্ট' অনুযায়ী যাহারা রেজেষ্ট্রী হইতে পারিত না, অথচ শিক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিত তাহা-দিগের সম্বন্ধেও এই আইন খাটিবে। প্রকারান্তরে এই আইনের সাহায্যে আর একটিও নূতন ভারতীয় যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা ছিল। ইহার প্রতিবাদ করাও সম্প্রদায়ের আবশ্যক হইয়াছিল। তবে উহাও সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি না, এই প্রশ্ন ছিল। সত্যাগ্রহ কখন অথবা কি বিষয় লইয়া করা হইবে তাহার জন্য সম্প্রদায় কাহারও নিকট কোনও সর্ত্তে বদ্ধ ছিল না। সম্প্রদায়ের বিচার বুদ্ধির উপরই, কোন্ বিষয়ে সত্যাগ্রহ করা হইবে না হইবে তাহা নির্ভর করে। কথায় কথায় যদি কেহ সত্যাগ্রহ করে তবে উহা সত্যাগ্রহ না হইয়া দুরাগ্রহ হয়। যদি কেহ নিজের শক্তি না বুঝিয়া এই অস্ত্রের ব্যবহার করে তবে সে যে কেবল হারিয়া যায় তাহাই নহে, নিজে কলঙ্কিত হয় এবং এই বিশুদ্ধ অস্ত্রের উপর পর্য্যন্ত কলঙ্ক লাগায়।

কমিটি দেখিলেন যে, ভারতীয়দের এই যে সত্যাগ্রহ ইহা কেবল এশিয়াটিক আইনের জন্যই প্রযুক্ত করা হইয়াছে। যদি এই আইন রদ হয় তাহা হইলে, উপরে যে ইমিগ্রেশন আইনের উল্লেখ করা হইল, উহাও নির্ব্বিষ হইয়া পড়ে। তথাপি যদি সম্প্রদায় এই ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে যে, এশিয়াটিক আইন রদ হইলে ইমিগ্রেশনের জন্য আর পুনর্ব্বার নূতন আন্দোলন দরকার হইবে না, তবে নূতন ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ সম্বন্ধে ভারতীয়দের কোনও আপত্তি নাই—ইহাই স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ আইনের প্রতিবাদ করাই চাই। তবে উহা সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কি না এই প্রশ্ন থাকে। কমিটি ইহাই নির্দ্ধারিত করেন যে, সত্যাগ্রহ যখন চলিতেছে সে অবস্থায় যদি সম্প্রদায়ের অধিকারের উপর নূতন কোনও আক্রমণ হয়, তবে সেই আক্রমণকেও সত্যাগ্রহের লক্ষ্যভুক্ত করিয়া লওয়া ধর্ম্মোচিত কার্য্য হইবে। শক্তি না থাকার জন্য উহা সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত না করা অন্য কথা। নেতারা ঠিক করিলেন যে, শক্তির অভাব অথবা শক্তির অল্পতার অছিলায় এই ইমিগ্রেশন আইনকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না, উহাও সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

এই হেতু ইহা লইয়াও স্থানীয় সরকারের সহিত পত্র ব্যবহার চালানো হইল। ইহাতে নূতন আইনের ত কোন পরিবর্ত্তন হইলই না, বরঞ্চ ইহাকে উপলক্ষ করিয়া জেনারেল স্মাট্‌স্ সম্প্রদায়কে, বিশেষ করিয়া আমাকে, লোক চক্ষে হেয় করার এক নূতন সুবিধা পাইলেন। স্মাট্‌স্ জানিতেন যে, যাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে সাহায্য করেন তেমন গোরাদিগকে বাদ দিলেও, এমন বহু সংখ্যক গোরা আরও ছিলেন, যাঁহাদের সহানুভূতি গুপ্তভাবে ভারতীয়দিগের দিকেই ছিল। এই গুপ্ত সহানুভূতি যদি নষ্ট করিতে পারা যায় তবে তাহা করাই ঠিক। এই জন্য আমি এক নূতন

ঝগড়া সুরু করিতেছি বলিয়া তিনি আমার বিরুদ্ধে দোষারোপ করিলেন। নিজের সঙ্গীদের সহিত কথাবার্ত্তায় ও পত্রাদিতে তিনি আমার ইংরাজ সহায়কদিগকে এই কথাটা জানাইলেন যে, "আমি গান্ধীকে যতটা চিনিয়াছি, আপনারা ততটা চিনিতে পারেন নাই। যদি গান্ধীকে বসিতে দেওয়া যায় ত শোয়ার জায়গা চাহিয়া বসিবে। আমি এই সব জানি বলিয়াই এশিয়াটিক আইন রদ করিতেছি না। সত্যাগ্রহ যখন সুরু করিয়াছিল তখন নূতন লোক আনা সম্বন্ধে কোনও কথা বলে নাই। এখন যখন আমি ট্রান্সভালের রক্ষার জন্য নূতন আইন করিতেছি তখন ইহার উপরেও তাহার সত্যাগ্রহ চালাইতে ইচ্ছা করিতেছে। এই রকম চালাকী আর কতদূর পর্য্যন্ত বরদাস্ত করা যায়? ভাল, তাহার যাহা শক্তি আছে করুক, যদি সমস্ত ভারতীয় নষ্টও হয় তবুও আমি এই আইন রদ করিব না এবং ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে স্থানীয় সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করা হইবে না। এই ন্যায়-সঙ্গত কার্য্যে প্রত্যেক ইউরোপীয়েরই সম্মতি থাকা উচিত।" একটু বিচার করিলেই উপরোক্ত যুক্তি যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। নূতন বাসিন্দা আনা বন্ধ করার আইন জন্মগ্রহণ করার পূর্ব্বেই আমরা তাহার কি করিয়া প্রতিবাদ করিব? তিনি আমার চালাকী অনেক দেখিয়াছেন বলিয়াছেন, কিন্তু একটারও দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নাই। আমি নিজে জানি যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আজ এত বৎসর আছি কিন্তু কখনও চালাকীর ব্যবহার করিয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না। আর এ বিষয়ে ইহার চেয়েও বেশী অগ্রসর হইয়া এ পর্য্যন্তও বলিতে আমার আটকায় না যে, এখানে কেন, সারা জীবনেও আমি কখনো চালাকীর ব্যবহার করি নাই। চালাকীর ব্যবহার আমি নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি। আমি উহা যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়াও মনে করি।

সেই জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও উহার ব্যবহার সর্ব্বদাই অপছন্দ করি। আমার সাফাই-এর জন্য এতটা লেখার প্রয়োজন ছিল না। যে পাঠক-দিগের জন্য আমি ইহা লিখিতেছি তাঁহাদের নিকট আমার নিজের সাফাই করিতেও লজ্জা বোধ হয়। আমার ভিতরে চালাকী নাই একথা যদি এতদিনেও তাঁহারা অনুভব না করিয়া থাকেন, তবে আমি যতই সাফাই করি না কেন, তাহা তাঁহাদের নিকট প্রমাণ করিতে পারিব না। উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহার হেতু এই যে, সত্যাগ্রহ যুদ্ধ কত কষ্ট করিয়া চালানো হইয়াছিল পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই সত্যাগ্রহের পরিচালকেরা নীতির দুরূহ মার্গ হইতে এতটুকুও বিচলিত হইলে, কি বিপদে আসিয়া পড়িতেন, তাহাও যাহাতে পাঠকেরা জানিতে পারেন, সে জন্যও উহার উল্লেখ করিলাম। শূন্যে দড়ির উপর দিয়া যখন বাজিকর চলে তখন তাহাকে যেমন একাগ্রচিত্ত হইতে হয়, তাহার দৃষ্টি একটু চঞ্চল হইলে, ডাহিনে বা বামে যেদিকেই পড়ুক্ তাহার মৃত্যু নিশ্চয়, সত্যাগ্রহীর তদপেক্ষাও অধিক একাগ্র দৃষ্টিতে চলা দরকার, একথা আমি আট বৎসর পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহ চালাইবার সময়ে দেখিয়া লইয়াছি। যে সকল মিত্রের উদ্দেশ্য করিয়া জেনারেল স্মাট্‌স্ ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাকে ভাল রকমই জানিতেন এবং তাঁহাদের উপর উহার প্রভাব বিপরীত রকমের হইয়াছিল। তাঁহারা আমাকে ও যুদ্ধকে যে কেবল ত্যাগ করিলেন না তাহাই নহে, বরঞ্চ তাঁহাদের আরো বেশী করিয়া সাহায্য করিবার ইচ্ছা হইল। সম্প্রদায় পরে দেখিয়াছিলেন যে, ঐ নূতন আইনটিও যদি সত্যাগ্রহের মধ্যে না আনা হইত তাহা হইলে ভারি মুস্কিলে পড়িতে হইত।

আমরা যাহাকে ক্রমবৃদ্ধির নিয়ম বলি, প্রত্যেক শুদ্ধ যুদ্ধেই তাহা খাটে। আমার অভিজ্ঞতা আমাকে ইহাই শিখাইয়াছে। সত্যাগ্রহ

সম্বন্ধে এই নিয়মকে আমি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানি। গঙ্গা যখন সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে তখন দুই দিক হইতে অপর নদী আসিয়া তাহাতে যোগ দেয়, তাহার বিস্তার ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, অবশেষে এমন হয় যে, ডাইনে বামে আর কূল দেখা যায় না, এবং কোনও যাত্রী তখন কোথায় গঙ্গা শেষ হইয়াছে আর সমুদ্র আরম্ভ হইয়াছে তাহা ধরিতে পারে না। সত্যাগ্রহ যুদ্ধও তেমনি, ইহা যখন চলিতে থাকে তখন ইহার মধ্যে আরও অন্য অনেক বিষয় আসিয়া পড়িয়া ইহার পরিণাম ফল বাড়িতেই থাকে। আমি জানিয়াছি যে, ইহা সত্যাগ্রহের অনিবার্য্য পরিণাম। সত্যাগ্রহের মূল তত্ত্বের মধ্যেই ইহার হেতু রহিয়াছে। সত্যাগ্রহে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা কম তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সেই জন্য যাহা সর্ব্বাপেক্ষা কম তাহা হইতে আর কিছু কমাইবার থাকে না। এবং স্বভাবিক নিয়মে উহা বাড়িতেই থাকে। অন্যপ্রকার যুদ্ধ শুদ্ধ হইলেও, তাহাতে দাবী কমানোর পথ প্রথম হইতেই রাখা হয়, সেইজন্য ক্রমবৃদ্ধির নিয়মের পরিবর্ত্তে তাহাতে হ্রাসের নিয়মই প্রযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু যে দাবি অল্প অপেক্ষাও অল্প ও অধিক অপেক্ষাও অধিক সে দাবিতে বৃদ্ধির নিয়ম কি করিয়া খাটিতে পারে তাহা বুঝাইতেছি। চওড়া হওয়ার জন্য, বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য, যেমন গঙ্গা নিজের প্রবাহ পথ ত্যাগ করে না, সত্যাগ্রহীও তেমনি তলোয়ারের ন্যায় সূক্ষ্মধার নীতিপথ ত্যাগ করে না। গঙ্গা যখন অগ্রসর হইয়া চলিতে থাকে তখন অন্যান্য নদী যেমন নিজের জল আনিয়া গঙ্গায় মিশাইয়া দেয়, সত্যাগ্রহরূপী গঙ্গাতেও তাহাই হয়। যখন নূতন ইমিগ্রেশন আইন সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। তখন সত্যাগ্রহের নিয়ম অনভিজ্ঞ ভারতীয়েরা, ট্রান্সভালে ভারতীয়দের বিরুদ্ধ যত আইন ছিল সে সমস্তই সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত

করিতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, সত্যাগ্রহ যখন চলিতেছে তখন ট্রান্সভাল, নাটাল, কেপকলোনি ও অরেঞ্জ-ফ্রী-ষ্টেট সকলকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যত কিছু আইন আছে তাহাদের প্রত্যেকটার বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহ করিয়া বসা উচিত। এই উভয় পথ গ্রহণ করিলেই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করা হইত। আমি তাহাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে, সত্যাগ্রহের আরম্ভ সময়ে যাহা গ্রহণ করা হয় নাই এক্ষণে সুবিধা দেখিয়া তাহা গ্রহণ করা ঠিক নহে। আমাদের যতই শক্তি থাকুক না কেন, বর্ত্তমান লড়াই যে দাবির জন্য করা হইয়াছে তাহা স্বীকৃত হইলেই শেষ করা হইবে। যদি আমরা এই নীতি স্বীকার করিয়া না লইতাম তাহা হইলে আমাদের জয়ের পরিবর্ত্তে পরাজয় হইত—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু আমরা যে সহানুভূতি পাইতেছিলাম তাহাও হারাইয়া বসিতাম। কিন্তু যখন চলতি সত্যাগ্রহের মধ্যে প্রতিপক্ষ নূতন বিরোধ, নূতন বিপদের সৃষ্টি করে তখন তাহা স্বভাবতঃই সত্যাগ্রহ ভুক্ত হয়। সত্যাগ্রহী যখন তাহার নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছে তখন যে বাধা তাহার উপর ফেলা হয় সত্যাগ্রহ বিচ্যুত না হইয়া তাহা সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। প্রতিপক্ষ সত্যাগ্রহী নহেন, সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ অসম্ভব, সেই জন্য কম বা বেশী দাবির নিয়মে তিনি বদ্ধ নহেন। যদি কিছু নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি সত্যাগ্রহীকে ভীত করিতে পারেন তবে তাহা করিবেন। কিন্তু সত্যাগ্রহী ত নির্ভয়। আর নির্ভয় বলিয়াই প্রতিপক্ষ যতই নূতন বিপদের সৃষ্টি করুক্ না কেন, পুরাতন ও নূতন সকল বিপদের বিরুদ্ধেই সে নিজের মন্ত্রোচ্চারণ করে ও এই শ্রদ্ধা রাখে যে, যতই বাধা আসুক না কেন, এই এক সত্যাগ্রহের মন্ত্রোচ্চারণই

তাহাতে ফলদায়ক হইবে। সেই হেতু সত্যাগ্রহ যতই দীর্ঘস্থায়ী হয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষ তাহাকে যত দীর্ঘস্থায়ী করে, ততই প্রতিপক্ষ নিজের দৃষ্টিতে নিজেরই অধিক ক্ষতি করে ও সত্যাগ্রহীর ক্ষতি কম করিতে থাকে। এই নিয়মের ক্রিয়ার অপর দৃষ্টান্ত আমরা এই যুদ্ধের ইতিহাসেই দেখিতে পাইব।

পঞ্চম অধ্যায়

সোরাবজী শাপুরজী আড়াজনীয়া

এখন নূতন লোকের প্রবেশাধিকারের বিষয়ও সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার পরীক্ষাও সত্যাগ্রহীর করিতে হয়। যে কোনও ভারতীয়ের দ্বারা এই পরীক্ষা করা সঙ্গত নয় বলিয়া কমিটি স্থির করিল। নূতন প্রবেশাধিকার আইনের দ্বিতীয় সর্ত্ত, যাহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু করার দরকার ছিল না, আইনের সেই অংশ যাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতে পারে এমন সত্যাগ্রহীকে ট্রান্সভালে পাঠাইয়া জেল ভোগ করানোই কমিটি ঠিক করিল। ইহা দ্বারা প্রমাণ করা হইল যে, সত্যাগ্রহ ধর্ম্মে সীমা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। এই নূতন লোক প্রবেশের প্রতিরোধ আইনের একটা অংশ ছিল যে, নবাগতের ইউরোপীয় কোনও ভাষার জ্ঞান থাকা চাই। কমিটি সেইজন্য স্থির করিলেন যে, পূর্ব্বে ট্রান্সভালে বাস করেন নাই এমন ইংরাজী জানা লোককে ট্রান্সভালে পাঠাইতে হইবে। অনেক ভারতীয় যুবক প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে সোরাবজী শাপুরজী আড়াজনীয়াকেই কমিটি নির্ব্বাচিত করেন।

পাঠক নাম দেখিয়াই বুঝিবেন যে সোরাবজী পার্শী ছিলেন। সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় পার্শীর সংখ্যা একশতের বেশী হইবে না। ভারতবর্ষে পার্শীদের সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়া থাকে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তাহাদের সম্বন্ধে সেই কথাই খাটে। সমস্ত পৃথিবীতে এক লক্ষের বেশী পার্শী নাই। এমন একটা ছোট সম্প্রদায় নিজ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিয়াছে, নিজের ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছে, উদারতায় কোনও সম্প্রদায় তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই—এ সমস্তই এই সম্প্রদায়ের মহত্ত্বের পরিচয় দেয়।

সম্প্রদায়ের মধ্যেও সোরাবজী রত্ন বিশেষ ছিলেন বলিয়া দেখা গিয়াছিল। যখন তিনি সত্যাগ্রহে প্রবেশ করেন তখনও তাঁহার সহিত আমার অল্পই পরিচয় ছিল। সত্যাগ্রহে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহার পত্র পড়িয়া আমার মনে ভাল ধারণা হয়। পার্শীদের গুণের আমি যেমন পূজক, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের যে দোষ তাহাও তেমনি আমার অজানা নয়। যখন সভ্যতার পরীক্ষার সময় আসিবে তখন সোরাবজী উত্তীর্ণ হইবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার সন্দেহ হইলে, যাহার সম্বন্ধে সন্দেহ, সে যদি নিজে তাহার প্রতিবাদ করে, তবে আমার সন্দেহের উপর আমি কার্য্য করি না—ইহাই আমার নিয়ম। সেই জন্য সোরাবজী পত্রে নিজের যে দৃঢ়তার বিষয় লিখিয়াছিলেন তাহাই মানিয়া লওয়ার উপদেশ আমি কমিটিকে দিলাম। পরিণামে সোরাবজী প্রথম শ্রেণীর সত্যাগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘদিন জেল ভোগ যাঁহারা করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের একজন। কেবল তাহাই নহে, সত্যাগ্রহ যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি এমন উচ্চাঙ্গের ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিলে সকলকে তাহা শুনিতে হইত। তাঁহার সঙ্কল্পে সর্ব্বদাই দৃঢ়তা, বিবেক, উদারতা শান্তি ইত্যাদি গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া কোনও সঙ্কল্প করিতেন না, আবার সঙ্কল্প করিলে তাহা ত্যাগ করিতেন না। তিনি যতটা পার্শী ছিলেন—আর তিনি পুরাপুরিই পার্শী ছিলেন—ততটাই দৃঢ়ভাবে তিনি ভারতীয় ছিলেন।

সঙ্কীর্ণ জাতি-অভিমানের স্পর্শও তাঁহাতে ছিল না। সত্যাগ্রহ যুদ্ধ শেষ হইলে সত্যাগ্রহীদের মধ্যে একজনকে বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া আনার জন্য ডাক্তার মেহ্‌তা বৃত্তি দিয়াছিলেন। নির্ব্বাচন কার্য্য আমারই করিতে হয়। দুই তিন জন লোক উপযুক্ত ছিল, কিন্তু সকল বন্ধুরাই একবাক্যে বলেন যে, সোরাবজীর বিচার শক্তি ও তাঁহার জ্ঞানের কাছে

কেহ দাঁড়াইতে পারে না। বিলাতে পাঠাইবার হেতু এই ছিল যে, তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া আমার স্থান লইয়া সম্প্রদায়ের সেবা করিবেন। সম্প্রদায়ের সম্মানভাজন হইয়া সম্প্রদায়ের আশীর্ব্বাদ লইয়া সোরাবজী বিলাত গিয়াছিলেন ও ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন। গোখলের সহিত তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকাতেই দেখা হয়, কিন্তু বিলাতে যাওয়ার পর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হয়। তিনি গোখলের মন হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। গোখলে যখন ভারতবর্ষে ফিরেন তখন তিনি সোরাবজীকে তাঁহার 'ভারত সেবক-মণ্ডলের' অন্তর্ভুক্ত করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। সোরাবজী ছাত্রদিগের মধ্যে অতিশয় প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সকলের দুঃখেই সমবেদনা বোধ করিতেন এবং বিলাতের আড়ম্বর ও আরাম তাহার মনকে এতটুকুও প্রভাবিত করিতে পারে নাই। যখন বিলাত যান তখন সোরাবজীর বয়স ত্রিশের উপর ছিল। তাঁহার ইংরাজী খুব ভাল জানা ছিল না। কিন্তু অধ্যবসায়ীর নিকট এ সকল অসুবিধা দাঁড়াইতে পারে না। সেখানে তিনি খাঁটি ছাত্রজীবন যাপন করিয়া পর পর পরীক্ষাগুলি পাস করিয়া যান। আমার সময় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। আজকালকার ব্যারিষ্টারীর জন্য তদপেক্ষা অনেক বেশী পড়িতে হয়। কিন্তু সোরাবজী পরাজয় কি তাহা জানিতেন না। বিলাতে যখন যুদ্ধের সময় সেবকবাহিনী (এম্বুলান্স কোর) সংগঠিত হয় তখন তাহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্তও ঐ বাহিনীতে ছিলেন। এই সেবকদলকেও সত্যাগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সে সময় অনেকে সত্যাগ্রহ প্রতিজ্ঞা লইয়াও স্খলিত হন। কিন্তু যাঁহারা প্রধান সত্যাগ্রহী ছিলেন তাঁহাদের পুরোভাগে ছিলেন সোরাবজী। একথাও আমি এখানেই বলিতেছি যে, ঐ সত্যাগ্রহের জয় হইয়াছিল। সোরাবজী ব্যারিষ্টার হওয়ার পর জোহানেসবর্গে ফিরেন।

সেখানে সেবাকার্য্য এবং ওকালতীও আরম্ভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে যে পত্র আসিত তাহাতেই তাঁহার প্রশংসা থাকিত—"তিনি তেমনি সরল রহিয়াছেন, আড়ম্বর মোটেই নাই, ছোট বড় সকলের সঙ্গেই মিশিতেছেন।" কিন্তু ঈশ্বর যেমন দয়াল তেমনি তিনি নিষ্ঠুর তাঁহার সাংঘাতিক ক্ষয়রোগ হয়। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে সম্প্রদায়ের প্রেম লইয়া সম্প্রদায়কে কাঁদাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন! এমনি করিয়া দুইটি রত্নকে—কাছলীয়া ও সোরাবজীকে পর পর অল্পকাল মধ্যেই ঈশ্বর ছিন্ন করিয়া লইয়া গেলেন।

এই দুই জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন ইহা যদি তুলনা করিতে হয় তবে কে বড় তাহা আমি বলিতে পারি না। দুইজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অতুলনীয় ছিলেন। কাছলীয়া যতটা পবিত্র চরিত্র মুসলমান ততটাই পবিত্র ভারতীয় ছিলেন; আবার সোরাবজীও যেমন পবিত্র চরিত্র পার্শী, তেমনি পবিত্র চরিত্র ভারতীয় ছিলেন।

এই সোরাবজীই প্রথম সরকারকে নোটীশ দিয়া আইনগুলি পরীক্ষা করার জন্য ট্রান্সভালে প্রবেশ করেন। সরকার এই চালের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই সোরাবজীকে লইয়া কি করা যায় তাহা তাড়াতাড়ি ঠিক করিতে পারিলেন না। সোরাবজী প্রকাশ্যভাবে সীমানা পার হইয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলেন। যেসব কর্ম্মচারী সার্টিফিকেট পরীক্ষা করিতেন তাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন "আমি ইচ্ছা করিয়া আইন পরীক্ষা করার জন্য ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতেছি। আমার ইংরাজী জ্ঞানের পরীক্ষা লইতে হয় তবে তাহা লইতে পারেন। আর যদি গ্রেপ্তার করিতে হয় তবে গ্রেপ্তার করিতে পারেন।" আমলা বলিলেন—"আপনি যে ইংরাজী জানেন তাহা আমি জানি, সেজন্য পরীক্ষা করার আবশ্যক নাই। আপনাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম আমি পাই

নাই। আপনি আপনার মত চলিয়া যান, যদি সরকারের গ্রেপ্তার করিতে হয় সেখান হইতে করিবেন।”

এমনি করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে সোরাবজী জোহানেসবর্গ পঁহুছিলেন। আমরা সকলে আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলাম। কেহই আশা করে নাই যে, সরকার তাঁহাকে ট্রান্সভাল সীমান্তের ভোকস্রষ্ট ষ্টেশন পার হইতে দিবেন। অনেকবার ইহা দেখা গিয়াছে, যখন আমি কোনও পথ বিচার করিয়া নির্ভীকতার সহিত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করিয়াছি সরকার তখন তাহার প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। ইহা সরকার মাত্রেরই ধর্ম্ম। সরকারের কোনও কর্ম্মচারী নিজেকে নিজের বিভাগের সহিত এতটা ওতঃপ্রোত করিয়া রাখে না যে, কোনও একটা সাধারণ আন্দোলন উপস্থিত হইলে, কি করিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া ফেলিবে ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। ইহা ভিন্ন আমলাদের দৃষ্টি কেবল একটা বিষয়ে নহে, নানা বিষয়ে দিতে হয়। সেইজন্য তাহাদের মনও বিভক্ত হইয়া থাকে। এতদুপরি আমলারা তাহাদের প্রভুত্ব গর্ব্বে নিশ্চিন্ত থাকে এবং বিশ্বাস করে যে, যতই আন্দোলন হোক্ না কেন, এই শক্তির নিকট তাহা ছেলে-খেলা মাত্র। আর ইহার বিপরীত অবস্থা আন্দোলনকারীদের। তাহারা তাহাদের লক্ষ্য কি তাহা জানে, লক্ষ্যে পঁহুছিবার পথ কি তাহা জানে, এবং যদি ঠিক কি করিবে সে বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত থাকে, তবে পুরাপুরি তৈরীও থাকে। তাহার রাত্রি দিন ঐ একটা মাত্রই বিষয় ধ্যেয় হয়। সেইজন্য যদি সে দৃঢ়ভাবে বিচার পূর্ব্বক নিজ গন্তব্য পথে চলে, তবে সে বরাবরই সরকারের আগে আগে চলিতে পারে। অনেক কর্ম্ম-প্রগতি যে ব্যর্থ হয়, তাহার কারণ সরকারের অপূর্ব্ব শক্তি নয়, পরিচালকদিগের যে গুণ থাকা চাই, সেই গুণের অভাব বশতঃই হয়।

মোটের উপর সরকারের অমনোযোগিতার জন্যই হোক্ অথবা ইচ্ছাকৃত ব্যবস্থানুযায়ীই হোক্ সোরাবজী জোহানেসবর্গ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিলেন। সোরাবজীকে লইয়া কি করিতে হইবে তাহা স্থানীয় কর্ম্মচারীর জানা ছিল না, উপর হইতেও কোন নির্দ্দেশও আসিয়াছিল না। সোরাবজী এইভাবে আসিয়া পড়ায় সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব উৎসাহ উপস্থিত হইল, আর কতকগুলি যুবক মনে করিল যে, সরকার হারিয়া গিয়াছে, অল্পদিনেই মিটমাট করিয়া ফেলিবে। তাহাদের ঐ প্রকার ভাবনা যে ভিত্তিহীন তাহা তাহারা অল্প সময় মধ্যেই বুঝিতে পারিল। আর, সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিল যে, মিটমাট হওয়ার পূর্ব্বে অনেক যুবককে আত্মবলি দিতে হইবে।

সোরাবজী আসার খবর নিজেই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে, নূতন প্রবেশাধিকার আইন অনুযায়ী তিনি নিজেকে ট্রান্সভালে বাস করার অধিকারী মনে করেন, কারণ তাঁহার আবশ্যক ইংরাজী জ্ঞান আছে এবং যিনি পরীক্ষা করিতে চাহেন সেই আমলার নিকট পরীক্ষা দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত আছেন। এই পত্রের কোনও জবাব পাওয়া গেল না, অথবা সেই পত্রের জবাবেই দিন কয়েকের মধ্যে সমন আসিল। কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। ভারতীয় দর্শক দ্বারা কোর্ট পূর্ণ হইয়া গেল। মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে কোর্টে যে সমস্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া তৎক্ষণাৎ এক সভা করা হয় এবং সোরাবজী তাহাতে তেজপূর্ণ বক্তৃতা করেন। যতদিন জয়লাভ না হয় ততদিন তিনি জেলে যাইতেই প্রস্তুত থাকিবেন। অন্য যে বিপদ হয় সে সমস্তও সহ্য করিতে প্রতিজ্ঞা লইলেন। ইতিমধ্যে আমি সোরাবজীর ভাল রকম পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং বুঝিয়াছিলাম যে, সোরাবজী একটি

পবিত্র রত্ন। বিচার আরম্ভ হইল, আমি উকীল দাঁড়াইলাম। সমনের মধ্যে কতকগুলি দোষ ছিল তাহা দেখাইয়া বলিলাম যে, ঐ সমন অগ্রাহ্য করা হোক্। সরকারী উকীল বিরুদ্ধ যুক্তি দিলেন। কিন্তু কোর্ট আমার যুক্তি গ্রহণ করিয়া সমন অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সোরাবজীর নামে আর একটা সমন জারি করিয়া তাঁহাকে পরদিন কোর্টে হাজির হইতে নির্দেশ করা হইল।

পরদিন ১০ই জুলাই ১৯০৮, ম্যাজিষ্ট্রেট সোরাবজীকে এক সপ্তাহ মধ্যে ট্রান্সভাল ত্যাগ করার আদেশ দিলেন। কোর্টের হুকুম পাওয়ার পর সোরাবজী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ভারননকে জানাইলেন যে, তিনি ট্রান্সভাল ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। সেই জন্য তাঁহাকে আবার সমন দিয়া ২০শে তারিখে কোর্টে আনা হইল ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করা অপরাধে এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দা ভারতীয়দিগকে গ্রেপ্তার করিলেন না। যত বেশী গ্রেপ্তার হয়, লোকের উৎসাহ তত বাড়ে একথা সরকার বুঝিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিল তাহারা আইনের ফাঁক দিয়া বাহিরে আসিলে তাহাতেও উৎসাহ দ্বিগুণ হইত। সরকার যত খুসী ইচ্ছা ভারতীয়দের বিরুদ্ধ আইন পাস করিয়া লইয়াছিলেন। অনেক ভারতীয় সার্টিফিকেট পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা রেজেষ্ট্রী করিয়াছিল ইহাতেই তাহারা সে দেশে থাকার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। সরকার এখন তাহাদিগকে কেবল জেলে পাঠানোর জন্যই গ্রেপ্তার করার সার্থকতা দেখিলেন না। সরকার ভাবিলেন দিন কতক ঢিলা দিলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। কিন্তু সরকার সত্যাগ্রহীদের ধাত বুঝিতে পারেন নাই। ভারতীয়েরা শীঘ্রই সরকারের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল এবং সরকার অচিরেই ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেঠ দাউদ মহম্মদ প্রভৃতির যোগদান

যখন সম্প্রদায় দেখিল যে, সরকার কিছুই করিতেছেন না, তখন নূতন কোনও দিক দিয়া আক্রমণের রাস্তা খুঁজিয়া লইতে হইল। সত্যাগ্রহীর যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুঃখ সহ্য করার শক্তি থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রান্তি নাই। সেইজন্য সরকারের হিসাব তাঁহারা বিপর্য্যস্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

নাতালে এমন কতক বাসিন্দা ছিলেন যাঁহাদের ট্রান্সভালে বাস করার অধিকার পূর্ব্ব হইতে ছিল; ব্যবসা করার জন্য তাঁহাদের ট্রান্সভালে যাওয়ার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের প্রবেশের অধিকার আছে বলিয়া সম্প্রদায় গণ্য করিত। তাঁহারা অল্পস্বল্প ইংরাজীও জানিতেন। সোরাবজীর মত ইংরাজী জ্ঞান যাহাদের আছে তাঁহাদের ট্রান্সভাল প্রবেশে সত্যাগ্রহের নীতি ভঙ্গ হয় না। সেইজন্য দুই প্রকার ভারতীয়কে ট্রান্সভালে প্রবেশ করানো স্থির হইল—যাঁহাদের পূর্ব্ব হইতে বসবাসের অধিকার আছে, আর যাহারা ইংরাজী শিখিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত।

ইহাদের মধ্যে শেঠ দাউদ মহম্মদ, পারশী রস্তমজী প্রভৃতি বড় বড় বেপারী ছিলেন, আর সুরেন্দ্ররায় মেঢ়, প্রাগজী খণ্ডুভাই দেশাই, হরিলাল গান্ধী, রতনশী সোঢ়া ইত্যাদিও শিক্ষিতবর্গের মধ্যে ছিলেন।

শেঠ দাউদ মহম্মদের পরিচয় দিতেছি। ইনি নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল বেপারী আসিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। তিনি

সুরাটের সুন্নি বোরা ছিলেন। চতুরতায় তাঁহার সমান ভারতীয় আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখি নাই। তাঁহার বুঝিবার শক্তি খুব উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহার লেখাপড়া বেশী জানা ছিল না, কিন্তু কার্য্য ও ব্যবহার দ্বারা তিনি চলনসহিভাবে বলার মত ইংরাজী ও ডচ শিখিয়াছিলেন। ইংরাজ বেপারীদের সহিত তিনি সুন্দর কার্য্য চালাইতেন। তাঁহার দানশীলতার বিশেষ খ্যাত ছিল। তাঁহার বাড়ীতে পঞ্চাশজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি প্রতিদিনই ভোজন করিতেন। সম্প্রদায়ের জন্য চাঁদা দিতেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার এক অমূল্য রত্নের ন্যায় গুণবান পুত্র ছিল। তাহার চরিত্র পিতা অপেক্ষাও উচ্চ ছিল। তাহার হৃদয় স্ফটিকের মত নির্ম্মল ছিল। এই পুত্রের চরিত্রোন্নতিতে দাউদ শেঠ কথনো বিঘ্ন ঘটান নাই। নিজের এই পুত্রকে দাউদ শেঠ পূজা করিতেন বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। তাঁহার একটা দোষও যেন হুসেনের না থাকে—এই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়া ভাল শিক্ষা দিয়াছিলেন। এ হেন পুত্ররত্নকে শেঠ দাউদ ভরা যৌবনে হারান। হুসেনকে ক্ষয়-রোগ আক্রমণ করে ও তাহার প্রাণ হরণ করে। শেঠ দাউদের এই ক্ষত আর কথনো শুকায় নাই। হুসেনের সহিত ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিরাট আশাও ডুবিয়া যায়। হুসেনের নিকট হিন্দু-মুসলমান যেন দক্ষিণ ও বাম চক্ষু ছিল। সে সত্যকার তেজস্বী ছিল। আজ শেঠ দাউদও নাই। কাল কাহাকে না কবলিত করে?

পার্শী রুস্তমজীর পরিচয় আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। অনেক পাঠকই তাঁহার নাম জানেন। আমি কোনও কাগজ পত্রের সাহায্য না লইয়াই এই অধ্যায় লিখিতেছি, সেই জন্য অনেক নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আশা করি, ভাইয়েরা আমাকে মাফ করিবেন। এই অধ্যায়ের নামগুলি তাঁহাদিগকে অমর করার জন্য উল্লেখ করা হয় নাই।

সত্যাগ্রহের রহস্য বুঝাইবার জন্য, কেমন করিয়া ইহাতে জয়লাভ হইয়াছিল, ইহার কি কি বিঘ্ন ঘটিয়াছিল এবং কেমন করিয়াই বা সে বিঘ্ন দূর করা হইয়াছিল, এ সকল দেখাইবার জন্যই আমি লিখিতেছি। যেখানে যেখানে আমি নাম করিয়াছি সেখানেও আমি দেখাইয়াছি যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় নিরক্ষর লোকেরাও কেমন পরাক্রম দেখাইয়াছে। আর উহা হইতে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান ইত্যাদি কি করিয়া একসাথে মিলিত হইয়াছিল, কেমন করিয়া বেপারী, শিক্ষিত লোককে হুকুমে খাটাইয়াছিল ইত্যাদিও পাঠক দেখিতে পাইবেন। যেখানেই আমি গুণীর পরিচয় করাইয়াছি সেখানে ব্যক্তির নয়, তাঁহার গুণেরই স্তুতি করিয়াছি।

এইভাবে যখন দাউদ শেঠ নিজের সত্যাগ্রহী দলবল লইয়া ট্রান্সভাল সীমান্তে পঁহুছিলেন তখন ট্রান্সভাল সরকার প্রস্তুত ছিলেন। এই দলকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে দিলে সরকার উপহাসের পাত্র হইবেন, সেইজন্য ইহাদিগকে গ্রেপ্তার না করিয়া উপায় ছিল না। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়, মোকদ্দমা চালানো হয় ও ভোকস্রষ্ট সীমান্ত জেলে কয়েদ করা হয়। ইহাতে সম্প্রদায়ের উৎসাহ বাড়ে। নাতাল হইতে যাঁহারা সাহায্য করিতে আসিয়া জেলে গেলেন তাঁহাদিগকে ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়েরা যদিই বা মুক্ত না করিতে পারে, তবু নিজেরা ত জেলে যাইতে পারে। জেলে যাওয়ার অনেক রাস্তা ছিল। যদি বাস করার সার্টিফিকেট না দেখানো যায়, তবে ব্যবসা করার লাইসেন্স দেওয়া হয় না। ব্যবসার লাইসেন্স না লইয়া ব্যবসা করিলে আইন ভঙ্গ করা হয়। নাতাল হইতে কেহ প্রবেশ করিলেই সার্টিফিকেট দেখাইতে হয়, দেখাইতে না পারিলেই গ্রেপ্তার করিতে হয়। সার্টিফিকেট ত পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল, সেই জন্য রাস্তা সাফ হইয়াই ছিল। এই

দুই রাস্তাই লওয়া হয়। কেহ বা বিনা লাইসেন্সে ফেরী করিতে গিয়া কেহ বা বিনা সার্টিফিকেটে সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার হইতে লাগিল। এখন লড়াই জমিয়া গেল বলা যায়। অনেকের পরীক্ষা হইতে লাগিল। নাতাল হইতে আর এক দল আসিল, জোহানেসবর্গেও ধরপাকড় আরম্ভ হইল। এমন অবস্থা হইল যে, যাহার ইচ্ছা হয় সেই গ্রেপ্তার হইতে পারে। জেল ভরিয়া উঠিল।

যাঁহারা এইভাবে ধরা পড়িলেন তাঁহাদের মধ্যে ইমাম সাহেব বাওয়াজীর ছিলেন। তাঁহার চারিদিনের জন্য জেল হয়। তিনি ফিরি করিয়া ধরা পড়েন। তাঁহার শরীর এমন অশক্ত ছিল যে, লোকে তাঁহার জেল হওয়ার কথায় হাসিত। কতজন আমাকে আসিয়া বলিয়াছেন যে, ইমাম সাহেবকে না ধরে ত ভাল। তিনি ধরা পড়িলে সম্প্রদায়কে লজ্জা দিবেন। আমি এই সাবধানতার কথায় কান দিই নাই। ইমাম সাহেবের শক্তির বিচার করার আমি কে? ইমাম সাহেব কখনো খালি পায় বাহির হন নাই, তিনি সৌখীন লোক ছিলেন, তাঁহার মালয় নিবাসী পত্নী ছিলেন, ঘর সংসার করিতেন, গাড়ীঘোড়া ছাড়া কোথাও চলিতেন না। এ সকলই সত্য, কিন্তু তাঁহার মনের খবর তিনি ছাড়া আর কে জানে। এই ইমাম সাহেবই চারদিনের জেল খাটিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার জেলে গেলেন। তিনি জেলে গিয়া আদর্শ কয়েদী হইলেন, কঠিন পরিশ্রম করিয়া আহার করিতেন। আর যাঁহার নিত্য নূতন খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস, তিনি মকাই-এর আটার জাউকেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মানিতে লাগিলেন। তিনি ত হার মানিলেনই না, বরঞ্চ সাদাসিধা জীবন গ্রহণ করিলেন। কয়েদী হইয়া পাথর ভাঙ্গিতেন, ঝাড়ু দিতেন, তিনি অন্য কয়েদীদিগকেই হারাইয়া দিলেন। অবশেষে যখন তিনি ফিনিক্সে আসিলেন তখন ছাপাখানায়

কম্পোজিটরের কাজও করিতেন। ফিনিক্সে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কম্পোজিটরের কাজ শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। সেই অনুসারে ইমামসাহেব যথাশক্তি কম্পোজিটরের কাজ শিখিয়াছিলেন। এই ইমাম সাহেব এক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়া নিজের শক্তি অনুযায়ী দেশের সেবা করিতেছেন।

এমনি করিয়া অনেকে জেলের মধ্যে শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। জোসেফ রায়পন ছিলেন ব্যারিষ্টার ও কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েট। নাতালের গিরমিটিয়া পিতামাতার ঘরে জন্মিয়া তিনি সাহেব হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ত বাড়ীতেই বুট না পরিয়া চলিতেন না। ইমাম সাহেবের ওজু করার সময় পা ধুইতে হয়, নামাজ পড়ার সময় খালি পা হইতে হয়, বেচারা রায়পনের ত তাহাও করিতে হয় নাই। ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করিয়া বগলে তরীতরকারীর পোঁটলা লইয়া তিনি ফিরি করিতে আরম্ভ করিলেন। জেলে যাইতে হইল। রায়পন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকেও কি রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে হইবে?" "আপনি যদি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যান, আমি কাহাকে তবে তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠাইব? জেলে আপনাকে ব্যারিষ্টার বলিয়া কে চিনিবে?" আমি জবাব দিলাম। জোসেফ রায়পনের পক্ষে এই জবাবই যথেষ্ট ছিল। তিনি জেলে গেলেন।

ষোল বৎসরের কত ছেলে ত জেলে গেল। মোহনলাল মাঞ্জী ঘেলানী নামে একজন চৌদ্দ বৎসরের ছেলেও ছিল।

জেলের প্রভুরা দুঃখ দেওয়ার বাকী রাখেন নাই। পায়খানা সাফ করাইত। ভারতীয় কয়েদীরা হাসিমুখে তাহা করিত। পাথর ভাঙ্গাইত। আল্লার নাম বা রাম নাম লইতে লইতে তাহারা পাথর ভাঙ্গিত। তাহারা পুষ্করিণী খুঁড়াইয়াছে, পাথুরে মাটি কোপাইয়াছে হাতে

কড়া পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বা অসহ্য দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়াছে, কিন্তু কেহ হার মানে নাই।

জেলের ভিতর মধ্যে মধ্যে যে ঝগড়া ও দ্বেষ ভাব দেখা না দিত তাহা নয়। . খাওয়া লইয়া সব চাইতে বেশী ঝগড়া হওয়ার কথা ; আমরা তাহা হইতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।

আমি দ্বিতীয়বার ধৃত হইলাম। ভোকস্রাষ্ট জেলে এক সময় আমরা ৭৫ জন পর্য্যন্ত কয়েদী ছিলাম। আমাদের পাক করার ভার নিজের হাতে লইয়াছিলাম। ঝগড়া নিবারণ করার ভার আমার হাতেই ছিল। সেইজন্য রান্নার ভারও আমি লইলাম। প্রেমের বশে আমার হাতের সিদ্ধ অসিদ্ধ জাউ গুড় ছাড়াই সাথীরা খাইয়া যাইতেন।

সরকার দেখিলেন যে, আমাকে আলাদা করিয়া ফেলিলে আমারও কিছু সাজা হয়, কয়েদীদিগকেও জব্দ করা যায়। এমন সুন্দর অবকাশ সরকার ছাড়িবেন কেন?

আমাকে প্রিটোরিয়ায় লইয়া গেলেন। সেখানে বদমাইস কয়েদীকে রাখার নির্জ্জন কক্ষে আমাকে রাখা হইল। মাত্র দুইবার ব্যায়ামের জন্য আমাকে বাহিরে আনিত। ভোকস্রষ্টে ঘি দেওয়া হইত, এখানে তাহাও দেওয়া হইত না। কিন্তু এখানকার জেলের দুঃখের কথা আমি বলিতে চাই না।

যাঁহার মনে কৌতূহল হয়, তিনি আমার "দক্ষিণ আফ্রিকার জেলের অভিজ্ঞতা" নামক বইখানা যেন পড়েন।

এমন করিয়াও ভারতীয়দিগকে হার মানাইতে পারে নাই। সরকার হতবুদ্ধি হইলেন। জেলে কত ভারতীয় ভর্ত্তি করিবেন? খরচা বাড়িয়া যায়, এখন কি করা যায়?

সপ্তম অধ্যায়

নির্ব্বাসন

সেই এশিয়াটিক্ আইনে তিন প্রকার সাজার ব্যবস্থা ছিল। অর্থদণ্ড, জেল ও নির্ব্বাসন। এই তিন প্রকারের সাজাই এক সাথে দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের ছিল এবং ছোট ম্যাজিষ্ট্রেটকেও এই ক্ষমতা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল। প্রথমতঃ ট্রান্সভালের সীমা পার হইয়া নাতাল, ডেলাগোয়া বে অথবা অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের সীমার মধ্যে অপরাধীকে রাখিয়া আসা হইত। যাহারা নাতালের দিক হইতে প্রবেশ করে তাহাদিগকে ভোক্স্রাষ্ট ষ্টেশনের সীমার বাহিরে লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ইহাতে সীমার বাহিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও অসুবিধা ছিল না। এই রকম ছাড়িয়া দেওয়ায় ভারতীয়দের উৎসাহ বাড়িত।

স্থানীয় সরকারের সেইজন্য শাস্তি দেওয়ার নূতন পথ খুঁজিতে হইল। জেলে আর যায়গা ছিল না। সরকার ভাবিল যে, যদি ইহাদিগকে সমুদ্র পার করিয়া ভারতবর্ষে ফেলিয়া আসা যায়, তাহা হইলেই ভয় পাইয়া যাইবে ও বশ্যতা স্বীকার করিবে। এই প্রকার মনে করার কতকটা হেতুও ছিল। সরকার একটা বড় দল এইভাবে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। এই প্রকারে বহিষ্কৃত লোকগুলির খুবই দুর্গতি হইয়াছিল। ষ্টীমারে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা অত্যন্তই খারাপ ছিল। সকলকে ডেকেই পাঠাইয়া ছিল। যাহাদিগকে এই রকম পাঠায় তাহাদের মধ্যে কতজনের দক্ষিণ আফ্রিকায় জমি-জিরাত ছিল, ব্যবসা-কর্ম্ম ছিল, নিজের পরিবার ছিল এবং কাহারও বা দেনা ছিল। শক্তি

থাকিতেও এইভাবে সকল খোয়াইতে, দেউলিয়া হইয়া যাইতে অনেকেই প্রস্তুত হইতে পারে না।

কিন্তু এই প্রকার করিলেও অনেক ভারতীয় সম্পূর্ণ দৃঢ় থাকিল। আবার অনেকে দমিয়াও গেল। তাহারা ধরা দেওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করিল। পোড়ানো সার্টিফিকেটের নকল চাহিয়া লওয়া পর্য্যন্ত যদিও কেহ নামে নাই, তবু অনেকেই ভয়ে ভয়ে নূতন করিয়া সার্টিফ্রিকেট কাটাইল।

তাহা হইলেও যাহারা দৃঢ় ছিল তাহাদের সংখ্যাও ফেলিয়া দেওয়ার মত নয়। আমি জানি তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক ছিল যাহারা হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতেও যাইতে পারিত—দ্রব্য সামগ্রীর মায়া ত ছাড়িয়াই দিয়াছিল। যাহাদিগকে ভারতবর্ষে ফেরৎ পাঠাইয়া দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে গরীব ও মূর্খ লোক ছিল—যাহারা কেবল বিশ্বাসের বলে যুদ্ধে আসিয়া যোগ দিয়াছিল। তাহাদের উপর এই বিপদ দেখিয়া স্থির থাকা যায় না। তাহাদিগকে কোন রকমে সাহায্য করাও মুস্কিল ছিল। টাকাও যথেষ্ট ছিল না। আর পয়সা দিয়া সাহায্য করা মানে সত্যাগ্রহ যুদ্ধে হারিয়া বসা। উহাতে টাকার লোভেই লোক যুদ্ধে আসিবে। সেইজন্য একজন লোককেও পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। যাহারা উহাদের জন্য দুঃখ অনুভব করিবে, তাহারাই ধর্ম্ম জ্ঞানে সাহায্য করিবে বলিয়া আমরা মানিয়া লইয়াছিলাম। আমি ইহা দেখিয়াছি যে, সহানুভূতি, মিষ্টকথা, মিষ্ট দৃষ্টি দ্বারা যে কাজ আদায় করিতে পারা যায় তাহা পয়সা দিয়াও করা যায় না। যে পয়সার লোভে কাজ করে কিন্তু সহানুভূতি পায় না, সে শেষকালে কাজ ত্যাগ করিয়া যায়। আবার প্রেমের বশীভূত হইয়া লোকে অনেক সঙ্কটও সহ্য করিতে প্রস্তুত হয়।

সেইজন্য এই বহিষ্কারের সম্বন্ধে যতটা সম্ভব সহানুভূতি দিয়া সাহায্য করাই ঠিক করিলাম। তাহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইল যে, ভারতবর্ষে তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইবে। পাঠকেরা জানেন যে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই গিরমিট-মুক্ত ভারতীয় ছিল। তাহাদের আত্মীয় স্বজন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। কেহ কেহ ত দক্ষিণ আফ্রিকাতেই জন্মিয়াছিল। এ সকলের নিকট যে ভারতবর্ষ বিদেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ অবস্থায় লোকগুলিকে ভারতবর্ষের তট-ভূমিতে ফেলিয়া শুকাইয়া মারা হত্যাকরা ছাড়া আর কিছুই নহে। সেইজন্য ইহাদিগের জন্য যথা সম্ভব সকল ব্যবস্থাই হিন্দুস্থানে করা চাই, স্থির করিলাম।

এ সকল করিলেও, তাহাদের সহিত একজন পরিচালক যতক্ষণ না থাকিবে ততক্ষণ শান্তি পাইবে না। দেশ-বহিষ্কৃতের এই প্রথম দল যাইতেছিল। ষ্টীমার ছাড়ার অল্প সময়ই বাকী ছিল। পছন্দ করিয়া লোক নির্ব্বাচন করার সময় ছিল না।

সাথীদিগের মধ্যে ভাই পি, কে, নাইডুর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তুমি এই নিরাশ্রয় ভাইদের সঙ্গী হইয়া কি ভারতবর্ষে যাইতে পারিবে?"

"না পারিব কেন?"

"কিন্তু ষ্টীমার যে এখনই ছাড়িবে।"

"তা' ছাড়ুক না।"

"কিন্তু, তোমার কাপড় চোপড়? খাওয়াও ত হয় নাই।"

"কাপড় যাহা পরিয়া আছি, এই, আর ভাত ত ষ্টীমারে গিয়া খাইব।"

আমার যেমন আনন্দ হইল, তেমনি আশ্চর্য্য হইলাম।

পার্শী রস্তমজীর বাড়ীতে এই কথা হইতেছিল। সেইখানে

কয়েকখানা কাপড় ও কম্বল তাহার জন্য যোগাড় করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম।

"দেখিও, রাস্তায় এই ভাইদের সামাল করিতে হইবে। আমি মাদ্রাজে মিঃ নটেশনের নিকট তার করিয়াছি। তিনি যেমন বলেন, তেমনি করিবে।"

"আমি খাঁটি সৈন্য হওয়ার চেষ্টা করিব।" এই বলিয়া সে রওনা হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম যেখানে এমন বীর-পুরুষ আছে, সেখানে পরাজয় নাই। ভাই নাইডুর জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায় হইয়াছিল। সে ভারতবর্ষ কখনো দেখে নাই। তাহার নিকট মিঃ নটেশনের নামে পরিচয় পত্র দিলাম। তাঁহাকে তারও করিলাম।

ভারতবর্ষের মধ্যে এই সময় একমাত্র মিঃ নটেশনই ছিলেন, যিনি প্রবাসী ভারতীয়দের বিষয়টা বুঝিবার জন্য যত্ন লইতেন, যিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন এবং যিনি তাহাদের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে বুঝিয়া শুনিয়া লিখিতেন। তাঁহার সহিত আমার নিয়মিত পত্র ব্যবহার চলিত। যখন এই দেশ-বহিস্কৃত ভাইয়েরা ভারতবর্ষে পঁহুছিল তখন মিঃ নটেশন তাহাদের সম্পূর্ণ সাহায্য করিয়াছিলেন। নাইডু ভাইএর মত লোক সঙ্গে থাকাতে মিঃ নটেশনেরও সাহায্য হইয়াছিল। নাইডু স্থানীয় চাঁদা তুলিয়া এই ভাইদিগকে বুঝিতেই দেয় নাই যে, তাহারা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

স্থানীয় সরকারের এই নির্ব্বাসন যেমন ঘাতকের কার্য্য হইয়াছিল, তেমনি বে-আইনী হইয়াছিল। সাধারণতঃ লোকে খবর রাখে না যে, সরকার অনেক সময় নিজের আইন নিজেই ইচ্ছাপূর্ব্বক ভঙ্গ করে। যখন মুস্কিল আসে, যখন সরকারের নূতন আইন প্রস্তুত করার সময় থাকে না, তখন আইন ভঙ্গ করিয়াই ইচ্ছামত কাজ করিয়া লয়। পরে হয়

নূতন আইন করে, নয় ত প্রজাকে পূর্ব্বকৃত আইন ভঙ্গের কথা ভুলাইয়া দেয়।

ভারতীয়দের দিক হইতে সরকারের এই বে-আইনী কার্য্যের বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন আরম্ভ হইল। ভারতবর্ষেও ইহা লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। ট্রান্সভাল সরকারের পক্ষে এই ভাবে দেশের বাহির করিয়া দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। ভারতীয়েরা রীতিমত ভাবে ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিল, আপিল করিল ও অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষকে ভারতবর্ষে নির্ব্বাসন করার প্রথা বন্ধ করিতে হইল।

কিন্তু সরকারের এই নির্ব্বাসন নীতির প্রভাব সত্যাগ্রহী সৈন্যদের উপরও পড়িল। এখন যাহারা রহিল তাহারা পাকা যোদ্ধা। "দাঁড়াও না ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিতেছি" এই ধমকের ভয় সকলে সহ্য করিয়া যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

সত্যাগ্রহীদিগকে ভগ্নোদ্যম করার জন্য সরকার কোনও ত্রুটি করেন নাই। গত অধ্যায়ে আমি বলিয়াছি যে, সত্যাগ্রহী কয়েদীদিগকে জেলে দুঃখ দিতে সরকার কম করেন নাই। তাহাদিগকে দিয়া পাথর পর্য্যন্ত ভাঙ্গাইয়া লইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট ছিল না। প্রথমে সমস্ত কয়েদীকে এক সঙ্গে রাখিতেন; এখন তাহাদিগকে আলাদা আলাদা রাখার নিয়ম করিলেন ও প্রত্যেক জেলেই খুব পীড়ন করিতে লাগিলেন। ট্রান্সভালে শীতের প্রকোপ খুব। এত ঠাণ্ডা যে প্রাতঃকালে কাজ করিতে গেলে হাত জমিয়া যায়। শীতকালটা কয়েদীদের পক্ষে সেইজন্য ক্লেশকর। এই অবস্থায় কতকগুলি কয়েদীকে এমন জেলে রাখিল, যেখানে কেহ তাহাদের সহিত দেখাও করিতে পারে না। এই দলে নাগাপ্পন নামে এক সত্যাগ্রহী যুবক ছিল। সে জেলের নিয়ম পালন করিত। যেখানে কাজে দিত সেইখানেই খাটিত। প্রাতঃকালে তাহাকে রাস্তার কাজ

করিতে লইয়া যাইত ; তাহাতে তাহার কঠিন নিউমোনিয়া রোগ হয়। তাহাতেই সে প্রাণত্যাগ করে। তাহার সাথীরা বলিল যে, সে শেষ সময় পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহের কথা চিন্তা করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করে। জেলে যাওয়ার জন্য তাহার অনুশোচনা হয় নাই। দেশের জন্য এই মৃত্যুকে সে বন্ধুর মত আলিঙ্গন করে। এই নাগাপ্পন আমাদের মাপে মাপিলে নিরক্ষর বলা যাইবে। সে ইংরাজী ও জুলু প্রভৃতি ভাষা অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাকে বিদ্বান বলা যায় না। তবুও তাহার ধৈর্য্য, তাহার শক্তি ও মরণান্ত পর্য্যন্ত তাহার দেশভক্তির বিচার করিলে, তাহার ত কোনও কিছুর অভাব ছিল বলিয়া দেখা যায় না। সে বিদ্যালাভ না করিয়াও ট্রান্সভালে যুদ্ধ চালাইতে পারিয়াছে। নাগাপ্পনের মত সিপাই না হইলে কি সত্যাগ্রহ যুদ্ধ চলিতে পারিত ?

যেমন নাগাপ্পন জেলের কষ্টে মারা যায় তেমনি নারায়ণ স্বামী নির্ব্বাসনের ক্লেশে মারা যায়। তাহার নির্ব্বাসনের দুর্গতির অবসান মৃত্যুতেই হয়। কিন্তু এই সকল ঘটনায় সম্প্রদায় দমে নাই। কেবল যাহারা দুর্ব্বল ছিল তাহারাই খসিয়া পড়ে। যাহারা দুর্ব্বল ছিল তাহারা যথাশক্তি দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছে ; তাহারা দুর্ব্বল বলিয়াই তাহাদিগকে অবহেলা করিতে নাই। এমনি একটা রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, যাহারা অগ্রসর হইয়া চলে, তাহারা, যাহারা পিছনে পড়িয়া থাকে তাহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ও নিজদিগকে বড় মনে করে। বাস্তবিক ব্যাপার ত ইহার বিপরীত। যাহার পঞ্চাশ টাকা দেওয়ার শক্তি আছে, সে যদি পঁচিশ টাকা দিয়া বসিয়া পড়ে, আর যাহার পাঁচ টাকা দেওয়ার শক্তি আছে সে পাঁচ টাকাই দিয়া যায়, তাহা হইলে যে পাঁচ টাকা দিয়াছে সেই বেশী দিয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে ; কিন্তু যে পঁচিশ টাকা দিয়াছে সে পাঁচ টাকা দেনেওয়ালার

নিকট বার বার করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে। আমাদের বুঝা চাই যে, ইহাতে গর্ব্বিত হওয়ার কারণ নাই। যে ব্যক্তির শক্তি অল্প সে যদি তাহার যতটা শক্তি আছে সমস্তই দিয়া দেয়, আর একজন যদি নিজের শক্তির কম করিয়া দিয়াও পরিমাণে উহা অপেক্ষা বেশী দেয় তাহা হইলে যে শক্তি চুরি করিয়া রাখিল, তদপেক্ষা প্রথমোক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠতর। সেইজন্য ইহাও জানিয়া রাখা দরকার যে, যুদ্ধ কঠিন হইয়াছিল বলিয়া যাহারা খসিয়া পড়িয়াছে তাহারাও দেশ সেবা করিয়াছে। ক্রমে এমন সময় আসিয়া পড়িল যখন অধিকতর সহ্য শক্তি, অধিকতর সাহসের প্রয়োজন। তাহাতেও ট্রান্সভালের ভারতীয়েরা পশ্চাৎপদ হয় নাই। যুদ্ধ চালাইতে যে কয়টি লোকের আবশ্যক সে কয়টি লোক ছিলই।

এইভাবে দিনে দিনে লোকের পরীক্ষা হইতে চলিল। ভারতীয়েরা যতই অধিক শক্তি দেখাইতে লাগিল, সরকারও ততই অধিক শক্তি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সকল দেশেই দুর্দ্দান্ত কয়েদীদের জন্য অথবা যাহাদিগকে বিশেষ করিয়া সায়েস্তা করিতে হইবে তাহাদের জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র জেল থাকে, ট্রান্সভালেও ছিল। 'ডায়কলুফ' তেমনি একটা জেল ছিল। সেখানকার জেলার কঠোর। সেখানকার খাটুনী কঠোর। তাহা হইলেও সেখানে যত কয়েদী ধরিতে পারে, তত পাঠানো হইল তাহারা খাটিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু অপমান সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। জেলার তাহাদিগকে অপমান করায় তাহারা উপবাস করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। উপবাসের সর্ত্ত এই ছিল যে, "যে পর্য্যন্ত এই জেলারকে বদলী না করা হয় অথবা আমাদিগকে অন্য জেলে না পাঠানো হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা আহার করিব না।" এই উপবাস বিশুদ্ধভাব হইতে গৃহীত হইয়াছিল। যাহারা উপবাস গ্রহণ করিল তাহাদের মধ্যে লুকাইয়া খাওয়ার লোক কেহ ছিলনা। পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, এই প্রকার উপবাসে আজকাল যেমন

সোরগোল হইয়া থাকে ট্রান্সভালে সে রকম হওয়ার কিছু ছিল না। সেখানকার নিয়মও কঠিন ছিল—এখানকার মত কয়েদীদিগকে দেখিতে যাওয়ার প্রথাও ছিল না। সত্যাগ্রহীরা একবার জেলে প্রবেশ করিলে তাহাদের নিজের উপরেই নির্ভর করিতে হইত। লড়াই ছিল গরীবদের ও লড়াই গরীবি চালেই চলিতেছিল। সেই জন্য এইভাবে প্রতিজ্ঞা লওয়ায় বিপদ খুব ছিল। তাহা হইলেও সত্যাগ্রহীরা দৃঢ় ছিল। সে দিনের তাহাদের সেই উপবাস আজকার উপবাস অপেক্ষা অনেক অধিক স্তুতির যোগ্য। কেননা, তখন উপবাস করার প্রথাই আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা অটল ছিল এবং তাহারা জয় লাভ করে। সাতদিন উপবাস করার পর তাহাদিগকে অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হইল।

অষ্টম অধ্যায়

পুনরায় ডেপুটেশন

এই প্রকারে সত্যাগ্রহীদিগকে জেলে পাঠানো ও নির্ব্বাসন দেওয়া চলিতেছিল। ইহাতে জোয়ার-ভাটাও অবশ্য ছিল। উভয় পক্ষই কতকটা নরম হইয়া পড়িয়াছিল। সরকার দেখিলেন যে, জেলে পাঠাইয়া প্রধান সত্যাগ্রহীদিগকে ঠাণ্ডা করিতে পারিবেন না। নির্ব্বাসন দ্বারা সরকারেরই অপমান বাড়িতেছিল। কতকগুলি মোকদ্দমা করায়, আদালতে সরকারের পক্ষই হারিয়াছিল। এদিকে ভারতীয়েরাও আর বড় ভাল রকম যুদ্ধ দিতে প্রস্তুত ছিল না। পূর্ব্বের ন্যায় সত্যাগ্রহীর সংখ্যাও ছিল না। কতক সত্যাগ্রহী ভীত হইয়া গিয়াছিল, কতক বা হার মানিয়াছিল। এবং যাহারা তখনও যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগকে এই পরাজিত লোকেরা মূর্খ বলিতেছিল। এই মূর্খেরা কিন্তু নিজদিগকেই বিজ্ঞ মনে করিয়া ঈশ্বরের উপর, যুদ্ধের সত্যতার উপর ও নিজের পক্ষের সত্যতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া বসিয়াছিল। তাহারা একথা মানিত যে, অন্তিমে সত্যেরই জয় হইবে।

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতি চঞ্চল আকার ধারণ করিয়াছিল। বোয়ার ও ইংরাজ মিলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত সংস্থা একত্র হইয়া স্বাধীনতা চাহিতেছিল। জেনারেল হার্টযোগ বৃটিশ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। অপরেও বৃটিশদের সহিত কেবল নামমাত্র সম্বন্ধ রাখা পছন্দ করিতেছিলেন। ইংরাজেরাও সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছিন্ন হইতে দেওয়া কখনো সহ্য করিবেন না। যাহা কিছু অধিকার পাওয়ার তাহা

বৃটিশ পার্লামেণ্টের মধ্য দিয়াই পাওয়া দরকার। এই অবস্থায় বোয়ার ও বৃটিশেরা ঠিক করিলেন যে, একটা ডেপুটেশন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিলাতে গিয়া সেখানকার মন্ত্রীমণ্ডলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবে।

ভারতীয়েরা দেখিল যে এখন যে, অবস্থা আছে, যদি ইহার উপর ইউনিয়ন হইয়া সবগুলি গভর্ণমেণ্ট এক হয়, তবে তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইবে। সকল সংস্থাই সর্ব্বদা ভারতীয়দিগের উপর ক্রমশঃই অধিক চাল দিতে ইচ্ছা করিতেছিল। সেই জন্যই এই সকল বিরোধীরা একত্র হয়। ভারতীয়দের উপর আরও অধিকতর অত্যাচার হইবে ইহা ভারতীয়েরা দেখিতে পাইতেছিল। বৃটিশ ও বোয়ার সিংহের গর্জ্জনে ভারতীয় মূষিকের আওয়াজ ডুবিয়া যাইবে, গেলেও তবু ভারতীয়েরা ঠিক করিলেন যে, কোনও চেষ্টাই বাদ দেওয়া নয়। ইঁহারা সেইজন্য এক ডেপুটেশন পাঠানো স্থির করিলেন। এইবার ডেপুটেশনে আমার সহিত পোরবন্দরের মেমন শেঠ হাজী হবিবকে পাঠানো হইয়াছিল। ইঁহার ট্রান্সভালের ব্যবসা অনেক দিনের পুরাতন ছিল। ইঁহার অভিজ্ঞতা খুব ছিল। ইংরাজী শিক্ষা না পাইলেও ইংরাজী, ডচ, জুলু ইত্যাদি ভাষা সহজেই বুঝিতে পারিতেন। সত্যাগ্রহীদিগের উপর ইঁহার সহানুভূতি ছিল কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ সত্যাগ্রহী ছিলেন না। আমরা এই দুই ভাই দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে যে ষ্টীমারে রওনা হইয়াছিলাম, সেই ষ্টীমারেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত রাজনীতিবিৎ মেরিম্যান যাইতেছিলেন। তিনিও ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য যাইতেছিলেন। জেনারেল স্মাটস্ প্রভৃতিও পূর্ব্বে হইতে গিয়া উপস্থিত ছিলেন। নাতালের তরফ হইতে আর একটা আলাদা ভারতীয় ডেপুটেশনও এই সময় গিয়াছিল। তাঁহাদের বিষয় সত্যাগ্রহ ছিল না; নাতালের অন্যান্য অসুবিধার বিষয় ছিল।

এই সময় লর্ড ক্রু উপনিবেশের জন্য মন্ত্রী ছিলেন এবং লর্ড মর্লি ভারতবর্ষের জন্য মন্ত্রী ছিলেন। আমরা অনেকের সহিত দেখা করিলাম। যাহার সহিত দেখা করা যায়, পার্লামেণ্টের এমন কোনও মেম্বর বা সভাপতি কাহারও সহিত দেখা করাই আমরা বাদ দেই নাই। লর্ড এম্পথিল যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই মহাশয় ব্যক্তি মিঃ মেরিম্যান, জেনারেল বোথা প্রভৃতির সহিত দেখা করিতেন এবং একদিন জেনারেল বোথার নিকট হইতে এক সমাচার লইয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন,—"তিনি আপনাদের মনোভাব বুঝিতে পারেন, আপনাদিগের ছোটখাট প্রার্থনা পূরণ করিতে রাজী আছেন, কিন্তু এশিয়াটিক য়্যাক্ট ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নূতন লোক আসার আইন পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত নহেন। আইনের মধ্যে কালাধলায় ভেদ আপনি রদ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু সে ভেদ রদ করিতে তিনি পারেন না। ভেদ রাখাই জেনারেল বোথার স্থির সিদ্ধান্ত, আর যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, তিনি রদ করিতে রাজি হইবেন, তবু দক্ষিণ আফ্রিকার গোরারা তাহা কদাচ সহ্য করিবে না। জেনারেল স্মাট্‌সেরও জেনারেল বোথারই অনুরূপ মত। তাঁহারা উভয়েই বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাই তাঁহাদের অন্তিম সিদ্ধান্ত এবং তাঁহাদের শেষ কথা। ইহা অপেক্ষা বেশী চাহিলে আপনার এবং আপনার সম্প্রদায়েরই দুঃখ হইবে। এক্ষণে আপনি যাহা করিবেন, ইহাঁদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়া করিবেন। জেনারেল বোথা আমাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন এবং আপনাকে আপনার দায়িত্ব বুঝিতে বলিয়াছেন।" এই সমাচার দিয়া লর্ড এম্পথিল বলিলেন—"দেখুন কার্য্যতঃ আপনার সকল প্রার্থনাই জেনারেল বোথা স্বীকার করিতেছেন, আর এই দুনিয়ায় এমনি দেওয়া নেওয়াই চলে। আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবেই না। আমার নিজের পরামর্শ

এ বিষয়ে এই যে, তাঁহাদের কথা আপনি মানিয়া নিন্। যদি আপনার সিদ্ধান্তের উপর লড়িতে হয়, তবে এইটুকু পাইয়া ইহার পর লড়িবেন। আপনারা দুইজনেই এই বিষয়ে বিবেচনা করিবেন, তারপর যাহা উপযুক্ত হয় সেই জবাব দিবেন।”

ইহা শুনিয়া আমি শেঠ হাজি হবিবের দিকে তাকাইলাম। তিনি বলিলেন—“আমার হইয়া আপনি উহাকে বলুন যে, আমি মিটমাট প্রার্থী দলের পক্ষ হইয়া জানাইতেছি যে, আমরা জেনারেল বোথার কথায় স্বীকৃত আছি। তিনি এখন যাহা দিতে চাহিতেছেন তাহাই গ্রহণ করিয়া পরে নীতি লইয়া লড়াই করিলেও চলিবে। এখন আমাদের সম্প্রদায় একেবারে নষ্ট হইবে ইহা আমার ভাল মনে হয় না। যে পক্ষের হইয়া আমি বলিতেছি সেই পক্ষই সংখ্যায় অধিক এবং সেই পক্ষেরই টাকাও অধিক।” আমি এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে তরজমা করিয়া দিলাম এবং পরে আমার দিক হইতে বলিলাম, “আপনি যে কষ্ট করিয়াছেন সে জন্য আমরা উভয়েই আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার সাথী যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। তিনি যে পক্ষ সংখ্যায় ও অর্থে অধিক বলশালী তাহাদের কথাই বলিতেছেন। আমি যাহাদের হইয়া বলিতেছি তাহারা অর্থে গরীব ও সংখ্যার মাপেও কম। কিন্তু তাহারা মরিয়া হইয়াছে। তাহাদের লড়াইটা ব্যবহারিক সুবিধার জন্য এবং নীতির জন্যও বটে। যদি ব্যবহার ও নীতি এই দুইয়ের মধ্যে একটাকে বাদ দিতে হয়, তাহা হইলে তাহারা ব্যবহারিক সুবিধা ত্যাগ করিয়া নীতির জন্যই লড়িবে। জেনারেল বোথার কত শক্তি তাহা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞাকে আমরা উহা হইতেও ভারি মনে করিব। সেই জন্য প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত আমরা নষ্ট পাইতেও রাজি আছি। আমরা ধৈর্য্য ধরিয়া আছি। আমাদের বিশ্বাস আছে,

আমরা আমাদের নির্দ্ধারিত পথেই স্থির থাকিব এবং যে ঈশ্বরের নামে আমরা প্রতিজ্ঞা লইয়াছি তিনিই সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করাইবেন।

আপনার অবস্থা আমি বুঝি। আপনি আমাদের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে যদি মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহীর সহিত আপনি আর সঙ্গ না রাখিতে চাহেন তাহা হইলে আমরা কিছু খারাপ মনে করিব না ও আপনার কৃত উপকার ভুলিব না। আমি আশা করি যে, আমি যে আপনার কথা রাখিতে পারিলাম না সে জন্য আপনি আমাকে মাফ করিবেন। জেনারেল বোথাকে আপনি আমাদের উভয়ের কথাই শুনাইবেন এবং বলিবেন যে, আমরা অল্প সংখ্যক, কিন্তু, আমরা প্রতিজ্ঞায় অটল এবং আমরা আশা রাখি যে, আমাদের দুঃখ সহ্য করার শক্তি অবশেষে তাঁহাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে এবং তাহারা 'এশিয়াটিক য্যাক্ট' রদ করিবেন।"

লর্ড এম্পথিল উত্তর দিলেন :—

"আপনি এমন ভাবিবেন না যে, আমি আপনাদিগকে ত্যাগ করিতেছি। আমাকে সদাচরণই পালন করিতে হইবে। ইংরাজেরা হাতের কাজ এত সহজে ছাড়ে না। আপনাদের যুদ্ধ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনারা শুদ্ধ উপায় গ্রহণ করিয়াই লড়িতেছেন। আমি আপনাদিগকে কেমন করিয়া ছাড়িব? কিন্তু আমার অবস্থাও বুঝিতে পারিতেছেন। দুঃখ ত আপনাদিগকে ভুগিতেই হইবে, কিন্তু কোনও রকমে যদি কিছু মিটমাট হয়, তাহা হইলে তাহাই গ্রহণ করিতে বলা আমার ধর্ম্ম। কিন্তু আপনারা যেরূপ দুঃখ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত, আপনাদিগকে তাহা হইতে আমি কি করিয়া বাধা দিব? আমি ত আপনাদিগকে ধন্যবাদই দিব। আপনাদের কমিটির সভাপতি আমিই থাকিব এবং আমার দ্বারা যতটা হয় সাহায্য করিব। আপনাকে একথাও মনে

রাখিতে হইবে যে, পার্লামেণ্ট সভায় আমি একজন ক্ষুদ্র সভ্য। আমার কথার বিশেষ মূল্য নাই। তাহা হইলেও উহার যে মূল্যই থাকুক, তাহা আপনাদের জন্যই ব্যবহৃত হইবে—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকিবেন।

এই উৎসাহের বাক্য শুনিয়া, আমরা উভয়েই সন্তুষ্ট হইলাম। পাঠকেরা এই কথোপকথনে একটা প্রীতিকর ঘটনা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শেঠ হাজি হবিব ও আমার মধ্যে এত মতভেদ থাকিলেও এত মধুর সম্পর্ক ছিল এবং পরস্পরের প্রতি এত বিশ্বাস ছিল যে, শেঠ হাজি হবিব তাঁহার বিরুদ্ধ মতও আমাকে দিয়া বলাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহার এ বিশ্বাস ছিল যে, আমি তাঁহার কথা ঠিক মত লর্ড এম্পথিলকে বলিব।

এই অধ্যায় শেষ করার পূর্ব্বে আমি একটা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিব। ইংলণ্ডে প্রবাসকালে অনেক ভারতীয় বিপ্লববাদীর সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। 'হিন্দ্ স্বরাজ্য' নামে পুস্তকখানা ফিরিবার সময় 'কিলডোনান ক্যাস্‌ল' নামে জাহাজে বসিয়া লেখা। বহিখানা তারপরেই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজে প্রকাশ করা হইয়াছিল। সেই বিপ্লববাদীদের এবং যাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুরূপ মত পোষণ করিতেন, তাঁহাদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্যই আমি ঐ পুস্তকের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি লর্ড এম্পথিলের সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। ইহার কারণ এই যে, তিনি পাছে একথা মনে না করেন যে, আমি আমার রাজনৈতিক মত গোপন করিয়া তাঁহার নাম ও পরিচয়ের অপব্যবহার করিয়াছি। লর্ড এম্পথিলের সহিত এই আলোচনা আমার মনে স্থায়ী ভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার সহিত দেখা করার সময় করিয়া লইতেন। যদিও তিনি 'হিন্দ্ স্বরাজ্য' পুস্তিকায়

ব্যক্ত রাজনৈতিক মত স্বীকার করিতেন না, তথাপি তিনি শেষ পর্য্যন্ত আমাদের যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব বরাবর ছিল। সত্য কার্য্য করিবেই—এই আদর্শ একজনও যদি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে তবে মতভেদ সত্ত্বেও সকলের সহিত সত্যাগ্রহীর মধুর ব্যবহার অক্ষুণ্ণ থাকে। সত্যাগ্রহের যুদ্ধে জীবন যাপন করাতেই প্রতিদিনের জয়, জয়ের জন্য প্রতীক্ষা করার আবশ্যক নাই।

কাহারও সেবা তুচ্ছ করিতে নাই। সকল সেবাই সত্যাগ্রহীর উদ্দেশ্য-প্রাপ্তির সাহায্য করে। নিতান্ত হীনজনের সেবারও মহৎ মূল্য আছে।

সত্যেরই যখন সর্ব্বদা জয় হইতেছে, তখন যাহা পরাজয় তাহাই জয়, যাহা হইতেছে তাহাই ঠিক হইতেছে।

নবম অধ্যায়

টলষ্টয় ফার্ম—১

এবার বিলাত হইতে কোনও সুসংবাদ লইয়া ফিরিতে পারি নাই। লর্ড এম্পথিলের সহিত আমার কথাবার্ত্তার প্রভাব সম্প্রদায়ের উপর কি হইবে তাহা লইয়া আমার দুশ্চিন্তা ছিল না। আমি জানিতাম যে, সম্প্রদায় শেষ পর্য্যন্ত আমার সহিত দাঁড়াইয়া থাকিবে। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব পরিষ্কার হইয়াছিল। আমি সত্যাগ্রহের ব্যাপকতা ও অলৌকিকতা আরো বেশী করিয়া বুঝিয়াছিলাম বলিয়া আমি শান্ত হইয়া রহিলাম। আমি যে 'হিন্দ্ স্বরাজ্য' বইখানা ফিরিবার পথে লিখিয়াছিলাম, তাহা কেবল সত্যাগ্রহের মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্যই। এই পুস্তকখানা আমার সত্যাগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধার পরিমাপ দিতেছে। আর সেইজন্য কত জন লোক আমার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, সে সংখ্যার জন্য আমার চঞ্চলতা ছিল না।

কিন্তু টাকার জন্য আমার ভাবনা ছিল। দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালাইবার উপযুক্ত অর্থ আমার নিকট নাই—এই দুঃখ আমাকে বিষম ব্যথিত করিতেছিল। আমি তখনও একথা আজিকার মত তত স্পষ্ট করিয়া বুঝি নাই যে, পয়সা ছাড়াই সত্যাগ্রহের লড়াই করা চলে। অনেক সময় টাকা পয়সা সত্যের যুদ্ধকে দূষিত করে এবং ঈশ্বর সত্যাগ্রহীকে ও মুমুক্ষুকে আবশ্যকের অতিরিক্ত পাথেয় দেন না। কিন্তু আমি আস্তিক ছিলাম। ঈশ্বর তখন আমাকে সঙ্গ দিলেন; আমার দুঃখবোধ দূর হইল। একদিক দিয়া যেমন জাহাজ হইতে নামার সঙ্গেই আমাকে বিলাত-

যাত্রার নিষ্ফলতার সংবাদ দিতে হইল, তেমনি টাকার অসুবিধা মিটিয়াছে সে সংবাদও দিতে পারিলাম। কেপটাউনে নামিতেই বিলাত হইতে তার পাইলাম যে, সার রতন টাটা ২৫,০০০৲ টাকা দিয়াছেন। এই ভাবে প্রচুর অর্থ আসিয়া পড়িল। কাজ চলিতে লাগিল।

সত্যাগ্রহের যুদ্ধ হইতেছে সত্যের, আত্মশুদ্ধির, আত্মবলের যুদ্ধ, সেইজন্য যত টাকাই আসুক না কেন তাহা দিয়া এ যুদ্ধ চালানো যায় না। এই যুদ্ধের জন্য চরিত্রবল চাই। গৃহবাসীর পরিত্যক্ত গৃহ যেমন একটা ধ্বংসাবশেষ দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া মনে হয়, চরিত্রহীন মানুষকে তাহার টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও তেমনি মনে হয়। সত্যাগ্রহীরা দেখিতে পাইল যে, লড়াই এখন যে কত দীর্ঘ হইবে তাহার মাপ করা যায় না। কোথায় একদিকে জেনারেল স্মাট্‌স্ ও জেনারেল বোথার প্রতিজ্ঞা যে এক চুলও নড়িবেন না, আর কোথায় অপরদিকে সত্যাগ্রহীর মরণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকার প্রতিজ্ঞা। এ যুদ্ধ ত হাতীর সহিত পিঁপড়ার যুদ্ধের মত। হাতী এক পা ফেলিয়া অসংখ্য পিঁপড়া পিষিয়া ফেলিতে পারে। সত্যাগ্রহীরা এখন যুদ্ধকালের একটা সময়ও আর নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। এক বৎসরই লাগুক্ আর বহু বৎসরই লাগুক্, তাহাদের মনের ভাব একই থাকিবে। তাহাদের ত লড়াই করাতেই জিত। লড়াই করা মানে জেলে যাওয়া, নির্ব্বাসিত হওয়া। ইতিমধ্যে পরিবারের কি অবস্থা হইবে? যে কেবল জেলে যাইবে তাহাকে কে চাকুরী দিবে? জেল হইতে বাহির হইলে নিজেই বা খাইবে কি আর খাওয়াইবেই বা কি? কোথায় থাকিবে, বাড়ী ভাড়াই বা কে দিবে? সুতরাং জীবিকা বিহীন হইয়া সত্যাগ্রহীদিগকে শুকাইয়াই মরিতে হইবে। নিজে ক্ষুধায় মরিয়া, পরিবারকে ক্ষুধায় মারিয়া যুদ্ধ করিবার মত লোক জগতে অনেক নাই।

এ পর্য্যন্ত যাহারা জেলে যাইতেছিল তাহাদের পরিবারের খোরাকীর

টাকা সত্যাগ্রহীরাই যোগাইতেছিল। সকলেই নিজ নিজ আবশ্যকতার অনুরূপ লইত। সকলকে এক সমান দেওয়া হইত না। যাহার পাঁচটি ছেলে-মেয়ে আছে, আর যে ব্রহ্মচারীর কোনই পোষ্য নাই এ দুইজনকে কি এক পংক্তিতে ফেলা যায়? কেবল ব্রহ্মচারী যোদ্ধাও পাওয়া সম্ভব নয়। তবে কি ভাবে সাহায্য দেওয়া যায়? ব্যবস্থা এই ছিল যে, প্রত্যেক পরিবারকে জিজ্ঞাসা করা যে, কত কম হইলে তাহাদের চলে, আর, সেই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া টাকা দান করা। ইহাতে কপটাচারের খুব অবকাশ ছিল। কতকগুলি কপটাচারী লোক এই সুবিধার অপব্যবহার করিয়াছিল। আবার অপরে সৎস্বভাব হইয়াও তাহারা যে চালে থাকিত তদনুরূপ অর্থ প্রত্যাশা করিত। আমি দেখিলাম যে, এই ভাবে দীর্ঘদিন লড়াই চালানো অসম্ভব। যে সাহায্যের যোগ্য তাহার প্রতি অন্যায় হওয়ার এবং যে অযোগ্য তাহার ভণ্ডামী করিয়া বেশী টাকা লওয়ার ভয় ছিল। এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের একটা মাত্র উপায় ছিল, তাহা হইতেছে এই যে, সকল পরিবারকে একত্র রাখা এবং সকলের সঙ্গে থাকিয়া সকলকে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া। ইহাতে কাহারও উপর অন্যায় হওয়ার ভয় ছিল না, কাহারও ফাঁকি দেওযার অবকাশ ছিল না। ইহাতে সাধারণের ব্যয় কম হইবে এবং সত্যাগ্রহীর পরিবারেরা সাদা-সিধা ও নূতন জীবন যাপন করিবার ও সকলের সহিত একত্র বাস করিবার শিক্ষা পাইবে। এই ভাবে বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন ধর্ম্মের ভারত-বাসীরাও একত্র থাকিতে পারিবে।

এক্ষণে যায়গা পাওয়া যায় কোথায়? যদি সহরে থাকার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে মাসিক ভাড়াই এত দিতে হইবে যে, পরিবারকে যে অর্থ দিতে হইত ভাড়াই তাহা হইতে বেশী পড়িয়া যাইবে। সহরে সাদা সিধা ভাবও রাখা যাইবে না। তাহা ছাড়া সহরে এমন যায়গাও পাওয়া যাইবে না

যেখানে অনেকগুলি পরিবার একত্র থাকিয়া কিছু রোজগার করিতে পারিবে।

তাহা হইলেই এমন স্থান ঠিক করিতে হয়, যাহা সহর অপেক্ষা অধিক দূরেও না হয়, অধিক নিকটেও না হয়—এই রকম ধারণা করিলাম। ফিনিক্স ত ছিলই, সেখান হইতে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজখানা চালানো হইত, সেখানে কিছু ক্ষেত খামারের কাজও ছিল ও অন্যান্য কতকগুলি সুবিধাও ছিল। কিন্তু ফিনিক্স ছিল জোহানেসবর্গ হইতে তিন শত মাইল দূরে—ত্রিশ ঘণ্টার রাস্তার ব্যবধান। এতদূর হইতে সেখানে পরিবার লইয়া যাওয়া ও ফেরৎ আনা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। লোকেরও নিজেদের বাড়ী ঘর ছাড়িয়া এতদূর যাইতে প্রস্তুত হওয়ার কথা নয়। আর তাহারা সম্মত হইলেও এতদূরে পরিবার ও জেল হইতে মুক্ত সত্যাগ্রহীকে পাঠানো সম্ভব নহে।

সেইজন্য যায়গা চাই ট্রান্সভালের মধ্যে এবং জোহানেসবর্গের কাছেই। মিঃ কলেনবেকের সহিত পাঠকের পরিচয় হইয়াছে। তাঁহার ৩১০০ বিঘা জমি কেনা ছিল। তিনি তাহাই সত্যগ্রহীদিগকে ব্যবহারের জন্য দিলেন। সে জমিতে ফলের বাগিচা ছিল ও পাঁচ সাত জন লোক থাকিতে পারে এমন ছোট একটা বাড়ী ছিল। জলের ঝরণা ছিল। ষ্টেশন সেখান হইতে মাইলখানেকের পথ ছিল এবং জোহানেসবর্গ ২১ মাইল দূরে ছিল। এই জমির উপর ঘর তুলিয়া পরিবারগুলিকে রাখা স্থির হইল।

দশম অধ্যায়

টলষ্টয় ফার্ম্ম—২

এই তিন হাজার তিন শত বিঘা জমির মধ্যে একটা ছোট পাহাড় ছিল। ফলের বাগিচায় প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু, এপ্রিকট, কুল ইত্যাদি হইত। এত হইত যে, ফলের সময় কেবল উহাই পেট ভরিয়া খাইয়া লোকে থাকিতে পারিত। জলের জন্য একটা ছোট ঝরণা ছিল, সেখান হইতে জল পাওয়া যাইত। থাকার স্থান হইতে ঝরণা প্রায় পাঁচ শত গজ দূরে ছিল। জল বাঁকে করিয়া আনিতে পরিশ্রম হইত

আমরা স্থির করিয়াছিলাম যে, এখানে আমরা চাকর দিয়া বা বেতন-ভোগী লোক দিয়া বাড়ীর কাজই হোক্ আর ঘর বাঁধার কাজই হোক্, কোনও কাজই করাইব না। সেইজন্য পায়খানা সাফ্ হইতে রান্না পর্য্যন্ত সমস্তই নিজেদের হাতেই করিতে হইত। যে সকল পরিবার রাখা হইয়াছিল তাহাদের সহিত প্রথম হইতেই স্থির ছিল যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে আলাদা থাকিতে হইবে। সেইজন্য ঘর গুলিও ভিন্ন স্থানে উঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। দশজন স্ত্রীলোক ও ৬০ জন পুরুষ থাকিতে পারে এমন বাড়ী শীঘ্রই তৈয়ারী করা স্থির হইল। মিঃ কলেনবেকের জন্য একটা আলাদা ঘর ও তাহার সহিত একটা স্কুল করা স্থির হইল। ইহা ছাড়া একটা কারখানায় ছুতারের কাজ, মুচির কাজ প্রভৃতি করারও ব্যবস্থা হইল।

এইস্থানের যাহারা বাসিন্দা তাহাদের দেশ ছিল মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও উত্তর ভারতে। ধর্ম্মে তাহারা ছিল হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খৃষ্টান। প্রায়

চল্লিশজন যুবক, দুই তিনজন বৃদ্ধ, পাঁচজন স্ত্রীলোক ও পঁচিশ ত্রিশজন ছেলেপিলের মধ্যে চার জন বালিকা ছিল।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহাদের এবং অপর লোকেরও মাংসাহারের অভ্যাস ছিল। মিঃ কলেনবেক ও আমার ইচ্ছা ছিল যে, যদি এখানে মাংসাহারের ব্যবস্থা না করা যায় তবে ভাল হয়। কিন্তু যাহাদের মাংস খাইতে বাধে না, যাহারা জন্ম হইতেই উহা খাইতে অভ্যস্ত তাহাদিগকে এখানে থাকা কালে মাংসাহার ত্যাগ করিতে কি করিয়া বলা যায়? আর না বলিলে খরচাই বা কোথা হইতে আসিবে? আবার যাহাদের গো-মাংস খাওয়া অভ্যাস তাহাদিগকে কি তাহাও দিতে হইবে? কতগুলি পাকশালা চালান হইবে? আমার কর্ত্তব্য কি? এই পরিবারদিগকে যখন ভরণপোষণের জন্য অর্থ দিয়াছি তখনই ত মাংসাহারের সাহায্য করিয়াছি। যদি এখন নিয়ম করি যে, মাংসাহারী চাই না তাহা হইলে আমাকে সত্যাগ্রহ যুদ্ধ কেবল নিরামিষাহারী দ্বারাই করাইতে হয়। সে কেমন করিয়া হয়? লড়াই ত ভারতীয় মাত্রেরই করার কথা। আপনার ধর্ম্ম আমি স্পষ্ট দেখিলাম যে, যদি খৃষ্টান ও মুসলমান ভাইয়েরা গোমাংসও চায়, তবে আমার তাহা না দিয়া উপায় নাই। আমি তাহাদিগকে এস্থানে আসিতে নিষেধ করিতে পারি না।

কিন্তু যেখানে প্রেম সেইখানেই ঈশ্বর সহায়। আমি সরলভাবে খৃষ্টান ভগ্নীদের নিকট আমার সঙ্কটের কথা বলিলাম। মুসলমান মা-বাপেরা আমাকে কেবল নিরামিষ পাকশালা রাখার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এখন ভগ্নীদের সহিতই আমার বোঝাপড়ার বাকী ছিল। তাঁহাদের অনেকেরই ছেলে জেলে ছিল। ছেলেদের সম্মতি আমি পাইয়াছিলাম। তাহাদের সহিত আমার এই আলোচনা অনেকবার হইয়াছিল। কিন্তু ভগ্নীদের সহিত এই প্রথমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিলাম। তাঁহাদিগকে

এখানকার গৃহাদির অসুবিধার কথা, খরচার কথা ও আমার আন্তরিক ইচ্ছার কথা সমস্ত বলিলাম। তাঁহাদিগকে একথা বুঝাইয়া দিলাম যে, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে নির্ভয়ে থাকেন যে, তাঁহারা গোমাংস চাহিলে আমি তাহাও দিব। ভগ্নিগণ প্রেমবশতঃ মাংসের আবশ্যক নাই বলিলেন। রান্নার ব্যবস্থা তাঁহাদের হাতেই ফেলিয়া দিলাম। তাঁহাদের সাহায্য করার জন্য আমাদের মধ্য হইতে দুই একজন পুরুষ নির্দ্দিষ্ট রাখিলাম। তাহাদের মধ্যে আমি অবশ্যই একজন ছিলাম। আমার উপস্থিতিতে ছোটখাটো বিসম্বাদ আর উঠিতে পারিত না। রান্নায় সাদা সিধার চূড়ান্ত করা হইয়াছিল। খাওয়ার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। পাকশালা একটাই করা হইয়াছিল। সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন। সকলকেই নিজ নিজ বাসন মাজিয়া লইতে হইত। সাধারণ ব্যবহারের বাসনও পালা করিয়া নিজেদের মধ্যে মাজা স্থির হইল. একথা বলা প্রয়োজন যে, যদিও টলষ্টয় ফার্ম্ম দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল তথাপি ভাই অথবা ভগ্নীদের মধ্যে কেহই মাংসাহার করিতে চান নাই। মদ, তামাক ইত্যাদি ত বন্ধ ছিলই।

আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বাড়ীও নিজেদের হাতেই তৈরী করার আমাদের আগ্রহ ছিল। স্থপতি ত মিঃ কলেনবেকই ছিলেন। তিনি একজন ইউরোপীয় রাজমিস্ত্রী যোগাড় করিলেন। একজন গুজরাটী ছুতার বিনা পয়সায় খাটিয়া দিতে স্বীকৃত হইল এবং সে তাহার সঙ্গে আরো কয়েকজনকে অল্প বেতনে কাজ করিতে সম্মত করাইয়া নিযুক্ত করিল। মজুরের কাজ আমরাই করিতে লাগিয়া গেলাম। আমাদের মধ্যে যাহাদের হাতে পায়ের কুশলতা ছিল তাহারা কাজ করিয়া অবাক্ করিয়া দিল। একজন বিহারী সত্যাগ্রহী একাই ছুতারের অর্দ্ধেক কাজ করিয়া ফেলিত। সাফ্‌সুফ্‌ করার কাজ, সহরে যাওয়ার কাজ, সেখান

হইতে সকল মালপত্র আনার কাজ, সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী থাম্বিনাইডু ঘাড়ে লইয়াছিল।

এই দলে ভাই প্রাগজীও ছিলেন। তিনি জীবনে কখনো এই সব ঝঞ্ঝাট সহ্য করেন নাই। এখানে ছিল শীতের কাঁপুনী, গ্রীষ্মের জ্বালা ও বর্ষার জলে ভেজা। আমরা তাঁবুতেই প্রথমে বাস আরম্ভ করিয়া দিই। যতদিন ঘর তৈরী হইতেছিল, ততদিন লোক তাঁবুতেই শুইত। দুই মাসে ঘর তৈরী হইয়া গেল। ঘরগুলি করুগেটের ছাউনী ছিল সেইজন্য উহা তুলিতে বেশী সময় লাগে নাই। মাপ মতই সমস্ত কাঠ পাওয়া যাইত। তাহাদের কেবল টুকরা করিয়া লওয়াই প্রধান কাজ ছিল। দরজা জানালা বড় বেশী তৈরী করিতে হয় নাই। সেইজন্যই এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি ঘর করা সম্ভবপর হইয়াছিল। মজুরের কাজে ভাই প্রাগজী পুরা হাজিরা দিতেন। ফার্ম্মের কাজে জেলের অপেক্ষা কঠিন খাটুনী ছিল। একদিন ত প্রাগজী ক্লান্তিতে ও গরমে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। কিন্তু প্রাগজী হারিয়া যাওয়ার লোক ছিলেন না। তিনি এইখানেই ভাল করিয়া শরীর গড়িয়া লইলেন এবং অবশেষে খাটুনীতে সকলের সাথে সমান দাঁড়াইয়া গেলেন।

এমনি ছিলেন আমাদের আর একজন মিঃ জোসেফ বায়প্পন। তিনি ব্যারিষ্টার হইলেও ব্যারিষ্টারীর অভিমান ছিল না। তাঁহার দ্বারা বেশী মজুরের কাজ হইত না। ট্রেণ হইতে বোঝা নামানো, গাড়ী বোঝাই করা এ সব কাজ তাঁহার দ্বারা হইত না। তবে তিনি যথাশক্তি কাজ করিতেন। টলষ্টয় ফার্ম্মে দুর্ব্বল যে ছিল সে সবল হইল এবং মজুরী খাটা সকলের পক্ষে স্বাস্থ্যের উন্নতিকারক হইয়াছিল।

সকলকেই কোনও না কোনও কাজে জোহানেসবর্গে যাইতে হইত। ছেলেরা মজা করার জন্য যাইতে চাহিত। আমাকেও কাজের জন্য

যাইতে হইত। নিয়ম এই করা হইল যে, ফার্ম্মের কাজে গেলে সে ট্রেণে যাইতে পারিবে। আর তৃতীয় শ্রেণী ভিন্ন ত টিকিট লওয়াই হইত না। যাহাদের সখ করিয়া সহরে যাওয়ার ইচ্ছা তাহারা হাঁটিয়া যাইবে। যদি এই কঠিন নিয়ম না করা হইত তাহা হইলে জঙ্গলে বাস করিয়া যে পয়সা বাঁচাইতে চাহিয়াছিলাম, রেল ভাড়ায় ও সহরে গিয়া টিফিন খাওয়ার খরচায় সে সমস্ত উড়িয়া যাইত। সহরে যাইতে সঙ্গে ঘরের খাবার লইয়া যাইতে হইত। ঘরের খাবারও ছিল খুবই সাদা সিধা। বাড়ীতে পেষাই করা গমের আটা হইতে বাড়ীতে তৈয়ারী পাঁউরুটী, তাহার উপর কতকটা ঘরে ভাজা চীনা বাদামের মাখন আর নারাঙ্গীর ছালের মোরোব্বা। গম পেষাই করার জন্য একটা হাতে চালানো লোহার জাঁতাকল বসানো হইয়াছিল। চীনা বাদাম ভাজিয়া পিষিয়া লওয়া হইত তাহাই ছিল মাখন। এই মাখনের দাম দুধের মাখনের চার ভাগের এক ভাগ পড়িত। নারাঙ্গী ত ফার্ম্মেই প্রচুর হইত। গাইয়ের দুধ ফার্ম্মে ছিলই না। আমরা আবশ্যক হইলে কৌটার দুধ ব্যবহার করিতাম।

এখন সহরে যাতায়াতের কথা বলি। নিয়ম ছিল যে, যদি কেহ সখের জন্য জোহানেসবর্গ যাইতে ইচ্ছা করে, তবে সে সপ্তাহে একদিন কি দুইদিন পায় হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে পারে। তবে যেদিন যাইবে সেই দিনেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, ফার্ম্ম জোহানেসবর্গ হইতে ২১ মাইল দূরে ছিল। পায় হাঁটিয়া যাওয়ার এই এক নিয়ম হইতেই শত শত টাকা বাঁচিয়া গিয়াছিল। হাঁটিয়া যাওয়ায় লাভও খুব হইত। কতজনের পথ হাঁটার নূতন অভ্যাস হইল। নিয়ম এই ছিল যে, যাহারা যাইবে তাহাদের রাত্রি দুইটায় উঠিয়া আড়াইটায় বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সকলেই ছয় সাত ঘণ্টায় পঁহুছিতে

পারিত। সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে পঁহুছিতে পারা যাইত।

পাঠকেরা মনে করিবেন না যে, এই নিয়ম ভার স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই ভালবাসিয়া এই নিয়ম পালন করিত। জোর করিয়া আমি একজন লোককেও রাখিতে পারিতাম না। সহরে খবরাখবর করিতে যাতায়াতেই হোক্ অথবা ফার্ম্মের ভিতরকার কাজেই হোক্, যুবকেরা হাসিমুখে লাগিয়া যাইত, হল্লা ও কোলাহল করিতে করিতেই কাজ উঠাইয়া দিত। মজুরীর কাজ করার সময় তাহাদিগের দুষ্টামি বন্ধ করা শক্ত হইত। অক্লেশে যতটা কাজ করিতে পারে তাহাই করার নিয়ম করা হইয়াছিল। ইহাতে কাজ কম হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয় না।

পায়খানার কথাটাও বুঝা দরকার। এত বড় বস্তী হইলেও কোথাও আবর্জ্জনা, ময়লা, উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি কাহারো চোখে পড়িত না। সমস্ত আবর্জ্জনাই গর্ত্তে চাপা দেওয়া হইত। কেহ রাস্তায় জল ফেলিতে পারিত না। সমস্ত স্থানের জলই বালতিতে জমিতে দেওয়া হইত ও তাহা লইয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া হইত। উচ্ছিষ্ট ও শাক পাতা যাহা জমিত, তাহা দ্বারা সার হইত। বাড়ীর নিকটেই কোনও স্থানে দেড় ফুট গভীর গর্ত্ত করা হইত! সমস্ত পায়খানার ময়লা উহাতে আনিয়া ফেলা হইত। তাহার উপর পুনরায় খুব চাপিয়া মাটি দিয়া ভরাট করা হইত। উহাতে দুর্গন্ধ মাত্রও হইতে পারিত না। সেখানে মাছি ভন্ ভন্ করিত না এবং ময়লা যে সেখানে পোঁতা হইয়াছে একথা কেহ বলিতেও পারিত না। ইহা হইতে বহুমূল্য সার হইত। যদি আমরা বিষ্ঠা ঠিক মত ব্যবহার করি তবে অনেক লক্ষ টাকার সার বাঁচাইতে পারি, অনেক রোগ হইতেও বাঁচিতে পারি। পায়খানার সম্বন্ধে

আমাদের বদভ্যাসের জন্য আমরা নদীর পবিত্র পার অপবিত্র করি, মাছির উৎপত্তি করাই। মাছি আমাদের অনবধানতা বশতঃ বিষ্ঠা হইতেই উৎপন্ন হইয়া বিষ্ঠাতেই বসে, এবং স্নানাদি করার পর আমাদের পরিচ্ছন্ন দেহে ও কাপড় চোপড়ে সেই মাছিকেই আবার আমরা বসিতে দেই। একটা যদি ছোট কোদালি রাখে তাহা হইলে গৃহস্থ অনেক নোংরা জিনিষ হইতে বাঁচিতে পারে। আমরা চলার পথে ময়লা ফেলি, থুথু ফেলি, নাক ঝাড়ি, এ সকল দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি পাপাচরণ করি। দয়ার অভাবই ইহার কারণ। যে ব্যক্তি জঙ্গলে বাস করে সেও যদি নিজের কৃত থুথু, কফ, বিষ্ঠাদি চাপা না দেয় তবে সে দণ্ডনীয়।

আমাদের কাজ ছিল সত্যাগ্রহী পরিবারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা, এবং খরচা বাঁচানো ও অবশেষে স্বাশ্রয়ী হওয়া। যদি এইরূপ করিতে পারি তবে যতদিন ইচ্ছা আমরা লড়িতে পারিব। আমাদের জুতার জন্য একটা ব্যয় ছিল। গরম দেশে বন্ধ জুতা ব্যবহারে হানিই হয়। পায়ের ঘাম পা-ই আবার শুষিয়া লয়, সেজন্য পায়ের চামড়া নরম হয়। মোজার দরকারই ছিল না। কিন্তু কাঁটা, পাথর ইত্যাদি হইতে পা-কে কোনও রকমে রক্ষা করার আবশ্যকতা আমরা অনুভব করিয়াছিলাম। সেইজন্য আমরা স্যাণ্ডাল তৈরী করা শিক্ষা করিব স্থির করিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রেপিষ্ট নামে রোমান ক্যাথলিক পাদরীদের মঠ আছে। সেখানে এই জুতা তৈরীর কাজ হয়। তাঁহারা জার্ম্মাণ। তাহারই এক মঠ হইতে মিঃ কলেনবেক জুতা তৈরী শিখিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া আমাকে এবং আর একজন সাথীকে শিখাইলেন। এইরূপে কতকগুলি যুবক স্যাণ্ডাল তৈরী করা শিখিয়া গেল। আমরা অতঃপর উহা বন্ধুদিগের মধ্যে বেচিতে আরম্ভ করিলাম। আমার একথা এখানে বলা আবশ্যক যে, আমার অনেক শিষ্যই আমার অপেক্ষা এই কাজে

অধিক দক্ষ ছিল। ছুতারের কাজও শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইল। আমরা একটি গ্রাম বসাইতেছিলাম। আবশ্যকের অন্ত ছিল না, পিঁড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া পেটরা পর্য্যন্ত অনেক ছোট বড় দ্রব্যের আবশ্যক ছিল। আমরা উহা নিজেরাই বানাইয়া লইতে লাগিলাম। প্রথম কয়েক মাস আমাদিগকে অবৈতনিক মিস্ত্রি সাহায্য করিয়াছিল। এই কার্য্যের ভার মিঃ কলেনবেক নিজেই লন। তাঁহার কুশলতা ও নিপুণতার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিক্ষণেই পাইতাম।

যুবক, বালক ও বালিকাদের জন্য পাঠশালা করা অবশ্যই দরকার। এই কাজটাই সকল কাজ অপেক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। শেষ পর্য্যন্তও এই কার্য্য আমরা সম্পূর্ণ ভাবে করিয়া উঠিতে পারি নাই। শিক্ষা দেওয়ার ভার প্রধানতঃ মিঃ কলেনবেক ও আমার উপর পড়িয়াছিল। স্কুল দুপুরে বসিত। আমরা উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়াইতে আসিতাম, স্কুলের ছাত্রেরাও পরিশ্রান্তই থাকিত। ফলে, তাহারাও বার বার ঝিমায়, আমরাও ঝিমাই। চোখে জল দিই, ছেলেদের সহিত খেলা করি, এমনি করিয়া আমরা আমাদের আলস্য জয় করিতাম, কিন্তু কতবার তাহা নিরর্থক হইয়াছে। শরীর যখন আরাম চায় তখন তাহা আদায় করিয়া ছাড়ে। ইহা ত খুব ছোট অসুবিধার কথা বলিলাম। কেননা ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া তবু ত আমরা ক্লাস চালাইতাম। কিন্তু তামিল, তেলেগু ও গুজরাটী—এই তিন ভাষায় যে সকল ছেলেরা কথা বলে তাহাদিগকে কি শিখাইব, কোন রীতিতে শিখাইব? প্রত্যেককে তাহার মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা হইত। তামিল আমি অল্পবিস্তর জানিতাম। কিন্তু তেলেগুর ত অক্ষরের পরিচয়ও ছিল না। এই অবস্থায় এক শিক্ষক কি করিবে? যে সব যুবক ছিল তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে শিক্ষাকার্য্যে লাগাইলাম। এই ব্যবস্থা সফল হইয়াছিল বলা যায় না।

ভাই প্রাগজীকেও কাজে লাগানো হইয়াছিল। যুবকদিগের মধ্যে কয়েক জন খুব দুর্দ্দান্ত ও অলস ছিল। বইএর সহিত তাহাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধ চলিত। এরকম ছেলে শিক্ষককে কি মানে? আবার আমার কার্য্যও অনিয়মিত ছিল! দরকার হইলেই আমাকে জোহানেসবর্গ যাইতে হইত। মিঃ কলেনবেকেরও তেমনি যাইতে হইত। আবার অন্য একটা অসুবিধা ছিল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। মুসলমানদিগকে কোরাণ শিখাইবার লোভ হইত। পার্শীকে আবেস্তা শিখাইবার ইচ্ছা হয়। এক খোজা বালক ছিল তাহার খাস খোজা ধর্ম্মের ছোট বই ছিল। তাহার পিতা উহা শিক্ষা দেওয়ার ভার আমার মাথায় চাপাইয়াছিলেন। আমি মুসলমান ও পার্শী ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তক সংগ্রহ করিলাম। হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্ত্ব যেমন আমি বুঝিয়াছিলাম তাহা লিখিয়া ফেলিলাম। তাহা আমার ছেলেদের জন্য অথবা এই ফার্ম্ম সম্পর্কে লিখিয়াছিলাম, সে কথা আমার স্মরণ নাই। আমার কাছে যদি আজ সেখানা থাকিত তাহা হইলে আমার ধার্ম্মিক মনোভাবের প্রগতির পরিমাপের জন্য তাহা ছাপিয়া ফেলিতাম। কিন্তু এমন অনেক জিনিষ আমি এ জীবনে রাখি নাই—ফেলিয়া দিয়াছি অথবা পোড়াইয়া ফেলিয়াছি। যে সকল বস্তু রক্ষা করার প্রয়োজন আমি কম বোধ করিয়াছি এইভাবে তাহা নষ্ট হইয়াছে, অথবা আমার কর্ম্মক্ষেত্র বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দ্রব্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য আমার মনে অনুতাপ নাই। ঐ ধরণের লেখা ইত্যাদি রাখা আমার কাছে বোঝা ও খরচ বাড়াইবার হেতু হইয়া পড়িত। সেগুলিকে সাবধানে রাখার ব্যবস্থা করার জন্য আলমারি ইত্যাদির আবশ্যক হইত। আমার অপরিগ্রহী আত্মার নিকট ইহা অসহ্য বোধ হইত।

এই ধরণে শিক্ষাদান করা ব্যর্থ হয় নাই। ছেলেদের মধ্যে একের

অন্যের প্রতি অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা দেয় নাই। একে অন্যের ধর্ম্মের প্রতি, আচরণের প্রতি উদারতা দেখাইতে শিখিয়াছিল। সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিল, কর্ম্মঠ হইয়াছিল, এবং আজও সেই বালকদের মধ্যে যাহাদের জীবনযাত্রার সংবাদ আমি রাখি, তাহাদের দেখিয়া একথা মনে হয় যে, টলষ্টয় ফার্ম্মে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিরর্থক হয় নাই।

উহা অসম্পূর্ণ হইলেও সুচিন্তিত ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল। টলষ্টয় ফার্ম্মের অনেক মধুর স্মৃতির মধ্যে এই শিক্ষার পরীক্ষা কম মধুর নয়। কিন্তু সেই সকল স্মৃতির পরিচয় দেওয়ার জন্য আর এক অধ্যায় আবশ্যক।

একাদশ অধ্যায়

টলষ্টয় ফার্ম্ম—৩

এই অধ্যায়ে টলষ্টয় ফার্ম্মের অনেক স্মৃতির সংগ্রহ দেওয়া হইতেছে বলিয়া এগুলি অসংলগ্ন লাগিবে, সেজন্য পাঠকের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

শিক্ষক হিসাবে আমাকে যে ক্লাসে পড়াইতে হইত কোনও শিক্ষকের অদৃষ্টে সে প্রকার ক্লাস জোটে না। এই একই ক্লাসে সাত বৎসরের বালক-বালিকা হইতে বিশ বৎসরের যুবক, আর তের বৎসরের বালিকা পর্য্যন্ত ছিল। কতকগুলি ছেলে এমন ছিল যাহাদিগকে জঙ্গলী বলা যায়, তাহাদের দুর্দ্দান্তপনার ত কথাই নাই।

এই দলের মধ্যে আমি কি শিক্ষা দিব? সকলের স্বভাবের অনুকূল কি করিয়া হওয়া যায়? আর সকলের জন্য আমি কোন্ ভাষায় কথা বলিব? তামিল তেলেগু ছেলেরা তাহাদের মাতৃভাষা অথবা ইংরাজী বুঝে। ইংরাজীতেই তাহাদের সহিত আমার কাজ চালাইতে হইয়াছিল। গুজরাটীদের সহিত গুজরাটীতে ও বাকী সকলের জন্য ইংরাজীতে—এই প্রকার ভাগ করিয়া লইলাম। ব্যবস্থা এই ছিল যে, প্রধানতঃ তাহারা যাহাতে আনন্দ পায় এমন কিছু গল্প করা অথবা পড়িয়া শোনানো। তাহাদিগকে এক সঙ্গে মিশিতে দিয়া মিত্রভাব, সেবাভাব শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা একটা উদ্দেশ্য ছিল। আর কিছু ইতিহাস ভূগোলের সাধারণ জ্ঞান ও একটু লিখিতে শেখানো, এই ছিল কল্পনা। দুই একজনকে শিখানো হইত কিছু গণিত। এই ত ছিল মোটামুটি চালাইয়া লওয়ার ধরণ। প্রার্থনার জন্য কতকগুলি ভজন শিখানো হইত আর তাহাতে তামিল বালকদিগকেও যোগ দিতে প্রলুব্ধ করা হইত।

বালক ও বালিকারা অবাধে মিশিত। টলষ্টয় ফার্ম্মে এই পরীক্ষা আমি খুব বেশী নির্ভয়ে করিয়াছিলাম। তখন যেরূপ অবাধে মিশিতে, একত্র শিক্ষা করিতে দিতাম, আজ সে প্রকার অবাধে মিশিতে ও একত্র শিক্ষা গ্রহণ করিতে দিতে আমার সাহস নাই। আমার মনে হয় যে, তখন আমার মন আজকার দিনের মনের অপেক্ষা অধিক নির্দ্দোষ ছিল। আর একটা কারণ আমার অনভিজ্ঞতাও হইতে পারে। তাহার পর আমি আঘাত পাইয়াছি, আমার দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা হইয়াছে। যাহাদিগকে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহারা দূষিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমার নিজের স্বভাবেরও গভীরতম নিম্নপ্রদেশে আমি বিকার লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি—সেইজন্য আজ ভীরু হইয়া পড়িয়াছি।

আমি যে ঐ চেষ্টা করিয়াছিলাম সেজন্য আমার অনুতাপ বোধ হয় না। আমার আত্মা সাক্ষ্য দিতেছে যে, এই পরীক্ষা দ্বারা খারাপ কিছু হয় নাই। কিন্তু একবার গরম দুধে মুখ পুড়িলে লোকে যেমন ঘোলও ফুঁ দিয়া পান করিয়া থাকে, আমার সেই অবস্থা হইয়াছে।

মানুষ কাহারও কাছ হইতে শ্রদ্ধা অথবা সাহস চুরি করিয়া আনিয়া চালাইতে পারে না। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। টলষ্টয় ফার্ম্মে আমার সাহস ও শ্রদ্ধা পরাকাষ্ঠায় পঁহুছিয়াছিল। আমাকে সেই শ্রদ্ধা ও সেই সাহস ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট মিনতি করিতেছি। কিন্তু তিনি শুনিলে তবে ত? তাঁহার কাছেও আমার মত অসংখ্য ভিখারী আছে। তবে আমার কথা এই যে, ভিখারীও যেমন অসংখ্য তাঁহার কানও তেমনি অসংখ্য। তাঁহার উপর আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রহিয়াছে, যখন আমি যোগ্য হইব তখনই তিনি আমার নিবেদন শুনিবেন, ইহাও জানি।

এইবার আমার পরীক্ষার কথা বলি। যে সব ছোকরা বদমাইস

ছিল, তাহাদিগকে আর নির্ম্মল কিশোরী কন্যাদিগকে একত্র স্নান করিতে পাঠাইতাম। বালকদিগকে সংযম সম্বন্ধে আমি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। আমার সত্যাগ্রহ মতবাদের সঙ্গেও তাহারা খুব পরিচিত ছিল। তাহাদের উপর যে আমার মায়ের মত স্নেহ ছিল তাহা আমি জানিতাম এবং তাহারাও তাহা জানিত। পাঠকদের হয় ত ঝরণার কথা স্মরণ আছে। উহা পাকশালা হইতে দূরে ছিল। সেখানে এইভাবে মিলিতে দিতাম আবার নির্ম্মলতারও আশা রাখিতাম। মায়ের চোখ যেমন কন্যার পিছনে থাকে, আমার চক্ষুও তেমনি মায়েরই মত এই বালিকাদের পিছনে পিছনে ফিরিত।

স্নানের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক সাথে সকল ছেলে ও সকল মেয়ে স্নান করিতে যাইত। একজোটে থাকার মধ্যে যে নিরাপদ ভাব রহিয়াছে তাহা এখানে ছিল। কেহই নিরালা থাকিত না। অনেক দিনই আমি এ সময়ে উপস্থিত থাকিতাম।

খোলা বারান্দায় সকলেই শুইতাম। বালক-বালিকারা আমার আশপাশে পড়িয়া থাকিত। বিছানার মধ্যে মধ্যে ফুট তিনেক করিয়া ফাঁক থাকিত। শয্যা কোন্‌টার পর কোনটা পাতা হইবে তাহা সাবধানতার সঙ্গেই ঠিক করা হইয়াছিল। কিন্তু মন দূষিত হইলে এই সাবধানতায় কি করিবে? এই ছেলে ও মেয়েদের সম্বন্ধে ঈশ্বরই লজ্জা রাখিয়াছিলেন বলিয়া আজ দেখিতে পাইতেছি। বালক ও বালিকারা এমনি নির্দ্দোষভাবে মিশিতে পারে, আমার এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই এই পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মা'বাপের আমার প্রতি অসীম বিশ্বাস ছিল। তাই ঐ প্রকার পরীক্ষা করিতে তাঁহারাও দিয়াছিলেন।

একদিন কোনও বালিকা অথবা বালক আমাকে সংবাদ দিল যে, এক যুবক দুইটি বালিকার সহিত হাসি-মস্করা করিয়াছে। এই সংবাদে

আমি যুবকদিগকে তিরস্কার করিলাম, মন আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। আমি অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট মনে হইল না। আমার ইচ্ছা হইল—দুইটি বালিকার দেহেই এমন কোনও চিহ্ন থাকে, যাহার দ্বারা যুবকেরা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের দিকে কদাচ কুদৃষ্টিতে তাকাইতে নাই এবং বালিকারাও যাহাতে বুঝে যে, তাহাদের পবিত্রতার উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। বিকারগ্রস্ত রাবণ সীতাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই যদিও রাম সে সময় দূরেই ছিলেন। এমন কোনও চিহ্ন কি আমি এই বালিকাদিগকে দিতে পারি না, যাহাতে এই বালিকারা নিজদিগকে সুরক্ষিত মনে করে এবং অপরেও তাহাদের প্রতি নির্ব্বিকার থাকে? রাত্রিটা জাগিয়া কাটিল। প্রাতঃকালে বালিকাদিগকে বুঝাইলাম। তাহারা যেন ভয় না পায় এমনি ভাবে বুঝাইয়া দিলাম যে, তাহাদের ঐ সুন্দর ও লম্বা চুলগুলি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ফার্ম্মে নাপিত ছিল না, ক্ষৌরকার্য্য ও চুল ছাঁটাই একে অপরের করিয়া দিত, ক্ষুর কাঁচি আমার কাছেই থাকিত। প্রথমে বালিকারা বুঝে নাই কিন্তু বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইয়া ফেলিয়াছিলাম। প্রথমে ত আমার কথা তাহারা সহ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু পরে যখন উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিল তখন তাহারা সাহায্য করিয়াছিল। বালিকাদ্বয় উভয়েই উন্নতমনা ছিল। হায়, আজ তাহাদের একজন নাই। কন্যাটি ভারি তেজস্বিনী ছিল। অপরটি বাঁচিয়া আছে, নিজের ঘরসংসার চালাইতেছে। অবশেষে তাহারা দুইজনেই স্বীকৃত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই যে হাত এই লেখনী চালাইতেছে সেই হাতে কাঁচি লইয়া চুলে চালাইয়া দিলাম। পরে ক্লাসে বসিয়া এই কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া সকলকে বুঝাইলাম। ইহার পরিণাম খুব ভাল হইল। আর কখনো মস্করা করার কথা শুনি নাই। ঐ বালিকাদের

কোনও হানি ত হয়ই নাই, তবে লাভ কতটা হইয়াছিল, তাহা ঈশ্বর জানেন। আমি আশা করি, যুবকেরা সে কথা আজও মনে রাখিয়াছে ও তাহাদের দৃষ্টি শুদ্ধ রাখিতেছে।

আমি যে এই পরীক্ষার কথা লিখিতেছি, ইহা কাহারও অনুকরণ করার জন্য নহে। কোনও শিক্ষক যদি ইহা অনুকরণ করিতে যান, তবে তিনি বড় বিপদের আশঙ্কা মাথায় লইয়াই করিবেন। বিশেষ অবস্থায় একজন লোক কতদূর যাইতে পারে তাহা ও সত্যাগ্রহ যুদ্ধের পবিত্রতা দেখাইবার জন্যই আমি এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। এই বিশুদ্ধতাতেই যুদ্ধ বিজয়ের মূল রহিয়াছে। এই প্রকার পরীক্ষার জন্য শিক্ষককে পিতা ও মাতা উভয়ই হইতে হয়, নিজের মাথাটা কাটিয়া ফেলার মত কঠিন এই পরীক্ষা, ইহার জন্য কঠোর তপশ্চর্য্যা আবশ্যক।

এই কার্য্যের প্রভাব সমস্ত ফার্ম্মবাসীর উপর না পড়িয়া থাকিতে পারে না। যত কম খরচে হয় থাকার জন্য পরিচ্ছদের পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করা হয়। সেখানে সহরে সাধারণতঃ পুরুষের পোষাক ইউরোপীয়দের মত ছিল, সত্যাগ্রহীদেরও সেই মত ইউরোপীয় পোষাকই ছিল। ফার্ম্মে এত পরিচ্ছদের আবশ্যক ছিল না। আমরা ত সকলেই মজুর হইয়া গিয়াছিলাম, সেই জন্য পোষাকও ইউরোপীয় মজুরের মত রাখিয়াছিলাম। অর্থাৎ মজুরদের পাত্‌লুন ও মজুরদের সার্ট পরিতাম। এগুলি জেলের অনুকরণে তৈরী করিয়াছিলাম। আসমানী রংএর সস্তা পাত্‌লুন ও সার্ট পাওয়া যাইত, তাহাই সকলে ব্যবহার করিত। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকে ভাল সেলাই জানিতেন। তাঁহারা সেলাই করার সমস্ত কাজের ভার লইলেন।

আমাদের খাদ্য ছিল ভাত, ডাল, তরকারী ও রুটি। কখন কখন ইহার সহিত জাউ। এই ছিল সাধারণ নিয়ম। এই সমস্ত দ্রব্য একই

বাসনে পরিবেশন করা হইত। খাওয়ার বাসন ছিল থালার পরিবর্ত্তে জেলে যেরূপ ব্যবহার হইত সেইরূপ লোহার তাওয়া ও হাতের তৈরী কাঠের চামচ। খোরাক তিনবার দেওয়া হইত। সকালে ছয়টার সময় রুটি ও ঘরে তৈরী কফি, এগারটায় ডাল, ভাত, তরকারি ও সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় জাউ ও রুটি অথবা দুধ ও ঘরের কফি। রাত্রি নয়টায় সকলকেই শুইতে হইত। খাওয়ার পর সন্ধ্যা সাত বা সাড়ে সাতটায় প্রার্থনার নিয়ম ছিল। প্রার্থনায় ভজন হইত। কোনও দিন রামায়ণ, কোনও দিন বা ইসলামের পুস্তক হইতে কিছু পাঠ হইত। ভজন ইংরাজী, হিন্দী ও গুজরাটীতে হইত। কোনও দিন বা তিন ভাষাতেই, কোনও দিন বা এক ভাষাতে হইত।

ফার্ম্মে অনেকেই একাদশী ব্রত পালন করিতেন। শ্যার পি-কে কোতোয়াল এই সময় ফার্ম্মে আসেন, তাঁহার উপবাসাদির ভাল রকম অভ্যাস ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া অনেকেই চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ করিল। এই সময়টা রোজাও আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের মধ্যে মুসলমান যুবক ছিল। আমি তাহাদিগকে 'রোজা' পালন করার জন্য উৎসাহিত করিলাম। উহাই আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। তাহাদের জন্য অতি প্রত্যুষে ও রাত্রিতে ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সন্ধ্যাবেলায় তাহাদের জন্য জাউ ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। তাহারা মাংসাহার করিত না, কেহ খাইতে চাহেও নাই! ইহাদের সহিত সঙ্গ রাখার জন্য আমরাও উপবাস করিয়া সন্ধ্যাবেলা আহার করিতাম। সাধারণ প্রথা অনুসারে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আহার শেষ করা হইত। মুসলমান ছেলেরা সংখ্যায় অল্প ছিল, সেইজন্য অপর সকলে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খাওয়া শেষ করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইবার জন্য তৈরী হইয়া থাকিত। মুসলমান ছেলেরাও এত বিনয়ী হইয়াছিল যে, রোজা রাখিয়াও তাহার জন্য কাহারও কোন

অসুবিধা হইতে দিত না। আবার এদিকে অমুসলমান ছেলেরাও, মুসলমানদের রোজার সময় নিজেদের খাওয়ার সংযম করিতেছিল। ইহাতে সকলের উপরই 'উত্তম' প্রভাব হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান ছেলেদের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া ঝগড়া অথবা বিবাদ একবারও হইয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ নাই। বরঞ্চ ইহার বিপরীত ভাবই আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মে দৃঢ় থাকিয়া একে অপরের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান রক্ষা করিত ও একে অপরকে ধর্ম্ম ক্রিয়া করিতে সাহায্য করিত।

সহর হইতে এত দূরে থাকিয়াও ব্যারামপীড়ার জন্য চিকিৎসার সাধারণ আয়োজন কিছুই ছিল না। এই সময় ছেলেমেয়েদের নিষ্পাপ থাকা সম্বন্ধে আমার যেমন শ্রদ্ধা ছিল, কেবল প্রাকৃতিক উপায়ে পীড়া আরোগ্য করার সম্বন্ধেও তেমনি শ্রদ্ধা ছিল। আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, সাদাসিধা জীবনযাত্রায় অসুখ হইবেই বা কেন, আর যদি হয় তবে তাহা আমিই সারাইতে পারিব। আমি যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছি (আরোগ্য সাধন) উহা সেই সময়কার পরীক্ষার ও শ্রদ্ধার বিবরণ। আমি মনে এই অভিমান রাখিতাম যে, আমাকে পীড়িত হইতেই হইবে না। কেবল জল, মাটি ও উপবাসের প্রয়োগ দ্বারা ও আহারের পরিবর্ত্তন দ্বারা সকল রকম রোগই আরাম করা যায় মনে করিতাম। ফার্ম্মে কোনও একটা রোগেও ঔষধ কিংবা ডাক্তারের আবশ্যক হয় নাই। এক জন সত্তর বৎসরের উত্তর ভারতবাসী বৃদ্ধের হাঁপানি-কাসি কেবল খাদ্যের পরিবর্ত্তন ও জলের প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু এই ভাবে প্রয়োগ করার সাহস আজ হারাইয়া বসিয়াছি। আর, নিজে দুইবার পীড়িত হওয়ায় প্রয়োগ করার অধিকারও হারাইয়া বসিয়াছি বলিয়া মনে করি।

ফার্ম্মের কার্য্য যখন চলিতেছে তখন গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায়

আইসেন। তাঁহার ভ্রমণের কথা অপর অধ্যায়ে বলা হইবে। তবে তখনকার একটা অম্লমধুর স্মৃতি আছে যাহা এখানেই বলিতেছি। আমাদের ফার্ম্মের জীবন যাত্রার ধরণ ত পাঠকেরা জানেন। ফার্ম্মে খাটিয়া বলিয়া কোনও পদার্থ ছিল না। তবে গোখলের জন্য একটা চাহিয়া আনিয়াছিলাম। তাঁহাকে নিরিবিলি থাকিতে দেওয়ার মত কামরাও ছিল না ; বসিতে দেওয়ার মধ্যে স্কুলের বেঞ্চ মাত্র ছিল। এত প্রচুর যেখানে আয়োজন সেখানে দুর্ব্বল শরীর গোখলেকে এই ফার্ম্মে না আনিলে চলে কি করিয়া? তিনিই বা ফার্ম্ম না দেখিয়া থাকেন কি করিয়া? আমার মনে হইয়াছিল যে, এক রাত্রির অসুবিধা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন, আর ষ্টেশন হইতে ফার্ম্ম এই দেড় মাইল রাস্তা বই ত নয়, ইহা হাঁটিয়াই আসিতে পারিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিলাম এবং তিনিও আমার উপর বিশ্বাস বশতঃ বিচার না করিয়া সমস্ত ব্যবস্থাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে সেই দিন আবার বৃষ্টি হইতেছিল। হঠাৎ কোনও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না। এমনি করিয়া প্রেমবশতঃ সেদিন গোখলেকে যে কষ্ট দিয়াছিলাম তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। অভ্যাসের এত পরিবর্ত্তন তাঁহার সহ্য হইল না ; ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইল। তাঁহাকে খাওয়ার জন্য পাকশালায় লইয়া যাইতে পারিলাম না। মিঃ কলেনবেকের ঘরে তাঁহাকে উঠাইয়াছিলাম। সেখানে খাবার লইয়া যাইতে যাইতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তাঁহার জন্য বিশেষ করিয়া আমি 'সুপ' তৈরী করিয়াছিলাম, ভাই কেতোয়াল আটার রুটি করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা গরম গরম খাওয়াইব কি করিয়া? তিনি কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া তাঁহার যে কি কষ্ট হইতেছে এবং আমার মূর্খতা যে কত বড় তাহা বুঝিতে পারিলাম। যখন তিনি দেখিলেন যে,

আমরা সকলেই মাটিতে শুই, কেবল তাঁহার জন্য খাটিয়া আনিয়াছি তখন তিনি খাটিয়া দূর করিয়া দিয়া নিজের বিছানা মাটিতেই করিয়া লইলেন। আমার সে রাত্রি অনুতাপ করিয়া কাটিল। গোখলের এক অভ্যাস ছিল যাহাকে আমি বদভ্যাস বলি। তিনি চাকরের সেবা লইতেন। এ যাত্রায় চাকর লইয়া ঘুরিতে বাহির হন নাই! মিঃ কলেনবেক ও আমি তাঁহার পা টিপিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই তিনি উহাতে স্বীকৃত হইলেন না। আমাদিগকে ত স্পর্শ করিতেই দিলেন না, উপরন্তু কতকটা চটিয়া, কতকটা হাসিয়া বলিলেন—"তোমরা মনে কর যে, দুঃখ ভোগকরার জন্য এক তোমরাই জন্মিয়াছ, আর আমার মত লোকে কেবল তোমাদের সেবার পরিপুষ্ট হইতে জন্মিয়াছে। তোমাদের এই বাড়াবাড়ির শাস্তি আজ পুরা মাত্রায় গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগকে আমাকে স্পর্শ করিতেও দিব না। তোমরা সকলে পায়খানা করার জন্য দূরে যাও আর আমার জন্য কমোডের ব্যবস্থা করিয়াছ এ কেমন কথা? আমার যতই অসুবিধা হোক্, তোমাদের গর্ব্ব ভাঙ্গিব।" বাক্য যেন বজ্রের মত বাহির হইল। কলেনবেক ও আমি মরমে মরিয়া গেলাম। তাঁহার মুখে হাসি ছিল এইটুকু রক্ষা। অর্জ্জুন না জানিয়া কৃষ্ণের প্রতি অনেক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে সকল কি কৃষ্ণ মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন? গোখলেও কেবল আমাদের সেবার ভাবই স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেবা করিতে দেন নাই। তাঁহার মোম্বাসা হইতে লেখা প্রেমপূর্ণ পত্রখানা আমার হৃদয়ে খোদিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন এবং যে সেবা আমরা করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা শেষ পর্য্যন্ত করিতে দেন নাই। কেবল খাওয়া দাওয়া, তাহা আমাদের নিকট হইতে না লইয়া আর কি করিবেন? পরের দিন প্রাতে তিনি না নিজে বিশ্রাম করিলেন, না

আমাদিগকে করিতে দিলেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতা আমরা পুস্তকাকারে ছাপিতে ছিলাম, তিনিই সেইগুলি সংশোধন করিয়া দিলেন। যদি কিছু লিখিতে হয়, তবে পায়চারি করিতে করিতে ভাবিয়া লইয়া পরে লেখাই তাঁহার অভ্যাস ছিল। একখানা ছোটখাট চিঠি লেখার ছিল। আমি ত ভাবিলাম এখনি লিখিয়া ফেলিবেন, কিন্তু তাহা কি হয়। আমি ইহা লইয়া মন্তব্য করিতে গিয়া এই উপদেশ পাইলাম—"আমার জীবনযাত্রার ধরণ তুমি কি করিয়া জানিবে? আমি কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়েও তাড়াতাড়ি করি না। উহা বিবেচনা করিয়া লই, উহার কেন্দ্রগত ভাব স্থির করিয়া লই, উপযুক্ত ভাষা বিবেচনা করি, তাহার পর লিখি। যদি সকলেই এই প্রকার করিত তবে কত সময় বাঁচিয়া যাইত? জনসাধারণও আজ যে অপরিপক্ক লেখাগুলি পড়িতেছে তাহার আঘাত হইতে বাঁচিয়া যাইত।"

যেমন গোখলের সহিত সাক্ষাতের বর্ণনা না দিলে টলষ্টয় ফার্ম্মের কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি মিঃ কলেনবেকের সম্বন্ধেও বলা যায়। মিঃ কলেনবেকের সহিত আমি পূর্ব্বেই পাঠকের পরিচয় করাইয়াছি। কলেনবেক ফার্ম্মের সকলের সহিত মিশিয়া যেমনভাবে একেবারে তাহাদেরই একজন হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যজনক মনে হয়। গোখলে সহজে আকৃষ্ট হওয়ার লোক নহেন। তিনি কলেনবেকের জীবনের মহা পরিবর্ত্তনদ্বারা অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কলেনবেক কথনো কায়িক ক্লেশ সহ্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। কোনও অসুবিধা ভোগ করেন নাই। এমন কি আরামে জীবন যাপন করাই ধর্ম্ম করিয়া লইয়াছিলেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু সুখকর তাহা ভোগ করিতে বাকী রাখেন নাই, ধন-সম্পদ দ্বারা যে জিনিষ পাওয়া যায় নিজের সুখের জন্য তাহা সংগ্রহ না করিয়া ছাড়েন নাই

এই প্রকার লোকের পক্ষে টলষ্টয় ফার্ম্মে বাস করা, সকলের মত শোওয়া-বসা ও খাওয়া-দাওয়া করিয়া সকলের সঙ্গে ওতঃপ্রোত হইয়া যাওয়া যেমন তেমন কথা নহে। আমাদের লোকেরা ইহাতে যেমন আশ্চর্য্য তেমনি আনন্দিত হইয়াছিল। আর, গোরাদের মধ্যে কতজন ত তাঁহাকে মূর্খ অথবা পাগল বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কাহারও কাহারও আবার তাঁহার ত্যাগ করার শক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি সম্মানের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল। কলেনবেক নিজের ত্যাগকে কখনো দুঃখদায়ক মনে করিতেন না। তিনি ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া যত না আনন্দ পাইয়াছিলেন, ত্যাগদ্বারা তাহার অপেক্ষা অধিক আনন্দ ভোগ করিতে-ছিলেন। সরল জীবনের সুখের কথা বর্ণনা করিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন এবং যাঁহারা শুনিতেন, তাঁহাদেরও ক্ষণকালের জন্য এই সুখ ভোগ করার ইচ্ছা হইত। তিনি ছোটবড় সকলের সহিতই এমন ভাবে মিশিতেন যে, তাঁহার ক্ষণকালের জন্য অনুপস্থিতিও লোকে অনুভব করিত। গাছের উপর তাঁহার অত্যন্ত সখ ছিল বলিয়া বাগানের কাজ নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন। আর সেই জন্য প্রতিদিন প্রাতেই তিনি ছেলেদিগকে ও বড়দিগকেও গাছপালার জন্য কাজে লাগাইতেন। তাঁহার এমন সদানন্দ ভাব ছিল যে, তিনি বাগিচার কাজে খুব খাটাইলেও লোকে আনন্দ করিয়া খাটিত। যে দিনই রাত্রি দুইটায় উঠিয়া জোহানেসবর্গ যাওয়ার দল বাহির হইত, মিঃ কলেনবেক সেই দলে থাকিতেনই।

তাঁহার সহিত প্রায়ই ধর্ম্মালোচনা হইত। আমার সহিত অহিংসা, সত্য ও সংযম ছাড়া আর কি কথা আছে? সর্পাদি মারা পাপ—একথা বলায় মিঃ কলেনবেক আমার অন্য ইউরোপীয় মিত্রদেরই মত প্রথমে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পরে ধর্ম্মের দিক হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তই

স্বীকার করিয়া লন। আমার সহিত যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন হইতেই তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন যে, যে কাজ বুদ্ধি সমর্থন করে, সেই অনুযায়ী আচরণ করা উচিত ও তাহাই ধর্ম্ম। আর সেই জন্যই তিনি নিজের জীবনে মহৎ পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্ত মধ্যেই করিতে পারিয়াছিলেন। এখন সাপ মারা যদি অন্যায় হয়, তবে মিঃ কলেনবেকের ত তাহাদের সহিত মিত্রতা করা চাই। প্রথমতঃ বিভিন্ন রকমের সাপের সম্বন্ধে পরিচিত হওয়ার জন্য তিনি সাপের বিষয়ে কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিলেন। তিনি তাহা পড়িয়া বুঝিলেন যে, সকল সাপ বিষাক্ত নয়। আর কতকগুলি ত শস্যাদির উৎপাদনে সহায়ক হয়। তিনি সব রকম সাপ চিনিয়া ফেলিলেন, তারপর ফার্ম্ম হইতে একটা জবরদস্ত অজগর ধরিয়া তাহাকে পুষিতে লাগিলেন। তাহাকে নিজের হাতে খাওয়াইতেন। আমি তাঁহার সহিত ইহা লইয়া মৃদুভাবে যুক্তিতর্ক করিলাম। বলিলাম—"আপনি যদিও বন্ধু-ভাবে উহাকে পালন করিতেছেন, অজগরের কিন্তু সে বোধ নাই, কেন না আপনার প্রীতির সহিত ভয়ও মিশানো রহিয়াছে। উহাকে ছাড়া রাখিয়া উহার সহিত খেলা করার সাহস আপনার বা আমাদের কাহারও নাই। আমরা এই ধরণের মুক্ত সাপের সহিত খেলা করার মত সাহসের ভাবই বিকশিত করিতে চাই। সেইজন্য এই সাপ পোষার মধ্যে যদিও সৎ ইচ্ছা রহিয়াছে কিন্তু ইহাতে হিংসাও আছে। আমাদের ব্যবহার এমন হওয়া চাই যাহা এই অজগরও বুঝিতে পারে। আমরা ত ইহা সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া থাকি যে, প্রাণী মাত্রেই ভয় ও প্রীতি বুঝিতে পারে। আপনি জানিয়াছেন যে, এই সাপ বিষাক্ত নয়। কেবল উহার চালচলন, উহার অভ্যাস ইত্যাদি দেখার জন্যই উহাকে কয়েদ করিয়াছেন। ইহাও একপ্রকার বিলাসিতা। মৈত্রীর সম্পর্ক যেখানে সেখানে এই প্রকার বিলাসের স্থান নাই।"

মিঃ কলেনবেক আমার যুক্তি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু অজগরটাকে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিতেও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। আমি ইহা লইয়া কোনও চাপাচাপি করিলাম না। সাপের রকম সকমে আমি আমোদ পাইতাম, ছেলেরা ত খুবই আনন্দ করিত। উহাকে বিরক্ত করিতে সকলকেই নিষেধ করা হইয়াছিল। কয়েদী নিজেই পলাইবার রাস্তা খুঁজিতেছিল। পিঞ্জরের দরজা খোলাই থাকুক, অথবা কয়েদী নিজেই কোন রকমে খুলিতে পারিয়া থাকুক, যে রকমই হইয়া থাকুক দুই চারদিনের ভিতরেই একদিন প্রাতঃকালে মিঃ কলেনবেক তাঁহার কয়েদী মিত্রের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়া দেখেন যে, মিত্রের পিঞ্জর খালি। মিঃ কলেনবেক খুসী হইলেন—আমিও হইলাম। এই ঘটনার পর হইতে আমাদের মধ্যে সাপের সম্বন্ধে হামেশা আলোচনা হইত। মিঃ কলেনবেক এক গরীব জার্ম্মানকে ফার্ম্মে আনিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি গরীব এবং আতুর ছিল। তাহার কুঁজ এত বড় হইয়াছিল যে, লাঠির সাহায্য ছাড়া চলিতে পারিত না। তাহার সাহসের অন্ত ছিল না। সে শিক্ষিত ছিল বলিয়া সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনায় আনন্দ পাইত। ফার্ম্মে সে ভারতীয়দের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিত। সে নির্ভয়ে সাপের সহিত খেলিতে আরম্ভ করিল। সাপের ছানা হাতে করিয়া আনিত ও হাতের উপর রাখিয়া উহাকে লইয়া খেলাইত! ফার্ম্ম যদি দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকিত তাহা হইলে এই আলবার্টের এই পরীক্ষার কি পরিণাম হইত ঈশ্বর জানেন। সাপ লইয়া এই প্রকার খেলা করার ফলে সাপের ভয় কমিয়া গেলেও কেহ মনে করিবেন না যে, ফার্ম্মে কাহারও সাপের ভয় আর ছিল না অথবা সর্পাদি মারা সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। এই জিনিষটা করা পাপ এই বোধ এক জিনিষ, আর সেই অনুযায়ী আচরণ করা অন্য জিনিষ। যাহার ভিতর সাপের ভয় আছে ও যে সাপের হাতে

মরিতে প্রস্তুত নয় সে সঙ্কটে পড়িলে সাপকে না মারিয়া ছাড়িবে না। এইরূপ এক ঘটনা ফার্ম্মে ঘটে। আমার তাহা স্মরণ আছে। পাঠকগণ হয় ত কল্পনা করিয়া লইয়াছেন যে, ফার্ম্মে সাপের উপদ্রব খুব ছিলই। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন এই ফার্ম্মে কোনও বসতি ছিল না। কিছুদিন হইতে স্থানটা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। একদিন মিঃ কলেনবেকের ঘরে এমন যায়গায় একটা সাপ দেখা গেল সেখান হইতে উহাকে তাড়ানো বা ধরা অসম্ভব। ফার্ম্মের এক ছাত্র উহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। আমাকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, এখন কি করা যায়? সে মারিয়া ফেলার হুকুম চাহিল। হুকুম না পাইলেও সাপ মারিতে পারিত, কিন্তু সাধারণতঃ এই ধরণের কাজ ছেলেরা কি অপরে আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া করিত না। মারিবার হুকুম দেওয়াই আমি ধর্ম্ম জ্ঞান করিলাম ও মারিতে হুকুম দিলাম। আজ একথা লেখার সময়েও ইহা আমার মনে হইতেছে না যে, কিছু অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছিল। সাপটাকে ধরার অথবা ফার্ম্মের লোককে নির্ভয় করার শক্তি আমার ছিল না এবং আজ পর্য্যন্তও তাহা লাভ করিতে পারি নাই।

পাঠকেরা সহজেই বুঝিবেন যে, ফার্ম্মে সত্যাগ্রহী কখনো বেশী, কখনো কম থাকিত। জেলে যাইতে প্রস্তুত অথবা জেল হইতে আসিয়াছে এমন কেহ না কেহ থাকিতই। এক্ষণে একদিন এই রকম দুইজন ছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট যাহাদিগকে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজ মুচলিকাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরের দিন দণ্ডের আদেশ লওয়ার জন্য তাহাদের উপস্থিত হওয়ার কথা। কথা বলিতে বলিতে শেষ ট্রেণের সময় হইয়া গেল এবং তখন গিয়া আর ট্রেণ ধরা যাইবে কি না সন্দেহ। তাহারা দুইজনেই যুবক ছিল ও ব্যায়াম-কুশল ছিল। তাহারা দৌড়িতে লাগিল ও আমরা কয়েকজন তাহাদিগকে উঠাইয়া দিয়া আসার জন্য সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিলাম।

রাস্তাতেই ট্রেণ আসার সিটি শুনিলাম। যখন ট্রেণ ছাড়ার সিটি পড়িল তখন আমারা ষ্টেশনের বাহিরে পহুঁছিয়াছি। ঐ দুই ভাই ত খুব জোর দৌড়াইতে লাগিল, আমরা পিছনে পড়িয়া গেলাম। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। এই দুইজনকে দৌড়াইতে দেখিয়া ষ্টেশন মাষ্টার চল্‌তি ট্রেণ থামাইয়া সেই দুইজনকে উঠাইয়া দিলেন। আমি পঁহুছিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। এই ঘটনায় দুইটা বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। এক হইতেছে, সত্যাগ্রহীদের জেলে যাওয়ার ও নিজেদের কথা রাখার আগ্রহ ; আর স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত সত্যাগ্রহীদের প্রতিষ্ঠিত মধুর সম্পর্ক। এই যুবকেরা এই ট্রেণ না ধরিতে পারিলে পরদিন কোর্টে উপস্থিত হইতে পারিত না। তাহাদের অন্য কোনও জামিন ছিল না ; তাহাদিগকে কোর্টে টাকাও জমা রাখিতে হয় নাই। তাহাদের ভদ্রতার উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সত্যাগ্রহীর চরিত্র সম্বন্ধে এমনি খ্যাতি রটিয়াছিল যে, তাহারা জেলে যাইতে উৎসুক বলিয়া কোর্টের আমলারাও তাহাদের জামিন চাহিত না। এই কারণেই ঐ যুবকদের ট্রেণ ফেল করার এত ভয় হইয়াছিল। সেইজন্যই তাহারা বায়ুবেগে দৌড়াইতেছিল। সত্যাগ্রহের প্রথম দিকটায় আমলাদের কতকটা ত্রাস হইয়াছিল বলা যায়। জেলের আমলারা কোনও কোনও স্থানে অতিশয় কড়া হইয়াছিল সত্য কিন্তু যেমন যুদ্ধ বাড়িয়া যাইতেছিল তেমনি আমরাও দেখিতেছিলাম যে, আমলাদের কড়া ভাব ক্রমশঃ কমিতেছে এবং কতকটা মধুর সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অধিকদিনের সংস্পর্শ হইলে এই ষ্টেশন মাষ্টারের মত তাঁহারাও সাহায্য করিতেছিলেন। ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, সত্যাগ্রহীরা কোনও প্রকার ঘুষ দিয়া আমলাদের নিকট হইতে সুবিধা গ্রহণ করিতেছিল। অন্যায় করিয়া কোনও সুবিধা পাওয়ার ধারণা সত্যাগ্রহীদের মনেও ছিল না? কিন্তু ভদ্রতা কে না গ্রহণ করিতে চায়? আর এই

ভদ্র ব্যবহার সত্যাগ্রহীরা অনেক স্থানেই পাইয়াছে। ষ্টেশন মাষ্টার যদি অভদ্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে, তবে আইনের ভিতর থাকিয়াও খুব জ্বালাতন করিতে পারেন; এই প্রকার জ্বালাতনের প্রতিবাদ করিয়াও কোনও প্রতিকার হইতে পারে না, আর যদি লোক ভাল হয়, তবে আইন পালন করিয়াও অনেক সুবিধা দিতে পারে। এই রকম সকল সুবিধাই আমাদের ফার্ম্মের নিকটস্থ ষ্টেশনের মাষ্টার মিঃ ললীর নিকট হইতে পাওয়া যাইত। আর তাহার হেতু হইতেছে,—সত্যাগ্রহীদের বিবেক, তাহাদের ধৈর্য্য, তাহাদের দুঃখ সহ্য করার শক্তি।

একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এখানে লেখার অযোগ্য নয় বলিয়া মনে করি। আজ প্রায় ৩৫ বৎসর হইল ধার্ম্মিক, আর্থিক ও স্বাস্থ্যের দিক হইতে আমার খাদ্য সংস্কার ও পরীক্ষা করার সখ চলিতেছে। এই সখে এখনও মন্দা পড়ে নাই। এই পরীক্ষার প্রভাব আমার নিকটে যাহারা থাকে তাহাদের উপরও পড়ে। এই খাদ্য পরীক্ষা ব্যতীত বিনা ঔষধে কেবল স্বাভাবিক চিকিৎসা—জল ও মাটির সাহায্যে চিকিৎসা করার পরীক্ষাও আমি করিতাম। যখন ওকালতী করিতাম তখন মক্কেলদের সঙ্গেও আমার পারিবারিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিত। তাহারাও আমাকে তাহাদের সুখ দুঃখের ভাগী করিয়াছিল। চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার পরীক্ষার সহিত পরিচিত হইয়া কেহ কেহ আমার পরামর্শ লইত। এই প্রকার সাহায্য লওয়ার জন্য কেহ কেহ টলষ্টয় ফার্ম্মেও আসিতেন। ইহাদের মধ্যে লুটাবন নামে উত্তর ভারতবাসী আমার এক পুরাণো মক্কেল ছিল। সে প্রথম গিরমিটিয়াদের সহিত আসিয়াছিল। তাহার বয়স ৭০এর উপর ছিল। অনেক দিন হইতে তাহার পুরাতন হাপানি ও কাসি ছিল। বৈদ্যের বড়ি ও ডাক্তারের বোতলের সেবা সে অনেকদিন করিয়াছিল। এই সময় আমার ঔষধের ব্যবহার

সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসের অন্ত ছিল না। যদি সে আমার সমস্ত নির্দ্দেশ পালন করে ও ফার্ম্মে বাস করে, তবে তাহার উপর পরীক্ষা করিব বলিয়া স্বীকার করিলাম। তাহাকে ঔষধ দিব একথা কি করিয়া বলা যায়। সে আমার সর্ত্ত স্বীকার করিল। লুটাবনের তামাক খাওয়ার বিষম অভ্যাস ছিল। অন্য সর্ত্তের মধ্যে তামাক ছাড়িতে হইবে বলিয়াও একটা সর্ত্ত ছিল। লুটাবনকে একদিনের উপবাস করাইলাম। প্রতিদিন বারোটায় আমি তাহাকে রৌদ্র-স্নান করাইতে লাগিলাম। তখন রৌদ্রের তেজ ছিল না। অল্প ভাত ও জলপাইয়ের তেল খাইতে দিলাম। তাহার সহিত মধু, আবার কখনো জাউ ও মিঠা নারাঙ্গী বা আঙ্গুর, কিছু ঘরের তৈরী কফি দেওয়া হইত। লবণ ও মসলা একেবারেই বাদ দেওয়া হইয়াছিল। যে ঘরে আমি শুইতাম সেইঘরের ভিতরে লুটাবনেরও বিছানা হইত। বিছানার জন্য প্রত্যেককে দুইখানা করিয়া কম্বল দেওয়া হইয়াছিল—একখানা পাতার জন্য ও একখানা গায় দেওয়ার জন্য। আর একখানা কাঠের পিঁড়ি বালিশ রূপে ব্যবহৃত হইত। এক সপ্তাহ কাটিল, লুটাবনের শরীরে কতকটা শক্তি আসিল। হাঁপ্ কম হইত ; কাসিও কমিয়াছিল। কিন্তু রাত্রিতে হাঁপ ও কাসি দুই-ই বাড়িত। আমার তামাকের উপর সন্দেহ হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করায় লুটাবন বলিল "আমি খাই না"। দুই একদিন গেল। কমিল না দেখিয়া আমি গোপনে লুটাবনের উপর লক্ষ্য রাখিব স্থির করিলাম। সকলেই মাটির উপর শুইত। সাপের ভয় ছিল বলিয়া মিঃ কলেনবেক আমাকে একটা টর্চ লাইট দিয়াছিলেন, নিজেও একটা রাখিয়াছিলেন। উহা পার্শ্বে রাখিয়াই আমি শুইতাম। এক রাত্রি শয্যায় শুইয়া আমি জাগিয়া থাকা স্থির করিলাম। দরজার বাহিরে বারান্দায় আমার বিছানা, আর দরজার ভিতরেই লুটাবনের বিছানা। দুপুর রাত্রিতে লুটাবনের

কাসি উঠিল। সে দেশলাই জ্বালাইয়া বিড়ি খাইতে আরম্ভ করিল। আমি ধীরে ধীরে তাহার শয্যার নিকট গিয়া টর্চ জ্বালাইয়া ধরিলাম। লুটাবন ভয় পাইল, ব্যাপার বুঝিল, বিড়ি ফেলিয়া উঠিয়া বসিল, আমার পায় পড়িল। "আমি বড় অপরাধ করিয়াছি, আর কখনো তামাকু খাইব না, আমি আপনাকে ঠকাইয়াছি। আমাকে মাপ করুন"—এই বলিতে বলিতে লুটাবন ফোঁপাইতে লাগিল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম ও বুঝাইলাম যে, বিড়ি না খাইলে তাহারই ভাল। আমার হিসাব মত তাহার কাসি সারিয়া যাওয়ার কথা; কেন সারে নাই সে সন্দেহ মিটিল। লুটাবন বিড়ি ছাড়িল, আর সঙ্গে সঙ্গে দুই তিন দিনেই তাহার কাসিও নরম পড়িল। একমাসের মধ্যে দুই-ই বন্ধ হইল। লুটাবনের শরীরে খুব শক্তি হইল, সে বিদায় চাহিল। ষ্টেশন মাষ্টারের ছিল একটি দুই বছরের ছেলে। তাহার টাইফয়েড হইয়াছিল। তিনি আমার চিকিৎসার কথা শুনিয়াছিলেন। আমার পরামর্শ চাহিলেন। প্রথমদিন আমি কিছুই খাইতে দিলাম না। দ্বিতীয় দিন খাইতে দিলাম মাত্র অর্দ্ধেকটা কলা বেশ্ করিয়া মাড়িয়া তাহাতে আধ চামচ অলিভ অয়েল ও একটু লেবুর রস, আর কিছু না। ছেলেটির পেটে রাত্রিতে মাটির পুলটিশ বাঁধিয়া দিলাম। ইহাতেই সে আরাম হইয়া গেল। কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, ডাক্তারের রোগ নির্ণয়ে ভুল ছিল, উহা টাইফয়েড জ্বর ছিল না।

এই রকম অনেক পরীক্ষা ফার্ম্মে হইয়াছিল। কোনও একটা নিষ্ফল হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। কিন্তু আজ এই ধরণের চিকিৎসা করার সাহস আমার নাই। টাইফয়েড রোগীকে অলিভ অয়েল ও কলা দেওয়ার কথায় এখন কম্প উপস্থিত হয়। ১৯১৮ সালে আমার আমাশয় হয়, আমি তাহা সারাইতে পারি নাই। আজও আমি বুঝিতে

পারিতেছি না যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে চিকিৎসায় উপকার হইত এখানে তাহা সফল হয় না কেন?—ইহার হেতু আমারই আত্মবিশ্বাসের অল্পতা না এখানকার আবহাওয়া ঐ চিকিৎসার উপযুক্ত নয়? অন্ততঃ ইহা আমি জানি যে, এই ধরণের ঘরাও চিকিৎসার ফলে ও টলষ্টয় ফার্ম্মে যে সাদাসিধা জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহার ফলে আর কিছু না হোক্ দুই তিন লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গিয়াছিল। বাসিন্দাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সত্যাগ্রহীরা বিশুদ্ধ আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছিল, অসদাচরণ ও দাম্ভিকতার পথ বন্ধ হইয়াছিল এবং ভাল ও মন্দ পৃথক করা গিয়াছিল।

উপরের কাহিনীগুলিতে যে খাদ্য সম্বন্ধে পরীক্ষার কথা বলা হইল তাহা কেবল স্বাস্থ্যের দিক হইতেই করা হইয়াছিল, কিন্তু এই ফার্ম্মেই আমি নিজের উপর এক অত্যন্ত গুরু পরীক্ষা করিলাম। উহা কেবল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেই করা হইয়াছিল।

নিরামিষাহারী হিসাবে আমাদের দুধ খাওয়ার অধিকার কতটা আছে, অথবা নাই এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়াছিলাম, আর অনেক পড়িয়াও ছিলাম। এই ফার্ম্মে থাকার সময় আমার হাতে কোনও পুস্তক অথবা সংবাদপত্র আসিয়া পড়ে। তাহাতে দেখিলাম যে, কলিকাতায় গো-মহিষকে নিঃশেষে দোহন করা হয়। উহাতে 'ফুকা' নামক সাংঘাতিক ও ভয়ানক প্রক্রিয়ার বর্ণনা ছিল। এক সময় মিঃ কলেনবেকের সহিত দুধ খাওয়ার আবশ্যকতা বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে আমি উক্ত প্রসঙ্গও উত্থাপন করি। দুধ ত্যাগ করার দ্বারা অন্য আধ্যাত্মিক লাভেরও বর্ণনা করি। যদি দুধ ত্যাগ করা যায় তবে ভাল হয়, একথাও বলি। মিঃ কলেনবেক অত্যন্ত সাহসী ছিলেন বলিয়া দুধ ছাড়ার পরীক্ষা করিতে তখন হইতেই প্রস্তুত হইলেন। আমার কথা তাঁহার খুব ভাল

লাগিয়াছিল। সেই দিনই আমরা দুই জনে দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিলাম এবং আমরা দুই জনেই মাত্র শুষ্ক ফল ও টাটকা ফলের উপর নির্ভর করিতে লাগিলাম। রান্নাকরা জিনিষ খাওয়াও বন্ধ করিলাম। কেমন করিয়া এই পরীক্ষার শেষ হইয়াছিল সে কথা বলার স্থান ইহা নয়, তবে এইটুকুমাত্র জানাইতেছি যে, কেবল ফলাহার করিয়া ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ছিলাম এবং সে সময় মধ্যে কোনও দুর্ব্বলতা অথবা কোনও ব্যাধি ভোগ করি নাই। এই সময়টাতে আমার শারীরিক কার্য্য করার শক্তি সম্পূর্ণ ছিল। এমন শরীর ছিল যে, একদিনে পায় হাটিয়া ৫১ মাইল গিয়াছিলাম। ৪০ মাইল দিনে চলা ত সোজা জিনিষ হইয়া পড়িয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই পরীক্ষার আধ্যাত্মিক পরিণাম খুব ভালই হইয়াছিল। এই পরীক্ষা কতকটা ত্যাগ করিতে হইয়াছে বলিয়া আমার মনে একটা দুঃখ রহিয়াছে। আজ রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টায় যতটা ঢুকিয়া পড়িয়াছি তাহা হইতে যদি মুক্তি পাই, তবে পুনরায় এই বয়সে ও এই শরীরে, বিপদের আশঙ্কা লইয়াও এই আধ্যাত্মিক পরীক্ষা আবার আরম্ভ করিয়া দিই। ডাক্তার ও বৈদ্যদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি না থাকায় আমার পরীক্ষায় তাঁহারা বিঘ্ন-স্বরূপ হইয়াছিলেন।

এক্ষণে এই মধুর অথচ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতির বিষয় লেখা শেষ করিতে হয়। এই রকম বিপদজনক পরীক্ষা কেবল আত্মশুদ্ধির যুদ্ধের জন্যই করা যাইতে পারে। সত্যাগ্রহের অন্তিম যুদ্ধের জন্য টলষ্টয় ফার্ম্ম এক আধ্যাত্মিক শুদ্ধি ও তপশ্চর্য্যার স্থান হইয়া পড়িয়াছিল। যদি এই রূপ স্থান না পাওয়া যাইত, অথবা না গড়িয়া উঠিত, তবে আট বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে পারিত কিনা, বেশী করিয়া অর্থ পাওয়া যাইত কিনা, আর শেষ দিকে যে হাজার হাজার লোক যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল তাহারা যোগ দিত কিনা, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। টলষ্টয়

ফার্ম্মকে লোকের কাছে জাহির করা হইত না। তাহা হইলেও, যে জিনিষ লোকের অনুগ্রহের পাত্র সে জিনিষ অনুগ্রহের ভাব জাগ্রত করিয়াছিল। যাহা নিজে করিতে প্রস্তুত নহে, করিতে দুঃখ বোধ করে, সেই কাজ ফার্ম্মবাসীরা করিতেছিল, লোকে ইহা স্বীকার করিত। ১৯১৩ সালে যে বৃহত্তর ভিত্তির উপর লড়াই চলিয়াছিল তাহাতে এই ফার্ম্মের কাজের জন্য ইহার উপর লোকের বিশ্বাস একটা বড় সম্পদ হইয়াছিল। এই প্রকার সত্য সম্পদের পুরস্কারের হিসাব দেওয়া যায় না; সত্য সম্পদের পুরস্কার কখন্ পাওয়া যায় বলা যায় না, কিন্তু পাওয়া যে যায়ই সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেহ যেন সেবিষয়ে সন্দেহ না করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

গোখলের প্রবাস

এই ভাবে টলষ্টয় ফার্ম্মে সত্যাগ্রহীরা জীবন যাপন করিতেছিল এবং অদৃষ্টে যাহাই থাকুক তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কবে যে যুদ্ধ শেষ হইবে তাহা তাহারা জানিত না, তাহাদের সে চিন্তাও ছিল না। তাহাদের একমাত্র প্রতিজ্ঞা ছিল যে, এই এশিয়াটিক আইনের বশীভূত হইবে না এবং তাহার জন্য যে দুঃখ সহিতে হয়, তাহা সহিবে। এই যোদ্ধাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করাই ছিল জয়, কেননা যুদ্ধ করিতেই ছিল তাহাদের আনন্দ। যুদ্ধ করা তাহাদের হাতেই ছিল; কাজেই জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ তাহাদের নিজের উপরই নির্ভর করিত। একথাও বলা যায় যে, সত্যাগ্রহীর অভিধানে দুঃখ অথবা পরাজয় বলিয়া কোনও বস্তু নাই। গীতার কথায় বলা যায়, তাহার নিকট সুখ-দুঃখ, হার-জিত সমান।

এখানে সেখানে দুই একজন সত্যাগ্রহী জেলে যাইত। কিন্তু যখন জেলে যাওয়ার দরকার হইত না তখন বাহির হইতে ফার্ম্মকে দেখিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না যে, এখানে সত্যাগ্রহীরা থাকে, অথবা তাহারা যুদ্ধের জন্য তৈরী হইতেছে। এই অবস্থায় কোনও অবিশ্বাসী যদি এখানে আসিতেন এবং তিনি যদি মিত্র হইতেন তবে আমাদিগকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখিতেন, আর যদি কোনও সমালোচক আসিতেন তবে নিন্দা করিতেন। বলিতেন "আলস্য লাগিয়াছে তাই এই জঙ্গলে পড়িয়া পড়িয়া রুটি খাই-তেছে, জেলের ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছে, আর সেই জন্য এই সুন্দর ফল

বাগিচায় বসিয়া সহরের ঝঞ্ঝাট হইতে বিদায় লইয়া ছুটি ভোগ করিতেছে।" এই সমালোচকদিগকে কেমন করিয়া বুঝানো যাইবে যে, সত্যাগ্রহী অন্যায় করিয়া জেলে যাইতে পারে না, কে বুঝাইবে যে, সত্যাগ্রহীর শান্তি, সত্যাগ্রহীর সংযমের অর্থই লড়াইয়েরজন্য প্রস্তুত হওয়া। এই সমালোচকদিগকে কে বুঝাইবে যে, সত্যাগ্রহী মানুষের সাহায্যের ভাবনা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের আশ্রয়ই গ্রহণ করিয়া আছে। ফলে কিন্তু যাহা কেহ ভাবে নাই, এমন ঘটনা ঘটিয়াছিল, অথবা ঈশ্বর ঘটাইয়াছিলেন। অপ্রত্যাশিত পরীক্ষা আসিয়াছিল এবং বাহিরের দর্শকও দেখিতে পারে এমন বিজয়লাভ হইয়াছিল।

গোখলে ও অন্যান্য নেতাদিগকে আমি অনুনয় করিতেছিলাম যে, তাঁহারা যেন দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া ভারতবাসীর অবস্থা দেখেন। কিন্তু কেহ আসিবেন কিনা সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ ছিল। মিঃ রিচ কোনও নেতাকে পাঠাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু যে সময় লড়াই একেবারে মন্দা পড়িয়া গিয়াছে সে সময় আসার গরজ কে করিবে? ১৯১১ সালে গোখলে বিলাতে ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াইয়ের বিষয়টা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। বড় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় নাতালে গিরমিটিয়া পাঠানো বন্ধ করার জন্য এক আইন প্রণয়নের প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। উহা পাশও হইয়াছিল। তাঁহার সহিত আমার পত্র ব্যবহার চলিতেছিল। ভারত-সেক্রেটারীর সহিতও তিনি কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া জানিয়া লওয়ার কথাও তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। সেক্রেটারী তাঁহার আসার কথা অনুমোদন করিলেন। গোখলে ছয় সপ্তাহ দক্ষিণ আফ্রিকায় সফরের ব্যবস্থা করিতে আমাকে লিখিলেন

এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করার সর্ব্বাপেক্ষা শেষের তারিখ জানাইয়া দিলেন। আমার আনন্দের অন্ত রহিল না। এপর্য্যন্ত কোনও নেতাই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ করিতে আসেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা কেন, কোনও উপনিবেশেই ভারতবাসীদের অবস্থা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুসন্ধান করার জন্য কেহ যান নাই। এই অবস্থায় আমরা সকলেই গোখলের মত মহান নেতার আগমনের সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম। আমরা ঠিক করিলাম যে, গোখলেকে এমন সম্মান দেখাইব যাহা রাজার ভাগ্যেও জোটে না। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান সহর-গুলিতে তাঁহাকে লইয়া যাইব বলিয়া স্থির করিলাম। সত্যাগ্রহীরা ও অন্য ভারতীয়েরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য লাগিয়া গেল। এই অভ্যর্থনায় গোরাদিগকেও যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিলাম এবং প্রায় সকল স্থানেই তাঁহারা যোগ দিলেন। যেখানে যেখানে সাধারণ সভা হইবে, সেখানকার মেয়র যদি সম্মত হন তবে তাঁহাকেই সভাপতি করা স্থির করিলাম। যেখানে যেখানে টাউন হল পাওয়া যায় সেখানে টাউন হলেই সভা করার ব্যবস্থা করিলাম। প্রধান ষ্টেশনগুলিকে রেলওয়ের সম্মতি লইয়া সাজাইবার ভার লইলাম। অনেক ষ্টেশনেই এই ভাবে সাজাইবার অনুমতি পাওয়া গেল, কিন্তু সাধারণতঃ এ প্রকার অনুমতি পাওয়া যায় না। অভ্যর্থনা করার জন্য এই যে ধুম ধামের সহিত আয়োজন হইতেছিল, ইহার প্রভাব কর্ত্তৃপক্ষের উপরেও পড়ে এবং তাঁহারা যতটা সহানুভূতি দিতে পারেন তাহাও দিলেন। প্রবেশ-দ্বার স্বরূপ জোহানেসবর্গের রেলওয়ে ষ্টেশন সাজাইতে আমাদের প্রায় পনের দিন লাগিয়াছিল। সেখানে এক সুন্দর কারুকার্য্যখচিত তোরণ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা যে কেমন যায়গা তাহার পরিচয় তিনি বিলাতেই

পাইয়াছিলেন। ভারত-সচিব দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে গোখলের উচ্চ পদ ও সাম্রাজ্যে তাঁহার স্থান সম্বন্ধে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্য ষ্টীমারের টিকিট করিতে অথবা ক্যাবিনের ব্যবস্থা করিতে কাহার গরজ পড়িয়াছে ? গোখলের শরীর প্রায়ই ভাল থাকে না, তাঁহার জন্য ভাল ক্যাবিন চাই, নিরালা ক্যাবিন চাই। এমন ক্যাবিন নাই বলিয়া প্রকারান্তরে ষ্টীমার কোম্পানী জবাব দিলেন। আমার ঠিক মনে নাই যে, এই খবরটা ইণ্ডিয়া আফিসে গোখলে নিজেই দিয়াছিলেন অথবা আর কেহ দিয়াছিল। ষ্টীমার কোম্পানীর ডিরেক্টরের নামে ইণ্ডিয়া আফিস হইতে পত্র গেল এবং সে রকম ক্যাবিন "না থাকিলেও" পত্র যাওয়ার পরই গোখলের জন্য খুব ভাল এক ক্যাবিন তৈরী হইয়া গেল! এই প্রাথমিক কটু ব্যবহারের পরিণাম মধুর হইয়াছিল। ষ্টীমারের কাপ্তানের নিকটও গোখলেকে স্বাগত করার জন্য উপদেশ গিয়াছিল। সেই জন্য এই সমুদ্র যাত্রা কাল গোখলের শান্তিতে ও আনন্দে কাটিয়াছিল। তিনি ষ্টীমারের খেলা-ধূলায় ভাল রকমেই যোগ দিতেন এবং সেই জন্য ষ্টীমারের যাত্রীদের মধ্যে খুব লোক-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইউনিয়ন সরকার গোখলকে তাঁহাদের অতিথি হইতে ও সেলুন ব্যবহারে সম্মত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেলুন ও সরকারী আতিথ্যের সম্বন্ধে আমার সহিত পরামর্শ করিয়া এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কেপটাউন বন্দরে গোখলে নামিলেন। আমি যেরূপ মনে করিয়াছিলাম তাঁহার শরীর তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী খারাপ দেখিলাম। তিনি নির্দ্দিষ্ট এক প্রকারের খাদ্যই খাইতেন। পূর্ব্বে যতটা পরিশ্রম করিতে পারিতেন, এক্ষণে তাহা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁহার জন্য যে কার্য্যক্রম নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার

সহ্য হইবে না দেখিয়া যতটা সম্ভব কার্য্যক্রমের পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম। যদি পরিবর্ত্তন না করা যায়, তবে তিনি শরীরের দিকে না দেখিয়াই কাজ করিয়া যাইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার জন্য কঠিন কার্য্যক্রম স্থির করার জন্য বড় অনুতাপ হইল। কতকটা পরিবর্ত্তন করিলাম, কিন্তু যেমন ছিল অধিকাংশ তাহাই রাখিতে হইল। গোখলের জন্য থাকার ব্যবস্থা একেবারে নিরালা করা যে আবশ্যক তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহাকে নিরিবিলি থাকিতে দেওয়া খুব বেশী মুস্কিলের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আমি বিনয়ের সহিত ও সত্যের খাতিরে ইহাও বলিব যে, আমার রোগীর ও গুরুজনের সেবা করার অভ্যাস ও সখ ছিল বলিয়া আমার ভুল বুঝিতে পারায়, এতটা ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলাম যে, তাঁহাকে শান্তি দিতে পারিয়াছিলাম এবং খুব নিরিবিলি থাকার ব্যবস্থাও করিতে পারিয়াছিলাম। সমস্ত ভ্রমণ কালটাতে তাঁহার সেক্রেটারীর কাজ আমিই করিয়াছিলাম। স্বেচ্ছাসেবক যাহারা ছিল তাহারা সর্ব্বদা সশঙ্কিতভাবে প্রস্তুত থাকিত। সেই জন্য সেবকের অভাবে কোনও কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করিতে হয় নাই। কলেনবেক এই স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ছিলেন।

কেপটাউনে যে খুব ভালরকম জমকাল সভা হইবে—ইহা জানা কথাই ছিল। শ্রাইনর পরিবার সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সেই পরিবারের প্রধান ডবলিউ, পি, শ্রাইনারকে সভাপতি হওয়ার অনুরোধ করায় তিনি সম্মত হইয়াছিলেন। বিরাট সভা হইয়াছিল, অনেক ভারতীয় ও গোরারা আসিয়াছিলেন। মিঃ শ্রাইনার মিষ্ট বাক্যে গোখলেকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। গোখলে সংক্ষেপে বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার বক্তৃতা জ্ঞানে সমৃদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক অথচ বিনয়

পূর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে ভারতীয়েরা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনি গোরাদের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিলেন। একথা আমি বলিতে পারি, গোখলে যে মুহূর্ত্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই এই দেশের নানা প্রকারের লোকের হৃদয়ের ভিতরেও প্রবেশ করিলেন।

কেপটাউন হইতে জোহানেসবর্গ যাওয়ার কথা। দুই দিন রেলে চলিতে হইবে। লড়াইয়ের কুরুক্ষেত্র ছিল ট্রান্সভাল। কেপটাউন হইতে আসিবার পথে ট্রান্সভালে প্রবেশের মুখে রেলওয়ে ষ্টেশন ছিল ক্লার্কস্‌ডর্প। সেখানে অনেক ভারতীয় বাস করিত। সেই জন্য ক্লার্কস্‌ডর্পে ও জোহানেসবর্গে এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী আর দুইটা সহরে সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুতরাং ক্লার্কস্‌ডর্প হইতে যাওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উভয় স্থানের মেয়রই সভাপতি হইয়াছিলেন। এক এক জায়গায় এক ঘণ্টার বেশী সময় দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। জোহানেসবর্গে ট্রেণ একেবারে ঠিক সময়ে পঁহুছিয়াছিল ; একমিনিটও এদিক ওদিক হয় নাই। ষ্টেশনের উপরে বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী গালিচা ইত্যাদি পাতা হইয়াছিল। একটা মঞ্চও (প্লাটফর্ম্ম) তৈরী করা হইয়াছিল। জোহানেসবর্গের মেয়র ও অন্য গোরারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। মেয়র জোহানেসবর্গে বাস কালে তাঁহার মোটরখানা ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন। গোখলেকে ষ্টেশনেই অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। প্রত্যেক স্থলেই অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইত। জোহানেসবর্গের অভিনন্দন পত্রখানা জোহানেসবর্গেরই খনির সোণায় হৃদয়াকৃতি একটি পাতে খোদাই করিয়া লেখা হইয়াছিল ও উহা দক্ষিণ আফ্রিকার কাষ্ঠের উপর বসানো হইয়াছিল। কাঠের উপর ভারতীয় দৃশ্য সমূহ খোদাই করা হইয়াছিল। সকলের সহিত পরিচয় করিতে, অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করিতে ও তাহার উত্তর দিতে ও দ্বিতীয়

মানপত্র গ্রহণ করিতে বিশ মিনিট মাত্র সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। অভিনন্দন পত্র পড়িতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগে নাই,—ইহা এত সংক্ষেপ করা হইয়াছিল। গোখলের জবাবেও পাঁচমিনিটের বেশী লাগে নাই। স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল যে, প্লাটফর্ম্মে নির্দ্দিষ্ট লোক অপেক্ষা বেশী আসে নাই। গণ্ডগোল মোটেই হয় নাই। বাহিরে বহু লোকের ভিড় ছিল, কিন্তু সকলেই এত শান্ত ছিল যে, কথাবার্ত্তা কহিতে কোনও অসুবিধা হয় নাই।

সহর হইতে ৫ মাইল দূরে এক টিলার উপরে মিঃ কলেনবেকের একটা সুন্দর বাংলা ছিল। গোখলের বাসের জন্য সেই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানকার দৃশ্য এত মনোরম ছিল, সেখানকার শান্তি এত আনন্দদায়ক ছিল, সে বাংলা অনাড়ম্বর হইলেও শিল্পকলায় এমন সাজানো ছিল যে, গোখলের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। সকলের সহিত দেখা করার ব্যবস্থা সহরেই করা হইয়াছিল। তাহার জন্য একটা আফিস ভাড়া করিয়া লওয়া হইয়াছিল। উহাতে একটা কামরা কেবল তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য ছিল। একটা কামরা দেখা সাক্ষাৎ করার, আর একটায় সকলের বসার ব্যবস্থা ছিল। জোহানেসবর্গের কয়েকজন নামজাদা গৃহস্থের বাড়ীতে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ করাইবার জন্য গোখলেকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। গোরাদের মধ্যে প্রধানদের এক নিজস্ব সভা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের দিকটা গোখলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া জোহানেসবর্গে গোখলের সম্মানার্থে এক বড় ভোজ দেওয়া হয়। উহাতে ৪০০ জন লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ১৫০ জন গোরা ছিলেন। ভারতীয়েরা টিকিট করিয়া আসিবেন এই ব্যবস্থা ছিল। উহার মূল্য এক গিনি করিয়া ধার্য্য হইয়াছিল। ঐ টিকিটের টাকা দিয়া এই ভোজের খরচ তোলা হইয়াছিল। ভোজে

বস্তু কেবল নিরামিষ ছিল ও ইহাতে মদ ছিল না। রান্না কেবল স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা করা হইয়াছিল। এই জিনিষটা বুঝানো এখানে মুস্কিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের ভারতীয়দের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির হাঙ্গামা নাই, সকলেই এক সাথে বসিয়া খায়। যাহারা নিরামিষ আহারী তাহারা অবশ্যই সেখানেও নিরামিষই খাইয়া থাকে। এদেশে কতকগুলি ভারতীয় খৃষ্টান ছিলেন, যাঁহাদের সহিত আমি অপর সকলের ন্যায়ই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম। তাঁহারা অধিকাংশই গিরমিটিয়াদের সন্তান। আবার ইঁহাদের মধ্যে অনেকে হোটেলে রান্নার ও পরিবেশন করার কাজও করিয়া থাকেন। ইঁহাদেরই সাহায্যে এত লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা গিয়াছিল। ভোজে পনের রকমের খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় গোরাদের নিকট ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন ও আজগুবী ধরণের ভোজ হইয়াছিল। ভারতীয়দের সহিত একসাথে বসিয়া খাওয়া, নিরামিষ ভোজন করা, আর মদ্য বর্জ্জিত ভোজন গ্রহণ করা—এই তিন জিনিষই অনেকের নিকট নূতন ; দুইটা ত সকলের পক্ষেই নূতন জিনিষ ছিল।

এই সম্মেলনে গোখলে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্য সকল বক্তৃতা অপেক্ষা দীর্ঘ হইয়াছিল এবং মহত্বপূর্ণ ছিল। গোখলে এখানে ৪৫ মিনিট কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা তৈরী করার জন্য তিনি আমাদিগের নিকট হইতে সকল কথা খুব ভাল করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, স্থানীয় লোকের পক্ষটা অগ্রাহ্য না করা—যতটা সম্ভব তাহারা যেভাবে জিনিষটা দেখে সেইভাবে গ্রহণ করাই, তাঁহার সারা জীবনের কার্য্যের রীতি। সেইজন্য আমার দিক হইতে আমি তাঁহাকে দিয়া এই সভায় কি বলাইতে চাই তাহা জানিতে চাহিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এই সর্ত্তও করিয়া লইলেন

যে, আমার লেখা হইতে তিনি যদি একটা বাক্য, অথবা একটা যুক্তিও না গ্রহণ করেন, তবে যেন আমি দুঃখিত না হই। আমার লেখা খুব দীর্ঘও হইবে না, খুব ছোটও হইবে না, কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ও বাদ যাইবে না। সকল সর্ত্ত মানিয়াই আমাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে বক্তব্য লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি অবশ্য আমার ভাষা আদৌ ব্যবহার করেন নাই। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত গোখলে আমার লেখার ভাষা গ্রহণ করিবেন ইহা আমি আশাই বা কেমন করিয়া করিব? আমার যুক্তিগুলিও যে তিনি লইয়াছিলেন একথাও বলিতে পারি না। তবে আমার যুক্তির সার্থকতা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি ধরিয়া লইতেছি যে, তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে ঐ সকল ভাবও হয় ত তিনি ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ গোখলের চিন্তাধারা এমন ছিল যে, তাহার মধ্যে আমার ভাবসমূহের স্থান ছিল কি ছিল না, একথা বলা শক্ত। গোখলের সমস্ত বক্তৃতার সময়ই আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় না যে, কোনও বক্তৃতাতেই এমন একটা কথাও তিনি বলিয়াছিলেন, একটা বিশেষণও প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাহার সম্বন্ধে আমার মনে হইয়াছে যে, উহা না বলিলেই ভাল হইত। তাঁহার উক্তির স্পষ্টতা, দৃঢ়তা, বিনয় ইত্যাদি তাঁহার অত্যন্ত পরিশ্রম ও সত্যপরায়ণতার ফল।

জোহানেসবর্গে কেবল ভারতীয়দেরই এক বিরাট সভা করারও আবশ্যক ছিল। বক্তৃতা মাতৃভাষায় অথবা রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে দেওয়ার জন্য আমার পূর্ব্ব হইতেই আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহের জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সহিত আমার সম্পর্ক সরল ও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। সেই জন্য আমার ইচ্ছা হইত যে, ভারতীয়দের সভায় গোখলে হিন্দীতেই কথা বলেন তো ভাল হয়। এই বিষয়ে গোখলের ভাব আমি জানিতাম। ভুল হিন্দীতে বলা অপেক্ষা তিনি মারাঠী অথবা

ইংরাজীতেই বলা পছন্দ করিতেন। মারাঠীতে বলা তাঁহার নিকট কৃত্রিম বোধ হইতেছিল। কারণ যদি মারাঠীতেই বলা হয় তবে গুজরাটীদের ও উত্তর ভারতীয়দের জন্য উহা পুনরায় হিন্দুস্থানীতে তরজমা করিতেই হইবে। তাহাই যদি হয় তবে ইংরাজীতে বলিতেই বা দোষটা কোথায়? সৌভাগ্যক্রমে মারাঠী বলিতে গোখলে স্বীকার করিতে পারেন এমন এক বিশেষ যুক্তি আমার কাছে ছিল। কঙ্কন প্রদেশের অনেক মুসলমান জোহানেসবর্গে বাস করিত, কিছু মারাঠী হিন্দুও ছিল। ইঁহাদের সকলেরই গোখলের মারাঠী বক্তৃতা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহারা আমাকে মারাঠীতে বলার জন্য গোখলেকে অনুরোধ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম "আপনি মারাঠীতে বলিলে ইঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন, আর উহার হিন্দী তরজমা আমি করিয়া যাইব।" একথা শুনিয়া তিনি খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"তোমার যা হিন্দী জ্ঞান তাহা আমি জানি, এই হিন্দী জ্ঞানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া যায় না; তুমি আবার মারাঠীরও তরজমা করিতে চাও? বল ত সত্যি এমন সুন্দর মারাঠী তুমি কোথায় শিখিলে?" আমি বলিলাম—"আমার হিন্দীর সম্বন্ধে যে কথা, মারাঠীর সম্বন্ধেও সেই কথা। মারাঠীতে আমি একটা কথাও বলিতে পারি না। কিন্তু যে বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে, সেই বিষয়েই আপনি মারাঠীতে বলিবেন, সুতরাং তাহার ভাবার্থ অবশ্যই আমি হিন্দীতে বলিতে পারিব। উহার ভুল অর্থ করিব না ইহা আপনি দেখিয়া লইবেন। মারাঠী ভাল জানে এমন অন্য লোকও আছে, তরজমা করার জন্য এরূপ লোক আমি অবশ্যই দিতে পারি, কিন্তু তাহা আপনার পছন্দ হইবে না। সেই জন্য আপনি মারাঠীতেই বলুন আমি কাজ চালাইয়া লইব। কঙ্কনের এই বাসিন্দাদের আপনার মারাঠী কথাই শোনার ইচ্ছা; আমারও শুনিতে ইচ্ছা রহিয়াছে। গোখলে

বলিলেন—"তোমার যাহা মর্জি তাহা করিবেই, তোমার পাল্লায় যখন পড়িয়াছি তখন মারাঠীতে না বলিয়া কি আর উপায় আছে?" এই বলিয়া গোখলে আমার কথায় সম্মতি দিলেন। ইহার পর হইতে জাঞ্জীবার পর্য্যন্ত প্রত্যেক সভাতেই তিনি মারাঠীতে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং আমি তাঁহার স্বয়ং-নিযুক্ত ভাষান্তরকারীর কাজ করিয়াছি। ব্যাকরণ-শুদ্ধ ইংরাজীতে বলা অপেক্ষা ভাঙ্গাচুরা হিন্দীতে যতটা পারা যায় বলা ভাল—একথাটা তাঁহাকে মানাইতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু আমি একথা জানি যে, কেবল আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় মারাঠীতে বলিয়াছিলেন। বলার পরিণাম দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—ইহাও দেখিতে পাইয়াছিলাম। যেখানে নীতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই, সেখানে সেবকের মর্জি পালন করার গুণ যে তাঁহার ছিল, ইহা তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক ব্যবহারেই দেখা গিয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গেখালের প্রবাস (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জোহানেস্‌বর্গ হইতে আমাদিগকে প্রিটোরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইউনিয়ন সরকারের নিমন্ত্রণ ছিল, সেইজন্য হোটেলে তাঁহার জন্য সরকারের প্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহাকে উঠানো হইল। এইস্থানে ইউনিয়ন সরকারের মন্ত্রীদিগের সহিত দেখা করার কথা। তাঁহাদের মধ্যে জেনারেল বোথা ও জেনারেল স্মাট্‌স্‌ও ছিলেন। প্রতিদিনের কার্য্যক্রম তাঁহাকে সকাল বেলায় বলিয়া দেওয়া আমার রীতি ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাতেও বলিতাম। মন্ত্রীদিগের সহিত দেখা করা বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ। আমরা ঠিক করিলাম যে, আমি গোখলের সহিত যাইব না, যাইতে চাহিবও না। আমার উপস্থিতি গোখলে ও মন্ত্রীদিগের মধ্যে কতকটা ব্যবধান দাঁড়াইয়া যাইবে, আর তাঁহারাও ইচ্ছামত স্থানীয় ভারতীয়দের বিষয়ে ও মন চায় ত আমার যাহা ভুল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন সে সকল কথাও বলিতে পারিবেন না। তাহা ছাড়া তাঁহারা ভবিষ্যতে কি করিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছু বলিতে ইচ্ছা হইলেও, আমি থাকিলে তাহাও হয় ত বলিতে পারিবেন না। এক্ষণে প্রশ্ন হইল এই যে, আমি না থাকিলে অথবা অন্য কোনও ভারতীয় দায়িত্ববান নেতা গোখলের সঙ্গে না থাকিলে, কথাবার্ত্তা কালে যদি কোনও বিষয় উপস্থিত হয় অথবা নূতন ঘটনার আলোচনা হয় যাহার উত্তর গোখলে দিতে পারেন না, অথবা যদি ভারতীয়দিগের তরফ হইতে কোনও স্বীকৃতি দিতে হয়, তবে কি করা যাইবে? কিন্তু গোখলে নিজেই ইহার ব্যবস্থা করিলেন। আমাকে

প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতীয়দের ঐতিহাসিক বিবরণ ঘটনার অনুক্রমে তৈরী করিতে বলিলেন। ভারতীয়েরা কতদূর কি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে, তাহারও একটা বিবরণ লিখিতে হইল। উহার বাহিরের কোনও বিষয় যদি উঠে, তবে গোখলে সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা স্বীকার করিবেন ইহা স্থির করিলেন এবং স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন। এখন রহিল কেবল ঐতিহাসিক বিবৃতি প্রস্তুত করা ও গোখলের তাহা পড়িয়া লওয়া। কিন্তু তাহাই পড়ার সময় গোখলেকে দিতে পারি কোথায়? যতই সংক্ষেপ করি না কেন, ১৮ বৎসর ধরিয়া চারিটি উপ-নিবেশের ভারতীয়দের ইতিহাস আমি দশ বিশ পৃষ্ঠা না লিখিলে কি করিয়া জানাইব? আবার বিবৃতি পড়িয়াও তিনি কতকগুলি বিষয়ে প্রশ্ন করিতে পারেন। কিন্তু গোখলের স্মরণশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ ছিল, তাঁহার পরিশ্রম করারও তেমনি অসাধারণ শক্তি ছিল। সারারাত্রি নিজে জাগিলেন এবং পোলককে ও আমাকে জাগাইয়া রাখিলেন। সমস্ত বিষয়টার ধারণা করিয়া লইলেন এবং নিজে ঠিকমত বুঝিয়াছেন কিনা তাহা দেখার জন্য আমাদিগকে বলিয়া শুনাইলেন। অবশেষে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি নির্ভয় হইলেন।

প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া মন্ত্রীমণ্ডলের সহিত গোখলের কথাবার্ত্তা হইল। তিনি আসিয়াই আমাকে বলিলেন—"তোমাকে এক বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সকল ব্যাপারেরই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। 'এশিয়াটিক আইন' রদ হইবে। 'ইমিগ্রেসন আইন' হইতে বর্ণভেদ উঠিয়া যাইবে। তিন পাউণ্ড কর রদ হইবে।" আমি বলিলাম—"আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। মন্ত্রীমণ্ডলকে আমি যেমন চিনিয়াছি, আপনি ততটা চিনিতে পারেন নাই। আপনার আশা দেখিয়াই আমি আনন্দ লাভ করিয়াছি, কেননা আমি নিজেও আশার

উপরই নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু অনেকবার নিরাশ হইয়াছি বলিয়াই এ বিষয়ে আমি আপনার মত আশা করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমার ভয় নাই। আপনি যে তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। যদি আবশ্যক হয় তবে যুদ্ধ করা, এবং এই যুদ্ধ যে ন্যায় যুদ্ধ সে কথাও প্রমাণিত করাই ত আমার ধর্ম্ম। তাঁহারা আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাতে আমাদের যুদ্ধ যে ন্যায়ানুমোদিত তাহা প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে! আর যদি যুদ্ধই করিতে হয় তবে উহাতে আমরা দ্বিগুণ জোর পাইব। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আরো বেশী করিয়া ভারতীয়দের জেলে না গেলে চলিবে না এবং একবৎসরে আমার ফেরা হইবে না। তিনি বলিলেন—"আমি যাহা বলিলাম উহা হইবেই। আমাকে জেনারেল বোথা কথা দিয়াছেন যে, 'এশিয়াটিক আইন' রদ করা হইবে এবং তিন পাউণ্ড কর উঠাইয়া দেওয়া হইবে। তুমি এই বারো মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষে আসার ছুটি পাইবে, আমি কোনও ফাঁকি শুনিব না।"

জোহানেসবর্গের বক্তৃতা প্রিটোরিয়া হইতে ফিরিবার পর হয়। ট্রান্সভাল হইতে ডারবান, মরিৎসবর্গ প্রভৃতি স্থানে যাওয়া হয়। সেখানে বহু গোরার সম্পর্কে আসা হইয়াছিল। তিনি কিম্বারলীর হীরার খনি দেখেন। কিম্বারলীতে এবং ডারবানেও অভ্যর্থনাকারীরা জোহানেসবর্গের মতই ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপে ভারতীয়দের ও গোরাদের মন হরণ করিয়া গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তে পঁহুছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই আমি ও কলেনবেক তাঁহাকে জাঞ্জীবার পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিতে গিয়াছিলাম। ষ্টীমারে তাঁহার উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। পথে ডেলা-গোয়া-বে, ইন্‌হামবেন্‌, জাঞ্জীবার প্রভৃতি বন্দরে তাঁহাকে খুব অভিনন্দিত করা হইয়াছিল।

ষ্টীমারে আমাদের কথার বিষয় ছিল কেবল এক ভারতবর্ষ, অথবা সেই সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য। প্রত্যেক কথার ভিতর দিয়া তাঁহার কোমল হৃদয়, তাঁহার সত্যপরায়ণতা, তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

আমি দেখিয়াছি, গোখলে ষ্টীমারে খেলাধূলা করিতেন, কিন্তু সে খেলাও তাঁহার দেশ-সেবার ভাব হইতে প্রণোদিত এবং সেখানেও তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

ষ্টীমারে আমাদের আরামে কথা বলার খুব অবকাশ হইয়াছিল। এই কথাবার্ত্তাতেই গোখলে আমাকে ভারতবর্ষের কার্য্যের জন্য তৈরী করিয়া লইলেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেক নেতার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সে বর্ণনা এত নিখুঁত ছিল যে, ঐ সকল নেতাদের সহিত পরিচয়ের পরে তাঁহার বর্ণনার সহিত কোনও তফাৎ দেখিতে পাই নাই।

গোখলের দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসকাল সম্বন্ধে আমার পবিত্র স্মৃতির কথা সমূহ এখানে অনেক লিখিতে পারি। কিন্তু সত্যাগ্রহের ইতিহাসের সহিত তাহার যোগ নাই বলিয়া আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে কলম বন্ধ করিতে হইতেছে। জাঞ্জীবারে আমাদের বিদায় আমাদের উভয়ের পক্ষেই খুব দুঃখদায়ক হইয়াছিল। কিন্তু দেহধারীর পক্ষে নিকট হইতে নিকটতম সম্পর্কও শেষ করিতে হয়, এই ভাবিয়া আমি ও কলেনবেক মনকে প্রবোধ দিলাম। উভয়েই এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিলাম যে, গোখলের ভবিষ্যৎবাণী ফলিবে ও বৎসর মধ্যে আমরা ভারতবর্ষে যাইতে পারিব। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই।

যাহা হোক্, গোখলের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমরা আরও দৃঢ় হইলাম, এবং যখন এই লড়াই খুব কঠোর হইয়া

পড়িয়াছিল, তখন এই সাক্ষাৎকারের মর্ম্ম ও আবশ্যকতা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলাম। যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় গোখলে না যাইতেন তবে মন্ত্রী-মণ্ডলের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইত না এবং তিন পাউণ্ড কর রদ করাকেও আমরা লড়াইয়ের অঙ্গীভূত করিতে পারিতাম না। যদি 'এশিয়াটিক আইন' রদ হইয়াই লড়াই বন্ধ হইত তাহা হইলেও তিন পাউণ্ড করের জন্য নূতন করিয়া সত্যাগ্রহ করিতে হইত এবং তাহার জন্য অবার দুঃখে ডুবিতে হইত। লোকে সে দুঃখ সহ্য করিতে আবার তখনই প্রস্তুত হইত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ করা যায়। এই কর উঠাইয়া দেওয়া স্বাধীন ভারতীয়দের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। উহা রদ করার জন্য আর্জি ইত্যাদি আরো বেশী করিয়া করিতে হইত। লোকে ১৮৯৫ সাল হইতে কর দিয়া আসিতেছে। যতই দুঃখ হোক্ না কেন, সে অবস্থা যদি দীর্ঘদিন চলে তবে মানুষ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন তাহার প্রতিকার করা যে ধর্ম্ম তাহা মানুষকে বুঝানো কঠিন হয়। গোখলের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্যাগ্রহীদের পক্ষে কর্ত্তব্য সহজ করিয়া দিয়াছিল। সরকারের কথা অনুযায়ী উহা রদ করিয়া দিতে হয়, আর যদি না দেয় তবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য সত্যাগ্রহ করার কারণ জোরালো হইয়া পড়ে। কাজেও তাহাই হইয়াছিল। সরকার এক বৎসরের ভিতর কর রদ করিলেন না, উপরন্তু এই কর তুলিয়া দেওয়া হইবে না ইহাও সাফ্ শুনাইয়া দিলেন।

এইভাবে গোখলের আগমনের জন্যই আমরা তিন পাউণ্ড কর সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পাই এবং এই প্রবাসের জন্যই গোখলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় প্রশ্নে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে উক্তির মূল্য বাড়িয়া গেল, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

হওয়ায় ভারতবর্ষে সে বিষয় লইয়া কি করা উচিত তাহা তিনি নিজে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং ভারতবাসীকেও বুঝাইবার শক্তি লাভ করিলেন। পরে যখন লড়াই জোরে আরম্ভ হইল তখন ভারতবর্ষ হইতে অর্থ বৃষ্টি হইয়াছিল, লর্ড হার্ডিঞ্জও সত্যাগ্রহীর দিকে স্পষ্ট সহানুভূতি জানাইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে মিঃ এণ্ড্রুজ ও মিঃ পিয়ারসন দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। এ সমস্তই গোখলের প্রবাস না হইলে ঘটিত না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কেমন করিয়া হইয়াছিল ও তাহার পর কি হইয়াছিল, তাহা নূতন অধ্যায়ের বিষয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সহিত দেখা হইত যে, সত্যাগ্রহের নীতি কোনও প্রকারে ভঙ্গ না হয়, আবার এদিকেও দৃষ্টি রাখা হইত, যেন কোন অবৈধ উপায়ে সরকারকে উত্যক্ত না করা হয়। 'এশিয়াটিক আইন'টা কেবল ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়দের উপর প্রযুক্ত ছিল, সেই জন্য সত্যাগ্রহ নীতি অনুসারে কেবল ট্রান্সভালবাসী ভারতীয়েরাই এই যুদ্ধে যোগ দিতে পারিত। নাতাল, কেপকলোনি ইত্যাদি স্থান হইতে কাহাকেও সত্যাগ্রহী করা হইত না। কেহ ঐ স্থান হইতে সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিলেও তাহাকে লওয়া হইত না। লড়াইয়ের সীমাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া কেবল এই 'এশিয়াটিক আইনটা'র সম্বন্ধেই প্রযুক্ত করা হইয়াছিল। এই জিনিষটা ভারতীয়েরা বা গোরারা কেহই বুঝিতেন না। লড়াইয়ের আরম্ভকালে ভারতীয়দের নিকট হইতে এই প্রকার অনুরোধ আসিত যে, লড়াই আরম্ভ করার পরে 'এশিয়াটিক আইন' ছাড়া ভারতীয়দের অন্য দুঃখগুলিকেও যদি সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তবে তাহা কেন করা হইবে না? ধৈর্য্যের সহিত আমি তাহাদিগকে বুঝাইতাম যে, তাহাতে সত্য ভঙ্গ করা হয়। আর যেখানে সত্যেরই আগ্রহ সেখানে সত্য ভঙ্গ কেমন করিয়া হইতে পারে? সত্যাগ্রহের লড়াই শুদ্ধ ভাবে চালাইতে থাকিলে লড়িতে লড়িতেই যোদ্ধাদের শক্তি বাড়িয়া যায় এবং যদি দেখা যায়, আরম্ভকালের অপেক্ষা শক্তি বাড়িয়াছে, তথাপি যে বিষয় লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ তাহার অধিক বিষয় লওয়া যায় না। আবার অপরদিকে যদি

বিপরীত কারণে শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে তাহা হইলেও লড়াইয়ের কোনও অংশ ত্যাগ করা যায় না। এই উভয় সিদ্ধান্তের প্রয়োগই দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্পূর্ণভাবে হইয়াছিল। লড়াইয়ের আরম্ভে যে শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলাম, সে শক্তি পরে কমিয়া গিয়াছিল। ইহা আমরা দেখিয়াছি। তাহা হইলেও মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহী যুদ্ধ ছাড়ে নাই। এইভাবে ঠিক মত যুদ্ধ করিয়া যাওয়া বরঞ্চ সহজ, কিন্তু যখন শক্তির বৃদ্ধি হয় তখন সত্যাগ্রহের লক্ষ্য না বাড়ানো বড়ই কঠিন এবং উহাতে অধিকতর সংযম আবশ্যক। এই প্রকারের প্রলোভন দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেকভাবে পাইয়াছি কিন্তু একটিবারও সে সুবিধা লওয়া হয় নাই, একথা বলিতে পারি। সেই জন্যই আমি বার বারই বলিয়া থাকি যে, সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য একমাত্র বিষয়ে, সে উহাকে কমাইতেও পারে না, বাড়াইতেও পারে না— উহার ক্ষয়েরও অবকাশ নাই, বৃদ্ধিরও অবকাশ নাই। মানুষ নিজের জন্য যে মাপ সৃষ্টি করে, জগৎ সেই মাপেই তাহাকে মাপে। সত্যাগ্রহীরা যে এই প্রকার সূক্ষ্ম নীতির দাবী করিত সরকার তাহা জানিতেন এবং সরকার যদিও কোনও নীতিরই ধার ধারিতেন না, তবুও সত্যাগ্রহীকে তাহারই গড়া মাপে তাঁহারা মাপিতে লাগিলেন ও সেই জন্যই দুই চারবার সত্যাগ্রহীর উপর নীতিভঙ্গের দোষও আরোপ করিয়াছিলেন। 'এশিয়াটিক আইন' করার পর ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নূতন আইন করিলে তাহা যে সত্যাগ্রহ যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহা বালকেও বুঝিতে পারে, উহা এতই সোজা কথা। নূতন প্রবেশার্থী ভারতীয়দের উপর যখন নূতন করিয়া আইন করা হইল তখন তাহাও সত্যাগ্রহের ভিতর লওয়া হইল। তখন সরকার নূতন কথা পাড়িতেছি বলিয়া আমাদের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ অন্যায় অভিযোগ। নূতন লোকের প্রবেশ এইভাবে বন্ধ করিতে না দেওয়া লড়াইয়ের অঙ্গ করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতেই

সোরাবজী প্রভৃতি ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহা পাঠকেরা দেখিয়াছেন। সরকার ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু নিরপেক্ষ লোকদিগকে আমাদের কার্য্যের ঔচিত্য বুঝাইতে মোটেই কষ্ট হয় নাই। এই রকম গোখলে যাওয়ার পর পুনরায় হইল। গোখলে ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, তিন পাউণ্ডের কর এক বৎসরের ভিতর রদ করা হইবে এবং তাঁহার যাওয়ার পরই রদ করার আইন ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে জেনারেল স্মাট্‌স্ সেই পার্লামেণ্টেই প্রকাশ করিলেন যে, নাতালের গোরারা এই আইন রদ করিতে অসম্মত হওয়ায়, সরকার উহা রদ করিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ ব্যাপার এরূপ ছিল না। ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে চারটি উপনিবেশ রহিয়াছে। একা নাতালের সভ্যদের সেখানে কিছু করা অসম্ভব। তাহা ছাড়া, মন্ত্রীমণ্ডলের আইন গঠন করিয়া অন্ততঃ পার্লামেণ্টে দাখিল করার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু সে সকল কিছুই জেনারেল স্মাট্‌স্ করেন নাই। ইহা হইতেই এই সাংঘাতিক করকে আমরা সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করার শুভ অবসর বিনা চেষ্টায় পাইলাম। দুইটা কারণ পাওয়া গেল। একটা হইতেছে এই যে, লড়াই চলার সময় সরকার পক্ষ হইতে কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা ভঙ্গ করা হইলে তাহা সত্যাগ্রহের মধ্যে লওয়া যায়, দ্বিতীয় কারণ, গোখলের মত ভারতবাসীকে কথা দিয়া না রাখিলে তাঁহার অপমান করা হয় এবং সেই সূত্রে সমগ্র ভারতবর্ষকেই অপমান করা হয় এবং তাহা সহ্যও করা যায় না। যদি কেবল প্রথম হেতুই থাকিত এবং সত্যাগ্রহীর শক্তি না থাকিত, তবে উহা সত্যাগ্রহের অন্তর্ভুক্ত না করিলেও করা যাইত। কিন্তু ভারত-বর্ষের অপমান সত্যাগ্রহীদের সহ্য করার বিষয় নহে। এই জন্য তিনপাউণ্ড করও সত্যাগ্রহের অন্তভ ক্ত করা ধর্ম্ম বলিয়া বুঝাইলাম। যখন তিন পাউণ্ড কর সত্যাগ্রহে স্থান পাইল তখন গিরমিটিয়া ভারতীয়েরাও সত্যাগ্রহে

যোগ দেওয়ার অধিকার পাইল। পাঠকদের একথা মনে থাকিতে পারে যে, আজ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে লড়াইয়ের বাহিরেই রাখা হইয়াছিল। এদিক দিয়া যেমন লড়াইয়ের জোর বাড়িল তেমনি যোদ্ধাও বেশী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

গিরমিটিয়ারা আজ পর্য্যন্তও সত্যাগ্রহের কোনও চর্চ্চায় ছিল না। সেই জন্য তাহাদিগকে শিক্ষাই বা কি করিয়া দেওয়া যাইবে? তাহারা নিরক্ষর। সুতরাং 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' বা অন্য কাগজ কেমন করিয়া পড়িবে? তাহা হইলেও আমি দেখিয়াছিলাম যে, এই দরিদ্রেরা সত্যাগ্রহ নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছিল। যাহা ঘটিতেছিল তাহা তাহারা বুঝিতেছিল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই যুদ্ধে যোগ দিতে না পারিয়া কষ্ট বোধ করিতেছিল। কিন্তু যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়ায় তিন পাউণ্ড কর সত্যাগ্রহভুক্ত হইল, তখন তাহাদের মধ্যে কে যে যুদ্ধে যোগ দিবে সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা গোখলেকে লিখিলাম। তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ হইল। আমি তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিয়া জানাইলাম যে, মরণান্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব এবং এই কর রদ করাইয়া ছাড়িব। মাত্র একবৎসরের মধ্যে আমার ভারতবর্ষে যাওয়ার কথা ছিল, সে কথা পাল্টাইয়া গেল। এখন যে কতদিনে ফিরিতে পারিব তাহা আর বলার সামর্থ্য রহিল না।

গোখলে ছিলেন অঙ্ক-শাস্ত্রী। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যোদ্ধার সংখ্যা বেশী বা কম করিয়া ধরিলে কত হইবে। আমার মনে আছে, আমি তখন তাঁহাকে বেশী হইলে ৬৫ কি ৬৬ এবং কম হইলে ১৬ জন মাত্র হইবে লিখিয়াছিলাম। আর এই সামান্য সংখ্যক লোকের জন্য ভারতবর্ষ হইতে টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই, একথাও জানাইয়াছিলাম। আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে লিখিলাম এবং

তিনি যেন তাহার শরীর নষ্ট না করিয়া ফেলেন—ইহাও মিনতি পূর্ব্বক জানাইলাম। আমি সংবাদপত্র হইতে ও অন্যান্য সূত্রে একথাও জানিয়াছিলাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বোম্বাই ফিরিবার পরে তাঁহার উপর দুর্ব্বলতা ইত্যাদি দেখানোর অভিযোগ আনা হইয়াছিল। সেই জন্য আমার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি যেন এখানে টাকা পাঠাইবার জন্য কোনও আন্দোলন না করেন। কিন্তু গোখলে কড়া জবাব দিলেন—"দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমার কর্ত্তব্য কি তাহা তুমি যেমন বোঝ, ভারতবর্ষে আমাদেরও কি কর্ত্তব্য আছে, আমরা তেমনি তাহা বুঝি। আমাদের কি করা উচিত সে কথা তোমাকে বলিতে দিব না। আমি কেবল সেখানকার অবস্থাই জানিতে ইচ্ছা করি, আমার কি করা উচিত সে পরামর্শ চাই না।" এ কথার মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিলাম। ইহার পর এ বিষয় একটা কথাও বলি নাই অথবা লিখি নাই। সেই পত্রেই তিনি আমাকে আশ্বাস দেন ও সতর্ক করিয়া দেন।

গোখলের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, যখন এই ভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইল তখন যুদ্ধ দীর্ঘ দিন চলিবে। তবে কতদিন যে এই মুষ্টিমেয় লোক কয়টি ইউনিয়ন সরকারের পশুবলের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। এদিকে আমরা তৈরী হইতে আরম্ভ করিলাম। যুদ্ধ যে আর ধীরভাবে শুইয়া বসিয়া করা চলিবে না তাহা বুঝিয়াছিলাম। এখন হইতে জেলও যে বেশী দিনের হইবে তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। টলষ্টয় ফার্ম্ম বন্ধ করা স্থির করিলাম। জেল হইতে বাহির হইয়া কেহ কেহ নিজ পরিবার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। বাকী যাহারা ছিল তাহারা বেশীর ভাগই ফিনিক্সের লোক। সেই জন্য ফিনিক্স হইতেই যুদ্ধ চালাইব স্থির করিলাম। ফিনিক্স হইতে যুদ্ধ চালাইবার আর একটা হেতুও এই ছিল যে, এখন তিন পাউণ্ড

করের জন্য গিরমিটিয়ারা যোগ দিতে চাহিলে নাতালেই তাঁহার সুবিধা ছিল।

এখন যুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইতেই এক নূতন বিঘ্ন উপস্থিত হইল, যাহাতে স্ত্রীলোকদিগকেও যুদ্ধে পাওয়া গেল। কয়েকজন সাহসী স্ত্রীলোক যুদ্ধে যোগ দিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং যখন বিনা লাইসেন্সে ফেরি করিয়া জেলে আসা আরম্ভ হইয়াছিল তখন তাঁহাদের কয়েকজন ফেরি করিয়া জেলেও যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশের জেল আমরা সকলেই স্ত্রীলোকদিগের অনুপযুক্ত বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। জেলে পাঠাইবার হেতুও আমি বুঝি নাই; আর তখন তাহাদিগকে জেলে পাঠাইবার সাহসও আমার ছিল না। আমি ইহাও ভাবিয়াছিলাম যে, কেবলমাত্র পুরুষের উপর প্রযুক্ত আইন রদ করার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে উৎসর্গ করিলে হীনই হইতে হয়। কিন্তু এখন এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে স্ত্রীলোকদিগকেও অপমানিত করা হইল এবং যাহার জন্য স্ত্রীলোকদিগেরও যুদ্ধে যোগ দেওয়া আর নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইল না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যে বিবাহ বিবাহই নয়

কে জানে, ঈশ্বর অদৃশ্যে থাকিয়া ভারতীয়দের জয় দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিয়াই, দক্ষিণ আফ্রিকার গোরাদের অন্যায় আচরণ আরও স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন কিনা। ভারতবর্ষ হইতে অনেক বিবাহিত লোক দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিল। অনেকে এখানে আসিয়া বিবাহ করে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বিবাহ রেজেষ্ট্রী করার আইন নাই, ধর্ম্মানুষ্ঠানই যথেষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ভারতীয়দের সম্বন্ধে এই নিয়মই হওয়া উচিত। গত চল্লিশ বৎসর হইতে ভারতবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছিল। বস্তুতঃ এই দীর্ঘকাল মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্ম অনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহের সঙ্গতি সম্বন্ধে প্রশ্নও উঠে নাই।

কিন্তু এই সময় একটা মোকদ্দমা হইল যাহাতে জজ সাহেব রায় দিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে খৃষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ ভিন্ন অন্য বিবাহের অর্থাৎ যাহাতে রেজেষ্ট্রী করা হয় না এমন সকল বিবাহের স্থান নাই। হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ইত্যাদি ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ সেই ভয়ঙ্কর অপরাধেই দক্ষিণ আফ্রিকাতে বিবাহ বলিয়া আর গণ্য নহে এবং সেই আইন অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকায় সকল পরিণীতা স্ত্রী তাঁহাদের স্বামীর ধর্ম্মপত্নী হওয়ার পরিবর্ত্তে রক্ষিতা স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইলেন এবং এই স্ত্রীদের সন্তান পিতার সম্পত্তির ওয়ারিশও আর রহিল না। এই অবস্থা যেমন স্ত্রীলোকদের অসহ্য তেমনি পুরুষদের অসহ্য হইয়াছিল। দক্ষিণ

আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সোরগোল আরম্ভ হইল। আমার স্বভাব অনুযায়ী আমি সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাঁহারা কি ঐ জজের নির্দ্ধারণ স্বীকার করিবেন? আর সেই জজ আইনের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা যদি সত্য অর্থই হইয়া থাকে তবে তাহা অনর্থকর জানিয়া, সরকার কি নূতন আইন পাস করিয়া হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ আইন সম্মত বিবাহ বলিয়া গণ্য করিবেন? সরকারের তখন কথা শোনার মত মেজাজ নয়। আমার চিঠির উত্তর আসিল 'না'। সত্যাগ্রহী মণ্ডল একত্র হইয়া আলোচনা করিলেন যে, ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা উচিত কি না। সকলে স্থির করিলেন যে, এসময়ে আপিল করা চলে না। যদি আপিল করিতে হয় তবে সরকারই করিবেন। তাহা ছাড়া খোলাখালি ভাবে সরকারী উকীল যদি ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করেন তবেই মোকদ্দমা করা যায়, নচেৎ নহে। নিজেরা আপিল করিলে ঐ আইন দ্বারা হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতির বিবাহ নাকচ হইয়া গিয়াছে ইহাই মানিয়া লইতে হয়। আবার আপিল করার পরও যদি পরাজয় হয়, তবে সত্যাগ্রহই করিতে হইবে। সেইজন্য এই অপমানজনক বিষয় লইয়া আপিল না করাই স্থির হইল।

এমন একটা সময় উপস্থিত হইল যখন দিনক্ষণ দেখার অবসর নাই। স্ত্রীলোকদিগের অপমানের পর আর কে ধৈর্য্য রাখিবে? অল্প হোক্ বেশী হোক্, যে কয়জন পাওয়া যায় তাহাদের দ্বারাই জোরে সত্যাগ্রহ চালানো স্থির হইল। এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগকে আর লড়াইয়ে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়া যায় না। বরঞ্চ আমরা স্ত্রীলোকদিগকে এই লড়াইতে নামিতে আহ্বান করাই স্থির করিলাম। প্রথমে যে সকল ভগ্নী টলষ্টয় ফার্ম্মে ছিলেন তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইল। তাঁহারা সত্যাগ্রহী হওয়ার জন্য লালায়িতই ছিলেন। এই লড়াইয়ের মধ্যে যে সকল বিপদ আছে সে

বিষয়ে আমি তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইলাম। থাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, শোয়া-বসায় সব রকমেই যে পরাধীন হইতে হইবে তাহা বুঝাইলাম। জেলে কঠিন পরিশ্রম করাইবে, কাপড় কাচাইবে; অপমান করিবে ইত্যাদি বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলাম। কিন্তু এই ভগ্নীরা কিছুতেই ভয় পাইলেন না। সকলেই সাহসী ছিলেন। একজন কয়েক মাস গর্ভবতী ছিলেন, কয়েকজনের ছেলে ছিল, কিন্তু সকলেই সত্যাগ্রহী হইতে আগ্রহ করিলেন। তাঁহাদের ভিতরে কাহাকেও আমি আটকাইতে পারিলাম না। এই ভগ্নীরা সকলেই তামিল ছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের নাম দিতেছি ঃ—

১। শ্রীমতী থাম্বী নাইড়ু, ২। শ্রীমতী এন, পিল্লে, ৩। শ্রীমতী কে, মুরুগেসা পিল্লে, ৪। শ্রীমতী এ, পি, নাইড়ু, ৫। শ্রীমতীপি, কে, নাইডু, ৬। শ্রীমতী চিন্নস্বামী পিল্লে, ৭। শ্রীমতী এন, এস, পিল্লে, ৮। শ্রীমতী আর, এস, মুদলিঙ্গম, ৯। শ্রীমতী ভবানী দয়াল, ১০। শ্রীমতী এম, পিল্লে, ১১। শ্রীমতী বি, এম, পিল্লে। ইঁহাদের মধ্যে ছয়জনের কোলে ছেলে ছিল।

অপরাধ করিয়া জেলে যাওয়া সোজা কিন্তু নির্দোষ হইয়া গ্রেপ্তার হওয়া কঠিন। অপরাধী ধরা পড়িতে চায় না, সেইজন্য পুলিশ পিছনে ধাওয়া করিয়া ধরে। স্বেচ্ছায় নির্দোষ হইয়াও যাহারা জেলে যাইতে চায় পুলিশ তাহাদিগকে অগত্যা ধরে। এই ভগ্নীরা প্রথম চেষ্টায় নিষ্ফল হইলেন। তাঁহারা লাইসেন্স না লইয়া ফেরী করিতে লাগিলেন কিন্তু পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল না। তাঁহারা ফ্রিনিবন হইতে বিনা সার্টিফিকেটে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলেও কেহ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল না। এখন ইঁহাদের নিকট এক সমস্যা উপস্থিত হইল যে, কেমন করিয়া ধরা পড়া যায়। ধরা পড়িতে ইচ্ছা করে এমন পুরুষও বেশী

ছিল না, আবার যাহারা ধরা দিতে ইচ্ছা করিত তাহাদের ধরা পড়াও সহজ ছিল না।

— একটা শেষ উপায় আমরা হাতে রাখিয়াছিলাম তাহাই গ্রহণ করা স্থির করিলাম। এই উপায় খুব তেজব্যঞ্জক ছিল। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, আমার সঙ্গে সমস্ত ফিনিক্সকেই উৎসর্গ করিতে হইবে। আমার সর্ব্বশেষ ত্যাগের বিষয় ইহাই ছিল। ফিনিক্সে যাহারা থাকিত তাহারা আমার নিজস্ব সাথী ও পরিবারের লোক। আমি স্থির করিলাম, সংবাদপত্রখানা চালাইতে যে কয়জন লোকের প্রয়োজন ও ষোল বৎসরের কম যাহাদের বয়স কেবলমাত্র তাহাদিগকেই বাদ দিয়া আর সকলকেই জেলে পাঠাইব। ইহা অপেক্ষা বেশী আর কোনও ত্যাগই আমার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। গোখলেকে যে ষোলজনের কথা লিখিয়াছিলাম তাহারা ইহারাই। স্থির হইল যে, ইঁহারা ট্রান্সভালের নিষিদ্ধ সীমানায় প্রবেশ করিবেন এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশের জন্য ধৃত হইবেন। একটা ভয় ছিল যে, একথা রাষ্ট্র হইলে হয়ত সরকার ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে না, সেইজন্য দুই চারজন মিত্রকে ছাড়া আর কাহাকেও একথা জানানো হয় নাই। সীমানা অতিক্রম করিলে সাধারণতঃ পুলিশ নাম ধাম জিজ্ঞাসা করে, সে স্থলে নাম ধাম বলা হইবে না বলিয়া ঠিক করা হইল। আমলাদিগকে নাম ও পরিচয় না দেওয়াও একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পরিচয় দিলে আমার আত্মীয় জানিয়া পুলিশের না ধরার সম্ভাবনা ছিল, সেইজন্য পরিচয় না দেওয়াই স্থির হইল। আর যে ভগ্নীরা ইতিমধ্যে ট্রান্সভালে ধরা পড়িতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহারাও নাতালে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিবেন, স্থির হইল। যেমন নাতাল হইতে ট্রান্সভালে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ দণ্ডনীয় ছিল, তেমন ট্রান্সভাল হইতে নাতালে প্রবেশও দণ্ডনীয় ছিল। এই ভগ্নীদের সম্বন্ধে স্থির হইল যে, যদি

তাঁহারা নাতালে প্রবেশ করিতেই ধৃত হন, তবে ত ভালই, আর যদি না ধৃত হন তবে তাঁহারা নাতালের কয়লার খনির কেন্দ্রস্থল নিউক্যাস্‌ল-এ যাইবেন। সেখানে গিয়া মজুরদিগকে কাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসার জন্য অনুরোধ করিবেন। এই ভগ্নীদের মাতৃভাষা তামিল ছিল, তাঁহারা কিছু কিছু হিন্দীও জানিতেন, আর মজুরেরা বেশীর ভাগই মাদ্রাজ অঞ্চলের তামিল, তেলেগু ভাষী ছিল। অন্য দেশের মজুরও অনেক ছিল। যদি এই ভগ্নীদের কথা শুনিয়া মজুরেরা কাজ ছাড়ে, তবে সরকার তাঁহাদিগকে মজুরদের সঙ্গেই গ্রেপ্তার না করিয়া পারিবেন না। ইহাতে মজুরদের মনে পুরা উৎসাহ আসারও সম্ভাবনা ছিল। এইভাবে ব্যূহ রচনার কল্পনা করিয়া ট্রান্সভালস্থ ভগ্নীদিগকে বুঝাইলাম। অতঃপর আমি ফিনিক্সে গেলাম। ফিনিক্সে সকলের সহিত বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিলাম। প্রথমেই ফিনিক্সের ভগ্নীদের সহিত পরামর্শ করি। ভগ্নীদিগকে জেলে পাঠানোটা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা আমি জানিতাম। ফিনিক্সবাসী অনেক ভগ্নীই গুজরাটী ছিলেন। সেইজন্য ট্রান্সভালবাসিনী ভগ্নীদের ন্যায় তাঁহাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছিল না। তারপর ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমার আপনার লোক। আমার কথায় লজ্জার খাতিরেও ইঁহারা জেলে যাইতে প্রস্তুত হইয়া কাজের বেলায় ভয় পাইতে পারেন, অথবা জেলে গিয়া অবশেষে না পারিয়া মাফ চাহিয়াও ফেলিতে পারেন। এরূপ হইলে তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত ব্যথার কারণ হইবে ও লড়াই একেবারে নরম হইয়া যাইবে—ইহাও বিচার্য্য ছিল। আমি ত আমার স্ত্রীকে বলিবই না ঠিক করিয়াছিলাম। তাঁহাকে বলিলে তিনি অস্বীকার করিবেন না জানিতাম কিন্তু বিপদের সময় কতটা টিকিয়া থাকিতে পারিবেন তাহা জানিতাম না। এই রকম বিপদসঙ্কুল বিষয়ে যদি স্ত্রী নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিতে চায়, তবে স্বামী তাহা স্বীকার করিয়া লইতে পারে, কিন্তু স্ত্রী যদি

তাহা না পারে তবে স্বামীর এতটুকুও দুঃখিত হওয়া উচিত নয়—ইহাই ছিল আমার মত এবং সেইজন্য আমার স্ত্রীকে কিছুই বলিব না বলিয়াই স্থির করিলাম। অন্য ভগ্নীদের সহিত কথা বলিলাম, তাঁহারা ট্রান্সভালের সেই ভগ্নীদের মতই বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত ছিলেন এবং জেলে যাওয়ার জন্যও প্রস্তুত হইলেন। আমাকে কথা দিলেন যে, যতই দুঃখ হোক্ না কেন, জেলের কাল পূর্ণ অবশ্যই করিবেন। আমার স্ত্রী এই সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—"আমাকে এ খবর না দেওয়ায় আমার দুঃখ হইতেছে, আমার ভিতর এমন কি দুর্ব্বলতা দেখিতেছ যে, আমি জেলে যাইতে পারিব না? তুমি এই ভগ্নীদিগকে যে পথ লওয়ার পরামর্শ দিতেছ আমাকেও সেই পথই লইতে হইবে।" আমি বলিলাম—"তোমাকে দুঃখ দেওয়ার আমার ইচ্ছা নাই, আর ইহাতে অবিশ্বাসের কথাও নাই। তুমি আসিলে আমি সন্তুষ্টই হইব। কিন্তু আমার কথায় তুমি আসিতেছ ইহার আভাসমাত্রও আমার ভাল লাগে না। এই ধরণের কাজ সকলেরই নিজের সাহসেই করিতে হয়।" আরও বলিলাম—"আমার কথা রাখিবার জন্য তুমি সহজেই চলিয়া আসিবে, কিন্তু যদি কোর্টে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাক, হার মান, অথবা জেলের দুঃখে ভীত হইয়া পড়, তবে তোমাকে আমি কোনও দোষ দিব না বটে, কিন্তু আমার অবস্থাটা কি হইবে ভাবিয়া দেখ? তখন তোমাকে কেমন করিয়া আশ্রয় দিব, আর জগতের সম্মুখেই বা কি করিয়া দাঁড়াইব, এই ভাবিয়াই আমি তোমাকে কিছু বলিতেছি না।" তিনি জবাব দিলেন—"আমি যদি হার মানিয়া পলাইয়া আসি তবে আমাকে ঘরে স্থান দিও না। আমার ছেলেরা সহ্য করিতেছে, তোমরা সকলকেই সহ্য করিতে পারিবে আর আমিই পারিব না—একথা তুমি কি করিয়া ঠিক করিলে? আমি এই লড়াইয়ে যাইবই।" আমি জবাব দিলাম—"তাহা

হইলে আমি তোমাকে লড়াইয়ে লইবই, আমার সর্ত্ত তুমি জান, আমার স্বভাবও তুমি জান, এখন আরো বিচার করিতে হয় ত কর, আর পুনরায় ভাবিয়া যদি ইহাতে না আসিতে চাও তবে তাহাও করিতে পার।" আমাকে জবাব দিলেন—"বার বার ভাবার কিছু নাই, আমার সঙ্কল্প স্থির আছে।" ফিনিক্সে অন্য অধিবাসী ছিল, তাহাদিগকেও আমি স্বাধীনভাবে কর্ত্তব্য স্থির করিতে বলিলাম। আমি সকলকেই বার বার ও নানা রকম করিয়া একথা বুঝাইলাম যে, একবার যুদ্ধে প্রবেশ করিলে আর কোন ক্রমেই ফেরা নাই,—লড়াই অল্প দিনের জন্যই হোক্ আর দীর্ঘদিনের জন্যই হোক্, ফিনিক্স থাকে অথবা ধূলিসাৎ হইয়া যায়, শরীর ভাল থাকুক আর রোগই হোক্—কিছুতেই ফেরা নাই। সকলেই প্রস্তুত হইল। ফিনিক্সের বাহিরের একজন মাত্র এইদলে ছিলেন—শ্রীযুত রস্তমজী জীবনজী ঘোরখোদু। তিনি কিছুতেই যাওয়ার কথা শুনিয়া ঘরে থাকিতে চাহিলেন না, তিনি পূর্ব্বেও জেলে গিয়াছেন এবং এখনো যাওয়ায় আগ্রহ করিলেন। এই দলের লোকের নাম নীচে দেওয়া গেল :—

১। সৌভাগ্যবতী কস্তুর মোহন দাস গান্ধী। ২। সৌঃ জয়া কুম্বর মণিলাল ডাক্তর। ৩। সৌঃ কাশী ছগনলাল গান্ধী। ৪। সৌঃ সন্তোক মগনলাল গান্ধী। ৫। শ্রী পার্শী রস্তমজী জীবনজী ঘোরখোদু ৬। শ্রীছগন লাল কুশালচন্দ গান্ধী। ৭। শ্রীরাওজীভাই মণিলাল পটেল। ৮। শ্রীমগনভাই হরিভাই পটেল। ৯। শ্রীসোলোমন রায়পন। ১০। ভাই রামদাস মোহন চান্দ গান্ধী। ১১। ভাই রাজু গোবিন্দু। ১২। ভাই শিব পূজন বদ্রী। ১৩। ভাই গোবিন্দ রাজুলু। ১৪। কপ্পুস্বামী মুদালিয়ার। ১৫। ভাই গোকুল দাস হংসরাজ। ১৬। ভাই রেবাশঙ্কর রতনসী সোঢ়া।

অতঃপর কি হইয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিতেছি।

ষোড়শ অধ্যায়

স্ত্রীলোকেরা জেলে

এই দলকে সীমা পার হইয়া বিনানুমতিতে ট্রান্সভাল প্রবেশের জন্য জেলে যাইতে হইল। পাঠক নামগুলি পড়িয়া দেখিয়াছেন যে, ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। পুলিশ কদাচ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিত না। আমার সম্বন্ধেই এই রকম হইয়াছিল। দুই একবার আমাকে ধরার পর সীমা পার হওয়ার জন্য আর আমাকে ধরিত না। এই দল বাহির হওয়ার সংবাদ কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। খবরের কাগজে আর কোথা হইতে উঠিবে? তাহাদিগকে ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা পরিচয় না দিয়া বলিবে যে, আদালতে পরিচয় দিব।

পুলিশের কাছে এই ধরণের ব্যাপার প্রায়ই ঘটিত। ভারতীয়দের গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্কল্প লওয়ার পরে অনেক সময়ে মজা করার জন্যই তাহারা নাম বলিত না। সেইজন্য এইবারেও তাহাদের কিছু নূতন বোধ হইল না। পুলিশ এই দলকে গ্রেপ্তার করিল। মামলা চলিল ও সকলেরই তিন তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

যে ভগ্নীরা ট্রান্সভালে ধরা পড়িতে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন তাঁহারা নাতালে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে বিনানুমতিতে নাতালে প্রবেশের জন্য পুলিশ গ্রেপ্তার করিল না।

ধরা না পড়িলে তাঁহারা নিউকাস্‌লে গিয়া আড্ডা করিয়া সেখানকার কয়লার খনির ভারতীয় মজবদিগকে কাজ বন্ধ করার জন্য অনুরোধ

করিবেন বলিয়া স্থির ছিল। নিউকাস্‌ল ছিল নাতালের কয়লার খনির কেন্দ্রস্থল। এই সকল খনিতে প্রধানতঃ ভারতীয় মজুরেরাই কাজ করিত। ভগ্নীরা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের প্রভাব বিদ্যুৎ বেগে ছড়াইয়া পড়িল। তিন পাউণ্ড করের অবস্থার বর্ণনায় মজুরদের হৃদয় গলিয়া গেল। তাহারা নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া দিল। আমি টেলিগ্রাম পাইলাম। সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু তেমনি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। এখন কি করা যায়? আমি এই অদ্ভুত জাগৃতির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমার হাতে টাকা ছিল না, আর এত লোকও ছিল না যে, এই কার্য্য সামলাইতে পারি। আমার কর্ত্তব্য যাহা তাহা অবশ্য আমি বুঝিতে পারিলাম। আমাকে নিউকাস্‌ল যাইতে হইবে ও সেখানে গিয়া যাহা করার করিতে হইবে। আমি রওনা হইলাম।

এই সাহসী ভগ্নীদিগকে এখন সরকার আর না গ্রেপ্তার করিয়া পারেন না। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল, তাঁহারা প্রথম দলের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদেরও একই সাজা হইল—একই জেলে স্থান হইল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা জাগ্রত হইল, তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল। তাহাদের ভিতর নূতন চেতনা আসিয়াছে বলিয়া দেখা গেল। সেই সঙ্গে এই স্ত্রীলোকদিগকে উৎসর্গ করায় ভারতবর্ষও জাগ্রত হইয়া উঠিল। সার ফিরোজাশা মেটা আজ পর্য্যন্ত উদাসীন ছিলেন। ১৯০১সালে তিনি আমাকে এখানে না আসার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সত্যাগ্রহের যুদ্ধও তাঁহার মনে বিশেষ ঘা দিতে পারে নাই। কিন্তু এই স্ত্রীলোকদিগের জেল হওয়ার ঘটনা যেন তাঁহার উপর যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিল। তিনি নিজেই তাঁহার টাউনহলের বক্তৃতায় জানাইলেন যে, তাঁহার শান্তি

নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ এখন আর শান্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না।

স্ত্রীলোকদিগের বীরত্ব কি রকম! সকলকেই নাতালের রাজধানী মরিৎসবর্গের জেলে রাখা হয়। এখানে তাঁহাদিগকে খুব কষ্ট দেওয়া হয়। খোরাক যাহা দিত তাহা খাইয়া বাঁচা যায় না। মজুরীর জন্য তাঁহাদিগকে ধোবীর কাজ করিতে দিয়াছিল। বাহিরের কোনও খাদ্য দেওয়া প্রায় শেষ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল। এক ভগ্নীর বিশেষ খাদ্য খাওয়ার ব্রত ছিল। অনেক কষ্টে তাঁহাকে সেই খাদ্য দেওয়া স্থির হয়, কিন্তু জিনিষ এত খারাপ দিত যে, খাওয়া যাইত না। জলপাইয়ের তেলের আবশ্যক হইত। তাহা প্রথমে ত পাওয়াই যায় নাই, পরে পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহাও পুরানো ও খারাপ। নিজের পয়সায় কিনিয়া আনিতে দেওয়ায় অনুরোধ করিলে জবাব দেয়—"ইহা হোটেল নয়, যাহা দেওয়া হয় তাহাই খাইতে হইবে।" এই ভগ্নী যখন জেল হইতে বাহির হইলেন, তখন একেবারে অস্থিচর্ম্মসার। অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে বাঁচানো হইয়াছিল।

আর একজন স্ত্রীলোক সাংঘাতিক জ্বর লইয়া জেল হইতে বাহির হইলেন। জেল হইতে বাহির হওয়ার কয়েকদিন পরে সেই জ্বরেই ঈশ্বর তাঁহাকে লইলেন। তাঁহার কথা কি করিয়া ভুলিব!

ভালিয়ামার বয়স ছিল আঠারো। যখন আমি তাহার কাছে গেলাম তখন সে শয্যাশায়ী হইয়াছে। তাহার গড়ন ছিল লম্বা, তাহার কঙ্কালসার দেহ দেখিলে ভয় হইত।

"ভালিয়ামা, তোমার জেলে যাওয়ার জন্য ত অনুতপ্ত বোধ হইতেছে না?"

"অনুতাপ কেন হইবে! আবার যদি আমাকে ধরে তবে এখনো আমি জেলে যাইতে প্রস্তুত আছি।"

"কিন্তু যদি ইহাতেই মৃত্যু হয়?"

"হয় ত হোক্, দেশের জন্য মরিতে কার না ভাল লাগে।" এই কথাবার্ত্তার কিছুদিন পরেই ভালিয়ামার মৃত্যু হইল। তাহার দেহ গিয়াছে, কিন্তু এই বালিকা নিজেকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ভালিয়ামার মৃত্যুর পর শোক প্রকাশের জন্য উপযুক্ত সভা হয়। এই পবিত্র নারীর স্মরণার্থে 'ভালিয়ামা হল' স্থাপনের সঙ্কল্প করা হয়। এই হল স্থাপন করার ধর্ম্ম ভারতীয় সম্প্রদায় এখনো পালন করেন নাই। অনেক বিঘ্ন ঘটে। সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্দ্রোহ উপস্থিত হয়, প্রধান কার্য্যকর্ত্তারা একে একে পরলোকগমন করেন। সে যাহা হোক্, পাথর আর চূণ দিয়া হল তৈরী না হইলেও ভালিয়ামার সেবার বিনাশ নাই। সেই সেবার হল ত ভালিয়ামা নিজে হাতেই গড়িয়া গিয়াছে, তাহার মূর্ত্তি অনেকের হৃদয়ে আজও বিরাজ করিতেছে। যত দিন ভারতবর্ষের নাম থাকিবে, ততদিন দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসের সহিত ভালিয়ামা বাঁচিয়া থাকিবে।

এই ভগ্নীদের আত্মত্যাগ বিশুদ্ধ ছিল। ইঁহারা আইনের কথা কিছুই বুঝিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ভারতবর্ষের সম্বন্ধেই কোনো জ্ঞান ছিল না। তাঁহাদের দেশ-প্রেম কেবল শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদের অনেকে নিরক্ষর ছিলেন, সংবাদ পত্রের খবর তাঁহারা কি রাখিবেন? কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, সম্প্রদায়ের মানরূপ বস্ত্র হরণ করা হইতেছে। তাঁহাদের পক্ষে জেলে যাওয়া, আত্মোৎসর্গ করা—পবিত্র যজ্ঞ করা। এই প্রকার হৃদয়ের প্রার্থনা প্রভু শুনিয়া থাকেন। যজ্ঞের শুদ্ধতা যতটা ততটাই তাহার সফলতা। প্রভু ভক্তের ভক্তি

পাওয়ার জন্য বুভুক্ষু হইয়া আছেন। ভক্তি পূর্ব্বক অর্থাৎ নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে দেওয়া ফল, ফুল বা জল ঈশ্বর গ্রহণ করেন ও তাহার কোটিগুণ ফল দিয়া থাকেন। সুদামের পিটুলির চাপাটি ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছিলেন ও বহু বৎসরের ক্ষুধার উপশম করিয়াছিলেন। অনেক লোকের জেলে যাওয়া ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু একজন মাত্র শুদ্ধ আত্মার ভক্তির সহিত প্রদত্ত অর্ঘ কোন কালেও বিফল হইতে পারে না। কে বলিতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকায় কোন্ কোন্ লোকের যজ্ঞের ফল ফলিয়াছিল? কিন্তু এটুকু আমরা জানি যে, ভালিয়ামার যজ্ঞের ফল অবশ্যই ফলিয়াছিল, ভগ্নীদের যজ্ঞের ফলও অবশ্যই ফলিয়াছিল। স্বদেশের জন্য যজ্ঞে, জগতের জন্য যজ্ঞে অনেকে নিজেকে হোম করিয়াছে, আজও করিতেছে— ইহাই যথার্থ সেবা। আমরা ত জানিতে পারি না যে, কে শুদ্ধ। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা একথা জানিয়া রাখিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যদি একজনও শুদ্ধ হন, তবে তাঁহার যজ্ঞ, ফল প্রসব করার পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবী সত্যের বলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। অসৎ অসত্য অর্থাৎ যাহা নাই, সৎ সত্য অর্থাৎ যাহা আছে। অসতের যখন অস্তিত্ব নাই তখন সফলতা কোথা হইতে হইবে? আর যাহা সৎ তাহার নাশ কে করিতে পারে? ইহার মধ্যেই সত্যাগ্রহের সম্পূর্ণ শাস্ত্র রহিয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

মজুরের স্রোত

ভগ্নীদিগের এই ত্যাগের ফল মজুরদের উপর বড় অদ্ভুত হইল : নিউকাস্‌লের নিকটবর্ত্তী খনির মজুরেরা কাজ ছাড়িল। তাহাদের স্রোত চলিতে লাগিল। আমি সংবাদ পাইয়া ফিনিক্স হইতে নিউকাসলে আসিলাম।

এই সকল মজুরদের নিজেদের কোনও বাড়ীঘর ছিল না; মালিকেরাই তাহাদের ঘর দেয়, তাহাদের রাস্তায় আলো দেয়, মালিকেরাই তাহাদিগকে জল যোগায়। এই জন্য মজুরেরা সকল রকমেই পরাধীন। তাহাদের অবস্থা তুলসী দাস যেমন বলিয়াছেন :—

"পরাধীন স্বপনে সুখ নাহি"

এই হরতালিয়ারা আমার কাছে অনেক অভিযোগ লইয়া আসিতে লাগিল। কেহ বলে—মালিক রাস্তার বাতি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কেহ বলে—জল বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কেহ বা বলে—হরতালিয়াদের জিনিষ পত্র ঘর হইতে টানিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। এক পাঠান আসিয়া তাহার পিঠ দেখাইয়া আমাকে বলিল—"এই দেখুন আমাকে কেমন মারিয়াছে। আপনার জন্য আমি সেই বদমাসকে ছাড়িয়া দিয়াছি। আপনার যে সেই রকম হুকুম। আমি পাঠান। আর পাঠানেরা কখনো মার খায় না, মার দেয়।"

আমি জবাব দিলাম—"ভাই তুমি খুবই ভাল কাজ করিয়াছ, ইহাকেই আমি বাহাদুরী বলি। তোমার মত লোক লইয়াই আমি জিতিব।"

আমি তাহাকে ত ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম যে, অনেকের উপর যদি এই প্রকার মারপিট হইতে থাকে তবে হরতাল চলিবে না। এক মার দেওয়ার কথা ছাড়িয়া দিলে নালিশ করার আর কিছু ছিল না। যাহারা হরতাল করিতেছে তাহাদের বাতি-জল যদি বন্ধ করিয়া দেয় তবে অভিযোগ করার কিছু নাই। অভিযোগের হেতু থাকুক বা নাই থাকুক, এই অবস্থায় লোক থাকিতে পারিবে না, আমার একটা কোনও উপায় করিতেই হইবে। তাহা না হইলে, লোকের অপারগ হইয়া কার্য্যে যোগ দেওয়ার অপেক্ষা ইচ্ছা করিয়াই হার স্বীকার করিয়া কাজে ফিরিয়া যাওয়া ভাল। কিন্তু লোকে আমার এ উপদেশ শুনিবে না। একমাত্র পথ ছিল, এখন মজুরদের মালিকের বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া, আর তীর্থ যাত্রীর মত বাহির হইয়া পড়া।

মজুর বিশ পঁচিশ জন ছিল না। শত শত লোক হরতাল করিয়াছিল, হাজার হাজার লোকের হরতাল করারও বাধা ছিল না। উহাদের জন্য বাড়ী কোথায় পাইব? খাদ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিব? ভারতবর্ষ হইতে টাকা আনাইব না। ভারতবর্ষ হইতে যে অর্থ বৃষ্টি হইয়াছিল তাহা তখনো আরম্ভ হয় নাই। ভারতীয় বেপারীরাও এত ভয় পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারাও আমাকে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহাদের ব্যবসা খনির মালিকদের সহিত ও অন্য গোরাদের সহিত ছিল। সেই জন্য খোলাখুলিভাবে আমার সহিত তাঁহারা মিশিবেনই বা কি করিয়া? আমি যখনই নিউকাস্‌ল্‌ যাইতাম তখনই তাঁহাদের বাড়ীতে উঠিতাম। এখন আমি নিজেই তাঁহাদের রাস্তা সহজ করিয়া দিলাম। অন্যত্র উঠা স্থির করিলাম।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভগ্নীরা ট্রান্সভালে আসিয়াছিলেন।

তাঁহারা দ্রাবিড়ী ছিলেন। তাঁহারা এবারে তাঁহাদের এক খ্রীষ্টান কুটুম্বের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। এই পরিবার মধ্যবিত্ত। তাঁহাদের ছোট একটু জমি ছিল এবং তাহার উপর এক খানা তিন কামরা যুক্ত ঘর ছিল। আমি এইখানেই উঠা স্থির করিলাম। বাড়ীর কর্ত্তার নাম ছিল ল্যজরাস্। গরীবের আবার ভয়টা কি? ইঁহারা সকলেই গিরমিটিয়া আদি পুরুষের সন্তান, সেইজন্য ইঁহাদিগকেও তিন পাউণ্ড কর দিতে হইত। গিরমিটিয়াদের দুঃখের সহিত ইঁাহারা সম্পূর্ণ পরিচিত ছিলেন। এই পরিবার আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমাকে আশ্রয় দেওয়া কোনও দিনই সহজ কথা ছিল না, কিন্তু এখন আমাকে স্বাগত করা মানে অর্থ নাশকে স্বাগত করা, অথবা জেলে যাওয়াকে স্বাগত করা। ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অল্প লোকেই এই অবস্থায় পড়িতে চাহিবেন। আমার নিজেরও তাঁহাদের দিকে চাহিয়া এই কঠিন অবস্থায় ফেলিতে ইচ্ছা হইল না। ল্যজরাস্ বেচারার কিছু বেতন খোয়া যায় যাক্, তাঁহাকে যদি জেলে লইয়া যায় যাক্ কিন্তু তাঁহার অপেক্ষাও দরিদ্র গিরমিটিয়ারা দুঃখ কি করিয়া সহ্য করিবে? তাহাদের কাছে যে ভগ্নীরা ছিলেন তাহাদিগকে সাহায্য করায় গিরমিটিয়াদিগকে জেলে লইয়া যাইতে তিনি দেখিয়াছেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, মজুরদের প্রতি তাঁহারও একটা কর্ত্তব্য আছে। তিনি আমাকে আশ্রয় দিলেন। আশ্রয় ত বটেই—তিনি নিজের সর্ব্বস্বই দিলেন। আমার সেখানে যাওয়ার পর তাঁহার বাড়ীটা ধর্ম্মশালা হইয়া গেল। শত শত লোক যখন ইচ্ছা তখন আসা যাওয়া করিতেছে। তাঁহার বাড়ীর চারিদিকের স্থান লোকে ভরিয়া উঠিল। তাঁহার ঘরে সারা দিনরাত রান্না চলিতে লাগিল। আর সে কাজে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও দুইজনেই হাসিমুখে ছিলেন। তাঁহাদের মুখে আমি কখনো

অপ্রসন্নতা দেখি নাই। কিন্তু ল্যজরাস্ কি শত শত মজুরের খাওয়া যোগাইতে পারেন? মজুরদিগকে আমি বলিয়া দিয়াছিলাম যে, এই হরতাল স্থায়ী হইবে, সেইজন্য মালিকদের বাড়ী ঘর তাহারা ছাড়িয়া দিতে থাকুক। জিনিষ যদি কিছু বেচার মত থাকে তবে বেচিয়া ফেলুক্। বাকী সব নিজের নিজের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়া আসিবে। মালিকেরা উহাতে হাত দিবে না, আর যদি শত্রুতা করার জন্য উহা ফেলিয়া দেয় তবে সে লোকসানের ঝুঁকি লইতে হইবে। আমার কাছে আসিবার সময় পরিবার কাপড় ও গায়ে দেওয়ার কম্বল ছাড়া আর কিছুই আনিবে না। যতদিন হরতাল চলে, অথবা যতদিন তাহারা জেলের বাহিরে থাকিবে ততদিন আমি তাহাদের সঙ্গে থাকিব ও তাহাদিগকে খাওয়াইব। এই সর্ত্তে যদি তাহারা বাহির হইয়া আসিতে পারে, তবেই তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিবে ও সম্প্রদায় জিতিবে। এইরূপ করার যাহার সাহস নাই সে যেন নিজের কাজে ফিরিয়া যায়। যে ফিরিয়া যাইবে তাহাকে কেহ তিরস্কার করিতে পারিবে না, কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না। এই সর্ত্ত কেহ অস্বীকার করিয়াছিল বলিয়া আমার মনে পড়ে না। আমি যেদিন বলিলাম সেইদিন হইতে এই তীর্থযাত্রীদের কাতার জমিতে লাগিল। সকলেই নিজের স্ত্রী ছেলেপিলে লইয়া ও মাথায় কাপড়ের পোটলা লইয়া আসিতে লাগিল। আমার কাছে বাড়ী বলিতে খোলা জমি ছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়টাতে বর্ষাও ছিল না শীতও ছিল না।

আমার বিশ্বাস ছিল যে, ব্যবসায়ীরা ইহাদিগকে খাওয়াইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। নিউকাস্‌লের ব্যবসায়ীরা রান্না করার বাসন দিলেন ও চাল ডালের বস্তা পাঠাইয়া দিলেন। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা বেশী জিনিষ আসিতে লাগিল। সকলে জেলে যাইতে প্রস্তুত না থাকিলেও সকলের সহানুভূতি ছিল। সকলেই যথাশক্তি সাহায্য

করিতে প্রস্তুত হইল। যাহার কিছু দেওয়ার ছিল না, নিজের শরীর দিয়া সে সেবা দিতে লাগিল। এই অজ্ঞান অশিক্ষিত লোকদিগকে সামলাইবার জন্য শিক্ষিত বুদ্ধিমান স্বেচ্ছাসেবক আবশ্যক ছিল। তাহাও পাওয়া গেল। তাহারা আসিয়া অশেষ সাহায্য করিল। এইভাবে সকলে যথাশক্তি সাহায্য করিল ও পথ সহজ হইল।

লোক বাড়িতে লাগিল। এতগুলি লোক একস্থানে বিনা কর্ম্মে রাখা অসাধ্য না হইলেও বড় কঠিন কাজ। তাহাদের শৌচাদির রীতি ভাল ছিল না। ইহাদের ভিতর এমন লোকও ছিল যাহারা অপরাধ করিয়া জেল খাটিয়া আসিয়াছে। কেহ খুনী ছিল, কেহ বা চুরি করিয়া সাজা ভুগিয়া ফিরিয়াছে। কেহ বা ব্যভিচারের জন্য জেল খাটিয়া আসিয়াছে। যাহারা হরতাল করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কে নীতিপরায়ণ, কে নহে, আমি সে ভেদ ত করিতে পারি না। আমার কাজ ছিল কেবল হরতাল চালানো। ইহার মধ্যে অন্য সংস্কার অন্তর্ভুক্ত করিলে চলিবে না। এই দলের মধ্যে নীতি রক্ষা করার ভার আমার কাজ; কিন্তু অতীত কালে কে কি করিয়াছিল সে অনুসন্ধান করা আমার ধর্ম্ম ছিল না। আর এই ধরণের শিবচতুর্দ্দশীর মেলা যদি বসিয়া যায়, তবে তাহাতে নীতি ভঙ্গ না হইয়া যায় না। যতদিন ইহাদিগকে লইয়া কাটাইয়াছিলাম ততদিন শান্তি ছিল ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ঈশ্বর সকলকে আপন ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছিলেন কি না কে জানে, নচেৎ এমনভাবে কি করিয়া শান্তি ছিল?

আমি পথ পাইলাম। যেমন পূর্ব্বে সেই ১৬ জনের দল ট্রান্সভালের সীমায় প্রবেশ করায় জেলে গিয়াছে, আমি ঠিক করিলাম ইহাদিগকেও তেমনিভাবে লইয়া যাইব! এই দলকে ভাগ ভাগ করিয়া লইব—এক এক ভাগ সীমান্ত পার হইয়া যাইবে। কিন্তু আমি পরে এই মত ত্যাগ করিয়াছিলাম। কেননা বারে বারে লোক জেলে পাঠাইতে অনেক সময় লাগে। তাহা ছাড়া অনেক

লোক এক সঙ্গে গেলে যে কাজ হয় অল্প অল্প লোক গেলে সে কাজ হয়ও না।

আমাদের ওখানে এখন প্রায় পাঁচ হাজার লোক একত্র হইয়াছিল। এত লোক ট্রেণে লওয়া যায় না। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? আর ইহাতে লোকের পরীক্ষাও হইবে না। নিউকাস্‌ল হইতে ট্রান্সভালের সীমানা ৩৬ মাইল ছিল। নাতালের সীমান্ত গ্রাম ছিল চার্লসটাউন, ট্রান্সভালের ছিল ভোক্‌স্রাষ্ট। আমরা হাঁটিয়াই যাইব ঠিক করিলাম। মজুরদের সহিত পরামর্শ করিলাম। তাহাদের সহিত স্ত্রীলোক ও ছেলেপিলে ছিল। তাহাদের কেহ কেহ দ্বিধা করিল। হৃদয় কঠিন করা ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না। আমি জানাইলাম—যাহারা খনিতে ফিরিয়া যাইতে চায় তাহারা ফিরিতে পারে। কিন্তু কেহই ফিরিতে প্রস্তুত হইল না। যাহারা অশক্ত ছিল তাহাদিগকে ট্রেণে পাঠাইব স্থির করিলাম। বাকী সকলকেই পায়ে হাঁটিয়া চার্লসটাউন যাইতে হইবে একথা জানাইয়া দিলাম। এই পথটা দুইদিনে যাওয়ার কথা হইল। ইহাতে অবশেষে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। লোকেরা বুঝিল যে, বেচারা ল্যাজরাসের কিছু স্বস্তি হইবে। নিউকাসেলের গোরারা মড়কের ভয় করিতেছিল। তাহারা নানাপ্রকার ব্যবস্থা করার ভয় হইতে মুক্ত হইল। আমরাও তাহারা যে সব পীড়াদায়ক পথ অবলম্বন করিত তাহার ভয় হইতে মুক্ত হইলাম।

যখন এই যাত্রা স্থির হইল তখন খনির মালিকদিগের সহিত আমার দেখা করিবার জন্য ডাক আসিল। আমি ডারবান গেলাম। সেকথা নূতন অধ্যায়ে বলা হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

খনির মালিকগণ

খনির মালিকদের কথামত আমি তাহাদের সহিত দেখা করিতে ডারবান গেলাম। আমি বুঝিলাম যে, মালিকদের উপর কিছু প্রভাব হইয়াছে। তবে তাহাতে যে কিছু ফল হইবে সে আশা আমার ছিল না। কিন্তু সত্যাগ্রহীর নম্রতা রক্ষা করার সীমা নাই। সে মিটমাটের কোনও অবসরই ত্যাগ করে না। যদি কেহ সে জন্য তাহাকে ভীতু বলে, তবে তাহাও সহ্য করিতে হয়। যাহার নিজের বিশ্বাস আছে ও সেই বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন বল আছে, অপরে অগ্রাহ্য করিলেও সে দুঃখিত হয় না। সে নিজের অন্তরস্থ বলের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সেইজন্যই সে সকলের সহিত নম্র ব্যবহার দ্বারা লোককে বুঝাইতে পারে এবং তাহার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে।

সুতরাং মালিকদের এই নিমন্ত্রণ আমার কাছে ভাল লাগিল। আমি তাঁহাদের নিকট গেলাম ও উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করিলাম। আমার নিকট হইতে বুঝিতে না চাহিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি আমাকে জেরা করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাকে আমি যথাযোগ্য উত্তর দিলাম। তাঁহাকে আমি বলিলাম—"এই হরতাল বন্ধ করা আপনাদের হাতে।"

উত্তর পাইলাম—"আমরা ত সরকারের আমলা নাই"।

আমি বলিলাম—"আপনাদের সরকারের অধিকার না থাকিলেও আপনারা অনেক কিছু করিতে পারেন। আপনারা ত মজুরদের হইয়া লড়িতে পারেন। আপনারা যদি সরকারকে তিন পাউণ্ড কর উঠাইয়া

দিতে বলেন, তবে সরকার যে শুনিবে না, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আপনারা ইউরোপীয় মত গঠন করাইতে পারেন।"

"কিন্তু সরকারের সহিত কর দেওয়া লইয়া কথাবার্ত্তার সহিত এই হরতালের কি সম্বন্ধ আছে? যদি মালিকরা মজুরদিগকে কোনও কষ্ট দিয়া থাকে তবে রীতি অনুযায়ী তাহার জন্য আনজি করিতে পারেন।"

"মজুরদের কাছে হরতাল করা ছাড়া আর কোন পথ আছে বলিয়া আমি দেখি না। তিন পাউণ্ড কর মালিকদের সুবিধার জন্যই বসানো হইয়াছে। মালিকরা মজুরদের দ্বারা মজুর খাটাইয়া লইতে চায়, অথচ তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিতে চায় না। সেইজন্য এই কর উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত মজুরদের হরতাল করাতে কোনও নীতিগর্হিত কার্য্য, অথবা মালিকদের প্রতি কোনও অন্যায় হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না।"

"তাহা হইলে আপনি মজুরদিগকে কাজে যাইতে বলিবেন না?"

"আমি নিরুপায়।"

"ইহার পরিণাম কি তাহা জানেন ত?"

"আমি সাবধান আছি, আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ খেয়াল আছে।"

"সে কথা ঠিক, আপনার ক্ষতিটা আর কি হইবে? কিন্তু এই মূর্খ অবোধ মজুরদের যে লোকসান হইবে তাহা কি আপনি দিবেন?"

"মজুরদের লোকসান হইবে ইহা জানিয়া শুনিয়াই তাহারা এই হরতাল আরম্ভ করিয়াছে। আত্মসম্মান ত্যাগ অপেক্ষা অধিক লোকসান আর কি আছে, আমি জানি না। মজুরেরা যে ইহা বুঝিয়াছে ইহাতেই আমার সন্তোষ।"

এই ধরণের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। সকল কথা আজ স্মরণ নাই।

আমার যতটা মনে ছিল তাহাই সংক্ষেপে লিখিলাম। মালিকদের নিকটই তাঁহাদের মামলা কম জোর বোধ হইতেছিল।

ডারবানে যাতায়াতে আমি দেখিলাম যে, ট্রেণের গার্ড ইত্যাদির উপর এই হরতালের প্রভাব ও মজুরেরা যে শান্তভাবে আছে তাহার প্রভাব খুব ভাল হইয়াছিল। আমি তৃতীয় শ্রেণীতেই চলাফেরা করিতাম। আমাকে সেইখানেই রেলের গার্ড ও কর্ম্মচারীরা ঘিরিয়া লইত, আগ্রহের সহিত সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত। সকলেই আমাদের জয় কামনা করিত। আমাকে নানা প্রকারের ছোট খাট সুবিধা করিয়া দিত। আমিও তাহাদের সহিত সম্বন্ধ নির্ম্মল রাখিতাম। আমি কোনও সুবিধাই অনুভব করিতাম না। তাহারা স্বেচ্ছায় যে বিনয় প্রকাশ করিত তাহা আমার নিকট রুচিকর বোধ হইত, কিন্তু তাহাদের বিনয় আদায় করিয়া লওয়ার জন্য কখন চেষ্টা করি নাই। গরীব, অশিক্ষিত, অবুঝেরা যে এত দৃঢ়তা দেখাইতে পারে ইহা তাঁহাদের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। দৃঢ়তা ও সাহস এমন গুণ যে, বিরুদ্ধ পক্ষের উপরও তাহা প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

নিউকাস্‌লে ফিরিলাম। লোকের যেন স্রোত চলিতেছিল। লোকদিগকে সকল কথা মোটামুটি বুঝাইলাম। তাহারা যদি ফিরিতে চায় ত ফিরিতে পারে, একথাও বলিলাম। মালিকেরা যে ধমক দেখাইয়াছে তাহাও শুনাইলাম। ভবিষ্যতে যে বিপদ হইতে পারে, তাহাও তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। লড়াই কবে শেষ হইবে তাহার ঠিক নাই—সে কথা এবং জেলের দুঃখের কথা বলিলাম। কিন্তু সকলেই অটল রহিল। "আপনি যতদিন লড়াই করিবেন, আমরা হটিব না। আমাদের যে দুঃখ হইবে তাহা বুঝিয়াছি। আমাদের জন্য চিন্তা করিবেন না"—এইভাবে নির্ভীক জবাব দিল।

এখন যাত্রা করা বাকী ছিল। একদিন প্রভাতে উঠিয়া যাত্রা করিতে বলিলাম। রাস্তায় চলার নিয়ম শুনাইলাম। পাঁচ ছয় হাজার লোক লইয়া চলা যে সে কথা নয়। তাহারা সংখ্যায় কত ছিল আমার তাহাও গুণতি করা ছিল না। তাহাদের নাম ধাম কিছুই জানা ছিল না। যাহারা আছে তাহারা আছে—এমনি ধারা ছিল হিসাব। সকলকে দশ ছটাক রুটি ও আড়াই তোলা গুড় ছাড়া আর কিছু দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। ইহা ছাড়া রাস্তায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যাহা কিছু দেয়। কিন্তু লোকেরা এই রুটি ও গুড়েই সন্তুষ্ট ছিল। বুয়ার যুদ্ধ ও জুলু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমার খুব কাজে লাগিল। দরকারের বেশী কাপড় সঙ্গে থাকিবে না—এই সর্ত্ত ছিল। রাস্তায় কেহ কোন দ্রব্য লইতে পারিবে না। কোন আমলা অথবা ইংরাজের সঙ্গে দেখা হইলে যদি গালি দেয়, মারও যদি দেয় তবে সহ্য করিতে হইবে। আর কয়েদ যদি করে তবে ত কাজই হইল। আমাকে যদি কয়েদ করে তবুও তাহারা চলিতে থাকিবে। এই ধরণের সমস্ত কথা শিখাইয়া দিলাম। আমার অবর্ত্তমানে কাহার পর কে এই বাহিনীকে চালাইবে তাহাও শুনাইয়া দিলাম।

সকলেই বুঝিল। ভালভাবে সকলে চার্লসটাউন পঁহুছিলাম। চার্লস টাউনের ব্যবসায়ীরা খুব সাহায্য করিল। তাহাদের বাড়ী ব্যবহার করিতে দিল। মসজিদের আঙ্গিনায় রান্না করার আজ্ঞা দিল। রাস্তায় চলিতে যে রসদে চলে, বিশ্রাম কালে তাহাতে চলে না, এই জন্য রান্নায় বাসন আবশ্যক ছিল। তাহাও ব্যবসায়ীরাই খুসী হইয়া দিলেন। আমাদের সঙ্গে চাউল যথেষ্ট ছিল, ব্যবসায়ীরা নিজেদের অংশ দিলেন।

চার্লসটাউনকে ছোট গ্রাম বলা যাইতে পারে। এসময় সেখানে চার পাঁচ হাজারের বেশী লোক ছিল না। সেখানে এত লোক রাখা কঠিন

ছিল। ছেলেপিলেদিগকে বাড়ীতে রাখিলাম। অনেককে ময়দানেই রাখা হইল।

এখানকার অনেক মধুর স্মৃতি রহিয়াছে; কিছু সুখদায়ক স্মৃতিও আছে। মধুর স্মৃতির মধ্যে চার্লসটাউনের স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের আমলাদের কথা রহিয়াছে। তাহারা এত লোক দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া গেলেন ও কোনও কড়া ব্যবস্থা করার পরিবর্তে আমার সহিত দেখা করিলেন। কোনো কোনো ব্যবস্থা করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে চাহিলেন। তিনটা জিনিষ ইউরোপের লোকেরা সামাল করিয়া চলে, আমাদের লোকেরা করে না। জলের শুদ্ধতা এবং রাস্তা ও পায়খানার শুদ্ধতা। কথা হইল যে,রাস্তায় জল ফেলিতে পারিবে না, যেখানে সেখানে প্রস্রাব করিতে পারিবে না ও কোথাও আবর্জ্জনা ফেলিতে পারিবে না। তাঁহারা যে স্থান দেখাইয়া দিবেন সেই স্থানে লোকদিগকে রাখিতে হইবে এবং তাহাদের পরিচ্ছন্নতার জন্য আমাকে দায়ী হইতে হইবে। এ সকলই আমি ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম। আমি সম্পূর্ণ শান্তি পাইলাম।

আমাদের লোকদিগের দ্বারা এই নিয়ম পালন করানো খুব কঠিন ছিল। কিন্তু যাত্রীরা ও সাথীরা মিলিয়া কাজ সহজ করিয়া দিয়াছিল। আমার এই অভিজ্ঞতা আছে যে, যদি সেবক সেবা করে, হুকুম না করে, তবে অনেক কিছু করা যায়। সেবক যদি শরীর খাটায় তবে অপরেও খাটায়। এই বাক্যের সম্পূর্ণ প্রমাণ এই ছাউনীতে পাওয়া গিয়াছিল। আমার সাথীরা ও আমি ঝাড়ু দিতে, ময়লা সাফ্ প্রভৃতি কাজ করিতে কুণ্ঠিত ছিলাম না। লোকেরা সেই জন্য উৎসাহের সহিতই কাজ করিত। এই প্রকার না করিলে হুকুম দিয়া কে কাজ করাইবে? একে অপরকে যদি কেবল হুকুম করে তবে কাজ হয় না। কিন্তু সরদার নিজেই

যেখানে সেবক হয়, সেখানে সরদারীর দাবি আর কে করিতে চায়?

আমার সঙ্গীদিগের মধ্যে কলেনবেক পঁহুছিয়া গিয়াছিলেন। মিস্ শ্লেশিনও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই মেয়েটির পরিশ্রম করার শক্তি, মহৎ হৃদয় ও বিশ্বস্ততার যতই কেন প্রশংসা করি না, কিছুতেই তাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা যায় না। ভারতীয়দের মধ্যে ৺ পি, কে নাইডু ও ক্রিষ্টফরের নাম মনে পড়ে। আর কাহারও নাম মনে আসিতেছে না। ইঁহারা খুব পরিশ্রম করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

রান্নার মধ্যে ছিল ভাত আর ডাল। তরকারী খুব পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা আলাদা করিয়া রান্না করার বাসনের সুবিধা ছিল না। সেইজন্য একই পাত্রে ডালের সহিত মিশাইয়া রান্না করা হইত। রান্না চব্বিশ ঘণ্টাই চলিত। কেননা যখন তখন ক্ষুধার্ত্ত লোক আসিয়া উপস্থিত হইত। নিউকাসলে কাহারও থামিবার কথা ছিল না। চার্লস্‌টাউন আসার পথ সকলেরই জানা ছিল, সেইজন্য খনি হইতে রওনা হইয়া লোকে সোজা চার্লস্‌টাউনে আসিতেছিল।

যখন লোকের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার কথা ভাবি, তখন আমি কেবল ঈশ্বরের মহিমাই দেখিতে পাই। রান্নার প্রধান ভার আমি লইয়াছিলাম। কখনো ডালে বেশী জল হইত, কখনো কাঁচা থাকিত। কখনো তরকারী কখনো ভাত কাঁচা থাকিয়া যাইত। এই খাদ্য হাসি মুখে খায়, এমন লোক আমি জগতে কমই দেখিয়াছি। বরঞ্চ ইহার উল্টাই দেখিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে শিক্ষিত বলিয়া গণ্য ব্যক্তিদের খাদ্যের পরিমাণ কম হইলে, কাঁচা থাকিলে অথবা দিতে বিলম্ব হইলেই মেজাজ বিগড়াইত। রান্না করা অপেক্ষা পরিবেশন করা বেশী মুস্কিলের কাজ ছিল, উহাও আমারই হাতে রাখিয়াছিলাম। রান্না ভাল

ও মন্দ হওয়ার দায়িত্ব আমিই লইয়াছিলাম। লোক বেশী হওয়ায় খোরাকের পরিমাণ যখন কম হইয়া যায়, তখন কম পরিবেশন করিয়া সন্তুষ্ট করা আমারই হাতে ছিল। যে ভগ্নীদের পাতে কম দিয়াছি তাহারা তিরস্কার পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমার অবস্থা বুঝিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছে, খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ দৃশ্য জীবনে ভুলিবার নয়। আমি বলিয়া ফেলিতাম—"আমি নিরুপায়, রান্না কম আছে, লোক হইয়াছে, যাহা আছে তাহাই ভাগ করিয়া দিতেছি।" ইহাতে তাহারা আমার অবস্থা বুঝিতে পারিত এবং সন্তোষের সহিত ভোজন করিয়া যাইত।

এ সকলি মধুর স্মৃতি। কিন্তু তিক্ত স্মৃতির কথা বলি। যখনই বিশ্রাম করার অবকাশ হইত তখনই কোন্দল হইত, ব্যভিচারেরও অভিযোগ আসিত। স্ত্রী-পুরুষকে একসঙ্গে রাখিতে হইত—এতই ভিড় ছিল। ব্যভিচারীর কি আর লজ্জা সরম আছে? এই রকম অভিযোগ হইলেই আমি সেখানে গিয়া পঁহুছিতাম। লজ্জা পাইত। তাহাদিগকে আলাদা করিয়া রাখা হইত। কিন্তু আমি জানি না এমন কত ঘটনা যে হইয়া গিয়াছে কে বলিতে পারে? এ সকল বেশী বর্ণনা করা নিরর্থক। তবে সকলই যে ঠিক মত হয় নাই, এই কথা জানাইবার জন্য ইহার অবতারণা করিয়াছি। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে, এমন ঘটনাতেও কেহ ঔদ্ধত্য দেখায় নাই। ভাল আবেষ্টনে পড়িয়া জঙ্গলী স্বভাবের লোক, যাহাদের ভাল মন্দের বিচার নাই, তাহারাও যে ভাল থাকে ইহা আমি তখন অনেকবার দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই অভিজ্ঞতা আমার আবশ্যক ছিল, আমার ইহাতে উপকার হইয়াছিল।

উনবিংশ অধ্যায়

ট্রান্সভালে প্রবেশ

১৯১৩ সালের নভেম্বরের প্রথম ভাগের কথা বলিতেছি। যাত্রীদের সঙ্গে চলার বর্ণনা করার পূর্ব্বে দুইটি ঘটনার কথা লিখিব। যখন ট্রান্সভালে দ্রাবিড় ভগ্নীগণ জেলে গেলেন তখন ফতেমা বাঈ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও সাত বৎসরের ছেলে লইয়া গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য উপস্থিত হইলেন। মাতা ও কন্যাকে জেলে লইয়া সরকার ছেলেটিকে জেলে লইতে অস্বীকার করিলেন। ফতেমা বাঈ-এর আঙ্গুলের টিপ পুলিশ লইতে চাহিলে তিনি নির্ভীকভাবে ছাপ দিতে অস্বীকার করেন।

হরতাল খুব জোরে চলিতেছিল। পুরুষ ও স্ত্রীলোক সমানে যোগ দিতেছিল। ইহাদের মধ্যে দুইটি ছেলে এবং তাহাদের মা ছিল। একটি ছেলের যাত্রা পথে সর্দ্দি হয় ও সে মৃত্যুর শরণ লয়। আর একজনার ছেলে একটা খাদ পার হইতে কাঁখ হইতে পড়িয়া যায় ও জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু মায়েরা ইহাতেও হতাশ হয় নাই। উভয়ের পথ চলা চলিতে থাকে। একজন বলিল—"আমরা মৃতের জন্য শোক করিয়া কি করিব, জীবিতের সেবা করিয়া যাওয়াই আমাদের ধর্ম্ম।" এই প্রকার শান্ত বীর্য্য, এই প্রকার ঈশ্বরে আস্থা, এই প্রকার জ্ঞান আমি গরীবদের ভিতর অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি। এই প্রকার দৃঢ়তার সহিত স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা চার্লস্‌টাউনে তাহাদের কঠিন কর্ত্তব্য পালন করিতেছিল। কিন্তু আমরা কিছু শান্তি পাওয়ার জন্য চার্লস্‌টাউনে আসি

নাই। শান্তি যাহার চাই তাহার সে পদার্থের জন্য নিজ অন্তর মধ্যে খোঁজার আবশ্যক ছিল। বাহিরে যেখানেই তাকানো যাক্, সর্ব্বত্র যেন স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল—"এখানে শান্তি নাই।" কিন্তু এই প্রকার বাহ্যিক অশান্তির মধ্যেই মীরাবাঈ-এর ন্যায় ভক্তেরা বিষের পেয়ালা হাতে তুলিয়া হাসিমুখে পান করিয়াছেন। এমনি অবস্থায় অন্ধকার কারাকক্ষে সক্রেটিস্ হাতের সম্মুখে বিষের পাত্র রাখিয়া আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে বসিয়া বন্ধুদিগকে জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন ও আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন যে, "শান্তি যদি চাও তবে নিজের হৃদয়ের মধ্যে উহার অনুসন্ধান কর।"

এই জাতীয় শান্তির মধ্য সত্যাগ্রহীর দল ছাউনীতে বাস করিয়া, কাল কি হইবে সে বিষযে নিশ্চিন্ত মনে থাকিত।

আমি সরকারকে পত্র দিয়াছিলাম যে, আমরা ট্রান্সভালে বাস করার জন্য প্রবেশ করিতেছি না। সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্যই আমরা প্রবেশ করিতেছি এবং আমাদের আত্মসম্মান নষ্ট করার জন্য আমাদের যে খেদ হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়ার জন্য প্রবেশ করিতেছি। যদি আমাদিগকে চার্লস্‌টাউনেই গ্রেপ্তার করা হয় তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই। আপনারা ইহা না করিলে কেহ যদি ইহার মধ্য হইতে গোপনে ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়া যায় তাহার জন্য আমরা দায়ী হইব না। এই কার্য্যে কেহই ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখিতেছে না এবং কেহ গোপনে প্রবেশ করে ইহা আমাদের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু যেখানে হাজার হাজার অপরিচিত লোক একত্র হইয়াছে, যেখানে প্রেমের বন্ধন ব্যতীত অন্য কোনও শাসনের ব্যবস্থাও নাই, সেখানে কোনও ব্যক্তির কার্য্যের জন্য দায়ী হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আপনারা ইহা জানিবেন যে, যদি তিন পাউণ্ড কর উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে গিরমিটিয়ারা ফিরিয়া

যাইবে ও হরতাল বন্ধ হইবে। আমাদের অন্যান্য দুঃখ দূর করার জন্য যে সত্যাগ্রহ চলিতেছে, তাহাতে ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে না।

এখন সরকার কবে আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন তাহার ঠিক নাই। এই অনিশ্চিত অবস্থায় অনেকদিন সরকারের উত্তরের জন্য বসিয়া থাকা যায় না। একটা ডাক কি দুইটা ফিরতি ডাকের অপেক্ষা করা যায়। যদি ইতিমধ্যে সরকার গ্রেপ্তার না করে, তবে তখন চার্লস্‌টাউন ত্যাগ করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করা স্থির করিলাম। রাস্তায় গ্রেপ্তার না করিলে যাত্রীদল প্রতিদিন কুড়ি পঁচিশ মাইল করিয়া আট দিন চলিতে থাকিবে। আট দিনে টলষ্টয় ফার্ম্মে পঁহুছিবে আশা করা যায়। যে পর্য্যন্ত লড়াই চলে সে পর্য্যন্ত সকলে সেইখানে থাকিবে ও ফার্ম্মে কাজ করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করিবে—এই প্রকার ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম। মিঃ কলেনবেক সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানে উহাদের জন্য ঘর তৈরী করা হইবে এবং এই যাত্রীদলই সে কাজ করিবে। যতদিন ঘর তৈরী শেষ না হইতেছে ততদিন অসমর্থেরা তাঁবুতে থাকিবে, বাকী সকলেই খোলা জমিতে বাস করিবে। অসুবিধা ছিল যে, বর্ষাকাল আসন্নপ্রায়। সে সময় সকলেরই মাথা গুঁজিবার কোনও আশ্রয় চাই। কিন্তু সেদিকে যাহা দরকার তাহা করিয়া লইতে পারিবেন বলিয়া মিঃ কলেনবেকের আশা ছিল।

যাত্রীদের যাত্রার অন্যান্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। চার্লস্‌টাউনের ডাক্তার একটা ছোট ঔষধের বাক্স সাজাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর আমার মত লোক ব্যবহার করিতে পারে এমন যন্ত্রাদিও কিছু দিয়াছিলেন। এই বাক্স ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, কেন না যাত্রীদলের সহিত কোনও যানবাহন ছিল না।

পাঠকেরা হয়ত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অতি সামান্য মাত্র ঔষধই লওয়া হইয়াছিল। একশত লোক একবারে যতটুকু ব্যবহার করিতে পারে ততটুকু মাত্র। তাহার কারণ ছিল আমরা কোনও না কোনও গ্রামের কাছেই ছাউনী করিতাম। যে ঔষধ কম পড়িত তাহা সেইখান হইতেই লওয়া যাইত। আর যদি কেহ অসমর্থ হইয়া পড়িত, তবে তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইত না, রাস্তাতেই কোথাও রাখিয়া যাওয়া হইত—এইরূপই স্থির হইয়াছিল।

খাওয়ার জন্য রুটি ও গুড় ছাড়া আর কিছু আবশ্যক নাই। কিন্তু আট দিন এই খোরাকই বা কে যোগাইবে? রোজকার রোজ এই খাদ্য পঁহুছিয়া দেওয়া চাই। কেননা সঙ্গে ভাণ্ডার বহিয়া লওয়া চলিবে না। এই কার্য্য কে করিবে? কোনও ভারতীয়ের পাউরুটির কারখানা ছিল না। প্রত্যেক গ্রামেও রুটি তৈরীর ব্যবস্থা নাই, সহর হইতেই গ্রামে রুটি আসে। তাহা হইলেই কোনও রুটিওয়ালাকে ভার লইতে হয় এবং রেলযোগে প্রতিদিন পঁহুছাইয়া দিতে হয়। ভোকস্রাষ্ট চার্লস্‌-টাউন হইতে বড় যায়গা। সেখানে রুটির বড় কারখানা ছিল। একজন দোকানদার খুসী হইয়া যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রুটি পঁহুছিয়া দিতে স্বীকার করিলেন। আমাদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা জানিয়া বাজারের অপেক্ষা অধিক দাম লওয়ার চেষ্টাও তিনি করেন নাই। ভাল আটা হইতেই রুটি বানাইয়া দিতেন। তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে পঁহুছাইয়া দিতেন ও রেলওয়ালারা কেবল যে বিশ্বস্ততার সহিত আমাদিগকে উহা দিয়া দিতেন তাহাই নহে, (তাহারা সকলেই গোরা ছিলেন) উপরন্তু আমাদের জন্য কিছু কিছু বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, আমাদের সহিত কাহারও শত্রুতা নাই, আমরা কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাই না, নিজেরা দুঃখ পাইয়াই প্রতিকার করিতে চাই।

আমাদের চারিদিকের আবেষ্টন এই ভাবে শুদ্ধ হইয়াছিল ও শুদ্ধই থাকিয়া গিয়াছিল। মানুষের মধ্যে যে প্রেমভাব আছে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমরা খৃষ্টান্, ইহুদী, হিন্দু বা মুসলমান যাহাই হই না কেন, আমরা যে সকলেই ভাই এই ভাব সকলেই অনুভব করিতেছিলেন।

এই ভাবে যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া আমি মিটমাটের জন্য আর একবার চেষ্টা করিলাম। পত্র ও টেলিগ্রাম ইত্যাদি ত পাঠানো হইয়াই ছিল। আমি স্থির করিলাম যে, একবার টেলিফোন করিয়া দেখিব, তাহাতে আমাকে অপমান করে ত করিবে। চার্লসটাউন হইতে প্রিটোরিয়ায় টেলিফোন ছিল। আমি সেক্রেটারীকে বলিলাম যে, "জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে বলুন যে, আমার যাত্রার জন্য সব প্রস্তুত। ভোকস্রাষ্টের গোরারা উত্তেজিত হইয়া আছে, তাহারা আমাদের প্রাণ হানিও করিতে পারে। সেই ভয়ই তাঁহারা দেখাইতেছেন। তিনি হয়ত ইহা ইচ্ছা করেন না। যদি তিন পাউণ্ড কর রদ করার কথা দেন, তবে আমি যাত্রা আরম্ভ করি না। আমি আইন ভঙ্গ করার জন্যই বে-আইনী করিতেছি না, আমি নিরুপায় হইয়া করিতেছি। তিনি কি আর একথা শুনিবেন না?" আধ মিনিটের মধ্যেই জবাব আসিল—"জেনারেল স্মাট্‌স্‌ আপনার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতে চাহেন না, আপনার যাহা খুসী করিতে পারেন।" টেলিফোন বন্ধ হইল।

ইহাই হইবে আমি জানিতাম, কিন্তু অভদ্র জবাবটা আশা করি নাই। আজ ছয় বৎসর হইল সত্যাগ্রহের জন্য আমার সহিত সরকারের সম্বন্ধ চলিতেছিল, সেই জন্য আমি বিনয়ের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিকট বিনীত ব্যবহার পাওয়া আমার কিছু গর্ব্বের বিষয় নহে। আর তাঁহার এই অবিনয়ে আমি দমিয়াও গেলাম না।

আমার কর্ত্তব্যের সরল ও সহজ পথ আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম। পরের দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা প্রার্থনা করিয়া যাত্রা সুরু করিলাম। যাত্রীদলে ২০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন স্ত্রীলোক ও ৫৭ জন বালক-বালিকা ছিল।

বিংশ অধ্যায়

মহা অভিযান

এই যাত্রীদল ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে রওনা হইল। চার্লসটাউন হইতে এক মাইল দূরেই ভোকস্রাষ্টের খাদ ছিল। সেই খাদটা পার হইলে ভোকস্রাষ্টে বা ট্রান্সভালে প্রবেশ করা হয়। এই সীমার প্রবেশ মুখে এক দল ঘোড় সওয়ার ছিল। আমি প্রথম তাহাদের নিকট গেলাম ও যাত্রীদিগকে বলিয়া গেলাম যে, আমি সঙ্কেত করিলে খাদ পার হইবে। কিন্তু আমি যখন পুলিশের সহিত কথা বলিতেছি, তখন অকস্মাৎ যাত্রীদল খাদ পার হইয়া পড়িল। সওয়ারেরা ফিরাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু রোখা সম্ভব হইল না। আমাদিগকে গ্রেপ্তার করার সঙ্কল্প পুলিশের ছিল না। আমি যাত্রীদিগকে শান্ত করিলাম। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলার কথা বুঝাইলাম। পাঁচ সাত মিনিটে সব শান্ত হইয়া গেল। ট্রান্সভালের ভিতর যাত্রা সুরু হইল।

দুই দিন পূর্ব্বে ভোক্স্রাষ্টে সভা হইয়াছিল; তাহাতে অনেক ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়াছিল যে, যদি ভারতীয়েরা ট্রান্সভালে প্রবেশ করে তবে তাহারা বন্দুক চালাইবে। এই সভায় মিঃ কলেনবেক গোরাদিগকে বুঝাইতে গিয়াছিলেন। কেহই কলেনবেকের কথা শুনিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা কলেনবেককে মারিতে উঠিয়াছিল। কলেনবেক স্যাণ্ডোর নিকট হইতে কসরৎ শিখিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভয় দেখান শক্ত। এক গোরা তাঁহাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে। মিঃ কলেনবেক বলেন,—"আমি শান্তি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই

জন্ত আমি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামিতে পারি না। তবে আমাকে যাঁহারা প্রহার করিতে চাহেন তাঁহারা যত ইচ্ছা করিতে পারেন। কিন্তু আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই সভাতে বলিবই। আপনারা প্রকাশ্যভাবে সকল গোরাকেই আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সকল গোরাই আপনাদের মত নির্দোষ মানুষকে মারিতে ইচ্ছুক নয়—আমি এই কথাই শুনাইতে আসিয়াছি। একজন গোরা অন্ততঃ এমন আছে, যে আপনাদিগকে শুনাইতে চায় যে, আপনারা ভারতীয়দের উপর যে দোষ দিতেছেন তাহা মিথ্যা। আপনারা যাহা মনে করিতেছেন ভারতীয়েরা তাহা চায় না। তাহারা আপনাদের রাজত্ব চায় না, আপনাদিগের সহিত লড়াই করিতে চায় না, নিজেদের লোক দিয়া এই দেশ ভরিয়া ফেলিতে চায় না—তাহারা কেবল ন্যায় চায়। যাহারা ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতেছে তাহারা এখানে বাস করার জন্য আসিতেছে না, তাহাদের উপর যে অন্যায় কর বসানো হইয়াছে, তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ তাহাদের এই প্রবেশ। তাহারা সাহসী, তাহারা আপনাদের কোনও ক্ষতি করিবে না, আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, কিন্তু আপনাদের গোলাগুলী সহ্য করিয়াও প্রবেশ তাহারা করিবেই। আপনাদের গোলা, আপনাদের বল্লমের ভয়ে তাহারা ফিরিবে না। তাঁহারা দুঃখ সহ্য করিয়া আপনাদের হৃদয় গলাইবে। আমি এই কথা বলিতেই এখানে আসিয়াছি। এ কথা বলিয়া আমি আপনাদের সেবাই করিতেছি। আপনারা সাবধান হউন, অন্যায় হইতে নিবৃত্ত হউন।" লোকেরা লজ্জিত হইল। যে পালোয়ান দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল সে মিত্রতা করিল।

আমরা এই সভার খবর জানিতাম, সেইজন্ত ভোকস্রাষ্টে কিছু হাঙ্গামা হইবে বলিয়া প্রস্তুত ছিলাম। ভোকস্রাষ্টের গোরারাও তৈরী হইয়াছিল। যাহাতে গোরারা অন্যায় কিছু না করে সেইজন্যই হয়ত অনেক পুলিশও

জমায়েৎ হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, আমাদের শোভাযাত্রা শান্তিতেই চলিতে লাগিল। কোনো গোরাও কোথাও পরিহাস করিয়াছে একথা শুনিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। সকলেই যেন নূতন তামাসা দেখার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের কাহারও কাহারও চক্ষুতে মিত্রতার দৃষ্টি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

ভোকস্রাষ্ট হইতে আট মাইল দূরে একস্থানে আমাদের প্রথমদিন থাকার কথা। আমরা সেখানে সন্ধ্যা ৬টা ৭টার সময় পঁহুছিলাম। যাত্রীরা রুটি গুড় খাইয়া খোলা মাঠে পড়িয়া রহিল। কেহ বা ভজন গাহিতেছিল, কেহ বা কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। কয়েকজন স্ত্রীলোক একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ছেলে বহিয়া চলার সাহস লইয়া বাহির হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এখানে আসার পর আর তাহাদের চলার শক্তি ছিল না। সেইজন্য পূর্ব্ব নির্ণীত সর্ত্ত অনুসারে একজন ভাল ভারতীয় দোকানদারের নিকট তাহাদিগকে রাখিয়া গেলাম। বলিয়া গেলাম, আমরা যদি টলষ্টয় ফার্ম্মে পঁহুছিতে পারি তবে যেন সেইখানে পাঠাইয়া দেয়; আর যদি গ্রেপ্তার হই তবে যেন তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দেয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আমার এই অনুরোধ রাখিতে স্বীকার করিলেন।

রাত্রি গভীর হইল, সকলে শান্ত হইয়া গেল। আমি ঘুমাইতে যাইব, এমন সময় খট্‌মট্‌ শব্দ শুনিলাম। লণ্ঠন লইয়া গোরা আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম। আমার তৈরী হওয়ার কিছুই ছিল না। পুলিশের লোক বলিল—

"আপনার নামে আমার নিকট ওয়ারেণ্ট রহিয়াছে, আপনাকে আমার গ্রেপ্তার করিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কখন?"

"এখনি"—জবাব পাইলাম।

"আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন ?"

"এখন নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে, তারপর গাড়ী আসিলে ভোকস্রাষ্ট।"

আমি বলিলাম—"আচ্ছা আমি কাহাকেও না জাগাইয়াই আপনার সহিত আসিতেছি। তবে আমার সাথীকে কিছু উপদেশ দিয়া লই।"

"তাহা দিন।"

পি, কে, নাইডু আমার নিকট শুইয়াছিলেন, তাঁহাকে জাগাইলাম। তাঁহাকে গ্রেপ্তারের খবর দিয়া কাহাকেও প্রাতঃকালের পূর্ব্বে জাগাইতে নিষেধ করিলাম। সকালবেলায় নিয়মমত কুচ করিতে বলিয়া দিলাম। স্র্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যাত্রা আরম্ভ হওয়ার কথা। যখন তাহাদের বিশ্রামের সময় হইবে ও খাদ্য দেওয়ার সময় আসিবে তখন যেন সকলকে আমার গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়। ইতিমধ্যে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাকে বলিবেন। যদি যাত্রীদলকে গ্রেপ্তার করে তবে গ্রেপ্তার হইতে দিবেন। যদি গ্রেপ্তার না করে, তবে নির্দ্দিষ্ট রীতিতে কুচ চালাইবেন নাইডুর কোনই ভয় ছিল না। নাইডু গ্রেপ্তার হইলে কি হইবে তাহাও বলিয়া রাখিলাম।

ভোকস্রাষ্টে মিঃ কলেনবেক ছিলেন।

আমি পুলিশের সঙ্গে গেলাম ও ভোকস্রাষ্টের ট্রেণে চাপিলাম। ভোকস্রাষ্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। সরকারী উকীল মোকদ্দমা মুলতুবী রাখার জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সাক্ষী ইত্যাদি তৈরী ছিল না। আমি জামিনে খালাস হইবার আর্জিতে জানাইলাম যে, আমার সহিত ২০০০ লোক, ১২২ জন স্ত্রীলোক ও ৫০টি বালক-বালিকা আছে। জামিন দিলে আমি লোকগুলির ব্যবস্থা করিয়া আসিতে পারিব। সরকারী উকীল জামিনের প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট নিরুপায়। আমার জন্য মিঃ কলেনবেক পূর্ব্ব হইতে মোটর তৈরী রাখিয়াছিলেন।

উহাতে করিয়া আমাকে যাত্রীদের নিকট পঁহুছাইয়া দিলেন। ট্রান্সভালের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আমার সহিত আসিতে ইচ্ছা করায় তাঁহাকেও সঙ্গে লওয়া হয়। ফলে এই মোটর ভ্রমণ, মোকদ্দমার বিষয় ও লোকদের সহিত মেলামেশার সুন্দর বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। লোকেরা আমাকে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করিল, তাহাদের অপার আনন্দ হইল। মিঃ কলেনবেক তখনই ভোকস্রাষ্ট ফিরিয়া গেলেন। তাহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল চার্লসটাউনে। পরবর্ত্তী দলে যে সকল যাত্রী আসিতেছিল তাহাদের ব্যবস্থা তাঁহারই করার কথা।

আমরা চলিলাম, কিন্তু আমাকে মুক্ত থাকিতে সরকার দিতে পারেন না। সেইজন্য আমাকে দ্বিতীয়বারের জন্য ষ্ট্যাণ্ডারটনে গ্রেপ্তার করা হইল। ষ্ট্যাণ্ডারটন একটা বড় গ্রাম। এখানে আমাকে অদ্ভুত ধরণে গ্রেপ্তার করিতে আসিল। আমি লোকদিগকে রুটি বিলাইতেছিলাম। এই কাজে অনেকটা সময় লাগিত। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরিবেশনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে দিলেন। তারপর তিনি আমাকে একধারে ডাকিয়া লইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মনে হইয়াছিল যে, তিনি আমার সহিত কোনও কথা বলিতে চাহেন। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"আপনি আমার কয়েদী।"

আমি বলিলাম—"আমার পদোন্নতি হইয়াছে, পুলিশের বদলে ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেই আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন। তাহা হইলে এখনি বিচার করিবেন ত?"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—"আমার সঙ্গে চলুন, কোর্ট এখনো আছে।"

যাত্রীদিগকে পথ চলা ঠিক মত নির্ব্বাহ করিতে বলিয়া আমি ছুটি লইলাম। কোর্টে গিয়া দেখিলাম, আমার সাথীদিগকেও ধরিয়া

আনিয়াছে। তাঁহারা পাঁচজন ছিলেন—পি, কে, নাইডু, বিহারীলাল মহারাজ, রামনারায়ণ সিং, রঘুনারাসু ও রহিম খাঁ।

আমাকে তখনই কোর্টে দাঁড় করানো হইল। আমি ভোকস্রাষ্টের ন্যায় এখানেও জামিনে মুক্তি চাই। এখানেও সরকারী উকীল বিরুদ্ধতা করিলেন। এখানেও ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনে মুক্তি দিলেন। ভারতীয় বেপারীরা আমার জন্য গাড়ী তৈরী রাখিয়াছিলেন। যাত্রীরা তিন মাইল যাইতে না যাইতেই তাহাদের সহিত গিয়া মিশিলাম। এখন আমার ও লোকেদের বিশ্বাস হইল যে, টলষ্টয় ফার্ম্মে গিয়া হয়ত আমরা পহুঁছিতে পারিব, কিন্তু তাহা হয় নাই। আমার গ্রেপ্তার হওয়াতে লোকে অভ্যস্ত হইয়াছিল। ইহার ফল বড় সামান্য হয় নাই। আমার সাথীরা জেলেই রহিয়া গেলেন।

একবিংশ অধ্যায়

সকলেই জেলে

আমরা এইবার জোহানেসবর্গের খুব কাছেই আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠকেরা মনে রাখিবেন যে, সারা পথটা আট ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। আমরা এতাবৎ পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত পথ নিয়মিত অতিক্রম করিয়া আসিতেছিলাম। আর চারদিনের যাত্রা বাকী ছিল। কিন্তু আমাদের যেমন উৎসাহ বাড়িতেছিল, সরকারের জাগৃতিও ত তেমনি বাড়িয়া যাইবে। যদি আমাদিগকে যাত্রা পূর্ণ করিতে দেওয়া হয় আর তাহার পর গ্রেপ্তার করা হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারে যে, সরকার দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছেন অথবা ভাল চাল চালেন নাই। তাই যদি গ্রেপ্তার করিতেই হয় তবে যাত্রা পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই গ্রেপ্তার করা উচিত।

সরকার দেখিলেন যে, আমাকে গ্রেপ্তার করিলেও এই যাত্রীদল হতাশ হইতেছে না, ভীত হইতেছে না, অথবা দুর্দ্দান্তপনা করিতেছে না। হাঙ্গামা করিলেই তাহাদের উপর গোলাগুলী ছুঁড়িবার সুবিধা হয়। জেনারেল স্মাট্‌সের কাছে ত আমাদের দৃঢ়তা ও সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরক্ষা দুঃখদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সত্য সত্যই সে কথা বলিয়াওছিলেন। শান্ত লোককে কত আর বিরক্ত করা যায়? যে মরিয়া আছে তাহাকে আর কেমন করিয়া মারা যায়? মরিতে যে ইচ্ছুক তাহাকে মারিয়া আনন্দ নাই। সেইজন্যই শত্রুকে জীবন্ত ধরিতে চেষ্টা হইয়া থাকে। ইন্দুর যদি বিড়াল দেখিয়া না পলায়, তবে বিড়ালকে অন্য শিকার খুঁজিতে হইবে। যদি সকল মেষ সিংহের সামনেই দাঁড়াইয়া

থাকে, তবে সিংহের মেষ খাওয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। যদি সিংহ প্রতিরোধ না করিত তবে বড় বড় শিকারীর সিংহ শিকার করিত কি? আমাদের শান্তি ও আমাদের দৃঢ়সঙ্কল্পের মধ্যেই আমাদের জয় অবস্থান করিতেছিল।

গোখলের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, পোলক ভারতবর্ষে গিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার কার্য্যে সাহায্য করেন। মিঃ পোলকের স্বভাব এমন ছিল যে, তাঁহাকে যে কাজে লাগানো যাইত, তিনি সেই কাজেরই উপযোগী হইয়া পড়িতেন। তিনি যে কাজ হাতে লইতেন তাহাতেই তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে সেইজন্য ভারতবর্ষে পাঠাইবার উদ্যোগ চলিতেছিল। আমি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে, তিনি যেন যান। কিন্তু আমাব সহিত দেখা না করিয়া, সবটা আমার মুখে না শুনিয়া তাঁহার যাওয়ার ইচ্ছা হইল না। সেইজন্য আমার সহিত এই যাত্রা-পথ মধ্যেই দেখা করিবেন বলিয়া পত্র দিলেন। আমি তার করিলাম যে, যদি গ্রেপ্তার হওয়ার ঝুঁকি লইতে চান, তবে আসিতে পারেন। যোদ্ধারা আবশ্যক মত ঝুঁকি লইতে দ্বিধা করেন না। যদি গ্রেপ্তার করিতে চায়, তবে গ্রেপ্তার করুক্—ইহাই ত এই যুদ্ধের সূত্র। যে পর্য্যন্ত না গ্রেপ্তার করে সে পর্য্যন্ত বৈধ উপায়ে ধরা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা চাই। সেইজন্য মিঃ পোলক ধরা পড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আসা স্থির করিলেন।

আমরা এখন হেডলবর্গের নিকটে পঁহুছিয়াছি। সেইখানে তিনি নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিয়া আমাদের সহিত আসিয়া জুটিলেন। আমরা কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম। কথা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। তখন বেলা দুপুর—প্রায় তিনটা হইবে। আমরা উভয়েই দলের আগে আগে যাইতেছিলাম। অন্য সাথীরা আমাদের কথা শুনিতেছিল। মিঃ পোলক সন্ধ্যার ট্রেণে ডারবান ফিরিবেন এই কথা ছিল। কিন্তু শ্রীরাম-

চন্দ্রই রাজ্যাভিষেকের সময় যদি বনবাসের আদেশ পাইয়াছিলেন, তবে পোলক আর কে ? আমরা কথা বলিতেছি, এমন সময় আমাদের সাম্‌নে এক ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাতে এশিয়া বিভাগের কর্ত্তা মিঃ চমনী ও পুলিশের আমলা ছিলেন। উভয়েই গাড়ী হইতে নামিলেন। আমাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিতেছি।" এইবার চারদিনে তৃতীয়বার গ্রেপ্তার করা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"যাত্রীদিগকে ?"

"সে হবে এখন।"

আমি কিছু বলিলাম না। আমাকে কেবল আমার গ্রেপ্তারের খবর লোকদিগকে দিতে দিলেন। মিঃ পোলককে বলিলাম যে, তিনি যেন যাত্রীদলের সঙ্গে যান। লোকদিগকে শান্তিরক্ষা করিতে বলিতেছি, এমন সময় আমলা বলেন, "এখন আপনি কয়েদী, কথা বলিতে পারিবেন না।"

আমার স্থিতি বুঝিলাম। বুঝাইবার দরকার ছিল না। আমাকে কথা বন্ধ করিতে বলিয়াই গাড়োয়ানকে জোরে গাড়ী হাঁকাইতে হুকুম দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে যাত্রীদল চক্ষের অন্তরাল হইল।

আমলা জানিতেন যে, সে সময়ে আমি সেখানকার মালিক, কেননা সেই বিশ্বাসেই তিনি দুই হাজার লোকের মধ্য হইতে একাকী আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে, যদি তিনি পত্রদ্বারাও গ্রেপ্তারী সংবাদ দিতেন তাহা হইলেও আমি গিয়া ধরা দিতাম। এই অবস্থায় আমি যে কয়েদী তাহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিরর্থক। আমি লোকদিগকে যাহা বলিতেছিলাম তাহাতে সরকারের সুবিধা হওয়ার কথা। কিন্তু আসলে তাঁহাকে ত তাঁহার মূর্ত্তি দেখাইতে হইবে। আমি একথাও বলিব যে, অনেক আমলাই ইঁহার চেয়ে আমাদিগকে ভাল ভাবে বুঝিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, এই কয়েদ আমাদের পক্ষে বাধা স্বরূপ

অথবা দুঃখদায়ক নহে। আমাদের নিকট উহাই ত মুক্তির দ্বার। সেই জন্য তাঁহারা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ন্যায্য সুবিধা দিতেন, কেবল তাহাই নহে, গ্রেপ্তার করিতে তাহাদের নিজেদের সুবিধা যাহাতে হয়, যাহাতে সময় নষ্ট না হয় সেজন্য আমাদের সাহায্য লইতেন এবং তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতেন। দুই রকমের উদাহরণই পাঠক এই গ্রন্থে পাইবেন। আমাকে এখান হইতে সেখানে ঘুরাইয়া অবশেষে হেডলবর্গের থানায় লইয়া গেল। সেইখানেই রাত কাটিল।

যাত্রীদল লইয়া পোলক অগ্রসর হইলেন। হেডলবর্গ পঁহুছিলেন। সেখানে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অনেক জমায়েৎ হইয়াছিল। রাস্তায় শেঠ আমদ মহম্মদ কাছলীয়া ও শেঠ আমদ ভায়াতের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা কি করা হইবে সে সংবাদ পাইয়াছিলেন। যাত্রীদলের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা হইয়া গিয়াছিল। পোলক যখন দেখিলেন যে, যাত্রী-দলের জন্য কার্য্য শেষ হইয়াছে, তখন তিনি একদিন বিলম্ব হইলেও ডারবান যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সেখানে হইতে তখনও ভারতবর্ষে যাওয়ার জন্য ষ্টীমার ধরিতে পারিবেন। কিন্তু ঈশ্বর অন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

হেডলবর্গে যাত্রীদলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য দুইখানা ট্রেণ দাঁড়াইয়াছিল। লোকদের কেহ কেহ জেদ করিতে লাগিল এবং বলিল—"গান্ধীকে আন, সে বলে ত আমরা গ্রেপ্তার হইব ও ট্রেণে বসিব।" সত্যাগ্রহীর এ তেজ দেখানো চলে না। জেলে যাইবে তাহাতে গান্ধীকে কি দরকার? সিপাই কি কখনো উপরিতন কর্ম্মচারী মনোনীত করিতে পারে? অথবা অমুকের কথাই শুনিব বলিয়া জেদ করিতে পারে? মিঃ চমনী এই লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য মিঃ পোলক ও মিঃ কাছলীয়ার সাহায্য লইলেন। তাঁহারা অনেক কষ্টে বুঝাইলেন যে, যাত্রায় লক্ষ্য

হইতেছে জেল, সেইজন্য সরকার যখন গ্রেপ্তার করিতে চান, তখনই লোকের তাহা স্বাগত করিয়া লওয়া উচিত। ইহাতেই লোকের চরিত্র বল প্রকাশ হইতে পারে—যুদ্ধের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে। আমার ইচ্ছা অন্য কিছু হইতে পারে না ইহা লোকের বুঝা দরকার। লোকে বুঝিল ও ট্রেণে চাপিল।

এদিকে আমাকে কোর্টে হাজির করা হইল। উপরের ঐ ঘটনা সম্বন্ধে সে সময় আমি কিছুই জানিতাম না। আমি কোর্টে উপস্থিত হইলে জামিনে মুক্তি চাই। দুই কোর্টে আমাকে জামিন দিয়াছেন জানাই। আমি বলিলাম যে, হয় সরকার সকল যাত্রীকে গ্রেপ্তার করুন, না হয় আমাকে তাহাদের সহিত থাকিতে দিন। কোর্ট আমার আর্জি গ্রাহ্য করিলেন না। তবে আমার ইচ্ছা সরকারকে জানাইবেন বলিলেন। এই সময় আমাকে ডাণ্ডী লইয়া যায়। আমার উপর মামলা চালানো তখনো বাকী ছিল, সেইজন্য সেইদিনই আমাকে ডাণ্ডী লইয়া যাওয়া হয়।

এদিকে মিঃ পোলক হেডলবর্গে গ্রেপ্তার ত হইলেনই না, উপরন্তু তিনি যে যাত্রীদলকে গ্রেপ্তারে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ পাইলেন। মিঃ চমনী তাঁহাকে বলেন যে, সরকারের তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার ইচ্ছা নাই। কিন্তু ইহা মিঃ চমনীর অভিমত, অথবা তখন পর্য্যন্ত তিনি সরকারের যে মত জানিতেন তাহাই! সরকারের মত ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাইতেছিল। শেষকালে সরকার স্থির করেন যে, মিঃ পোলককে ভারতবর্ষে যাইতে দেওয়া হইবে না। মিঃ পোলককে আর মিঃ কলেন-বেককে গ্রেপ্তার করা হইল। মিঃ কলেনবেক খুব কাজ করিতেছিলেন। মিঃ পোলক চার্লসটাউনে গ্রেপ্তার হইলেন। মিঃ কলেনবেকও গ্রেপ্তার হইলেন ও উভয়কেই ভোকস্রাষ্ট জেলে রাখা হইল।

আমার নামে ডাণ্ডীতে মামলা হইল ও আমাকে নয় মাসের জেল দিল। আমাকে ভোকস্রাষ্ট লইয়া গেল। সেখানে মিঃ কলেনবেক ও মিঃ

পোলককে দেখিতে পাইলাম। আমরা তিনজন ভোকস্রাষ্ট জেলে একত্র হওয়ায় খুব আনন্দ হইল।

আমার নামে যখন মোকদ্দমা হইতেছিল, তখন আমাকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়। পুলিশের পক্ষে সাক্ষী যোগাড় করা শক্ত ছিল, সেইজন্য তাহারা আমার সাহায্য লইল। এখানকার আদালতে কেবল কয়েদী নিজে অপরাধ স্বীকার করিলেই তাহাকে সাজা দিত না।

আমার বেলা ত হইয়া গেল, কিন্তু মিঃ কলেনবেক ও মিঃ পোলকের বিরুদ্ধে কোথা হইতে সাক্ষী জুটিবে? যদি সাক্ষী না পাওয়া যায়, তবে তাঁহাদিগকে সাজা দেওয়া যায় না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী যোগাড় করাও শক্ত ছিল। মিঃ কলেনবেক নিজের অপরাধ স্বীকার করিলেন, কেননা তাঁহার যাত্রীদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মিঃ পোলকের ইচ্ছা ছিল ভারতবর্ষে যাওয়া। তাঁহার ইচ্ছা করিয়া জেলে যাওয়ার সময় এটা ছিল না। সেইজন্য আমরা তিনজনে মিলিয়া এই স্থির করিলাম যে, মিঃ পোলক অপরাধ করিয়াছেন কি না, এ বিষয় তিনি 'হাঁ' অথবা 'না' কিছুই বলিবেন না।

এই উভয়ের বিরুদ্ধে আমিই সাক্ষী হইলাম। আমাদের মামলা দীর্ঘদিন চলে, সে ইচ্ছা আমাদের ছিল না। সেইজন্য একদিনেই যাহাতে তিনজনের মামলা শেষ হয় তাহার সাহায্য করিয়াছিলাম এবং একদিনেই মামলা হইয়া গিয়াছিল। আমাদের এইবার তিন তিন মাসের জেল হইল। আমরা ভাবিলাম যে, এই তিন মাস ত একত্র থাকা যাইবে। কিন্তু সরকারের তাহা পোষাইল না।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন আমরা ভোকস্রাষ্ট জেলে সুখে কাটাইলাম। এখানে রোজই নূতন কয়েদী আসিত। তাহাদের নিকট হইতে বাহিরের খবর পাওয়া যাইত। এই সকল সত্যাগ্রহীদের মধ্যে হরবৎ সিং নামে একজন বুড়া কয়েদী

ছিল, তাহার বয়স ৭৫ বৎসরের উপর ছিল। সে কোনও খনিতে কাজ করিত না। সে অনেক বৎসর পূর্ব্বে গিরমিট শেষ করিয়াছিল বলিয়া হরতালের মধ্যে ছিল না। আমার গ্রেপ্তারের পর লোকের মধ্যে খুব উৎসাহ হইয়াছিল ও লোকে নাতাল হইতে ট্রান্সভাল প্রবেশ করিয়া গ্রেপ্তার হইতেছিল। হরবৎ সিং এইভাবে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কেন জেলে আসিলেন? আপনার মত বৃদ্ধকে ত আমি জেলে আসিতে নিমন্ত্রণ দিই নাই।"

হরবৎ সিং জবাব দিল,—"যখন আপনি, আপনার ধর্ম্মপত্নী ও আপনার ছেলে আমাদের জন্য জেলে চলিয়া আসিলেন তখন আর আমি কি করিয়া বসিয়া থাকি।"

"কিন্তু আপনি ত জেলের দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন না। আপনি জেল ত্যাগ করিয়া যান। আপনাকে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করিব কি?"

"আমি কখনো জেল ছাড়িব না। একদিন ত মরিতেই হইবে। যদি জেলেই মৃত্যু হয় তবে তাহা কি সুখের বিষয়ই হইবে!" এই দৃঢ়তা আমি কি করিয়া টলাইব? চেষ্টা করিলেই উহা টলিবার মত নহে। এই নিরক্ষর জ্ঞানীর নিকট আমার মাথা নত হইল। হরবৎ যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল, তাঁহার মৃত্যু জেলেই হইল।

তাঁহার শব ভোকস্রাষ্ট হইতে ডারবান লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং সেখানে শত শত ভারতীয় সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অগ্নিসৎকার করিয়াছিল। এই রকম লোক এই লড়াইয়ে হরবৎ সিং একাই ছিলেন না, আরও অনেক ছিল। তবে জেলে মরার সৌভাগ্য কেবল হরবৎ সিং-এরই হইয়াছিল। সেইজন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসে তাঁহার নাম সম্মানের সহিত উল্লেখ করিতেছি। লোকে স্বেচ্ছায় এইরূপে জেলে আসে ইহা

সরকারের পছন্দ হইল না। আর জেল হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার সময় আমার নির্দ্দেশ লইয়া যায় তাহাও সরকারের মনঃপূত হইল না। তাই সরকার আমাদের তিন জনকে আলাদা আলাদা করিয়া ফেলিলেন। কাহাকেও ভোকস্রাষ্ট জেলে রাখিলেন না এবং আমাকে এমন এক জেলে লইয়া গেলেন, যে স্থানে কোনও ভারতীয় যাইতেই না পারে। আমাকে সেইজন্য অরেঞ্জিয়ার রাজধানী ব্লুম্‌ফণ্টেনে পাঠাইলেন। সেখানে মোট জন পঞ্চাশ ভারতীয়ের বাস। আর তাহারা সকলেই হোটেলে চাকুরী করিত। এই প্রদেশের জেলে ভারতীয় কয়েদী আদৌ ছিল না। আমি একমাত্র ভারতীয় কয়েদী ছিলাম। বাকী সকলেই গোরা অথবা নিগ্রো ছিল। ইহাতে আমার দুঃখ হয় নাই। বরঞ্চ ইহাতে নিজেকে সুখী বলিয়াই গণ্য করিলাম। আমার সহিত দেখা করার অথবা কথা বলার কেহ ছিল না। এই নূতন অভিজ্ঞতা আমার ভালই বোধ হইল। আমি ১৮৯৩ সাল হইতে এ কয়েক বৎসর ধরিয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক পড়াশুনা করিতে পারি নাই, এখন যে এক বৎসরকাল পড়িতে পারিব এই সম্ভাবনায় আমার মনে আনন্দ হইল।

ব্লুমফন্‌টেন পঁহুছিলাম। এখানকার নির্জ্জনতা অসীম। অসুবিধা অনেক ছিল, কিন্তু সে সমস্ত সহ্য হইয়া গেল। সে সকল বর্ণনা করার জন্য পাঠককে এখন আটকাইয়া রাখিব না; তবে এটুকু জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এখানকার ডাক্তার আমার মিত্র হইয়া গেলেন। জেলার কেবল নিজের অধিকারটাই বুঝিতেন। কিন্তু ডাক্তার সাহেব কয়েদীকে প্রাপ্য অধিকার দেওয়াইতে চেষ্টা করিতেন। এই সময় আমি কেবল ফলাহার করিতাম। আমি দুধ, ঘি, অথবা ভাত ইত্যাদি খাইতাম না। আমার খাদ্য ছিল কলা, টোমাটো, কাঁচা চীনাবাদাম, নেবু ও জলপাইয়ের তেল। যদি ইহাদের কোনও একটা খারাপ থাকিত তাহা হইলেই

আমার খাওয়া হইত না। ডাক্তার সেই জন্য ঐগুলি খুব প্রচুর আনাইতেন এবং উহার সহিত বাদাম, আক্রোট ও ব্রাজিল-নাট দিতেন। নিজে হাতে ফলগুলি দেখিয়া লইতেন। আমাকে থাকার জন্য যে কামরা দেওয়া হইল তাহাতে হাওয়া চলাচলের অসুবিধা ছিল। ডাক্তার দরজা খোলা রাখার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। যদি দরজা খোলা রাখা হয়, তাহা হইলে জেলার চাকুরীতে ইস্তাফা দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। জেলার লোক খারাপ ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে ভাবে চলিতেছিলেন তাহা বদল করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁহার কাজই ছিল দুর্দান্ত কয়েদীদের সহিত। আমার মত ভাল কয়েদীর প্রতি যদি তিনি ভাল ব্যবহার করেন, তবে অপরেও আস্কারা পাইয়া মাথায় উঠিবে বলিয়া তাঁহার বাস্তবিক ভয় ছিল। আমি জেলারের দিকটা বুঝিতে পারিতাম। সেই জন্য ডাক্তার ও জেলারের মধ্যে আমাকে লইয়া যে ঝগড়া হইত, তাহাতে আমার সহানুভূতি জেলারের পক্ষেই থাকিত। জেলার অভিজ্ঞ লোক ছিলেন কিন্তু একগুঁয়ে ছিলেন। তিনি নিজের রাস্তাই সোজা দেখিতে পারিতেন।

মিঃ কলেনবেককে পাঠানো হইয়াছিল প্রিটোরিয়া জেলে ও মিঃ পোলককে জার্মিষ্টন জেলে।

কিন্তু সরকারের এই সকল ব্যবস্থাই কোন কাজের হয় নাই। আকাশই যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে জোড়া তাড়া দিবার স্থান কোথায়? নাতালের ভারতীয় গিরমিটিয়ারা সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিবার শক্তি কাহারও ছিল না।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

পরীক্ষা

স্বর্ণকার সোনা পরীক্ষা করার জন্য উহাকে কষ্টিপাথরে ঘষিয়া থাকে। যদি আরো পরীক্ষা করিতে হয় উহাকে গলাইয়া ফেলে, পিটায়, যদি ময়লা থাকে তবে বাহির করিয়া দেয়। অবশেষে খাঁটি সোনার তাল তৈরী করে। ভারতীয়দের এখন এই ধরণের পরীক্ষা হইতেছিল, উত্তপ্ত করিয়া গলাইয়া, হাতুরী পিটাইয়া তাহাদের পরীক্ষা করা হইতেছিল এবং এই পরীক্ষার পরই তাহাদের মূল্য নির্ণীত হইতেছিল।

যাত্রীদিগকে যে ট্রেণে চাপানো হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে বনভোজনের নিমন্ত্রণে লইবার জন্য নহে, পিষ্ট করিবার জন্য। রাস্তায় তাহাদের জন্য কোনও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। নাতালে পঁহুছানো মাত্রই তাঁহাদের নামে মামলা চালাইয়া তাহাদিগকে জেলে পাঠানো হয়। আমাদের আশা ও ইচ্ছা তাহাই ছিল। কিন্তু হাজার হাজার লোককে জেলে রাখায় সরকারেরই ব্যয় হইবে, আর ইহাতে ভারতীয়দেরই সুবিধা হইবে বলিয়া সরকার মনে করিলেন। ওদিকে জেলে থাকাকালে কয়লার খনিগুলিও বন্ধ থাকিবে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলিলে তিন পাউণ্ড কর উঠাইয়া না দিয়া উপায় থাকিবে না। ইউনিয়ন সরকার এইজন্য নূতন ফন্দী করিলেন। যে যে স্থান হইতে গিরমিটিয়ারা চলিয়া আসিয়াছিল, সেই সেই স্থানেই তারের বেড়া দিয়া জেল তৈরী হইল ও খনির কোনও কর্ম্মচারীকে জেলার বানানো হইল। এইভাবে মজুরেরা যাহা ত্যাগ করিয়াছিল সরকার তাহাদিগকে দিয়া

তাহাই বলপূর্ব্বক করাইতে লাগিলেন। খনির কাজ চলিতে লাগিল। গোলামী আর চাকুরীতে এই পার্থক্য যে, যদি চাকর কাজ ছাড়ে তবে তাহার নামে দেওয়ানী মোকদ্দমা চলে, আর গোলাম যদি কাজ ছাড়ে তবে জোর করিয়া তাহাকে কাজে লাগানো হয়। এখন মজুরেরা সম্পূর্ণই গোলাম হইয়া পড়িল।

কিন্তু ইহাতেই মিটিল না। মজুরেরা বাহাদুর লোক। তাহারা খনিতে কাজ করিতে সোজা অস্বীকার করিল। ফলে তাহাদিগকে সাংঘাতিক বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইল। যে সকল উদ্ধত চরিত্রের লোক হঠাৎ সরকারের আমলা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা লাথি মারিয়া, গালি দিয়া এবং অন্য প্রকারে কত যে অত্যাচার করিল তাহা লেখা যায় না। গরীব মজুরেরা এই সমস্তই ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিল। এই অত্যাচারের সংবাদ তারযোগে ভারতবর্ষে পঁহুছিল। এই সকল টেলিগ্রাম গোখলেকে করা হইত। এক দিন তার না পাইলে তিনি হেতু জিজ্ঞাসা করিয়া টেলিগ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন। তিনি রোগ শয্যা হইতেই এই সকল টেলিগ্রাম ভারতবর্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ব্যাপার লইয়া তাঁহার নিজের অনুসন্ধানাদি করার এত প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কি দিন কি রাত্রি ইহা লইয়াই লাগিয়া পড়িলেন। পরিণামে সারা হিন্দুস্থান জ্বলিয়া উঠিল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্ন ভারতবর্ষের প্রধানতম চিন্তার বিষয় হইল।

এ সময়ে লর্ড হার্ডিং তাঁহার বিখ্যাত বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতায় বিলাত ও দক্ষিণ আফ্রিকা আন্দোলিত হইয়া উঠিল। ভাইসরয় সাম্রাজ্যের উপনিবেশ সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে পারেন না, কিন্তু লর্ড হার্ডিং তীব্র সমালোচনা করিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি

সত্যাগ্রহীদের কার্য্য সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন এবং তাঁহার এই দৃঢ়তা দক্ষিণ আফ্রিকার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করিল।

মুহূর্ত্তকালের জন্য এই দুঃখী, সাহসী কয়েদী মজুরদের কথা রাখিয়া খনির বাহিরে অন্যত্র কি হইতেছিল তাহা দেখা যাক্। খনিগুলি নাতালের উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। কিন্তু মজুর খাটিত বেশী উত্তর ও দক্ষিণ তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে। উত্তর তটস্থ স্থানের মধ্যে ফিনিক্স, ভেরুলাম, টোঙ্গট ইত্যাদি ছিল। আর দক্ষিণদিকে ছিল ইসিপিঙ্গো, উমজিন্তো ইত্যাদি। উত্তর প্রদেশের মজুরদের সহিত আমার ভাল রকম জানা ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে আমার সহিত বুয়ার যুদ্ধে ছিল। দক্ষিণ দিকের লোকের সহিত এত পরিচয় ছিল না, তবে আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ দিককার ছিলেন। তাহা হইলেও এই জেলের কথা ও হরতালের কথা বিদ্যুৎবেগে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। উভয় তীরবর্ত্তী স্থান হইতেই অপ্রত্যাশিতভাবে হাজার হাজার লোক বাহির হইয়া পড়িল। কত লোক নিজেদের জিনিষ-পত্র বেচিয়া ফেলিল। তাহারা ভাবিয়াছিল লড়াই দীর্ঘদিনের জন্য হইবে এবং অপরের সাহায্যে খাওয়া চলিবে না। আমি জেলে যাওয়ার সময় সাথীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন সকল মজুরকে হরতাল করিতে না দেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, কেবল খনির লোকের সাহায্যেই লড়াইয়ে জয় হইবে। মোট মজুর প্রায় ষাটহাজার ছিল, ইহারা সকলেই যদি হরতাল করে তবে তাহাদিগকে পোষণ করা কঠিন। এত লোক লইয়া চলাফেরা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা কিছুই হাতে ছিল না, এত পরিচালক ছিল না—এত পয়সাও ছিল না। এতলোক একত্র হইলে একটা হাঙ্গামা ঠেকানোও শক্ত হইবে।

কিন্তু বন্যা যখন আসে তখন তাহাকে ঠেকাইবে কে? সমস্ত

স্থানের মজুরেরাই নিজ ইচ্ছায় বাহির হইয়া পড়িল, সে সকল স্থানে আপনা আপনিই স্বেচ্ছাসেবক ও কাজের ভার লইল।

সরকার এইবার বন্দুকের মর্য্যাদা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। জোর করিয়াই হরতালে বাধা দেওয়া হইতে লাগিল। মজুরদের পিছনে ঘোড়-সওয়ার লাগাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নিজ কর্ম্মস্থানে ফিরাইয়া আনা হইল। কিছু হাঙ্গামা করিলেই গুলী চালানো হইতে লাগিল। কতক লোক ফিরিতে অস্বীকার করিল, কেহ বা ঢিল ছুড়িল। সঙ্গে সঙ্গে গুলী চলিল। অনেক জখম হইল—দুই চারজন মরিল। কিন্তু লোকের উৎসাহ কমিল না। অনেক চেষ্টায় স্বেচ্ছাসেবকেরা হরতাল বন্ধ করিলেন। কিন্তু অনেকে কাজে ফিরিল না, অনেকে ভয়ে লুকাইয়া রহিল।

একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ভেরুলাম নামক স্থানে অনেক মজুর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা কোনও ক্রমেই ফিরে না। জেনারেল ল্যুকিন সিপাই লইয়া সেখানে হাজির হইলেন। গুলী চালানোর হুকুম দিতে প্রস্তুত হইলেন। সেই সময়ে সেখানে পার্শী রোস্তমজীর ছোট ছেলে উপস্থিত ছিল। মোটে আঠার বৎসর বয়স, কিন্তু সে ছেলে সোরাবজী বাহাদুর। সে জেনারেলের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"আপনি গুলী চালাইবার হুকুম দিবেন না, আমি এই লোকদিগকে শান্তভাবে কাজে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছি।" জেনারেল এই ছেলের বাহাদুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে তাহার প্রেমের বল পরীক্ষা করার অবকাশ দিলেন। সোরাবজী লোকদিগকে বুঝাইল, তাহারা বুঝিল। কাজে ফিরিয়া গেল। এইভাবে এক যুবকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, নির্ভীকতা ও প্রেমের জন্য কতকগুলি লোকের খুন হওয়া বন্ধ হইল।

পাঠকেরা জানিবেন যে, এই প্রকার গুলী চালানো বে-আইনী।

যাহারা খনি ত্যাগ করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের বেলায় তবুও আইনের সম্পর্ক ছিল, খনির লোকেরা বিনা অনুমতিতে ট্রান্সভালে প্রবেশ করার জন্য সরকার আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন। কিন্তু লোকে হরতাল করিলে সরকার আইনতঃ গ্রেপ্তার করিতে পারেন না। দক্ষিণে যে হরতাল হইয়াছিল তাহা আইনতঃ অপরাধ হইতে পারে না, সরকারের গায়ের জোরে হইতে পারে। শেষকালে ত গায়ের জোরই সরকারের নিকট আইন হইয়া পড়ে। ইংরাজের আইনে একটা চল্‌তি কথা আছে, "রাজা কোনও দোষ করিতে পারে না"। তাহার মানে গায়ের জোরই সর্ব্বশেষ আইন। এই দোষ সার্ব্বভৌম। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, আইনকে শিকাইয়া তুলিয়া রাখার জন্য সকল সময় দোষও দেওয়া যায় না। কখনো কখনো আইনের জন্যই বে-আইনী করিতে হয়। যে প্রভুত্ব লোকহিতের জন্যই ব্যবহৃত এবং যখন সেই প্রভুত্বের উপর বন্ধন প্রভুত্বকেই নষ্ট করে তখন সেই বন্ধন ছিন্ন করাই ধর্ম্ম ও উহাই বিবেকের নির্দ্দেশ। এইরূপ অবস্থা কদাচিৎ হইয়া থাকে। যেখানে প্রভুত্ব হামেসাই আইনের বন্ধন ছিন্ন করে সেখানে সে প্রভুত্ব দ্বারা লোকের উপকার হইতে পারে না। এখানে সরকারের প্রভুত্ব অবাধে খাটাইবার কোনও হেতু ছিল না। হরতাল করিবার অধিকার চিরকাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। হরতালকারীরা যে দুর্দ্দান্তপনা করিবে না সে কথা সরকারের জানার যথেষ্ট কারণ ছিল। হরতালের সর্ব্বাপেক্ষা গুরু পরিণাম ছিল তিন পাউণ্ড কর রদ হওয়া। শান্তিপ্রিয় লোকের বিরুদ্ধে শান্ত ব্যবস্থাই প্রযোজ্য। বিশেষতঃ এখানে প্রভুত্ব লোকহিতকর ছিল না। প্রভুত্ব কেবল গোরাদের উপকারের জন্য খাটানো হইয়াছিল। উহা সাধারণতঃই ভারতীয়দের বিরোধী ছিল। সেইজন্য এই পক্ষপাত-দুষ্ট প্রভুত্বের অবাধ ব্যবহার কোন ক্রমেই উচিত অথবা ক্ষমার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

আমার মতে এস্থানে প্রভুত্বের সম্পূর্ণ অপব্যবহার হইয়াছিল। কিন্তু যে কার্য্য সিদ্ধির জন্য এই অপব্যবহার হইয়াছিল, সে কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই। কখনও ক্ষণিক সিদ্ধি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই গুলী চালানোর ছয় মাসের মধ্যে যে তিন পাউণ্ড কর রক্ষার জন্য গুলী চালানো হইয়াছিল তাহা রদ হইয়া গেল। এই প্রকার অনেক সময় দুঃখই সুখের কারণ হয়। এই দুঃখের আর্ত্তনাদ সর্ব্বত্র শোনা গিয়াছিল। আমার মনে হয় যে, যেমন কোনও যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের যথাস্থানে থাকার আবশ্যকতা আছে, তেমনি যে কোনও লড়াইয়েও প্রত্যেক বস্তুরই নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যেমন যন্ত্রের ভিতর কাঠকুটো পড়িলে যন্ত্রের গতি বন্ধ হয়, তেমনি কতকগুলি জিনিষ লড়াইয়ের গতি রুদ্ধ করে। আমরা নিমিত্ত মাত্র, সেইজন্য আমরা সকল সময় জানিতে পারি না কোনটা অনুকূল, কোনটা প্রতিকূল। কি প্রকার উপায় প্রয়োগ করিতেছি তাহাই জানা আমাদের অধিকার। সাধন যদি পবিত্র হয়, তবে আমরা পরিণাম সম্বন্ধে নির্ভয় ও নিশ্চিত থাকিতে পারি।

এই যুদ্ধে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, যেমন যুদ্ধে নিযুক্ত লোকদের দুঃখ বাড়িতে লাগিল, যুদ্ধও তেমনি অগ্রসর হইতে লাগিল। যেমন এই দুঃখার্ত্তদের দোষ শূন্যতা স্পষ্ট হইতে লাগিল, যুদ্ধের অবসানও তত দ্রুত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এই যুদ্ধের সময় আমি ইহাও দেখিতে পাইলাম যে, এই প্রকার দোষশূন্য নিঃশস্ত্র ও অহিংস যুদ্ধে দুঃখের সময় প্রয়োজনীয় সাহায্য অনায়াসে আসে। অনেক স্বেচ্ছাসেবক যাহাদিগকে আমি জানিতাম না—আজও জানি না, তাহারা স্বেচ্ছায় এই সময় সাহায্য করিয়াছে। এই প্রকার সেবক বেশীর ভাগই নিঃস্বার্থ। তাহারা আপনা ভুলিয়াই যেন এই প্রকার সাহায্য করিয়া গিয়াছে। কেহ

তাহাদিগকে লক্ষ্য করে নাই, কেহ তাহাদিগকে প্রশংসাপত্র দেয় নাই। তাহাদের এই অমূল্য কার্য্য যে ঈশ্বরের হিসাবের খাতায় জমা হইয়া যায়, অনেক সেবক ইহাও জানে না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা পরীক্ষায় পাস হইয়াছিল। তাহারা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল ও অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। কেমন করিয়া যুদ্ধের শেষ হইয়াছিল তাহা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লিখিব।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

যুদ্ধ সমাপ্তির আরম্ভ

পাঠক হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে পারা যায়, সম্প্রদায় তাহা করিয়াছিল। যতটা আশা করা যায় তাহার অপেক্ষা বেশী সংযত শক্তিই তাহারা প্রয়োগ করিয়াছিল। যাহারা শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহাদের ভিতর অধিকাংশই দরিদ্র ও নির্য্যাতিত। পাঠকের হয়ত ইহাও স্মরণ আছে যে, ফিনিক্সেএর দুই কি তিন জন দায়িত্ববান লোক ব্যতীত আর সকল কর্ম্মীই জেলে আসিয়াছিল। ফিনিক্সের বাহিরে যাঁহারা কাজ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে শেঠ আমদ মহম্মদ কাছলীয়া বাহিরে ছিলেন। ফিনিক্সে ওয়েষ্ট ও মগনলাল গান্ধী ছিলেন। কাছলীয়া শেঠ সাধারণ দেখাশুনার কাজ করিতেন। মিস্ শ্লেশিন ট্রান্সভালের সমস্ত হিসাব পত্র ও প্রত্যন্ত সীমা লঙ্ঘনকারীদের দেখা শুনা করিতেন। 'ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়নের' ইংরাজী অংশ পরিচালনা করা ও গোখলের সহিত পত্র ব্যবহার করার ভার ছিল মিঃ ওয়েষ্টের উপর। এখন নিত্য নূতন অবস্থার সূত্রপাত হইতেছিল। এ সময় পত্র ব্যবহার আর ডাকের ব্যবস্থায় চলে নাই। পত্রের মতই লম্বা লম্বা টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইত। এই অশেষ দায়িত্বের কাজ মিঃ ওয়েষ্টকেই করিতে হইত।

যেমন কয়লার খনির অংশে নিউকাস্‌ল কেন্দ্র হইয়াছিল, তেমনি উত্তরাঞ্চলে এখন ফিনিক্স হরতালকারীদের কেন্দ্র হইয়া পড়িল। শত শত লোক পরামর্শের জন্য ও আশ্রয়ের জন্য আসিতে লাগিল। সুতরাং এক্ষণে সরকারের নজর ফিনিক্সের উপরেই বা না পড়িবে কেন? আশেপাশের

গোরাদের চক্ষুও লাল হইয়া উঠিল। ফিনিক্সে থাকা কতকটা বিপদজনক হইয়া উঠিল। তাহা হইলেও বালকেরা, ছেলেপেলেরাও সাহস করিয়া বিপদজনক কার্য্য করিয়া যাইতেছিল। এই অবসরে ওয়েষ্টকে গ্রেপ্তার করা হইল। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ওয়েষ্টকে ধরার কোনও কারণ ছিল না। আমাদের ব্যবস্থা এই ছিল যে, ওয়েষ্ট ও মগনলাল গান্ধী ধরা দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করিবেন না। যতটা সম্ভব ধরা পড়ার সম্ভাবনাকেই তাঁহারা এড়াইয়া চলিবেন। সেইজন্য ওয়েষ্ট ধরা পড়ার কোনও কারণ দেন নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, সরকার ত আর সত্যাগ্রহীদের সুবিধা দেখিয়া গ্রেপ্তার করিবেন না। গ্রেপ্তারের কারণ আছে কি না তাহাও বিচার করিয়া দেখিবেন না। প্রভুত্বের কাছে প্রধান ঈপ্সিত ব্যাপার হইতেছে এই যে, তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া যাইবে। অবশেষে ওয়েষ্টের গ্রেপ্তারের সংবাদ গোখলের নিকট গেল। তিনি ভারতবর্ষ হইতে দক্ষ লোক পাঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যখন লাহোরে সাধারণ সভা হইয়াছিল, এণ্ড্রুজ তাহাতে নিজের কাছে যাহা কিছু ছিল সে সমস্তই ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং সেই হইতেই গোখলের নজর তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। সেইজন্য ওয়েষ্টের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়াই তিনি তারযোগে এণ্ড্রুজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি এখনই দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইতে প্রস্তুত আছেন?" এণ্ড্রুজ তখনই যাইতে স্বীকার করিয়া জবাব দেন। এই সময়ই তাঁহার পরম প্রিয় মিত্র পিয়ার্সনও প্রস্তুত হইলেন এবং ইঁহারা দুইজনেই প্রথম ষ্টীমারেই দক্ষিণ আফ্রিকা যাইতে প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু এই সময় যুদ্ধের অবস্থা শেষ হওয়ার মত হইয়া আসিয়াছিল। হাজার হাজার নির্দ্দোষ লোককে জেলে পুরিয়া রাখার শক্তি ইউনিয়ন সরকারের ছিল না। জেনারেল স্মাট্স্ কি করেন তাহা সারা জগৎ দেখিতেছিল।

এই সময় সাধারণ রাজ্যাধিপতিরা যাহা করিয়া থাকেন জেনারেল স্মাট্‌স্‌ও তাহাই করিলেন। অনুসন্ধান করার কিছুই ছিল না। অন্যায়টা জগৎ-প্রসিদ্ধ ছিল। এই অন্যায় দূর করার আবশ্যকতা সকলেই দেখিতেছিলেন। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ও দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, অন্যায হইয়াছে এবং তাহা দূর করা চাই। কিন্তু তাঁহার অবস্থা সাপের ছুঁচা গেলার মত হইয়াছিল—, তাঁহার ন্যায় করা দরকার, কিন্তু ন্যায় করার শক্তি তিনি খোয়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজেই দক্ষিণ আফ্রিকার গোরাদিগকে ইহা বুঝাইয়াছিলেন যে, তিন পাউণ্ড করের রদ ও অন্যান্য সংস্কার করা হইবে না। এখন সেই করই উঠাইয়া দিতে হয় এবং অন্য সংস্কারও করিতে হয়। এইরূপ কঠিন অবস্থায় উপস্থিত হইলে সকল সময়েই প্রজা মতের উপর নির্ভরশীল রাজতন্ত্র একটা কমিশন নিয়োগ করিয়া থাকেন। এই কমিশনের নাম মাত্র একটা অনুসন্ধান কার্য্য করিতে হয়, কেন না কমিশনের ফল পূর্ব্ব হইতেই স্থির থাকে। কেবল কমিশন বসাইয়া সে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার একটা সাধারণ প্রথা আছে। এমনি করিয়া কমিশনের পরামর্শ অনুসারে যে ন্যায় করার ইচ্ছা পূর্ব্বে ছিল না সেই ন্যায়ের অনুষ্ঠান করা হয়। জেনারেল স্মাট্‌স্ কমিশনে তিনজন সভ্য নিযুক্ত করিলেন। এদিকে ভারতীয় সম্প্রদায় যতক্ষণ না কতকগুলি সর্ত্ত প্রতিপালিত হয় ততক্ষণ কমিশন বয়কট করিবেন স্থির করিলেন। একটা সর্ত্ত ছিল যে, সত্যাগ্রহীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে, দ্বিতীয় কমিশনে একজন ভারতীয় সভ্য থাকিবে। প্রথম সর্ত্ত কমিশন কতকটা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং সরকারকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কার্য্য সহজ করার জন্য মিঃ কলেনবেক, মিঃ পোলক ও আমাকে বিনা সর্ত্তে যেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আমাদের তিনজনকে এক সময়ে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমাকে মোটে দুই মাসের জেল খাটিতে হইয়াছিল।

এদিকে ওয়েষ্টকে ধরিয়া লইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল না, সুতরাং তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিয়াছিল। মিঃ এণ্ডুজ ও পিয়ার্সন পঁহুছিবার পূর্ব্বেই এই ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল। সেইজন্য এই দুই মিত্রকে আমিই ষ্টীমার হইতে নামাইয়া আনিতে গিয়াছিলাম। ইঁহাদের এ সকল ঘটনার কোনও সংবাদ জানা না থাকায় ইঁহারা খুব আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন। ইঁহাদের সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ।

আমরা তিনজনেই মুক্তি পাইয়া নিরাশ হইলাম। আমরা বাহিরের কোনই খবর জানিতাম না। কমিশনের খবর শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, আমরা কমিশনকে কোনও সাহায্য করিতে পারিব না। কমিশনের মধ্যে ভারতীয়দের পক্ষ হইতে কয়েকজন অবশ্যই থাকা চাই বলিয়া আমরা মনে করিলাম। এই অবস্থায় আমরা তিনজনে ডারবানে পঁহুছিলাম। সেখান হইতে জেনারেল স্মাট্স্কে পত্র দিলাম। উহার সারাংশ এইরূপ ঃ—

"আমরা কমিশন নিয়োগকে স্বাগত করিতেছি। কিন্তু উহাতে যে দুইজন সভ্য নিযুক্ত করা হইয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের সম্বন্ধে বিরোধ নাই। তাঁহারা প্রসিদ্ধ ও দক্ষ লোক। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই অনেক সময়েই ভারতীয়দের প্রতি তাঁহাদের অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে অন্যায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মানুষ নিজের স্বভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। এই দুই ভদ্রলোকও যে হঠাৎ নিজেদের স্বভাব বদলাইয়া ফেলিবেন, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। তাহা হইলেও আমরা একথা বলি না যে, তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করা হোক্। আমরা চাই যে, অন্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগকেও উহাতে লওয়া হোক্। আমরা সার জেম্স রোজ ইনেস্ ও মাননীয় ডবলিউ, পি,

শ্রাইনারকে উহাতে লওয়ার জন্য প্রস্তাব করি। ইঁহারা দুইজনেই বিখ্যাত লোক ও ন্যায়বান বলিয়া গণ্য। আমাদের দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, সকল সত্যাগ্রহী কয়েদীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে আমাদের জেলের বাহিরে থাকা মুস্কিল হইবে। এখন তাহাদিগকে জেলে রাখার কারণ দেখা যায় না। আর আমাদের যদি কমিশনে সাক্ষ্য দিতে হয়, তবে খনিতে ও অন্যান্য স্থানে যেখানে গিরমিটিয়ারা থাকে সেখানে যাওয়ার অধিকার দিতে হইবে। যদি আমাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য না হয়; তবে দুঃখের সহিত আমাদিগকে পুনরায় জেলে প্রবেশের রাস্তা খুঁজিতে হইবে।"

জেনারেল স্মাট্‌স্ কমিশনে আর লোক লইতে অস্বীকার করিলেন এবং জানাইলেন যে, কমিশন কাহারও পক্ষ হইতে নিযুক্ত হয় নাই। কমিশন নিয়োগ কেবল সরকারের সন্তোষের জন্য। এই জবাব পাওয়ার পর আমার কাছে একটি মাত্র পথ রহিল—আমরা জেলের জন্য তৈরী হইয়া প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিলাম যে, ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারী ডারবান হইতে জেল-যাত্রীদের কুচ আরম্ভ হইবে। আমরা ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তি পাই ; ২১শে ডিসেম্বর উক্ত পত্র দিই এবং ২৪শে জেনারেল জবাব দেন। কিন্তু এই জবাবে একটা বিষয় ছিল, যে জন্য আমি জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে পত্র দিলাম। জেনারেলের জবাবে এই কথা ছিল—"নিরপেক্ষ ভাবে এই কমিশনের সভ্য নিযুক্ত করা হইয়াছে, ইহাতে যেমন ভারতীয় পক্ষের পরামর্শ লওয়া হয় নাই, তেমনি খনির মালিক বা চিনির ক্ষেতের মালিক-দেরও পরামর্শ লওয়া হয় নাই।"

এই হেতু আমি ব্যক্তিগতভাবে জানাইলাম যে, সরকার যদি ন্যায় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কতকগুলি অবস্থা জানাইবার সুযোগ আমাকে দিতে হয়। ইহার

জবাবে জেনারেল স্মাট্‌স্ দেখা করিতে স্বীকার করিলেন। এইজন্য কুচ করা দিনকতকের জন্য মুলতুবী রহিল।

এদিকে যখন গোখলে শুনিলেন যে, নূতন কুচ আরম্ভ হইবে তখন লম্বা তার পাঠাইলেন, লর্ড হার্ডিং-এর এবং তাঁহার অবস্থা কঠিন হইবে জানাইলেন এবং কুচ বন্ধ করিয়া কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিয়া সাহায্য করিতে পরামর্শ দিলেন।

আমার উপর ধর্ম্ম-সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। যদি কমিশনের সভ্য সংখ্যা না বাড়ানো হয়, তবে তাহা বর্জ্জন করা প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিয়াছি। লর্ড হার্ডিং নারাজ হইবেন, গোখলে দুঃখিত হইবেন, তাহা হইলে এই প্রতিজ্ঞা কি করিয়া রক্ষা করা যায়? এণ্ড্রুজ আমাকে বলিলেন যে, গোখলের ইচ্ছার কথা, তাঁহার অসুস্থ শরীরের কথা এবং আমাদের সঙ্কল্প দ্বারা তিনি যে আঘাত পাইবেন সে কথা যেন বিচার করিয়া দেখি। সেদিকে অবশ্যই আমারও খেয়াল ছিল। সম্প্রদায়ের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়াই স্থির করা হইয়াছিল যে, কমিশনে লোক সংখ্যা না বাড়াইলে যত হানিই হোক্ না কেন, কমিশন বর্জ্জন করিতেই হইবে।

সেইজন্য প্রায় এক শত পাউণ্ড (১৫০০৲) খরচ করিয়া গোখলেকে লম্বা তার করিলাম। তাহার ভাবার্থ এই প্রকার :—

"আপনার দুঃখ বুঝিতে পারিতেছি। সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াও আপনার পরামর্শ মত চলিতে ইচ্ছা রাখি। লর্ড হার্ডিং যে সাহায্য করিতেছেন তাহা অমূল্য। শেষ পর্য্যন্ত যাহাতে তাঁহার সাহায্য পাই সে প্রকার ইচ্ছা রাখি। কিন্তু আমি এই চাই যে, আমাদের অবস্থা যেন আপনি বুঝিয়া দেখেন। ইহাতে হাজার হাজার লোকের প্রতিজ্ঞার প্রশ্ন আসিয়া পড়িতেছে। প্রতিজ্ঞা বিশুদ্ধ ভাব হইতে গৃহীত। সমস্ত যুদ্ধটাই প্রতিজ্ঞার উপর গঠিত করা হইয়াছে। যদি প্রতিজ্ঞার বন্ধন না

থাকিত, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে অনেকে আজ পাড়িয়া যাইত। যদি হাজার হাজার লোকের গৃহীত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, তবে নীতি বলিয়া কিছু আর থাকিবে না। প্রতিজ্ঞা লওয়ার সময় লোকে খুব বুঝিয়াই লইয়াছিল। এই প্রকারের প্রতিজ্ঞা যেন ভাঙ্গা না হয় একথা আপনিও বলিবেন, ইহাই আমি ইচ্ছা করি। এই তারের কথা লর্ড হার্ডিংকে জানাইবেন। আমি ইহাও ইচ্ছা করি যে, আপনার অবস্থা সঙ্কটজনক না হয়। আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া এই লড়াই আরম্ভ করিয়াছি। গুরুজনদিগের, প্রধান ব্যক্তি-দিগের সাহায্য আমরা প্রার্থনা করি। তবে তাহা পাওয়া যাক্ আর নাই যাক্ প্রতিজ্ঞার বন্ধন ভঙ্গ করিতে পারা যায় না, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন। প্রতিজ্ঞা পালনে আপনার সহায়তা ও আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতেছি।”

এই তার গোখলের নিকট পঁহুছিল। ইহা তাঁহার ভগ্ন শরীরের উপর আঘাত করিল। কিন্তু তাঁহার সাহায্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিল না। অথবা যদি করিয়া থাকে তবে তাহাতে তাঁহার সাহায্য আরও বাড়াইয়া দিল। লর্ড হার্ডিংকে তিনি তার পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু আমাদিগকে ত্যাগ করিলেন না। লর্ড হার্ডিংও স্থির রহিলেন।

আমি এণ্ড্রুজকে সঙ্গে করিয়া প্রিটোরিয়া গেলাম। এই সময়ে রেলের গোরা কর্ম্মচারীদের বড় রকম হরতাল চলিতেছিল। সেই হরতালের জন্য সরকারের অবস্থা সঙ্গিন হইয়াছিল। এই শুভক্ষণে আমাকে কুচ আরম্ভ করিতে বলা হইল। আমি প্রকাশ্যভাবে জানাইলাম যে, আমাদের দ্বারা রেলওয়ে হরতালের এইভাবে সাহায্য করা চলিতে পারে না। আমাদের লড়াই অন্যরকম। উহার পদ্ধতিও ভিন্ন। যদি আমাদের কুচ করিতে হয় তবে অন্য সময়ে, যখন রেলওয়ের হাঙ্গামা

শান্ত হইয়া যাইবে, তখন করিব। এই প্রকার সিদ্ধান্তের পরিণাম খুব ভাল হইল। রয়টার এই সংবাদ তার যোগে বিলাতে পাঠাইল। লর্ড এম্পথিল বিলাত হইতে ধন্যবাদ দিয়া তার করিলেন। জেনারেল স্মাট্‌সের সেক্রেটারী তামাসা করিয়া বলিলেন—"আপনাদিগকে আমার মোটেই পছন্দ হয় না, আদৌ কোনও সাহায্য করিতে চাই না। কিন্তু কি করিব? আপনারা আমাদের সঙ্কটের সময় যাচিয়া সাহায্য করেন। আপনাদিগকে কি করিয়া মারা যায়? আমরা অনেক সময়ে এই ইচ্ছাই করি যে, আপনারাও এই ইংরাজ হরতালকারীদের মত হাঙ্গামা সুরু করিয়া দেন। তাহা করিলে ঠিক সিধা করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু আপনারা ত শত্রুরও হানি করিবেন না। আপনারা নিজেরাই দুঃখ সহ্য করিয়া জয়লাভ করিতে চান। বিবেকের সীমা অতিক্রম করেন না। এমত অবস্থায় আমাদিগকে নাচার হইয়াই থাকিতে হয়। এই ধরণের কথা জেনারেল স্মাট্‌স্‌ও বলিয়াছিলেন।

পাঠকেরা জানিবেন যে, সত্যাগ্রহীদের শত্রুর প্রতি এই প্রথম বিবেক অনুমোদিত ও বিনয়োচিত ব্যবহার নহে। যখন উত্তর অঞ্চলে হরতাল আরম্ভ হইল তখন কিছু আঁখ কাটা হইয়া ক্ষেতেই পড়িয়াছিল, সেগুলি জায়গামত না আনিয়া ফেলিলে মালিকের খুব লোকসান হইত। সেখানে কাজ শেষ করিয়া দেওয়ার জন্য পনের শত লোক ফিরিয়া যায় এবং কাজ শেষ করিয়া দিয়া আবার সাথীদের সহিত আসিয়া যোগ দেয়। যখন ডারবান মিউনিসিপালিটীর গিরমিটিয়ারা হরতাল করিল তখন যাহারা ঝাড়ুদার ও মেথরের কাজ করিত, যাহারা হাসপাতালে কাজ করিত, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। তাহারও খুসী হইয়া ফিরিয়া কাজে যায়। ঝাড়ুদার ও মেথর এবং হাসপাতালের লোক কাজে না গেলে সহরে রোগের প্রকোপ আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে ও রোগীদেরও

শুশ্রূষা হয় না। সত্যাগ্রহীরা ইহা ইচ্ছা করিতে পারে না। সেইজন্য বাড়ীর চাকরদিগকেও হরতাল হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছিল। সত্যাগ্রহীকে প্রত্যেক পদক্ষেপেই বিরুদ্ধ পক্ষের অবস্থার কথা বিচার করিতে হইবে।

সত্যাগ্রহীদের বিবেক-সম্মত কার্য্য করার দৃষ্টান্ত দ্বারা যে একটা সংপ্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহাতে ভারতীয়দিগের প্রতিষ্ঠা খুব বাড়াইয়া দিয়াছিল ও মিটমাটের অনুকূল আবেষ্টনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

প্রাথমিক মিটমাট

এমনি করিয়া মিটমাটের জন্য চারদিকের অবস্থা অনুকূল হইয়াছিল। আমি ও মিঃ এণ্ড্রুজ যখন প্রিটোরিয়ায় পঁহুছিলাম, তখন সার বেঞ্জামিন রবার্টসন স্পেশাল ষ্টীমারে করিয়া আসিয়া পঁহুছিলেন। লর্ড হার্ডিং তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সার বেঞ্জামিনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, জেনারেল স্মাট্স্ যে দিন দেখা করার জন্য ধার্য্য করিয়াছিলেন সেই দিনই আমরা দেখা করিতে বাহির হইলাম। তাঁহার জন্য অপেক্ষা করার কারণও কিছু দেখিলাম না। লড়াইয়ের শেষে যাহা প্রাপ্তব্য তাহা কেবল আমাদেরই শক্তির উপরে নির্ভর করিত।

আমরা দুই জনেই প্রিটোরিয়া পঁহুছিলাম। জেনারেল স্মাট্সের সহিত আমার একারই দেখা করার কথা। এদিকে স্মাট্স্ সাহেব রেলে ধর্ম্মঘটের দরুণ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এই হরতাল এত ভীষণ হইয়াছিল যে, ইউনিয়ন সরকারকেও সামরিক আইন (মার্শাল ল) জারি করিতে হইয়াছিল। এই রেল কর্ম্মচারীরা যে কেবল নিজেদের বেতন বৃদ্ধি চাহিতেছিলেন, তাহাই নহে, রাজ্যর উপর প্রভুত্বও তাঁহারা চাহিতেছিলেন। আমার প্রথম সাক্ষাৎ খুব সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমি দেখিলাম যে, প্রথম যখন যাত্রীদল যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল তখন তাঁহার ভিতর যে উষ্মা ছিল, আজ তাহা নাই। পাঠকগণের মনে আছে যে, সে সময় জেনারেল স্মাট্স্ কথা বলিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। সত্যাগ্রহীর ধমক তখনও যেমন ছিল, এখনো

তেমনি আছে। তখন তিনি কথা বলিতেও চাহেন নাই আজ তিনি পরামর্শ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

ভারতীয় সম্প্রদায়ের দাবি ছিল যে, ভারতীয় সম্প্রদায় হইতে কমিশনে কাহারও থাকা চাই। কিন্তু এ বিষয়ে জেনারেল স্মাট্‌স্ দৃঢ় রহিলেন। তিনি বলিলেন,—"উহা হইতে পারে না, উহাতে সরকারের প্রতিপত্তি খাটো হয়, তাহা ছাড়া আমি যে পরিবর্ত্তন করিতে চাই তাহাও করিতে পারিব না। আপনি জানিবেন যে, মিঃ এসেলেন আমার লোক এবং সংস্কার সম্বন্ধে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে যাইবেন না; বরঞ্চ সরকারের অনুকূল হইবেন। কর্ণেল ওয়াইলী নাতালের একজন বিখ্যাত লোক, তাঁহাকে ভারতীয়দের বিরুদ্ধও বলা যাইতে পারে। সেই জন্য ইঁহারাও যদি তিন পাউণ্ড কর উঠাইয়া দিতে চাহেন, তবে আমার কাজ সহজ হয়। আমার অসুবিধা নানা দিকের এবং আমি কোনও অবকাশ পাইতেছি না, সেই জন্য আপনাদের সহিত গোলমালটা মিটাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা করি। আপনারা যাহা চাহেন তাহাই দেওয়া আমরা সাব্যস্ত করিয়াছি। কিন্তু কমিশনের সম্মতি ব্যতীত দেওয়া যাইবে না। আপনার অবস্থাও আমি বুঝিতে পারিতেছি। আপনারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন যে, আপনাদের পক্ষস্থ কাহাকেও কমিশনে না লইলে আপনারা কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিবেন না। আপনারা সাক্ষ্য নাই-বা দিলেন। কিন্তু যাহারা সাক্ষ্য দিতে চায় তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখার আন্দোলন করিবেন না ও আপনার সত্যাগ্রহ মুলতুবী রাখিবেন। আমি মনে করি, এরূপ করিলে আপনারও লাভ হইবে ও আমিও শান্তি পাইব। হরতালকারীদের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া আপনারা বলিতেছেন, কিন্তু আপনারা ছাড়া তাহা প্রমাণিত হইবে না। অথচ আপনারা সাক্ষ্য দিতে চাহেন না। কিন্তু এ পুরাপুরি

আপনাদের ব্যাপার। সুতরাং ইহার ফলাফল আপনারাই বুঝিবেন।”

জেনারেল স্মাট্‌স্ এই ধরণের কথা বলিলেন। মোটের উপর আমি এ সকল কথা অনুকূল বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। সিপাহীদের ও দারোগের সম্বন্ধে আমি খুব অভিযোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু কমিশন বর্জ্জন করায় তাহা প্রমাণ করার অবকাশ আমাদের হইবে না—এই ধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। একপক্ষ বলিতেছিলেন যে, ভারতীয়দের পক্ষ হইতে সিপাইদের দোষ প্রমাণ করানো হোক্। তাঁহারা বলিতেছিলেন যে, যদি সাক্ষ্য না দেওয়াই সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে অভিযুক্তদের সম্বন্ধে অভিযোগ এমনভাবে প্রচার করা হোক্ যে, অভিযুক্ত ইচ্ছা করিলে মান হানির দাবিতে নালিশ করিতে পারে এবং ক্ষতি পূরণের দাবি করিতে পারে। আমার ইহাতে মত ছিল না। কমিশন সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন সে সম্ভাবনা ছিল না। মানহানির মোকদ্দমা আহ্বান করার মত প্রচার করিয়া সম্প্রদায় মহা ঝঞ্ঝাটে পড়িবে। কিন্তু লাভহ ইবে মাত্র এই সন্তোষটুকু যে সে অভিযোগ প্রমাণ করিয়াছে। উকীল বলিয়া আমি জানি যে, মানহানি প্রমাণ করা শক্ত। কিন্তু আমার সব চাইতে বড় যুক্তি এই যে, সত্যাগ্রহীকে ত দুঃখ সহ্য করিতেই হয়, সহ্য করিতেই ত তাহারা প্রস্তুত। তাহারা দুঃখ ভোগ করিয়াছে ইহা প্রমাণ করার কোনও সার্থকতা নাই। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা সত্যাগ্রহীর হওয়াই উচিত নহে। সেই জন্য নিজের দুঃখ হইয়াছে ইহা প্রমাণ করার অসাধারণ অসুবিধা না লইয়া, শান্ত হইয়া থাকাই ভাল বলিয়া মনে হয়। সত্যাগ্রহীকে মূল পদার্থের জন্যই যুদ্ধ করিতে হয়। আসল বস্তু হইতেছে সেই অন্যায় আইন। তাহা রদ করা অথবা পরিবর্ত্তন করার যেখানে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে

সেখানে অন্য গোলমালে না পড়াই ভাল। সত্যাগ্রহীর মৌনই তাহাকে অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে সাহায্য করিবে। এই প্রকার যুক্তি দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের অধিকাংশকেই আমি বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। আমাদের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচার প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা না করাই আমরা স্থির করিলাম।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পত্র আদান প্রদান

প্রাথমিক পত্র ব্যবহারের জন্য জেনারেল স্মাট্স্-এর সহিত আমার পত্র ব্যবহার চলে। আমার পত্রের মর্ম্ম এই প্রকার ছিল :—

"আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, আমাদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আমরা কমিশনকে সাহায্য করিতে পারিব না। আপনি আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন ও উহার জন্য মর্য্যাদা দেখাইয়াছেন। আপনি সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করার নীতি স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য আমি আমার স্বদেশবাসীকে এই উপদেশ দিতেছি যে, তাঁহারা কমিশনের নিকট শুধু সাক্ষ্যই দিবেন না কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য কোনও রূপে কমিশনকে বাধা দিবেন না। যে পর্য্যন্ত কমিশন চলিবে ও যে পর্য্যন্ত নূতন আইন না হইবে সে পর্য্যন্ত সরকারের অবস্থা কঠিন যাহাতে না হয়, সে জন্য সত্যাগ্রহও মুলতুবী রাখার পরামর্শ আমি দিতেছি। ভারতবর্ষের বড়লাট, সার বেঞ্জামিন রবার্টসনকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্প্রদায়কে বলিতেছি। জেলে ও হরতালের সময় আমাদিগকে যে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে সে সম্বন্ধে আমি এই জানাইতেছি যে, আমাদের প্রতিজ্ঞার জন্য আমরা তাহা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিব না। সত্যাগ্রহী হিসাবে আমাদের কাজ যতটা পারা যায় দুঃখ সহ্য করা ও তাহার জন্য অভিযোগ না করা। কিন্তু এ সময় আমাদের মৌন থাকার এ অর্থ করিয়া লওয়া উচিত হইবে না যে, আমাদের নিকট প্রমাণ করার মত সাক্ষ্য নাই। আমি চাই যে, আপনি আমাদের

অবস্থা বুঝিয়া লইবেন। আমরা যখন সত্যাগ্রহ মুলতুবী রাখিতেছি তখন যাহারা সত্যাগ্রহের জন্যই জেলে আছে তাহাদেরও মুক্তি পাওয়া দরকার। আমরা কি চাই সে কথাও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

১। তিন পাউণ্ড কর রদ করা।

২। হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা।

৩। শিক্ষিত ভারতবাসীর এদেশে প্রবেশাধিকার।

৪। অরেঞ্জিয়ার সম্বন্ধে যে সর্ত্ত আছে তাহা পরিবর্ত্তন করা।

৫। বর্ত্তমান আইনগুলির সৎ প্রয়োগ হওয়া চাই, অথচ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের কোনও ক্ষতি যেন না হয়।

যদি এই সকল বিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর পাই তাহা হইলে সত্যাগ্রহ মুলতুবী রাখার জন্য সম্প্রদায়কে আমি পরামর্শ দিতে পারি।

১৯১৪ সালের ২১শে জানুয়ারী আমি এই পত্র লিখি। সেই দিনই যে উত্তর পাই তাহার মর্ম্ম এইরূপ ছিল :—

"আপনারা যে কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে পারিবেন না তজ্জন্য সরকার দুঃখিত। তবে আপনাদের স্থিতি বুঝিতে পারিতেছি। আপনারা যে অত্যাচার ভোগ করার কথা এখন উত্থাপন করিবেন না তাহার হেতু সরকার বুঝিতেছেন। ঐ প্রকার যন্ত্রণা দেওয়ার কথা সরকার স্বীকার করেন না, কিন্তু যখন আপনারা সাক্ষ্য দিবেন না তখন সরকারের এ বিষয়ে কিছু করার নাই। সত্যাগ্রহী কয়েদীদিগকে মুক্তি দেওয়ায় হুকুম আপনার পত্র পাওয়ার পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রদায়ের দুঃখাদির বিষয় আপনি যাহা লিখিয়াছেন, কমিশনের রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত সরকার সে বিষয়ে কিছু করা মুলতুবী রাখিবেন।"

এই পত্রের আদান প্রদান হওয়ার পূর্ব্বে আমি ও মিঃ এণ্ড্রুজ

অনেকবার জেনারেল স্মাট্সের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে সার বেঞ্জামিন রবার্টসনও প্রিটোরিয়াতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সার বেঞ্জামিন লোকপ্রিয় বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং তিনি গোখলের পরিচয় পত্রও আনিয়াছিলেন, তথাপি আমি দেখিলাম যে সাধারণ ইংরাজ কর্ম্মচারীর যে সকল দুর্ব্বলতা আছে তিনি সে সকল হইতে মোটেই মুক্ত নহেন। তিনি আসার পর মুহূর্ত্ত হইতেই সম্প্রদায়ের ভিতর ভেদ বুদ্ধি সৃষ্টি করিতে ও সত্যাগ্রহীদিগকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রিটোরিয়াতে তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল হয় নাই। তিনি যে ধমক দেখাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমি যে টেলিগ্রাম সমূহ পাইয়াছিলাম সে কথা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। আমি কেবল তাঁহার সহিত কেন, সকলের সহিতই এইরূপ স্পষ্টতা ও বিশুদ্ধতার সহিত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি, সেই জন্য তিনি আমার মিত্র হইয়া পড়িলেন। আমি অনেক বারই দেখিয়াছি যে, যাহারা ভীত হয় তাহাদের সহিত 'আমলারা ভয় দেখানোর রীতিই গ্রহণ করেন এবং যাহারা ভয় না পাইয়া সিধা ব্যবহার করে, তাঁহারাও তাহাদের সহিত সিধা ব্যবহার করেন।

এই ভাবে প্রাথমিক মিটমাট হইল। সত্যাগ্রহ শেষবার মুলতুবী রহিল। অনেক ইংরাজ মিত্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা অন্তিম মিটমাটের সময় সাহায্য করিবেন এরূপ ভরসা দিলেন। সম্প্রদায়কে দিয়া এই মিটমাট স্বীকার করাইয়া লওয়া শক্ত ছিল। যে উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পড়িয়া যায় ইহা কাহারও অভিপ্রেত ছিল না। আর জেনারেল স্মাট্সকে কেহ বিশ্বাস করিলে ত? কতজনে আমাকে ১৯০৮ সালের মিটমাট স্মরণ করাইয়া দিলেন ও বলিলেন—"একবার জেনারেল স্মাট্স্ ঠকাইয়াছেন, অনেকবার নূতন বিষয় সত্যাগ্রহে প্রবেশ করানো

হইয়াছে বলিয়া বদনাম দিয়াছেন, সম্প্রদায়কে নানাপ্রকার সঙ্কটে ফেলিয়াছেন, তথাপি যে আপনি বুঝিতে পারেন না ইহা কি কম দুঃখের কথা? আবার এই লোকটি আপনাকে দাগা দিবে। কিন্তু আবার যখন আপনি সত্যাগ্রহ করার কথা বলিবেন তখন কে আপনাকে বিশ্বাস করিবে? ইহা কি কখনো সম্ভব যে, লোকে বারে বারে জেলে যাইবে ও বারে বারে বেকুব সাজিবে? জেনারেল স্মাট্‌সের মত লোকের সহিত একটা মাত্র মিটমাটই হইতে পারে—যাহা তিনি দিতে চাহেন তাহা হাতে হাতে দেওয়া। উঁহার নিকট প্রতিশ্রুতি লওয়া নয়। যে ব্যক্তি কথা দিয়া কথা ভাঙ্গে তাহাকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়?" এই ধরণের যুক্তির যে কতকটা স্থান ছিল তাহা আমি জানিতাম। আমি ইহাতে আশ্চর্য্য হই নাই। কিন্তু সত্যাগ্রহী যতই দাগা পাক্ না কেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস ভঙ্গ হওয়া স্পষ্ট কারণ না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতির উপর তাহাকে ভরসা রাখিতেই হইবে। যে দুঃখকেই সুখ জ্ঞান করে সে পরে দুঃখ হইতে পারে এই ভয়ে অবিশ্বাস করিতে পারে না। বরঞ্চ সে নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া, প্রতিপক্ষ যে দাগা দিবে সে বিষয়ে কোনও চিন্তা না করিয়া যতবার হোক্ দাগা খাইতে থাকিবে ও বিশ্বাস রাখিতে থাকিবে এবং ইহা জানিবে যে, এই করিয়াই সত্যের বল বাড়িবে ও বিজয় নিকটে আসিবে। এই জন্য নানাস্থানে সভা করিয়া আমি এই মিটমাট গ্রহণ করার জন্য লোকদিগকে বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। লোকেও ইহাতে সত্যাগ্রহের রহস্য বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। এবারকার মিটমাটের মধ্যস্থ এবং সাক্ষী ছিলেন মিঃ এণ্ড্রুজ। আবার বড়লাটের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন সার বেঞ্জামিন রবার্টসন। এই কারণে এই মিটমাট মিথ্যা হওয়ার খুবই কম সম্ভাবনা ছিল। যদি আমি মিটমাট না করার জন্য জেদ করিতাম তাহা হইলে আমাদের উপর উল্টা দোষ আসিত এবং আমরা ছ'মাস

পরেই যে বিজয়লাভ করিয়াছিলাম তাহা করিতে অনেক প্রকার বিঘ্ন আসিত। সত্যাগ্রহীর উপর যাঁহাতে এতটুকুও দোষ আরোপ না করা হয় সেই জন্যই 'ক্ষমা বীরস্য ভূষণম' এই বাক্য প্রচলিত হইয়াছে। অবিশ্বাস ভয় হইতেই উৎপন্ন হয়। সত্যাগ্রহে নির্ভয়তা আছে। নির্ভীকের আবার ভয় কি? যেখানে বিরোধীর বিরোধকেই জয় করিতে হইবে, বিরোধীর নাশ করিতে হইবে না, সেখানে অবিশ্বাস কেমন করিয়া থাকিতে পারে?

এইভাবে মিটমাট স্বীকার করার পর, সম্প্রদায় ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট বসার জন্যই অপেক্ষা করিয়াছিল। ইতিমধ্যে কমিশন চলিতে লাগিল। কমিশনে খুব অল্প ভারতীয়ই সাক্ষ্য দিয়াছিল। সেই সময় সম্প্রদায়ের উপর সত্যাগ্রহীদের যে কি প্রবল প্রভাব ছিল, ইহা তাহারই পরিচয়। সার বেঞ্জামিন রবার্টসন অনেক ভারতীয়কে সাক্ষ্য দিবার জন্য বলিতেছিলেন। কিন্তু যাহারা সত্যাগ্রহের বিরোধী ছিল সেই অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আর সকলেই সঙ্কল্পে স্থির ছিল। এই বর্জ্জনের প্রভাব মোটেই খারাপ হয় নাই। কমিশনের কার্য্য সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল ও রিপোর্ট শীঘ্রই বাহির হইয়াছিল। ভারতীয় সম্প্রদায় সাহায্য করে নাই বলিয়া রিপোর্টে খুব সমালোচনা ছিল। কমিশনারেরা সিপাইদের দুর্ব্যবহারের কথা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রদায় যে যে জিনিষ দাবি করিয়াছিল সে সমস্তই দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিন পাউণ্ড কর উঠাইয়া দিতে হইবে, বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের প্রার্থনা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আরও কতকগুলি ছোট ছোট জিনিষও তাঁহারা দিতে অনুরোধ করেন ও সমস্ত কাজই শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে অনুরোধ করেন। জেনারেল স্মাটস্ যেমন বলিয়াছিলেন এই কমিশনের রিপোর্ট তদনুরূপ হইয়াছিল। মিঃ এণ্ড্রুজ বিলাত যাওয়ার জন্য বিদায় লইলেন। সার

বেঞ্জামিন রবার্টসনও ভারতবর্ষে ফিরিলেন। কমিশনের পরামর্শ অনুসারে আইন তৈরী হইবে আমরা এই প্রকার আশ্বাস পাইয়াছিলাম। কি প্রকার আইন হইয়াছিল ও কেমন করিয়া হইয়াছিল ইহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

ষড়বিংশ অধ্যায়

কমিশন রিপোর্ট দেওয়ার অল্পদিন পরেই যে আইন দ্বারা মিটমাট হইবে তাহার খসড়া ইউনিয়ন গেজেটে বাহির হয়। এই খসড়া বাহির হইতেই আমাকে কেপটাউন যাইতে হইল। ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট সেইখানেই বসিবে—সেইখানেই বসিয়া থাকে। এই বিলে নয়টা বিধি ছিল। এই সমস্তটা ফুলস্কাপ কাগজের একখানা পাতাতেই ধরিয়া যায়। তাহার একটা অংশ ছিল—ভারতীয়দের বিবাহ সম্বন্ধে। উহার মর্ম্ম এই যে, ভারতবর্ষে যে বিবাহ আইনমত সিদ্ধ এখানেও তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু কোন এক সময় একাধিক পত্নী আইনতঃ স্বীকার করা হইবে না। দ্বিতীয় অংশ ছিল, সেই তিন পাউণ্ড কর যাহা প্রত্যেক গিরমিট মুক্ত ব্যক্তিকে স্বাধীন ভাবে থাকিতে হইলে প্রতি বৎসর দিতে হইত, তাহা রদ করা হইবে। তৃতীয় অংশ দ্বারা যাহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করার সার্টিফিকেট পাইয়াছিল তাহাদের সেই সার্টিফিকেটের মূল্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। এই সার্টিফিকেট যাহার নিকট আছে সে সেই সার্টিফিকেটের উল্লিখিত ব্যক্তি ইহা প্রমাণিত হইলেই তাহার দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার অধিকার আছে বলিয়া স্বীকৃত হইবে। এই বিলের উপর ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে দীর্ঘ এবং ভাল আলোচনা হইয়াছিল। যে সকল ব্যাপারের জন্য আইন প্রণয়ন আবশ্যক ছিল না, তাহার মীমাংসা আমার সহিত জেনারেল স্মাট্‌সের চিঠি পত্রদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কেপকলোনির মধ্যে শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার, যাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের

বিশেষ অনুমতি পাওয়া যায়, যে সকল শিক্ষিত ভারতবাসী ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাদের একাধিক পরিণীতা স্ত্রী আছে তাহাদের প্রবেশাধিকার—এ সকল বিষয়ও খোলাসা করিয়া লওয়া হইয়াছিল। জেনারেল স্মাট্সের পত্রে নিম্নোক্ত বাক্যও ছিল :—"প্রচলিত আইন সম্বন্ধে ইউনিয়ন সরকার সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনো ইচ্ছা করিতেছেন যে, এই সকল আইন ন্যায়পরতার সহিত এবং বর্ত্তমানে যে যে স্বার্থভোগ করিতেছে তাহা রক্ষা করিয়া প্রযুক্ত হইবে। এই পত্র ১৯১৪ সালের ৩০ জুন লেখা হইয়াছিল। সেই দিনই আমি জেনারেল স্মাট্সকে যে পত্র দিই তাহার মর্ম্ম এই :—

"আপনার আজকার তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি যে আমার কথা ধৈর্য্যের সহিত ও বিনয়পূর্ব্বক শুনিয়াছেন, সেজন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। ভারতীয়দিগের রিলিফ আইন এবং আপনার সহিত এই পত্র ব্যবহারের পর সত্যাগ্রহ যুদ্ধ শেষ হইতেছে। এই যুদ্ধ ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ হয়। ভারতীয় সম্প্রদায় এই যুদ্ধের জন্য অনেক দুঃখ ও আর্থিক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন ; সরকারকেও চিন্তিত হইতে হইয়াছে। মন্ত্রীগণ জানেন যে, আমার কয়েকজন দেশী ভাইয়ের দাবি বেশী ছিল। ট্রেড লাইসেন্স বিল, ট্রান্সভাল গোল্ড-ল, ট্রান্সভাল টাউনসিপ য়্যাক্ট ও ১৮৮৫ সালের ট্রান্সভালের তিন আইন—এই সকল আইনের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, আর ইহা না হইলে বসবাস করা, ব্যবসা করা অথবা জমির স্বত্ব পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার হয় না। আর এইজন্য আমার সেই সকল বন্ধুদের সন্তোষ হয় নাই। অনেকের এই ন্যায্য অসন্তোষও আছে যে, এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে অবাধে যাতায়াত করা যায় না। আবার কাহারও এই অসন্তোষ রহিয়াছে যে, বিবাহের আইন যাহা করা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নয়।

আমার নিকট তাঁহাদের এই দাবি ছিল যে, উক্ত সমস্ত ব্যাপারের জন্যও আমি সত্যাগ্রহ করি। কিন্তু আমি তাঁহাদের দাবি স্বীকার করিতে পারি নাই। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, কোনও দিন এ সব বিষয়ে লোকের দুঃখের লাঘব সরকারকে করিতেই হইবে। ভারতীয় সম্প্রদায়কে নাগরিকের সম্পূর্ণ অধিকার যত দিন না দেওয়া হইতেছে তত দিন সম্পূর্ণ সন্তোষ হইতে পারে না।

আমার ভাইদিগকে আমি এই কথা জানাইয়াছি যে, তাঁহাদিগকে ধৈর্য্য রাখিতে হইবে এবং উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া লোক-মত এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যে, উপরের লিখিত বিষয় ছাড়াও সরকারকে আরও অগ্রসর হইয়া যাইতে হয়। আমার আশা হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার গোরারা যখন বুঝিবেন যে, ভারতবর্ষ হইতে গির-মিটিয়া মজুর আসা বন্ধ হইয়াছে এবং নূতন আইন দ্বারা নূতন স্বাধীন লোক আসাও প্রায় বন্ধ হইয়াছে, যখন দেখিবেন যে, ভারতীয়দের এখানকার রাজকার্য্যে কোনও হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা নাই তখন ঐ সকল স্বত্বাধিকার ভারতীয়েরা পাইবেন, এবং গোরারাও বুঝিবেন যে, ভারতীয়দিগকে উহা দেওয়া উচিত। ইতিমধ্যে সরকার গত কয়েক মাস এই সকল প্রশ্ন যে উদারতার সহিত সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই উদারতার নীতি অবলম্বনে আপনার পত্রে লিখিত ভাবে যদি আইন সমূহ প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সম্প্রদায় কতকটা স্বস্তি পাইবে এবং সরকারকেও হয়রাণ করার কারণ হইবে না।

উপসংহার

আট বৎসর পরে এমনি করিয়া এই মহাযুদ্ধের অন্ত হইল, সারা দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী শান্তি পাইল। দুঃখ ও হর্ষ এই মিশ্রিতভাব লইয়া আমি বিলাতে গোখলের সহিত দেখা করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিব বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বাহির হইয়া পড়ি। যে আফ্রিকায় আমি একুশ বৎসর কাল কাটাইয়াছি, যেখানকার অসংখ্য মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর আমার জীবন যাত্রা অগ্রসর হইয়াছে, যেখানে আমি জীবনের কাম্য কি তাহা জানিতে পারিয়াছি, সে স্থান হইতে বিদায় লওয়া বড়ই কঠিন ও দুঃখদায়ক। তবু আমার মনে আনন্দ এইজন্য ছিল যে, ভারতবর্ষে গিয়া গোখলের অধীনে সেবা করার সৌভাগ্য পাইব।

এই যুদ্ধের যেরূপ সুন্দরভাবে অবসান হইয়াছিল আজ তাহার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার এখনকার ভারতীয়দের অবস্থা তুলনা করিলে একটা কথা মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইতে পারে যে, সত্যাগ্রহের জন্য এত দুঃখ ত সহ্য করা গেল, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইল? সত্যাগ্রহ অস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? এখানে ইহার উত্তর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। সৃষ্টির একটি নিয়ম এই যে, যে জিনিষ যে উপায়ে পাওয়া যায় সে জিনিষ সেই উপায়েই রাখা যায়। সেই জন্য দণ্ড দ্বারা লব্ধ বস্তু দণ্ড-দ্বারাই রাখা যায়, সত্য দ্বারা লব্ধ বস্তু সত্য দ্বারাই রাখা যায়। সেই জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা আজ যদি সত্যাগ্রহ অস্ত্রের ব্যবহার করে, তবে নিজেকে সুরক্ষিত করিতে পারে। সত্যাগ্রহের এ প্রকার বিশেষত্ব নাই যে, সত্যদ্বারা লব্ধ বস্তু সত্য ত্যাগ করিলেও রক্ষা করা যায়।

যদি এই প্রকার ফলই পাওয়া যাইত তাহা হইলে তাহাতে শুভ হইত না। সেই জন্য আজ যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা খারাপ হইয়াছে তাহার কারণ, তাঁহাদের মধ্য সত্যাগ্রহীর অভাব হইয়াছে। ইহাতে এখনকার ভারতীয়দিগকে দোষ দেওয়া হইতেছে না, সেখানকার বাস্তবিক অবস্থার নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ব্যক্তিই হোক্ অথবা সম্প্রদায়ই হোক্, তাহার ভিতর যে বল নাই তাহা ধার করিয়া কোথা হইতে আনা যাইবে? সত্যাগ্রহী সেবকেরা একের পর এক চলিয়া গিয়াছেন। সোরাবজী, কাছলীয়া, নাইডু, পার্শী রুস্তমজী প্রভৃতির স্বর্গবাস হওয়ায় অভিজ্ঞ লোকদের মধ্যে অল্প লোকই রহিয়াছেন। তাঁহারা এখনও যুদ্ধ করিতেছেন এবং আমার মনে সন্দেহ নাই যে, তাঁহাদের মধ্যে সত্য থাকিলে সময়ক্রমে তাঁহারা সম্প্রদায়কে রক্ষাও করিতে পারিবেন।

অবশেষে পাঠকগণ, একথা অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, যদি এই মহাযুদ্ধ না হইত, এবং বহু সংখ্যক ভারতবাসী যে দুঃখ সহ্য করিয়াছেন তাহা যদি না করিতেন, তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা থাকিতেই পারিতেন না। কেবল ইহাই নহে, উপরন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা যে জয় লাভ করিয়াছেন তাহার ফলে অন্যস্থানের প্রবাসী ভারতবাসীরা কম বেশী বাঁচিয়া গিয়াছে। আর তাহারা যদি না বাঁচিয়া যায় তবে তাহাতেও তাহাদের ভিতর সত্যাগ্রহের অভাব এবং ভারতবর্ষেরও তাহাদিগকে রক্ষা করার শক্তি নাই—ইহাই প্রমাণ হয়। সত্যাগ্রহ অমূল্য অস্ত্র, ইহাতে নিরাশার অথবা পরাজয়ের স্থান নাই। যদি এই ইতিহাস হইতে একথা অল্পবিস্তরও প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

সমাপ্ত

প্রতিষ্ঠান-গান্ধী-সাহিত্য

প্রকাশক—খাদিপ্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা

১। **গান্ধীজীর আত্মকথা**—গান্ধীজীর পবিত্র জীবন-কাহিনী। মূল গুজরাটী হইতে সতীশবাবুর অনুবাদ। ইহার ভাষা বালকেও বুঝিতে পারে। দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার ইংরাজী অনুবাদ দুইখণ্ডের মূল্য সাড়ে দশ টাকা। বাংলা অনুবাদ প্রতি খণ্ড ৪০০ শত পৃষ্ঠা করিয়া। প্রতিখণ্ডের মূল্য ৸০ আনা।

২। **দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ**—দক্ষিণ আফ্রিকার নাম থাকিলেও জিনিষটা ভারতের সহিত নাড়ীর সূত্রে যুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকাতে, গান্ধীজী সত্যাগ্রহ অস্ত্র আবিষ্কার করেন, ও সেখানকার ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য প্রয়োগ করেন। ইহা সত্যাগ্রহের মূল সূত্র কি ও সত্যাগ্রহীকে কি ভাবে আচরণ করিতে হয় তাহার বিস্তৃত ইতিহাস। বস্তুতঃ ইহাই সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় পুস্তক। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ এই পুস্তকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিতেছে। ইহা গান্ধীজীর লেখা ও সতীশ বাবুর অনুবাদ। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। (যন্ত্রস্থ)

৩। **হিন্দ্ স্বরাজ্য**—দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ যখন চলিতেছিল সেই সময় ভারতবর্ষে কি ভাবে সত্যাগ্রহ চলা উচিত তাহা গান্ধীজী লিখেন। এ গ্রন্থ খানা ১৯০৮ সালে লেখা। ইহাতে ঋষির দিব্য-দৃষ্টি দেখিবেন। সত্যাগ্রহীর কথা অব্যর্থ। গান্ধীজী পবিত্র-চিত্ত সত্যাগ্রহী। তিনি যাহা ১৯০৮ সালে বলিয়াছিলেন তাহা আজ নিজেই সম্পাদন করিতেছেন। ২২ বৎসর পূর্ব্বেও সেই চরখার কথা, ওকালতী ত্যাগ, সেই খেতাব ত্যাগ ও লবণ করের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। এই পুস্তকের ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতেছে—এখনো হইবে। গান্ধীজীর লেখা, সতীশবাবুর অনুবাদ। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১১৪ পৃষ্ঠা—মূল্য ।৵০ আনা।

৪। চম্পারণ সত্যাগ্রহ—ভারতবর্ষে প্রথম প্রজা-সত্যাগ্রহের ইতিহাস। গান্ধীজী যে সত্য দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার প্রথম প্রয়োগ ও সাফল্যের বর্ণনা। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের হিন্দী 'চম্পারণমে মহাত্মাজী' অবলম্বনে সতীশবাবুর লেখা। (যন্ত্রস্থ)

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—গান্ধীভাষ্য—সতীশবাবুর সঙ্কলন।—প্রথমভাগে সতীশ বাবুর লেখা গীতা প্রবেশিকা, শেষভাগে গান্ধীজীর অনাসক্তি যোগ। মূল, অন্বয়, শব্দার্থ, গান্ধীজীর মূল গুজরাটী ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের অনুবাদ। প্রতি অধ্যায়ের শেষে সঙ্কলনকারের দেওয়া ভাবার্থ। ডবল ফুলস্ক্যাপ, ১৬ পেজি, ৫৬৪ পৃষ্ঠা—মূল্য ৷৷০ আনা। এই গীতা পড়িলে গান্ধীজীকে ও তাঁহার প্রেরণার মূল ধর্ম্ম কি তাহা জানিতে পারিবেন।

৬। য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা—গান্ধীজীর জেল-জীবনের—১৯২১-২৩ এই দুই বৎসরের অমূল্য ইতিহাস। ইহাতে সত্যাগ্রহীর আচরণ কি হওয়া উচিত ও গবর্ণমেণ্টের সহিত জেলে বাসকালে কি প্রকার আচরণ করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। গান্ধীজী ও সরকার উভয়কেই জানিতে হইলে এই বহিখানা পড়া দরকার। গান্ধীজীর লেখা সতীশবাবুর অনুবাদ। (যন্ত্রস্থ)

৭। জীবন-ব্রত—যে সকল ব্রত গান্ধীজী পালন করিতে চেষ্টা করেন, যাহা সবরমতীতে প্রতিপালিত হউক বলিয়া গান্ধীজী ইচ্ছা করেন, যে আদর্শের দিকে ভারতবর্ষ সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও গান্ধীজী যাহার প্রগতি অক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, এই ছোট বইখানিতে তাহাই আছে। এক কথায় গান্ধীবাদ বা 'গান্ধীইজম' কি তাহা এই বইখানাতেই পাইবেন। গান্ধীজীর লেখা গুজরাটী হইতে সতীশবাবুর অনুবাদ। (যন্ত্রস্থ)

৮। স্বাস্থ্য-রক্ষা—গান্ধীজীর লেখা গুজরাটী হইতে সতীশবাবুর অনুবাদ। ইহাতে অশন বসন, রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিজ্ঞতা-লব্ধ অপূর্ব্ব জ্ঞান ও যে দার্শনিক ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা বালকেরও বুঝার উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। (যন্ত্রস্থ)

প্রতিষ্ঠান-স্বরাজ-সাধন গ্রন্থাবলী

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত

১। **ভারতের সাম্যবাদ**—লেনিনের মত রাজ্য-তন্ত্র, অথবা সোভিয়েট অথবা ফ্যাসিষ্ট রাজ্য-তন্ত্র—কোনটা ভাল, কোনটা আমাদের দেশের উপযোগী তাহা আলোচনা করিয়া ভারতের শাশ্বত সাম্যবাদ কি ছিল, এখনও কি হইতে পারে তাহা দেখানো হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই গ্রন্থে ভারতের সভ্যতার ধারা কতকগুলি প্রবন্ধে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১২৬ পৃষ্ঠা—মূল্য ৷৷৹

২। **কার্পাস শিল্প**—যে শিল্প নষ্টের সঙ্গেই এদেশের স্বাধীনতা লোপ পাইয়াছে, তাহার ইতিহাস ও তাহা পুনরুদ্ধারের যে পথ আছে তাহা জানা দরকার। গান্ধী-আন্দোলনের প্রাণ-পদার্থ চরখা কেন হইল ও চরখা যাওয়ায় কি গিয়াছে ও চরখা ফিরিয়া আসিলে কি পাওয়া যাইবে, তাহার যুক্তিপূর্ণ বিবরণ আছে। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১৬০ পৃষ্ঠা—মূল্য ৸৹ আনা

৩। **চরখার ব্যবহার**—চরখার গঠন ও উহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখাইয়া চরখার প্রত্যেক অংশের নাম ও ব্যবহার বুঝান হইয়াছে। চরখা ও পিঞ্জন খাটানো ও মেরামত করার জ্ঞান, চিত্র সহযোগে বুঝান হইয়াছে। মোট ৭৮ খানা চিত্র আছে। মূল্য ।৹ আনা

৪। **চরখা ও মিল**—কেন চরকা লইব, মিলে কি দোষ এই প্রশ্নের সুন্দর সমাধান রহিয়াছে। কেমন করিয়া চরখাতেই বস্ত্রের প্রয়োজন মিটিতে পারে ও চরখা ধ্বংসে দেশী মিলের স্থান কি তাহা বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৶৹

৫। **খাদিম্যানুয়াল**—খাদি-সংস্থা চালাইতে হইলে যে সকল বিষয় জানা দরকার তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা আছে। (ইংরাজীতে) মূল্য প্রথম খণ্ড ২৲ টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড ১৲ টাকা